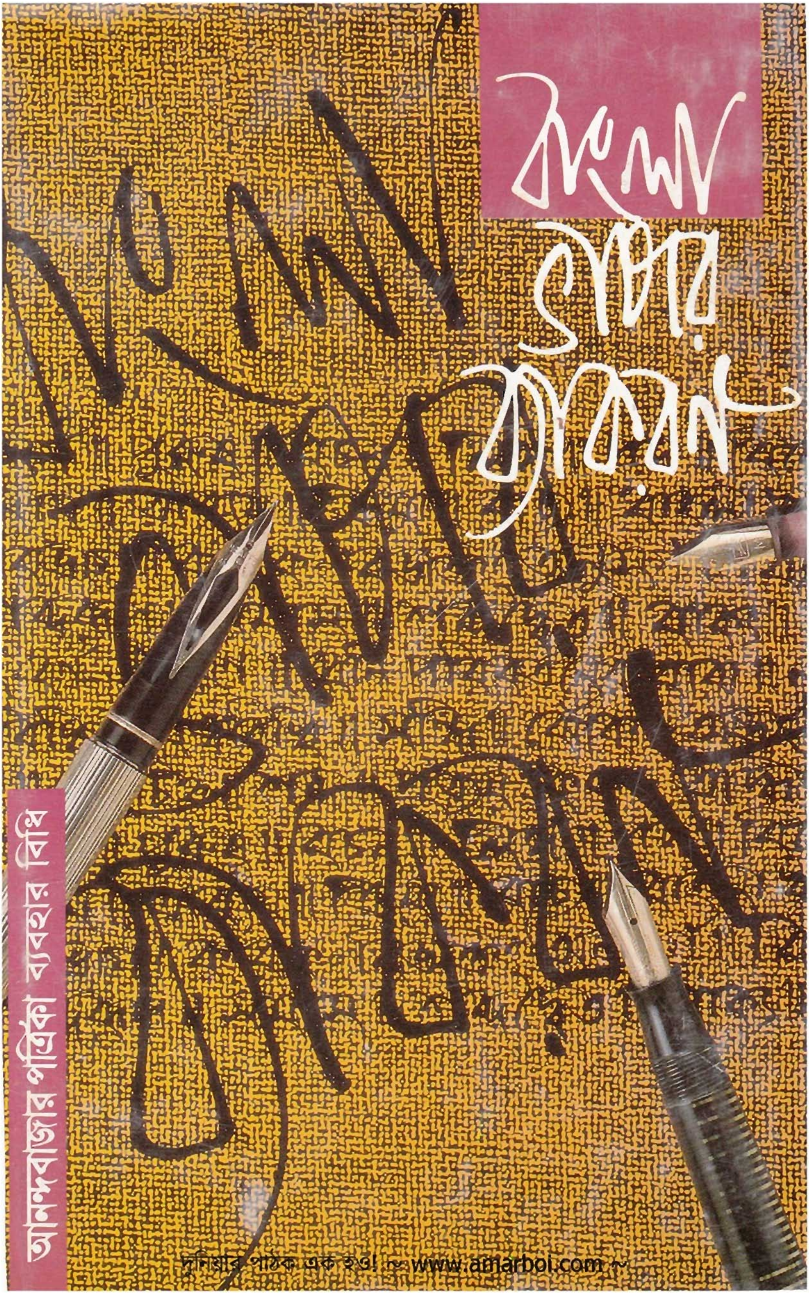

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষা, বাক্য শব্দ, অর্থ, ব্যাকরণবিধি ও বাগ্‌ধারা, এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য নানা ক্ষেত্রে যা শুদ্ধ রীতি বলে মান্য হবার যোগ্য, তারই সন্ধান-কর্মে নিযুক্ত রয়েছে 'আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহারবিধি'র অন্তর্ভূত গ্রন্থমালা। ভাষা যদি হয় একের ভাবনাকে অন্যের কাছে পৌঁছে দেবার মাধ্যম, তা হলে কীভাবে সেই মাধ্যমকে ব্যবহার করা সংগত, বাক্যের গঠন ও শব্দনির্বাচনই বা কেমন হওয়া উচিত, আবার যা আমাদের স্বাভাবিক বাগ্‌ধারা, তার সঙ্গেই বা আমাদের ভাষার সংগতি কীভাবে রক্ষিত হতে পারে, এই গ্রন্থমালা বস্তুত তারই পন্থা নির্দেশ করছে।

ভাষার উদ্‌ভব, বিকাশ ও রূপান্তর—একে-একে সবই এসে যাচ্ছে এই গ্রন্থমালার পরিকল্পিত বৃত্তে। একই সঙ্গে ভাবা হচ্ছে এমন কয়েকটি কোষগ্রন্থ ও শব্দাভিধানের কথাও, ঠিক যে-ধরনের কোষগ্রন্থ ও অভিধান ইতিপূর্বে অন্তত বাংলা ভাষায় রচিত হয়নি। যাঁর যে-বিষয়ে চর্চা অথবা অধিকার, তাঁরই উপরে ন্যস্ত সেই বিষয়ে গ্রন্থরচনার দায়িত্ব।

ব্যবহারবিধি-গ্রন্থমালায় প্রকাশিত প্রতিটি অভিমতই যে আনন্দবাজার পত্রিকার, এমন নয়। কিন্তু তাতে কিছু আসে-যায় না। এই পত্রিকা আসলে এ-ক্ষেত্রেও তৈরি করে তুলতে চায় এমন একটি পরিমণ্ডল, নানা বিষয়ে পারঙ্গম ব্যক্তিরা যেখানে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আপনাপন অভিমত ও সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করতে পারবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
ISBN 81-7215-306-6

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গলা ব্যাকরণ'-এর পর দীর্ঘকাল বাংলা ভাষার কোনও ব্যাকরণগ্রন্থ রচিত হয়নি—এমন গ্রন্থ যা পাঠ্যক্রমের দিকে তাকিয়ে রচিত নয়, সর্বসাধারণের দৈনন্দিন চাহিদাকে যা মেটাবে এবং জিজ্ঞাসু মনকে যা তৃপ্ত করবে। সেই দিকে তাকিয়েই এই ব্যাকরণগ্রন্থটির পরিকল্পনা। পাণিনি থেকে বিদ্যাসাগর—সংস্কৃত ব্যাকরণের এই আড়াই হাজার বছরের, এবং মানোয়েল থেকে সুনীতিকুমার—বাংলা ব্যাকরণের এই আড়াই শো বছরের পটভূমি অল্পপরিসরে আলোচিত এখানে। সেইসঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে প্রথাগত ব্যাকরণের সঙ্গে নব্য ব্যাকরণচিন্তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়। নোয়াম চমস্কি প্রভাবিত পাশ্চাত্য নব্যব্যাকরণচিন্তার বীজ যে ভারতীয় প্রাচীন ব্যাকরণচিন্তার মধ্যেও ছড়ানো ছিল এ-গ্রন্থে তা দেখিয়েছেন লেখক, একইসঙ্গে ইঙ্গিত দিয়েছেন ভবিষ্যতের বাংলা ব্যাকরণের চলার পথেরও। প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণের ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক দিকগুলির সঙ্গে পরপর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি সুপ্রয়োগ ও অপপ্রয়োগের বিভিন্ন নিদর্শন উপস্থিত করা হয়েছে এ-গ্রন্থে, ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের হাত ধরে চলতে-চলতে তুলে ধরা হয়েছে চলতি ভাষার বিশিষ্ট ভঙ্গিগুলিকে। সেদিক থেকে গ্রন্থটি একান্তভাবে মান্য চলিতভাষার ব্যাকরণ রচনার প্রেরণা হয়ে ওঠার যোগ্য। বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে রসবোধের এক অনবদ্য মিশেলে এ-গ্রন্থ আদ্যন্ত স্বাদু স্বাদু পদে পদে।

লেখক পরিচিতি : জন্ম ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে, দিনাজপুরে। উচ্চতর অধ্যয়নের বিষয় সংস্কৃত, কিন্তু চর্চার অন্তর্গত পালি, হিন্দি, উর্দু, ফার্সি ও আরবি ভাষা। বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় ও ভারতীয় ভাষাতেও অভিজ্ঞ। দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেছেন, এখন অবসৃত। অনূদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ : তিন খণ্ডে প্রকাশিত তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস ও দোহাবলী'। বিভিন্ন ভাষার অভিধান প্রণয়ন প্রকল্প, সাহিত্য আকাদেমি ও পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সঙ্গে যুক্ত। কিশোর সাহিত্যিক এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ গীতিকার-সুরকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচ্ছদ □ অমিয় ভট্টাচার্য ও কৃষ্ণেন্দু চাকী

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ

আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ

আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধি

আনন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৬
দ্বিতীয় সংস্করণ মে ২০০১
তৃতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৩

লেখক জ্যোতিভূষণ চাকী
প্রচ্ছদ অমিয় ভট্টাচার্য ও কৃষ্ণেন্দু চাকী
ফটো বিবেক দাস

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা
প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম,
যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি)
মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য
সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত
আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7215-306-6

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
জয়শ্রী প্রেস ৯১/১বি বৈঠকখানা রোড
কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত।

BANGLA BHASAR BYAKARAN
[Grammar]
by
Jyotibhusan Chaki

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

TK500-- -

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা ৭
প্রথম প্রকাশের ভূমিকা ৯
সংকেত-ব্যাখ্যা ১৪

প্রথম ভাগ : প্রবেশক

এক ▢ ভাষা : বাংলা ভাষা ১৭
দুই ▢ ব্যাকরণ : বাংলা ব্যাকরণ ২০
তিন ▢ আমাদের ব্যাকরণ-পরম্পরা ২৩
চার ▢ বাংলার শব্দভাণ্ডার ২৭
পাঁচ ▢ অর্থ পরিবর্তন ৩৮
ছয় ▢ বাগ্‌বিধি ৪২
সাত ▢ সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা ৪৮

দ্বিতীয় ভাগ : প্রথাগত ব্যাকরণ

ধ্বনিতত্ত্ব

আট ▢ ধ্বনি-বর্ণ-উচ্চারণ ৬৫
নয় ▢ ধ্বনি পরিবর্তনের ধারা ৮১
দশ ▢ নতি : ণত্ববিধি ও ষত্ববিধি ৮৯
এগারো ▢ সন্ধি ৯৪
বারো ▢ ঝোঁক-অন্তর্যতি-সুর ১০৮
তেরো ▢ ছেদচিহ্ন ১১১

রূপতত্ত্ব

চোদ্দ ▢ শব্দ ১১৯
পনেরো ▢ প্রত্যয় : কৃৎ ও তদ্ধিত ১২২
ষোলো ▢ উপসর্গ ১৪৫
সতেরো ▢ পুরুষ ১৫৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঠারো □ বচন ১৫৫
উনিশ □ লিঙ্গ ১৫৯
কুড়ি □ পদ ১৬৫
একুশ □ বিশেষ্য ১৬৭
বাইশ □ সর্বনাম ১৭০
তেইশ □ বিশেষণ ১৭৩
চব্বিশ □ অব্যয় ১৭৯
পঁচিশ □ ক্রিয়া ১৮৮
ছাব্বিশ □ বাচ্য ২০১
সাতাশ □ বাংলা ধাতুর গণবিভাগ ২০৫
আঠাশ □ কারক-বিভক্তি-অনুসর্গ ২১১
উনত্রিশ □ বিভক্তি ও শব্দরূপ ২২২
ত্রিশ □ সমাস ২৩১
একত্রিশ □ শব্দদ্বৈত ২৫০

বাক্যতত্ত্ব

বত্রিশ □ বাক্য ২৫৫
তেত্রিশ □ পদবিন্যাস ২৬৪
চৌত্রিশ □ বাক্যবিন্যাস ২৬৯

তৃতীয় ভাগ : নব্য ব্যাকরণ চিন্তা

পঁয়ত্রিশ □ বাক্যতত্ত্ব ও আধুনিক ব্যাকরণ ২৭৫
ছত্রিশ □ পাশ্চাত্যের ভাষাচিন্তা বা ব্যাকরণচিন্তার প্রেক্ষাপট ২৭৭
সাঁইত্রিশ □ চম্‌স্কি : রূপান্তর-সঞ্জননী ব্যাকরণ ২৮৬
আটত্রিশ □ সোস্যুর-চম্‌স্কি ও প্রাচীন ভারতীয় বাক্‌চিন্তা ২৯২
উনচল্লিশ □ প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণ ও নূতন ব্যাকরণ ভাবনা ২৯৪

টীকা ২৯৯
গ্রন্থপঞ্জি ৩০৭
নির্দেশিকা ৩১৩

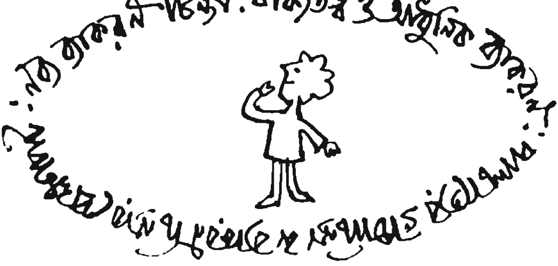

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় প্রথমেই বলব প্রথম মুদ্রণে বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিকেরা বইটির যে সমালোচনা করেছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। তাঁদের বেশকিছু পরামর্শে আমি উপকৃত হয়েছি এবং তা অনুসরণ করে কিছু কিছু সংশোধনও করেছি। বইটিতে 'সংস্কৃতের আঁচল' ধরেছি ঠিকই, তবে সন্তান যেমন করে মায়ের আঁচল ধরে তেমনি করে ধরেছি। ভাষার পথচলায় আমরা এখনও হোঁচট খাচ্ছি। অপপ্রয়োগে, বর্ণচ্যুতিতে, শব্দগ্রন্থনে সর্বত্রই আমাদের দুর্বলতা প্রকট। আঁচল একেবারে ছেড়ে দিলে আমাদের বড়ই 'দুরাবস্থা'য় পড়তে হতে পারে। তাই প্রথাগত ব্যাকরণ হিসেবেই এ বইটি লেখা। তবে প্রথাগত ব্যাকরণের গণ্ডির মধ্যে থেকেই মান্য চলিতভাষার স্বভাবধর্মগুলিতেও যথাসম্ভব চিহ্নিত করেছি। খাঁটি বাংলা ব্যাকরণের (লিখিত) স্বরূপ কী হবে তা নিয়ে মত ও মতান্তর লক্ষ্য করেছি। তাতে সংস্কৃত-সন্ধি বর্জিত হবে ধরে নেওয়া যায়, যদি থাকে তা হলে তা ধ্বনিপরিবর্তনের ধারা দিয়ে ব্যাখ্যাত হবে। এ বইয়ে আমি যেমন পাণিনীয় বিজ্ঞানের ধারায় সন্ধি বিশ্লেষণ করেছি তেমনি ধ্বনিবিজ্ঞানের ধারাও দেখিয়েছি। খাঁটি বাংলা সন্ধি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি, সেখানে পালির প্রভাবও দেখিয়েছি। খাঁটি বাংলা ব্যাকরণে সমাসও হয়তো থাকবে না, থাকলে কীভাবে থাকতে পারে তাও আলোচনা করেছি। কারকবিভক্তি হয়তো একেবারে অন্যপদ্ধতিতে লেখা হবে, তবে সে-সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট রূপরেখা এখনও পাইনি। সম্প্রদান ও অপাদান বাদ দিলেও মূল ধাঁচটা কী হবে সে সম্বন্ধে ভাষাতাত্ত্বিকেরা স্থির সিদ্ধান্তে আসেননি। খাঁটি বাংলা ব্যাকরণে আলোচ্য সম্ভাব্য সব প্রকরণই এতে আলোচিত হয়েছে। ছদ্মবেশী সমাস বা অব্যয় আলোচনা তো একেবারে বাংলার স্বধর্মের দিকে তাকিয়ে করেছি। বাক্যের উপর হয়তো নতুন ব্যাকরণে সবচেয়ে বেশি জোর পড়বে, চমস্কিচিন্তার পর। এই প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখেই চলিতভাষা ও বাক্যপ্রকরণে চলিতভাষার স্বভাবের উপরেই জোর দিয়েছি। এ ব্যাকরণটি নতুন দিনে অচল হোক এই তো চাই। অভিধানের মতো ব্যাকরণও প্রকাশের দিনটিতেই বাসি হয়ে যায়। এই সংস্করণে কয়েকটি ক্ষেত্রে ভাষাতত্ত্ববিদ ড. পৃথ্বীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পরামর্শ পেয়েছি। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

জ্যোতিভূষণ চাকী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম প্রকাশের ভূমিকা

সুধীজনেষু,

আমি ভাবতেই পারিনি এমন একটা গুরু দায়িত্ব আমার উপর এসে পড়বে।

কী ছিল বিধাতার মনে! হঠাৎ একদিন আহ্বান এল অভীক সরকারের কাছ থেকে : সকলের জন্য একটা বাংলা ভাষার ব্যাকরণ লিখতে হবে ; পাঠ্যসূচির গণ্ডি পেরিয়ে। গণ্ডি পেরোবার ইচ্ছেটা প্রবল হলেও গণ্ডি পেরোবার পৌরাণিক ভয়টাও সঙ্গে সঙ্গে থাকেই। তবু দায়িত্বটা মাথা পেতে নিলাম। কারণ, ফল যতই প্রাংশুলভ্য হয়, বামন ততই হয় উর্ধ্ববাহু। 'এই ব্যাকরণে নব্যব্যাকরণ চিন্তাও আলোচিত হলে কেমন হয়?' অভীকবাবুর প্রশ্ন। বললাম, 'মন্দ হয় না, কারণ ভবিষ্যতের বাংলা ব্যাকরণ হয়তো নোয়াম চম্স্কির ভাষাচিন্তাকে এড়িয়ে চলতে পারবে না।' এ আলোচনার নিষ্কর্ষ হল, আমাদের আলোচ্য হবে প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণই, তবে আধুনিক ব্যাকরণের সঙ্গে তার একটা সেতুবন্ধনের ইঙ্গিত যদি এতে থাকে তাতে ক্ষতি নেই। এই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন সুহৃদ্‌বর নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, যিনি সর্বদাই ভাষাজিজ্ঞাসু।

দায়িত্ব নিয়ে প্রথমেই মনে হল পদক্ষেপের নির্দেশ পাবার জন্য একটু পিছু ফিরে তাকানো দরকার—সেই আড়াই হাজার আর আড়াই শো বছর পিছনে। পাণিনি থেকে বিদ্যাসাগর—সংস্কৃত ব্যাকরণের এই ধারাটি আড়াই হাজার বছরের, আর মানোএল থেকে সুনীতিকুমার—বাংলা ব্যাকরণের এই ধারাটি আড়াই শো বছরের। প্রথম ধারাটির কাছে দ্বিতীয় ধারাটি ঋণী, তবু তা স্বতন্ত্র খাতে বয়ে চলতে চেয়েছে নিজের প্রাণশক্তিতে। ব্যাকরণ সেই প্রাণশক্তির সন্ধানীমাত্র।

AMARBOI.COM

প্রথমেই মনে পড়ে মানোএল সাহেবকে। বাংলা ব্যাকরণ লেখায় তিনিই প্রথমে হাত দিয়েছিলেন। হোক নিজেদের বাণিজ্যের তাগিদে বা ধর্মপ্রচারের তাগিদে, হোক পোর্তুগিজ ভাষায় লেখা, তবু তা আমাদের মাতৃভাষার প্রথম ব্যাকরণ। বঙ্গদেশ পোর্তুগিজদের একটি বিশেষ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। মানোএল দ্য আস্‌সুম্প্‌সাঁও ছিলেন ঢাকার ভাওয়াল অঞ্চলে। সেখানকার ভাষার আধারেই তিনি প্রথম বাংলা ব্যাকরণ লিখেছিলেন (প্রকাশকাল ১৭৪৩)। তারপর হ্যালহেড-কেরি-হটন প্রমুখ ইংরেজ সাহেবদের উদ্যোগেই বাংলা ব্যাকরণ লেখা হতে থাকে ইংরেজি ভাষাতে, যাতে সিভিলিয়ানরা বাংলা শিখতে পারেন। এখন প্রশ্ন, নিজস্ব বাংলা ব্যাকরণের পটভূমি হিসেবে এই সব ব্যাকরণকে কতটা পেয়েছি। দেখা যাচ্ছে, এঁদের মনের মধ্যে ছিল লাতিন ব্যাকরণের ছাঁচ, সেই ছাঁচের ছাপ যে এই সব ব্যাকরণে পড়বে তা তো খুবই স্বাভাবিক। তবু বাংলা ভাষার বিশিষ্ট কিছু রূপ এঁদের দৃষ্টি এড়ায়নি। এঁদের ব্যাকরণে পুরাতন কিছু প্রয়োগের যে-সব উদাহরণ মেলে পরবর্তী ব্যাকরণের উপকরণ হিসেবে সেগুলির ঐতিহাসিক মূল্য আছে। কিছু প্রয়োগ বেশ কৌতূহলোদ্দীপক, যেমন মানোএলের ব্যাকরণে 'একটা'-'একটী' যথাক্রমে পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ। হ্যালহেডের ব্যাকরণে প্রাচীন কবিতার উদাহরণে সম্বোধনে 'এ' বিভক্তি এবং এ-বিভক্তির পূর্বনিপাত ইত্যাদি। মানোএল ছাড়া অন্যান্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদেশিরা সংস্কৃত শিখেছিলেন তাই সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শটাও তাঁদের মনের মধ্যে ছিল। ফলে পরবর্তী ব্যাকরণের ধারা হয়ে উঠেছিল লাতিন-তথা-ইংরেজি এবং সংস্কৃতের মধ্যগা। রামমোহনও প্রথমে ইংরেজিতেই ব্যাকরণ লিখেছিলেন (Bengali Grammar in the English language)। বিদেশিরাই ছিলেন এ ব্যাকরণের উদ্দিষ্ট। কিছুটা দোটানার মধ্যে থাকলেও মাতৃভাষা বাংলা হবার দরুন রামমোহনের ব্যাকরণে বাংলা ভাষা-প্রকৃতির অনেক বৈশিষ্ট্যই ধরা পড়েছিল, কিছু মৌলিক চিন্তাও ছিল। কারককে তিনি ক্রিয়ান্বয়ী বলে মনে করেননি, বিশেষ্যের সঙ্গে বিশেষ্যের সম্পর্ককেও তিনি 'কারক সম্বন্ধ' বলে স্বীকার করেছিলেন। তাঁর উদ্ভাবিত case-এর 'পরিণমন' পরিভাষাটিতে case-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরা পড়ে। এ ব্যাকরণে সাধুভাষার প্রয়োগের দিকেই ঝোঁক ছিল। সাধুভাষার সঙ্গে চলিতভাষার প্রয়োগের বিশ্লেষণ প্রথম দেখা গেল শ্যামাচরণ সরকারের ব্যাকরণে (১৮৫০)। এ ব্যাকরণটিও প্রথমে ইংরেজিতে লেখা হয়েছিল সিভিলিয়ানদের জন্য। বিদেশিদের দিকে তাকিয়ে বাংলা ব্যাকরণ লেখার ধারাটি অব্যাহত রইল। ভাষাতাত্ত্বিক জন বিম্‌স্‌-এর বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হল ১৮৯১ সালে এবং পরে ১৮৯৪ সালে। ১৮৯৮ সালে রবীন্দ্রনাথ *ভারতী* পত্রিকায় এই ব্যাকরণটির সমালোচনা করেছিলেন। লেখ্য ও কথ্য ভাষার প্রভেদ থাকার দরুন, উচ্চারণের ব্যাপারে বিম্‌স্‌ যে-সব সূত্র রচনা করেছিলেন বহু ক্ষেত্রেই তার অপ্রযোজ্যতা দেখিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এ সমীক্ষা স্বাদেশিকদের কাছেই ঈপ্সিত ছিল অথচ কেউ এ ব্যাপারে এগিয়ে আসেননি, এ জন্য রবীন্দ্রনাথ দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন। নানা ত্রুটি সত্ত্বেও বিম্‌স্‌-এর ব্যাকরণে প্রণিধানযোগ্য অনেক বিষয়ই যে ছিল তা আলোচনা করেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

এই বিম্‌স্‌ সাহেবই বাংলা ভাষাকে প্রণালীবদ্ধ করার জন্য একটি সাহিত্য-সংস্থা স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন। রামগতি ন্যায়রত্ন ও রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ অনেকেই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য প্রস্তাবটি সমর্থন করেছিলেন বঙ্গদর্শনের একটি সম্পাদকীয় টীকায়। বিম্‌স্‌-এর মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে ১৮৮২ সালের ১৭ই জুলাই 'সারস্বত সমাজ' নামে একটি সাহিত্য সংস্থা স্থাপিত হল রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সভাপতিত্বে। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল বাংলা সাহিত্য ও ভাষাবিষয়ক আলোচনা। কিন্তু এই সংস্থা স্থায়ী হল না। একই উদ্দেশ্য নিয়ে বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অব লিটারেচার নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল ১৮৯৩ সালের ২৩শে জুলাই। ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী ও এল্‌ লিওটার্ড-এর উদ্যোগে এই অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠা হয়। পরের বছরই এর নামকরণ হয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। বাংলা সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে এই পরিষৎ একটি স্বর্ণযুগের সূচনা করেছিল। ভাষা ও সাহিত্য এই সংস্কৃতিচর্চায় একটি বিশিষ্ট স্থান নিয়েছিল। পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকল বাংলা ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণবিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধ। এই সব প্রবন্ধ লিখতেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্যোমকেশ মুস্তফি, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্তরঞ্জন রায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী, বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রমুখ সুধীজন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলা ব্যাকরণের পটভূমি হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষ একটি অধিবেশনের কথা স্মরণ করি।

১৯০১ সালে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে আয়োজিত এই অধিবেশনে 'বাংলা ব্যাকরণ' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়। এই প্রবন্ধ পাঠের পর বক্তব্যের সপক্ষে ও বিপক্ষে যাঁরা আলোচনায় যোগ দেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বীরেশ্বর পাঁড়ে, চারুচন্দ্র ঘোষ, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগীন্দ্রনাথ বসু, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখ বিদ্বজ্জন।

শাস্ত্রীমহাশয়ের মূল বক্তব্য ছিল এই যে স্কুলপাঠ্য বাংলা ব্যাকরণ অনেক রচিত হয়েছে বটে, কিন্তু তার মধ্যে কিছু সংস্কৃতঘেঁষা মুগ্ধবোধ-প্রভাবিত, আর কিছু ইংরেজিব্যাকরণ-প্রভাবিত। কিছু উভয়ের মিশ্রণে জগাখিচুড়ি। বাংলার নিজস্ব গতিপ্রকৃতির দিকে কেউ নজর দেননি। তাঁর মতে সন্ধি প্রভৃতি অনেক প্রকরণই বাংলার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন, কারক বিভক্তি গোঁজামিল, মিশ্রক্রিয়াকল্পন উদ্ভট, শব্দব্যুৎপত্তি-প্রাধান্য আপত্তিকর ইত্যাদি। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা কেউ পূর্ণত কেউ বা অংশত শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্যকে সমর্থন করেন। সংস্কৃতের সপক্ষে প্রধান বক্তা ছিলেন বীরেশ্বর পাঁড়ে। তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের সঙ্গে বাংলা ব্যাকরণের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার উপর জোর দেন। একটি উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, 'অনেকে পিতা শব্দকে শব্দের মূল রূপ বলিতে চাহেন, কারণ বাঙ্গালায় পিতা এই শব্দে বিভক্তি যোগ হয়, পিতাকে পিতার পিতা দ্বারা। কাজেই তাঁহারা 'পিতৃ' শব্দের অস্তিত্ব বাঙ্গালা ব্যাকরণে লোপ করিতে চাহেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য পৈতৃক, পিতৃব্য, পিতৃকৃত্য স্থলে 'পিতা' পাইবেন কোথায় ?' এই ধরনের বাদানুবাদের প্রত্যুত্তরে সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বললেন, 'আজকের প্রবন্ধের আলোচনায় দেখা গেল, মত দ্বিবিধ হইয়াছে। সংস্কৃতানুসারে ব্যাকরণ আর বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতিগত ব্যাকরণ। উভয়ের সামঞ্জস্য আবশ্যক। যে কোনও ভাষার গতি পর্যালোচনা করিলেই দেখা যায় ভাষা ব্যাকরণের অনুসারে গঠিত হয় না, গঠিত ভাষার নিয়মাদি নির্ধারণ ব্যাকরণের কর্তব্য।'

হীরেন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকেই এই মত ব্যক্ত করেন। রবীন্দ্রনাথ এই সব আলোচনায় অত্যন্ত অনুপ্রাণিত বোধ করে বলেন, 'সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সহজে বুঝা যায়, কিন্তু কোথায় কোথায় কিরূপ পার্থক্য আছে সেগুলি লক্ষ্য করাই এখন আবশ্যক। তবেই ইহার বর্তমান আকৃতি জানা যাইবে, তবেই ব্যাকরণ গঠনের চেষ্টা হইতে পারিবে।'

এই সব সমালোচনার উপর পুনরালোচনা সূত্রে পরবর্তী কালে সুকুমার সেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বক্তব্য সমর্থন করে বলেছেন, 'বাংলা ব্যাকরণে শব্দরূপে সংস্কৃত ও ইংরেজি ব্যাকরণের জোট মেলাবার চেষ্টা করে লেখকেরা যে বিভক্তি-কারক-case-এর ঘণ্ট পাক করে গেছেন তা এখনও বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের গলাধঃকরণ করতে হচ্ছে। এই দোষের ভাগী আমি-ও, সুনীতিবাবুর মতো। অপরাধ যেমন স্বীকার করছি, তেমনি এ কথাও জোর দিয়ে বলছি যে বাংলা ব্যাকরণ আমার নিজস্ব চিন্তা ও গবেষণার সাহায্যে রচনা ও প্রকাশ করার কোনও উপায় ছিল না।' (পঃ বঃ পুস্তক পর্ষদ প্রকাশিত *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনাসংগ্রহ* ২য় খণ্ড : প্রাসঙ্গিক তথ্যে ১নং সূত্র।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ঐতিহাসিক বিতর্কের কিছু অংশ এই জন্যই উল্লেখ করলাম যে ভবিষ্যতের ব্যাকরণের রূপ কেমন হওয়া উচিত তার ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যাবে।

মহাগ্রন্থ ও. ডি. বি. এল-এ বাংলা ভাষার পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পর *ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ* রচনায় সুনীতিকুমারকেও পাঠ্যের দিকে তাকাতে হয়েছিল, তবু এই বাংলা ব্যাকরণটিই ভবিষ্যৎ বাংলা ব্যাকরণের প্রেরণা হয়ে থাকল।

নতুন করে ব্যাকরণটি লিখতে চেষ্টা করেছি বৈয়াকরণ রবীন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার ও সুকুমার সেনকে সর্বদা মনের মধ্যে রেখে। কার কথাই বা ভোলা যাবে? শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষাগত আধুনিক দৃষ্টি, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাশৈলীর নির্দেশনা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ব্যাকরণরচনার নীতি-ভাবনা, রামেন্দ্রসুন্দরের ধ্বনি-চিন্তন, রাজশেখর বসুর শব্দ-চিন্তন, সুকুমার রায়ের শব্দার্থকৌতুকী—এসব গোপনে গোপনে কাজ করে যাবে যে কোনও ভাষাপথযাত্রীর মনে মনে।

এই ব্যাকরণে প্রথাগত ব্যাকরণ ও নব্যব্যাকরণচিন্তাকে একত্রিত করা হয়েছে। প্রথাগত ব্যাকরণে সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলা যেখানে যতটা সম্পর্কিত সেখানে ততটাই রাখা হয়েছে, বাংলার নিজস্বতাকে বিস্মৃত না হয়ে। প্রসঙ্গত পূর্বসূরিদের মতের মূল্যায়ন ও অন্য ভাষার সঙ্গে তুলনাত্মক আলোচনাও এসে পড়েছে অনেক বিষয়ে।

ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণে সুনীতিকুমার বাংলা ভাষার সাধু ও চলিত রীতি ও বাংলার শব্দসম্ভার আলোচনা করেছেন প্রবেশক বিভাগে। আমরাও তাই করেছি কিন্তু যে-শব্দার্থতত্ত্বকে তিনি পরিশিষ্টে রেখেছেন তা আমরা 'প্রবেশকে' রেখেছি শব্দসম্ভারের পরেই, শব্দসম্ভারের সঙ্গে অর্থ পরিবর্তনের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে। এর পর এসেছে বাগ্‌বিধি যা অর্থ পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত। বাগ্‌বিধি কথাটি আমরা বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ অর্থেই নিয়েছি যদিও যে-কোনও ভাষা নিজেই একটি বাগ্‌বিধি বা idiom। তবু ইংরেজিতে idiom বলতে সাধারণত idiomatic phrase বোঝায় আমরাও সেই অর্থেই 'বাগ্‌বিধি' শব্দটি ব্যবহার করেছি, সংকুচিত অর্থে। এই বাগ্‌বিধির মধ্যেই আমরা বিচিত্র অর্থব্যঞ্জনা পাই। যা semantics বা বাগর্থবিজ্ঞানের সমীক্ষার বিষয়। semantics আগে দর্শন ও তর্কবিদ্যারই বিষয় ছিল, এটি ব্যাকরণের আলোচ্য হয়েছে বর্তমান শতকের মাঝামাঝি। ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্বই ছিল ব্যাকরণের প্রধান আলোচ্য। প্রচলিত পরিভাষাই সর্বত্র গৃহীত হলেও কয়েকটি প্রাচীন পরিভাষার উল্লেখ করেছি প্রসঙ্গক্রমে। সর্বত্র পরিভাষার ব্যাখ্যা করেছি ব্যুৎপত্তি অবলম্বনে। 'কৃৎ' 'তদ্ধিত' 'প্রত্যয়' ইত্যাদির ওই নাম কেন হল তা ছাত্রাবস্থায় আমরা জানতে পারিনি। পুরুষগুলিরই বা উত্তমপুরুষ ইত্যাদি নাম কেন হল এ সব বিষয়ে আমাদের কৌতূহলের অন্ত ছিল না। প্রসঙ্গত তাই এদের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করেছি নানা প্রসঙ্গে।

প্রথম পর্বে প্রথাগত ব্যাকরণের পর দ্বিতীয় পর্বে নব্যব্যাকরণচিন্তা আলোচিত হয়েছে। নব্যব্যাকরণচিন্তার পটভূমি হিসেবে আমাদের প্রাচীন ব্যাকরণ চিন্তা এবং পাশ্চাত্য ব্যাকরণ পরম্পরার রূপরেখা এসেছে, সেই সূত্রেই এসেছে নোয়াম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চম্‌স্কির রূপান্তর-সঞ্জননী ব্যাকরণের কথা। আমাদের প্রাচীন ব্যাকরণ চিন্তায় যে পাশ্চাত্যের নব্যব্যাকরণচিন্তার বীজ পাওয়া যায় তা দেখানো হয়েছে। সব শেষে নব্যব্যাকরণচিন্তা থেকে আমরা আধুনিক বাংলা ব্যাকরণে কিছু নিতে পারি কি না তা আলোচিত হয়েছে।

এ ব্যাকরণ মূলত বর্ণনাত্মক হলেও কোথাও কোথাও তা নির্দেশাত্মক হয়ে উঠেছে। অপপ্রয়োগগুলি দেখানো হয়েছে। বলা বাহুল্য ব্যাকরণে চলন্ত ভাষার পথরোধ করতে আমরা কেউ চাই না। 'ফল' অর্থে 'ফলশ্রুতি' কি ঠেকানো গেল ? যাকে আমরা আজ অপপ্রয়োগ বলছি তা যে পরবর্তী কালে ভাষায় গৃহীত হতে পারে যে-কোনও ভাষার ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দেবে। এই প্রসঙ্গে এরিক প্যাট্রিজের *Usage and abusage'* গ্রন্থের প্রচ্ছদটির কথা হয়তো আপনাদের মনে পড়ছে। গভীর কালো রঙে titleটির 'ab' কে হালকা লাল রঙের একটি স্ট্রোকে কাটা হয়েছে, সেই একই স্ট্রোকে 'ab' অংশটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে usageএর আগে। এমন মার্জিত সত্যান্বেষী কৌতুক কমই দেখা যায়।

সাহিত্য লোকমুখ এবং সংবাদপত্র—এ সবই এ বইটির বিভিন্ন প্রকরণের উৎস। সংবাদপত্রের উদাহরণগুলি সবই আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে নেওয়া। সংবাদপত্র আজ ক্রমশ সংবাদ সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে। সংবাদপত্রের সঙ্গে সমাজজীবনের যোগ ক্রমশ ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠেছে। তাই জনমানসে সংবাদপত্রের প্রভাবের কথা মনে রেখেও এই ব্যাকরণজিজ্ঞাসা। কিছু বলতে গিয়ে বা লিখতে গিয়ে ভাষাপ্রয়োগের ব্যাপারে আমার মনে যে-সব প্রশ্ন জেগেছে সেগুলো হয়তো আপনাদেরও অনেকেরই প্রশ্ন—সে সবের জবাব খুঁজেছি এই ব্যাকরণ রচনার মধ্যে দিয়ে।

এই ব্যাকরণ রচনায় অভীক সরকার ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল নিকটভাষণ ও দূরভাষণে। এতে নতুন করে ভাবতে হয়েছে কোনও কোনও বিষয়ে। ড. পবিত্র সরকার, ড. মৃণালকান্তি নাথ, ড. রত্না বসু, বিশ্বপতি চাকী, ড. কল্যাণ দাশগুপ্ত, সুভাষ ভট্টাচার্য, ড. করুণাসিন্ধু দাস ও প্রকৃতি চাকীর কাছ থেকে নানা বিষয়ে সাহায্য পেয়েছি। সাহায্য পেয়েছি বাদল বসু এবং মলয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটেছে মুদ্রণ-সূত্রে। ঋণ বহু ছাত্র ও শিক্ষকের কাছে, অনেক পথচারীর কাছেও।

এই ব্যাকরণরচনায় কোনও পরিশ্রম করেছি বলে মনেই হয়নি। পূর্বসূরিরা যে পথ তৈরি করে গিয়েছেন সেই পথ ধরেই এগিয়েছি। আশেপাশে তাকিয়ে কিছু না-দেখা সৌন্দর্য দেখতে দেখতে চলেছি। তবে অনেক কিছুই হয়তো দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে। আর, গচ্ছতঃ স্খলনং সে তো আছেই। তবে ভরসা এই আপনারাই হাত ধরে তুলবেন।

২২.১১.৯৫ **জ্যোতিভূষণ চাকী**

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংকেত-ব্যাখ্যা

সা সাধু ভাষা
চ চলিত শব্দ
ইং ইংরেজি
আ. আরবি
ফা. ফারসি
লা. লাতিন
< পরেরটা থেকে আগেরটা উৎপন্ন বা রূপান্তরিত, যেমন হাত < হথ < হস্ত
> আগেরটা থেকে পরেরটা উৎপন্ন বা রূপান্তরিত যেমন, হস্ত> হথ > হাত
বাং বাংলা
√ ধাতুচিহ্ন (√গম্)
(১), (২) ইত্যাদিতে টীকার উল্লেখসংখ্যা
আ. বা. আনন্দবাজার পত্রিকা
১.২, ১.৩ ইত্যাদি প্রথম সংখ্যাটি পরিচ্ছেদ বোঝাবে, দ্বিতীয়টি ওই পরিচ্ছেদের অন্তর্বিভাগ বোঝাবে।
জ. ইংরেজি Z-এর ধ্বনি বোঝাতে
Trule রূপান্তরসূত্র

কৃৎ-তদ্ধিত প্রকরণে ধাতুর আগে উপসর্গ বা উপপদগুলির পর ড্যাসের বদলে হাইফেন চিহ্ন রাখা হয়েছে, যেমন প্র-√নম্+অ=প্রণাম। ধাতুর সঙ্গে উপসর্গের ঘনিষ্ঠতা বোঝাবার জন্যেই এই পদ্ধতি অবলম্বিত।

রূপান্তর-সঞ্জননী ব্যাকরণাংশের সংক্ষেপণগুলি সেখানেই ব্যাখ্যাত হয়েছে।

AMARBOI.COM

বানানবিধি

এই গ্রন্থে আনন্দবাজার পত্রিকার নির্দেশিত বানানপদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে। 'বাংলা কী লিখবেন কেন লিখবেন' গ্রন্থে এই ব্যবহারবিধি আলোচিত হয়েছে।

লেখকদের উদ্ধৃতিতে বানান যেমন আছে তেমনই রাখা হয়েছে।

বিদেশি নামের বানানে মূলভাষার কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম ভাগ : প্রবেশক

এক ▢ ভাষা : বাংলা ভাষা
দুই ▢ ব্যাকরণ : বাংলা ব্যাকরণ
তিন ▢ আমাদের ব্যাকরণ-পরম্পরা
চার ▢ বাংলার শব্দভাণ্ডার
পাঁচ ▢ অর্থ পরিবর্তন
ছয় ▢ বাগ্‌বিধি
সাত ▢ সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

ভাষা : বাংলা ভাষা

সেই সুদূর অতীতে কবে কখন মানুষ প্রথম কথা বলেছে তা আর জানবার উপায় নেই। কেমন করে ভাষা এল মানুষের মুখে তা এক অপার রহস্য। প্রকৃতি থেকেই সে ধ্বনি অনুকরণ করেছে, না ভয় বা বিস্ময়জনিত ধ্বনি উৎসারণের মধ্য দিয়েই ভাষায় পৌঁছেছে তা নিয়ে আজও জল্পনাকল্পনার শেষ নেই। তাই ভাষার দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বলতে ইচ্ছা করে—'ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে'। হ্যাঁ, এই ইচ্ছের সঙ্গে প্রয়োজন তো মিশে ছিলই। আভাসে-ইঙ্গিতে মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করেছিল বটে, তবে ক্রমশ জীবনের জটিলতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশের পথে আরও এগিয়ে যেতে সে নিশ্চয় চেয়েছিল। জানি না প্রথম যার মুখে কথা ফুটেছিল 'কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া—এ আমি কী বললাম।' এ ধরনের কোনও বিস্মিত জিজ্ঞাসা তার মনে জেগেছিল কি না। কথা বলতে বলতে তা জল-হাওয়ার মতো সহজ হয়ে উঠল। যে-ভাষা মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিত হল তা ক্রমশ আটপৌরে হয়ে গেল, তার সৌন্দর্য বা মাধুর্যের প্রতি আমরা উদাসীন হয়ে পড়লাম। বৈদিক ঋষির কণ্ঠে তাই ধ্বনিত হয়েছে—

> 'ভাষাকে কেউ দেখেও দেখে না, কেউ শুনেও শোনে না, কিন্তু সে অন্যের জন্যে নিজের দেহ প্রকাশ করে, পতির জন্যে সুসজ্জিতা প্রেমময়ী জায়ার মতো।' (১)

ধ্বনির মাধ্যমে ভাববিনিময় পশুজগতেও চলে, তবে সে ধ্বনি খুবই সীমিত, বিশেষ কতগুলি ভাবপ্রকাশেই তা নিঃশেষিত, কিন্তু মানুষের কণ্ঠধ্বনির সেই সীমাবদ্ধতা নেই। সে অজস্র ধ্বনি-প্রতীক সৃষ্টি করে অজস্র ভাবের আদানপ্রদান করতে পারে।

বহু ভাষাই জন্ম নিয়ে চিরদিনের জন্যে লুপ্ত হয়েছে কোনও চিহ্ন না রেখেই। তবু এখনও আনুমানিক দু-তিন হাজার ভাষা প্রচলিত আছে সারা পৃথিবীতে।

মানুষের ভাষার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা খুবই কঠিন। তবে, মোটামুটিভাবে ভাষার কয়েকটি লক্ষণ আমাদের চোখে পড়ে।

■ ভাষা পরস্পর ভাব-বিনিময়ের একটি মাধ্যম।

■ এই পারস্পরিকতা বিশেষ কোনও সমাজ বা জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

■ ভাষা ধ্বনি-প্রতীকের একটি সুসমঞ্জস বিন্যাস-ব্যবস্থা।

■ ওই ধ্বনি-প্রতীকগুলি বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত। এই উচ্চারণ মুখগহ্বরে জিভের বিশেষ অবস্থান বা তার বিভিন্ন অংশে জিভের স্পর্শকে কেন্দ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে। উচ্চারণে জিভের এই গুরুত্বের জন্যে বিভিন্ন ভাষায় জিভ আর ভাষা বোঝাতে একই শব্দ চলে, যেমন ইংরেজি 'tongue', ফারসি 'জবান', আরবি 'লিসান', ফরাসি 'langua', ইতালীয় 'lingua', স্পেনীয় 'lengua' ইত্যাদি।

১.১ ■ ভাষার সংজ্ঞা

ভাষার সংজ্ঞা যদি দিতে হয় তা হলে তা অনেকটা এইরকম দাঁড়াতে পারে—ভাষা মনের ভাবপ্রকাশের জন্যে বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন এমন শব্দসমষ্টি যা স্বতন্ত্রভাবে বিশেষ কোনও জনসমাজে ব্যবহৃত।

এই সংজ্ঞা অনুসরণ করে বলা চলে এই সব শর্ত মেনে যে-ভাষা বাঙালি জনসমাজে প্রচলিত, তা-ই বাংলা ভাষা। খুব খারাপ লাগছে বাংলা ভাষার সংজ্ঞা দেবার জন্যে এই সব কসরত করতে হচ্ছে বলে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে প্রমথ চৌধুরীর কথা—'বাংলা ভাষা কাকে বলে ? বাঙালির মুখে এ প্রশ্ন শোভা পায় না। এই প্রশ্নের সহজ উত্তর কি এই নয় যে, যে-ভাষা আমরা সকলে জানি শুনি ও বুঝি, যে-ভাষায় আমরা ভাবনা চিন্তা সুখদুঃখ বিনা আয়াসে বিনা ক্লেশে বহুকাল হতে প্রকাশ করে আসছি, এবং সম্ভবত আরও বহুকাল পর্যন্ত প্রকাশ করব, সেই ভাষাই বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষার অস্তিত্ব প্রকৃতিবাদ অভিধানের ভিতরে নয়, (২) বাঙালির মুখে'।

(কথার কথা ২৫৬, *প্রবন্ধসংগ্রহ*)

AMARBOI.COM

১.২ ■ উপভাষা

বাঙালির মুখে এক-এক অঞ্চলে এক-এক ভাষা। এই আঞ্চলিক ভাষাকে আমরা উপভাষা (dialect) বলি।

ভাষা সম্প্রদায়ের লোক খুব কম হলে সে ভাষায় কোনও উপভাষা দেখা যায় না, কিন্তু লোকসংখ্যা বেশি হলেই সে সম্ভাবনা দেখা দেয়। কারণ লোকে পৃথক পৃথক অঞ্চলে গণ্ডিবদ্ধ হয়ে পড়ে। তারা সেইসব অঞ্চলের বিশেষ সামাজিক বন্ধন ও বৃত্তিগত ব্যাপারে নিয়ন্ত্রিত থাকে বলে পারস্পরিক বাগ্‌ব্যবহারে তাদের মধ্যে বিশেষ ভঙ্গি, শব্দপ্রয়োগ ইত্যাদি দেখা দেয়, ফলে তাদের ভাষা মূল ভাষা থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। এ বাংলায় যেমন মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া ইত্যাদি ও বাংলায় তেমনি ঢাকা, মৈমনসিংহ, বরিশাল, কুমিল্লা ইত্যাদি অঞ্চলের বিভিন্ন উপভাষার সৃষ্টি হয়েছে। আসলে কোনও উপভাষা হল একটি ভাষার ভৌগোলিক রূপভেদ।

১.৩ ■ মান্য চলিত ভাষা

ভাগীরথী তীরে শিক্ষিত সমাজের উপভাষা লেখ্য ভাষার স্বীকৃতি পেয়েছে। একে আমরা বলছি মান্য চলিত ভাষা (Standard colloquial Bengali)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১.৪ ■ সাধুভাষা

এই মান্য চলিত ভাষা সাহিত্যে প্রবর্তিত হবার আগে সাহিত্যে যে মার্জিত ভাষা প্রায় দুশো বছর হল ব্যবহৃত হয়ে আসছে তাকে আমরা বলি সাধুভাষা (Chaste and Elegant Bengali)। এ ভাষা একান্তভাবেই লেখার ভাষা, মুখের ভাষা নয়।

সাধুভাষার ইংরেজি পারিভাষিক অনুবাদ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতেই পারে, কারণ চলিতভাষা মোটেই unchasteও inelegant নয়। কিন্তু সুনীতিকুমার সমর্থিত হওয়ায় এটি দীর্ঘদিন হল চলে আসছে। তাই এই অনুবাদ ব্যবহার করলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২

ব্যাকরণ : বাংলা ব্যাকরণ

ভাষাকে বর্ণনা করে বা বিশ্লেষণ করে দেখাবার চেষ্টা থেকেই ব্যাকরণের জন্ম, কিন্তু কী বর্ণনা করে দেখানো হবে ? দেখানো হবে কীভাবে ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয়, শব্দগুলি কীভাবে গঠিত হয়, তাদের রূপান্তরই বা কীভাবে সাধিত হয়, সেগুলি বাক্যে কীভাবে বিন্যস্ত হয়—এই সব। এ সব যদি আমরা বিশ্লেষণ করে দেখি তা হলে ভাষার কোনটি স্বভাবধর্ম তা ঠিকমতো বুঝতে পারব, কীসে তার স্বধর্মচ্যুতি তাও বুঝতে পারব।

ব্যাকরণের এই সূত্রই বাংলা ব্যাকরণের বেলাতেও খাটে।

বাংলা ব্যাকরণ কী ? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলতে পারি—যে ব্যাকরণ বাংলাভাষার ধ্বনি, শব্দ, পদ ও বাক্য ইত্যাদির বিশ্লেষণ করে ভাষার স্বরূপটিকে তুলে ধরে তাকেই আমরা বাংলা ব্যাকরণ বলতে পারি। সংজ্ঞাটির মধ্যেই ব্যাকরণ কেন পড়ব তার উত্তর প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। স্বরূপকে জানলেই বিরূপকে এড়াতে পারব—আমাদের কথায় ও লেখায় আমরা যথাযথ অর্থাৎ বাগ্‌বিধিসম্মত হতে পারব।

বাংলা ব্যাকরণ কি সংস্কৃতের আঁচল ধরেই চলবে ? বলা বাহুল্য সংস্কৃতের কাছে বাংলার ঋণ অপরিশোধ্য হলেও বাংলার চলনকে আমাদের পৃথক করে দেখতেই হবে। তবে যেখানে সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য সেখানে সংস্কৃত ব্যাকরণের গণ্ডির মধ্যে আমাদের যেতে হতেই পারে। প্রশ্ন ওঠে সংস্কৃত ব্যাকরণে তো শুধু পদসাধনের ওপরেই জোর দেওয়া হয়েছে, বাংলা ব্যাকরণেও কি তা-ই হবে ? আসলে ব্যাকরণকে মহাভাষ্যে প্রসঙ্গত যে-ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে গণ্ডগোলটা বোধ হয় সেখানেই। পতঞ্জলি বলেছেন, 'ব্যাক্রিয়তে অনেন, অর্থাৎ এর দ্বারা শব্দসাধন ব্যাখ্যাত হয় তাই এটি ব্যাকরণ।' এই উক্তিটিকে সামগ্রিকভাবে ব্যাকরণের সংজ্ঞার্থ হিসেবে ধরাটাই ভুল। (৩) পতঞ্জলি পাণিনির সর্বসঞ্চারী ভাষাবোধকেই বিশ্লেষণ করেছেন। পাণিনিতে প্রথমেই ধ্বনিতত্ত্বের যে বিস্তারিত বিশ্লেষণ আছে সারা বিশ্বের ধ্বনিতত্ত্ব গবেষণা তার কাছে ঋণী। এ ব্যাকরণের আর-একটি অংশ শব্দ ও ক্রিয়ারূপ সাধন। পদবিন্যাস বা syntax যে এ ব্যাকরণের অপরিহার্য অঙ্গ তা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। কারণ, পদের স্বরূপ আলোচনা বাক্যে তার ব্যবহার্যতার সঙ্গে অভিন্ন। কারকবিভক্তির আলোচনাও বাক্যনির্ভর। তাই বর্ণনাত্মক ব্যাকরণের সব অংশই যে এখানে আছে ব্লুমফিল্ড্ তা বহুদিন আগেই লক্ষ করেছিলেন :

> This Grammar (Panini) which dates from somewhere around 350 to 250 BC is one of the greatest monuments of human intelligence. It describes, with the minutest details, every

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

inflection, derivation and composition, and every syntactic usage of its author's speech. No other language, to this day, has been so perfectly described. *(Language* p II, L. Bloomfield)

বলা বাহুল্য, বাংলা ব্যাকরণ বাংলার স্বধর্মকেই ব্যাখ্যা করবে, কিন্তু এই ব্যাখ্যায় আমরা এই মহান পূর্বসূরিকে কোনও কোনও ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে পারি কি না তা ভেবে দেখতে হবে।

আধুনিক ব্যাকরণে বাক্যগঠন ও তার প্রথাপ্রকরণ নিয়ে গবেষণার যে নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে বাংলা ব্যাকরণের ক্ষেত্রে তার প্রযোজ্যতা নিয়েও আমাদের ভাবতে হবে।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে আরবিতে বাক্যরীতিকেই ব্যাকরণ বলা হয়েছে। 'ইলম্-উল্-নহ্ব্' শব্দটিতেই আছে তার সাক্ষ্য। (৪) বাংলায় বিশেষ করে সাধু-চলিত দুটি রীতি প্রচলিত থাকায় বাক্যরীতি বিশ্লেষণ যে বিশেষ গুরুত্ব পাবে তা বলাই বাহুল্য।

'দ্বাদশভির্বর্ষৈর্ব্যাকিরণং শ্রূয়তে ততঃ প্রতিবোধনং ভবতি'—বারো বছর ব্যাকরণ পড়ুক, তারপর বুদ্ধি কিছুটা খুলবে।

এ কথা শুনেই মনে হবে 'যঃ পলায়তি স জীবতি।'

এই জন্যে পাণিনির সঙ্গে পতঞ্জলির যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন বিষ্ণুশর্মারও, যিনি বারো বছরকে ছয় মাসে নামিয়ে আনতে পারেন।

কিন্তু কথাটা তা নয়। বারো বছর কেন? আজীবনই তো ব্যাকরণ আমাদের সঙ্গী, কারণ আজীবনই আমাদের মুখে রইবে ভাষা। সে ভাষা যেমন বদলাবে, ব্যাকরণও তেমনি বদলাবে। তার মানে ভাষা ও ব্যাকরণকে বলা যেতে পারে—একটি নিত্যবহতা ধারা। আসলে আমরা যে ব্যাকরণ মেনেই চলছি তা আমরা নিজেরাই জানি না। ফরাসি নাট্যকার মলিয়েরের সেই জেন্ট্ল্ম্যানের মতো আমরাও হয়তো বলতে পারি—এ কী! সারাজীবনই আমি ব্যাকরণ মেনে চলেছি?

ব্যাকরণ অনেক সময় বিপদে মধুসূদন। 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এ জটায়ু তপ্সেকে জিজ্ঞেস করছেন 'মুমূর্ষুতে উ-ঊ কোন্টা কীভাবে আসে, ভাই তপ্সে?' তপ্সে উ-ঊর পূর্বাপর আগম-নিগমটা বলে দেয়। ব্যাকরণজানা তপ্সে-ভাইদের সঙ্গে পেলে লিখিয়ে-দাদাদের খুশি হবারই কথা।

'আমি ও-সব ব্যাকরণ-ট্যাকরনের ধার ধারি না, ব্যাকরণই আমাকে অনুসরণ করে চলে'—এ ধরনের কথা কাউকে কাউকে বলতে শোনা যায়।

এ কথা ঠিক ব্যাকরণ পড়ে কেউ কথা বলতে শেখেনি, কথা এসেছে আপনা থেকেই। কিন্তু মানুষের মুখে কথা ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে একটা আদলও তৈরি হতে লাগল আপনা থেকেই। অনেক পরে সেই-সব আদল বোঝবার চেষ্টা থেকেই ব্যাকরণের জন্ম। যিনি বলেন ব্যাকরণ-ট্যাকরন মানি না, তিনিও অজান্তেই ব্যাকরণের পথ ধরে চলেন।

সুকুমার রায়ের 'আবোলতাবোল'-এ প্রথম পাতাতেই তাঁরই সৃষ্ট একটি অদৃশ্য চরিত্র ঘোষণা করল : 'হাঁস ছিল সজারু...হয়ে গেল হাঁসজারু (ব্যাকরণ মানি না)' ; ব্যাকরণ না মেনেই হাঁসজারু, হাতিমি, বকচ্ছপ ইত্যাদি যে-সব শব্দ গড়ে উঠল দুটো শব্দকে কাটা-ছেঁড়া করে তারপর একটি অংশ আর-একটির সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুড়ে, তার মধ্যেও একটা ব্যাকরণ পাওয়া গেল। ভাষাতত্ত্বে এই ধরনের শব্দগড়াকে একটি বিশেষ প্রবণতা বলে চিহ্নিত করা হয়। বাংলার ধোঁয়াশা, ইংরেজির 'টাইগন' তো আসলে হাঁসজারু-শব্দই। বৈদিক যুগেই তৈরি করা হয়েছিল এ ধরনের শব্দ : শ্যাম+শ্বেত=শ্যেত।

এই ধরনের তথাকথিত ব্যাকরণ-না-মানা অনেক শব্দ অভিধানে ঠাঁই করে নিয়েছে। তার মানে যাকে অনিয়ম বলা হচ্ছে আসলে তা-ও নিয়ম।

যে-কোনও ভাষাই বহতা নদীর মতো। বাংলাও তাই। তা বদলে বদলে চলছে, চলবেও। কোনও কোনও পরিবর্তন ব্যাকরণ হয়তো মেনে নেবে, কোনও কোনওটা হয়তো এক্ষুনি মানবে না, মানতে একটু দেরি হবে। ভাষাকে উদার হয়েও কখনও কখনও একটু বাছবিচার করতেই হয়। ভোরবেলা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে খবর পড়ছি আমরা। অনেক নতুন নতুন শব্দ আমাদের চোখে পড়ছে, চোখে পড়ছে বাক্যসংকোচনের নতুন কিছু রীতি, যতিচিহ্নেরও কিছু নতুন ব্যবহার, বানানের ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন ইত্যাদি ইত্যাদি।

এগুলোকে নির্বিচারে স্বাগত জানাব, না বাছবিচার করে গ্রহণ করব তা নিয়ে তো আমাদের ভাবতে হবেই, আর আমাদের সেই সব ভাবনার দিকেই তো ব্যাকরণ তাকিয়ে আছে। ব্যাকরণের মতো নিরপেক্ষ তো কেউ নেই। তাকে সালিস মানলে সে বলবে, 'আমার হাঁ-ও নেই, না-ও নেই। তোমরা যা বলছ বা লিখছ আমি তার রহস্যটাকে ধরবার চেষ্টা করছি মাত্র।' (৫)

এক সময়ে ব্যাকরণের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে : ars bene dicendi et bene scribendi অর্থাৎ ব্যাকরণকে বলা হয়েছে 'ঠিকমতো বলা আর লেখার কলাবিদ্যা'। কিন্তু আমরা তো দেখছি আজকের যে correct diction সে diction কাল আর থাকছে না। ব্যাকরণকেও ছুটে চলতে হচ্ছে। সেই গতিমান ব্যাকরণের হাত ধরেই আমাদের এগোতে হবে।

এ ব্যাকরণ সাধু ও মান্যচলিত বাংলা নিয়ে। আঞ্চলিক বাংলা নিয়ে নয়। অবশ্য আঞ্চলিক ভাষার কোনও শব্দ বা প্রয়োগরীতির উল্লেখ থাকতেই পারে বিশেষ কোনও ক্ষেত্রে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩

আমাদের ব্যাকরণ-পরম্পরা

(সংস্কৃত–বাংলা)

ব্যাকরণ শব্দটির উৎস কৃষ্ণযজুর্বেদে। যেখানে দেবতারা ইন্দ্রকে বললেন, আমাদের এই ভাষাকে আপনি ব্যাকৃত করুন, অর্থাৎ এই ভাষার ব্যাকরণ নির্দেশ করুন। এ ছাড়া ছয়টি বেদাঙ্গের মধ্যে শিক্ষা, নিরুক্ত, ব্যাকরণ ও ছন্দ এ চারটিই ভাষাবিজ্ঞানের অঙ্গ। এই অঙ্গগুলির মধ্যেও দেখি ব্যাকরণের স্পষ্ট নির্দেশ। 'শিক্ষা' মূলত ছিল ধ্বনিবিজ্ঞান। পাণিনিপন্থী বৈয়াকরণেরা বেদাঙ্গ-অন্তর্ভুক্ত এই শিক্ষা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। 'শিক্ষা ও বৈদিক প্রাতিশাখ্য'কে অবলম্বন করে বিবর্তিত হয়েছিল পরবর্তী ব্যাকরণ, যার মধ্যে পাণিনির স্থান ছিল বিশিষ্ট।

পাণিনির পর শ' দুয়েক বছর আগে নিরুক্তকারেরা বৈদিক শব্দের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিশেষ একটি ধারার প্রবর্তন করেন যা পরবর্তী ব্যাকরণচর্চাকে বেশ কিছুটা প্রভাবিত করেছিল। এঁদের মধ্যে যাস্কের রচনাই এখন লভ্য।

পাণিনির পর ব্যাকরণচর্চা কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। পাণিনি-ব্যাকরণের ধারার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি। কাত্যায়ন ছিলেন পাণিনির দোষদর্শী, পতঞ্জলি ছিলেন সমর্থক। পাণিনির মূল রচনা এই দুজনের সংশোধন ও সংযোজনের মধ্যে দিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছিল। এই তিনজনকে তাই বলা হয় ত্রিমুনি। কাত্যায়ন বার্তিক রচনা করেন, পরিবর্তনগুলিকে ধরবার জন্যে। পাণিনির বেশ কিছু সূত্র কাত্যায়ন নিষ্প্রয়োজন মনে করে বর্জন করেছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় তখন সংস্কৃত ভাষা একেবারে গতিহীন হয়ে পড়েনি। কিছু প্রয়োগ অচল হয়ে পড়েছিল, কিছু নূতন প্রয়োগ দেখা দিয়েছিল। কাত্যায়নের বেশ কিছু পরে আমরা পেয়েছি বৈয়াকরণ পতঞ্জলিকে। তিনি মহাভাষ্য রচনা করেন। এটি পাণিনি ব্যাকরণেরই ভাষ্য। পতঞ্জলি কাত্যায়নের পরিত্যক্ত কিছু পাণিনিসূত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। ব্যাকরণেও যে রসসৃষ্টি করা যায় তা দেখিয়েছেন পতঞ্জলি। এর পর দীর্ঘদিন ব্যাকরণচর্চার ক্ষেত্রে কোনও মৌলিক অবদান দেখা যায়নি। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে ভর্তৃহরি পদ্যবন্ধে 'বাক্যপদীয়' রচনা করেন, এতে বাক্যগঠনের বহু তত্ত্ব সূক্ষ্মভাবে আলোচিত হয়েছে, যদিও দার্শনিক তত্ত্বের উপরেই তার প্রতিষ্ঠা। ব্যাকরণচর্চায় বৌদ্ধ ও জৈন বৈয়াকরণদের অবদানও স্বীকৃতির দাবি রাখে। পরবর্তী কালে (সপ্তদশ শতকে) পাণিনি-চর্চায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভট্টোজি দীক্ষিতের *সিদ্ধান্তকৌমুদী*। তাঁর পুত্র ও তিনি নিজে 'সিদ্ধান্তকৌমুদী'র দুটি টীকা রচনা করেন—*বালমনোরমা* ও *প্রৌঢ়মনোরমা*। পাণিনি-ধারা ছাড়াও ঐন্দ্র, চান্দ্র, জৈনেন্দ্রীয়, শাকটায়নী, হেমচন্দ্রীয়, কাতন্ত্র,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারস্বত, মুগ্ধবোধ, জৌমর, সৌপদ্ম, কালাপিক ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যাকরণের ধারা প্রচলিত ছিল। এই সব ব্যাকরণধারার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি ও শব্দসাধন ব্যাপারে কিছু কিছু পার্থক্য ছিল। বঙ্গদেশে মুগ্ধবোধ ও কলাপব্যাকরণ সমধিক প্রচলিত থাকলেও পুরুষোত্তমদেবের ভাষাবৃত্তি, সীরদেবের পরিভাষাবৃত্তি এবং শরণদেবের দুর্ঘটবৃত্তি এখানে পাণিনিচর্চার সাক্ষ্য বহন করে।

ভট্টোজি দীক্ষিতের *সিদ্ধান্তকৌমুদীকে* সহজ সংক্ষিপ্ত করে রচিত হয়েছিল *লঘুকৌমুদী*। এই লঘুকৌমুদীও বাংলায় প্রচলিত ছিল। সিদ্ধান্তকৌমুদী ও মুগ্ধবোধাদি ব্যাকরণের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর *ব্যাকরণকৌমুদী* রচনা করেন। এতে বাংলা ব্যাখ্যা সংযোজিত হওয়ায় এবং শব্দরূপ-ধাতুরূপাদির সহজ বিন্যাস থাকায় ব্যাকরণচর্চা সহজ হয়। বাংলা-ব্যাকরণকারেরাও সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মগুলি ভালভাবে জানবার সুযোগ পান। শব্দরূপ ও ক্রিয়ারূপের বিন্যাস, সন্ধি, সমাস, ধাতুর গণবিভাগ ইত্যাদি বহু বিষয়ে বাংলা ব্যাকরণ বিদ্যাসাগরের এই *ব্যাকরণকৌমুদীর* কাছে ঋণী। ইয়োরোপীয় পণ্ডিত ও ভাষাতাত্ত্বিকেরাই প্রথমে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন। সর্বপ্রথম পোর্তুগিজ ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন মনোএল দা আস্‌সুম্প্‌সাঁও (১৭৪৩)। তার পর নাথেনিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড ইংরেজি ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ লেখেন (১৭৭৮)। উইলিয়ম কেরি প্রমুখ শ্রীরামপুরের আরও কয়েকজন বাংলা ভাষা শিখতে শিখতেই বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন।

রামমোহন রায় প্রথমে ইংরেজিতেই ব্যাকরণ লিখেছিলেন ১৮২৬ সালে; পরে তাঁর বাংলায় লেখা *গৌড়ীয় ব্যাকরণ* প্রকাশিত হয় ১৮৩৩ সালে। বাংলাভাষার স্বরূপটি ধরবার উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হয় এই ব্যাকরণে। বাঙালির লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণ হিসেবে রামমোহন রায় রচিত 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'ই স্বীকৃত। কিন্তু Leyden সাহেবের সংগ্রহে অল্পপরিসরে যে বাংলা ব্যাকরণটি পাওয়া গিয়েছে (লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত) তা ১৯৭০ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। এই বইটি বহু যুক্তিপরম্পরায় তিনি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ১৮০৭-১১ সালের মধ্যে লেখা বলে সিদ্ধান্তে এসেছেন। এই তথ্য স্বীকার করলে এই ব্যাকরণটিকে গৌড়ীয় বাংলা ব্যাকরণের ২৬-২৭ বছর আগে লেখা বাঙালির সর্বপ্রাচীন বাংলা ব্যাকরণ বলা যায়। এই ব্যাকরণটি গৌড়ীয় ব্যাকরণের মতো পরিণত না হলেও বাংলা ভাষায় বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য এতে নির্দেশিত হয়েছে।

গৌড়ীয় বাংলা ব্যাকরণের পরে যাঁরা বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্রজকিশোর গুপ্ত, শ্যামাচরণ শর্মা, শ্যামাচরণ সরকার, লোহারাম শিরোরত্ন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও মদনমোহন মিত্র প্রমুখ বিদ্বজ্জন।

আধুনিক যুগে বাংলায় ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানচর্চায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছে শিক্ষালাভ করে তিনি বাংলা ভাষার উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশ বিষয়ে গবেষণা করে ডি-লিট লাভ করেন ১৯২১ সালে। এই গবেষণা-নিবন্ধটি পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে The Origin and Development of the

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Bengali Language নামে প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে। এই গ্রন্থে অন্যান্য ভাষার ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্যে বাংলা ভাষাকে স্থাপন করে তিনি যেভাবে এর সর্বাঙ্গীণ বিশ্লেষণ করেছেন তা শুধু নব্যভারতীয় ভাষা নয়, পৃথিবীর যে-কোনও ভাষা বিশ্লেষণে অনুকরণীয়। এর পর ভাষাতত্ত্ববিষয়ক অন্যান্য অনেক গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। এই সময়ে ডঃ মুহম্মদ শহিদুল্লাহ্ও বাংলা ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ* প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে। বাংলা ভাষায় ব্যাকরণের ইতিহাসে এই গ্রন্থটির একটি বিশেষ স্থান আছে। ভাষাপ্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ বহু বিষয়েই অনন্য। সাধু-চলিত দুই ভাষারই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে বাংলা ভাষায় স্বরূপের এত কাছে এর আগে আর কেউ আসেননি। ODBL-এ বা 'বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা'য় তিনি ধ্বনি পরিবর্তনের যে-সব ধারা ধ্বনিবিজ্ঞানের আলোকে লক্ষ করেছেন তা তিনি এই ব্যাকরণে উপস্থাপিত করেছেন, ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনাতেও এর আগে এমন গভীরে কেউ যাননি। অর্থ পরিবর্তনের ধারা ও বাংলা ভাষার সঙ্গে অন্যান্য ভাষার তুলনাত্মক পর্যায়টি তিনি পরিশিষ্টে রেখেছেন। পূর্ণত প্রথাবিরোধী হয়তো হতে চাননি। এই সময়ে প্রচলিত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণের ব্যাকরণটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আচার্য সুনীতিকুমার বলেছেন 'রামমোহন আর নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ ছাড়া আর কেউ বাংলা ভাষার ভিতরকার প্রকৃতি ধরতে পারেননি, বা সেদিকে নজর দেননি।' (*মনীষী স্মরণে*, প ৫৪)। ডঃ সুকুমার সেনও বাংলা ভাষাবিষয়ক বহু গবেষণা গ্রন্থের সঙ্গে বাংলা ব্যাকরণের একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তীর বাংলা ব্যাকরণও একটি বিশিষ্ট অবদান। এগুলি সবই স্কুলপাঠ্য হিসেবে নির্দিষ্ট পাঠক্রমের ভিত্তিতে রচিত। বাংলা ব্যাকরণের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত যে ধারা চলেছে তা সুনীতিকুমারের *ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*-এরই হেরফের।

সময় এসেছে সর্বসাধারণের জন্যে একটি বাংলা ব্যাকরণ রচনার, যে ব্যাকরণ বাংলা ভাষার স্বরূপটিকে চিনিয়ে দেবে, এবং নতুন গবেষণার প্রেরণা দেবে।

বাংলা ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। বাংলা ভাষার বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য বা ইঙ্গিতকে তুলে ধরে বাংলা ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে তিনি বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার পথ দেখিয়েছিলেন। খাঁটি বাংলা ব্যাকরণের দিক্-নির্দেশে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের লেখাগুলিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

স্কুলপাঠ্য হিসেবে রচিত সাম্প্রতিক বাংলা ব্যাকরণগুলিতে কিছু কিছু নূতন চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। বিদেশে পূর্ণাঙ্গ বাংলা ব্যাকরণ রচিত না হলেও বাংলা ব্যাকরণের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা চলছে।

সুনীতিকুমার বা সুকুমার সেন নব্যভাষাতত্ত্বের উপর কোনও আলোকপাত করেননি, তাঁদের ভাষাচর্চার ক্ষেত্রও ছিল অন্য। তবে সুনীতিকুমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের নব্য ভাষাচিন্তা বিষয়ক গ্রন্থ *ভাষাতত্ত্ব*-এর' ভূমিকা লিখে (২০শে ডিসেম্বর ১৯৭৪) ওঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। ভূমিকার প্রথম দিকে বলেছেন : 'অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাতিদীর্ঘ পুস্তক 'ভাষাতত্ত্ব' পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি—আমার অনালোচিত কোনও কোনও বিষয়ে নূতন আলোক পাইয়াছি।'

আমাদের এখানেও সঞ্জননী ব্যাকরণচর্চার সূত্রপাত হয় ৭০-এর দশকে। এ বিষয়ে প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অধ্যাপক পবিত্র সরকার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত একটি ভাষাবিষয়ক সেমিনারে। তারপর থেকেই তিনি নব্য ভাষাচিন্তা বিষয়ে পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে চলেছেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রভারতী পত্রিকার হ্যালহেড-সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর *সংবর্তনী-সঞ্জননী ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা ভাষাবিচার* প্রবন্ধটি। তিনি মনে করেন সঞ্জননী ধ্বনিবিজ্ঞান বাংলার বহু উচ্চারণ ও ধ্বনি বিশ্লেষণে নূতন পথ দেখাতে পারবে। বাংলায় চম্‌স্কিতত্ত্বের প্রয়োগ-পদ্ধতি নিয়ে যাঁরা ভাবছেন তাঁদের মধ্যে প্রবাল দাশগুপ্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি চম্‌স্কিচিন্তাকে বাংলার বাক্য-অবয়বে প্রয়োগ করে বাংলার গঠনরহস্যকে যেমন ধরবার চেষ্টা করছেন, তেমনি বাংলা ব্যাকরণের সমস্যাগুলির সমাধান সূত্রও খুঁজে বের করতে চেষ্টা করছেন। উদয়নারায়ণ সিংহ এই নূতন ভাষাচিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে ভাষা পরিকল্পনা ও ব্যবহারিক প্রয়োগ নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করে চলেছেন। সম্প্রতি অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশ *ভাষা জিজ্ঞাসায়* সাধারণ ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করে তারই পটভূমিতে চম্‌স্কিতত্ত্ব সহজভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি সাম্প্রতিক ভাষাচিন্তাকে সামাজিক ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত করার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছেন।

বাংলাদেশের আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, রাজীব হুমায়ুন, মহম্মদ দানিউল হক, রফিকুল ইসলাম, মুনিরুজ্জমান, মনসুর মুসা প্রমুখ ভাষাগবেষকেরা নূতন ভাষাচিন্তাচর্চার মাধ্যমে বাংলা ব্যাকরণে নতুন ঢেউ আনতে আগ্রহী। আমরা আশা করব এঁদের মিলিত চেষ্টা বাংলা ভাষার নূতন ব্যাকরণ রচনায় ফলপ্রসূ হবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪

বাংলার শব্দভাণ্ডার

[বাংলো ভাষার বিভিন্ন উপাদান তৎসম তদ্ভব ইত্যাদি—তৎসম প্রতিশব্দ, অনুবাদ শব্দ—অপশব্দ—বিভিন্ন উপাদানের প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ]

শব্দ গেঁথে-গেঁথেই আমাদের কথা-মালা। ভাষায় শব্দ-উপাদানের ব্যাপারে যার-যার তার-তার ঠিক এমনটা হয় না। শব্দভাণ্ডারে নিজের ভাষার প্রাচীন ও পরিবর্তিত শব্দ তো থাকবেই, তার সঙ্গে থাকবে অন্য ভাষার ধার-করা শব্দ। সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে বিভিন্ন ভাষা-ভাষী গোষ্ঠী পরস্পর কাছে এসেছে, তাই শব্দের ব্যাপারে লেনদেন তো হবেই।

ভারতের মাটিতে আদি-অধিবাসীদের ভাষা তো ছিলই, তারপর বৈদিক আর্য এবং পরবর্তী আগন্তুকদের মধ্যে যারা এখানে থেকে গিয়েছে তাদের ভাষার উপাদান বাংলায় তো কিছু থাকবেই। যাদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বা ব্যবসায়িক যোগাযোগ ঘটেছিল তাদের ভাষার কিছু শব্দও বাংলার ভাণ্ডারে জমা হয়েছে। প্রয়োজনে গড়ে ওঠা বা গড়ে তোলা কিছু শব্দও সে ভাণ্ডারে ঠাঁই পেয়েছে।

AMARBOI.COM

৪.১ ■ তৎসম শব্দ

সংস্কৃত থেকে সরাসরি যে-সব শব্দ বাংলায় এসেছে তাকে আমরা তৎসম বলি। তৎ=সংস্কৃত। যা সংস্কৃতের মতো তা-ই তৎসম। 'সংস্কৃতের মতো' বলতে বুঝতে হবে উচ্চারণে তফাত হলেও আকৃতিতে অর্থাৎ বানানে যা অপরিবর্তিত থাকছে তা। যেমন :

অঙ্গ, অক্ষি, অগ্নি, অশ্ব, আকাশ, আঘাত, ইন্দু, ইষ্ট, ঈপ্সা, ঈশ্বর, উত্তর, উদর, ঐক্য, ঐহিক, ওষধি, ঔজ্জ্বল্য, ঔষধ, কবি, কান্তি, কুটুম্ব, কুঠার, কৃষি, ক্রোধ, ক্ষতি, গগন, গীত, ঘর্ম, চরণ, ছবি, ছিন্ন, জীবন, ঝঞ্ঝা, তন্তু, তৃণ, দন্ত, দান, ধান্য, ধূম, নক্ষত্র, নর, নিশা, পত্র, পাদপ, ফল, বংশ, বায়ু, বিদ্যা, বীণা, ভক্তি, মাল্য, যুবা, রাত্রি, রিক্ত, লজ্জা, লোহিত, শক্তি, শান্তি, শ্রম, শ্বশু, সাগর, সূর্য, সিংহ, হেতু, হোম ইত্যাদি।

একটি তৎসম শব্দের সঙ্গে অন্য-আর একটি যুক্ত হয়ে বহুতর শব্দের সৃষ্টি হয়েছে, এবং হয়ে চলেছে। যেমন অঙ্গসজ্জা, অঙ্গহানি, অক্ষিগোলক, অগ্নিগর্ভ, অশ্বশক্তি ইত্যাদি।

৪.২ ■ সংস্কৃতায়িত শব্দ

এমন কিছু শব্দ আছে যা মূলত সংস্কৃত নয়, আর্যেতর শব্দ যাদের সংস্কৃত করে নেওয়া হয়েছে। যেমন : অলাবু, কার্পাস, কম্বল, ঘণ্টা, ঘোটক, পুষ্প, পূজা, মঙ্গল, মর্কট, ময়ূর, মীন, অট্ট, অম্বা, কেকা, গঙ্গা, গণ্ডার, কুক্কুট, কোকিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুকুট, ডিম্ব, চুম্বন, পণ্ডিত, দুন্দুভি ইত্যাদি। গ্রিক হোরা, কেন্দ্র, সুড়ঙ্গ, দ্রম্য > দাম, দিনারও সংস্কৃতায়িত। ম্লেচ্ছ ও সিন্দূর ভোট-চিনীয়।

পূর্বমীমাংসা সূত্র ১. ৩. ১০-এর শবরভাষ্যে বেদে প্রচলিত ম্লেচ্ছদের (দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক) শব্দের উল্লেখ আছে। এই সব শব্দের অর্থ এদেরই ব্যবহার-অনুযায়ী গৃহীত হওয়া উচিত বলে শবর মনে করেন। সংস্কৃতে মূল নেই এমন শব্দের উদাহরণ হিসেবে তিনি 'পিক' ও 'নেম' (দেয়ালের ভিত্তি) শব্দের উল্লেখ করেছেন। পাখি ধরা, পাখি পোষা, চাষবাস, বাড়িঘর তৈরি ইত্যাদি বিষয়ের শব্দ এদের কাছ থেকেই গ্রহণীয় বলে শবর মনে করেন।

৪.৩ ■ প্রতিশব্দ

বাংলা শব্দপ্রয়োগ লক্ষ করলে দেখা যাবে প্রায় অর্ধেক শব্দই তৎসম। একেকটি তৎসম শব্দের অনেক প্রতিশব্দ আছে। এই সব প্রতিশব্দ বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব এগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে আমাদের চিন্তা, চেতনা, বিশ্বাস ও সংস্কার।

একটি উদাহরণ দিই অগ্নি ও অগ্নিবাচক শব্দ দিয়ে। 'অগ্নি' শব্দটি অগ্নির গতির নির্দেশক। অগ্নি মানে 'যা ঊর্ধ্বদিকে গমন করে'। 'তনূনপাৎ' শব্দটিতেও দেখি অগ্নির ঊর্ধ্বগমনের ইঙ্গিত। 'তনূনপাৎ' মানে যা তনুকে পাতিত করে না, অর্থাৎ যা নিচু দিকে যায় না। অগ্নির রূপের কথা বলছে 'চিত্রভানু' ও 'বিভাবসু'। 'চিত্রভানু' মানে যার কিরণ সুন্দর, আর 'বিভাবসু' বলছে ঔজ্জ্বল্যই এর সম্পদ। অগ্নির দাহিকা শক্তির কথা বলছে জ্বলন, দহন। 'কৃপীটযোনি' বলছে অগ্নির জন্মকথা। কৃপীট (কাষ্ঠ) যোনি (জন্মস্থান) যার। কাঠে ঘষেই তো আগুন জ্বালানো হত। অগ্নির বিশেষ একটি ধর্মের কথা বলছে 'বায়ুসখ'—মানে 'বায়ু সখা যার'। বায়ু যুক্ত হলেই তো অগ্নি প্রাণবন্ত হয়। হুতভুক্, হুতাশন, হব্যবাহন, বীতিহোত্র—অগ্নির এই সব প্রতিশব্দ বৈদিক সমাজের যজ্ঞ ও হোমের সঙ্গে সম্পর্কিত। 'বহ্নি' শব্দটিও তাই। আগুনে যা আহুতি দেওয়া হয় অগ্নি তা দেবতাদের কাছে বহন করে বলেই তার নাম 'বহ্নি'। সব কিছু শুদ্ধ করে বলেই অগ্নি 'পাবক'।

প্রতিশব্দের ছন্দোবদ্ধ অভিধানগুলো দেখে আমরা অবাক হই। শব্দের কী বৈচিত্র্য। কী বহুলতা। কিন্তু কালক্রমে প্রতিশব্দগুলির অধিকাংশই অবাচক হয়ে পড়ে। দু-তিনটি শব্দই ব্যবহারে আসে।

৪.৪ ■ প্রতিশব্দের ব্যবহার

সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে যে-কোনও প্রতিশব্দই গৃহীত হয়েছে ছন্দ বা অনুপ্রাসাদির প্রয়োজনে। বাংলায় তা চলবে না। বাংলায় বাগ্‌বিধি লক্ষ করেই কোনও শব্দের প্রয়োগ করতে হবে। 'আকাশ কালো হয়ে এল' এ বাক্যে 'গগন' এলে তা হাস্যকর হয়ে উঠবে। অথচ 'গগনে গরজে মেঘ' এই বাক্যে 'গগন' দিব্যি স্থান করে নিল। 'আকাশে গরজে মেঘ' বললে কান তা সহ্য করত না।

কবি সাহিত্যিকদের প্রয়োগ থেকে অপ্রচলিত তৎসম শব্দ লেখায় আসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইঙ্গিত, শিশিরিত, গৌরিমা ইত্যাদি রবীন্দ্রপ্রয়োগকে হয়তো স্বাগত জানাবে বাংলা গদ্য। কিন্তু বলাকায় শুধু আকাশ বোঝাতে 'ক্রন্দসী'র প্রয়োগ ছাড়পত্র পাবে কি ? ক্রন্দসী শব্দটি 'দ্বিবচন'—আকাশ মাটি দুটোকেই বোঝায়। তাই 'তোমা লাগি কাঁদিছে ক্রন্দসী'-তে কোনও আপত্তি ছিল না।

জীবনানন্দের 'নির্বেদী' (নিরাসক্ত অর্থে) এখন অনুসৃত (তুমি বহু নিরুত্তর—'নির্বেদী নিশ্চল'—পিরামিড)। (৬) সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ব্যবহৃত বহু শব্দই পরবর্তীরা ব্যবহার করেছেন। প্রামণিক, অনীহা, সোচ্চার প্রভৃতি শব্দও গুণিজনের প্রয়োগ থেকেই এসেছে। 'ফলশ্রুতি'-কে আর নির্বাসন দেওয়া যাবে না। 'ফলস্রুতি' করে নিলে অবশ্য ধর্মরক্ষা হত।

তৎসম শব্দকে বদলে দেবার একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে.। বৈদ্যুতীকরণ, বিকেন্দ্রীকরণ, আধুনিকীকরণ ('ইস্কোর আধুনিকীকরণ নিয়ে বসু-দেব ঐকমত্য' ইত্যাদি) দিব্যি চলছিল, হঠাৎ ২০.৫.৯৩-এর আনন্দবাজারে দেখা গেল 'আধুনিককরণ' (ইস্কোর আধুনিককরণের দায়িত্ব)। ভাবলাম, তা হলে সংস্কৃতের অভূততদ্ভাবে 'চ্বি'-কে বিসর্জন দেওয়া হল। কিন্তু একই দিনে দেখা গেল 'ইস্কোর বেসরকারীকরণের সিদ্ধান্ত' কথাটি। 'বেসরকার' ফারসি শব্দ, সেখানেও সংস্কৃতীকরণ অব্যাহত রইল 'চ্বি' যোগে। তা হলে 'আধুনিকীকরণে' নয় কেন ? যদি 'চ্বি' বাদ দিতে হয় দিন, তা হলে সর্বত্র একই নিয়ম করুন। স্তূপীকৃত, রাশীকৃত, সমীকরণ হোক স্তূপকৃত, রাশিকৃত, সমকরণ।

আবার উল্লিখিত শব্দটিকে অকারণে 'উল্লেখিত' লেখা হচ্ছে, যা কোনও অভিধানেই স্বীকৃত নয় (তা অনুল্লেখিতই থাকে ৯.৫.৯৩)। ণিজন্ত অর্থ হলেই 'উল্লেখিত' হতে পারে উৎ—লিখ্+ণিচ্+ত=উল্লেখিত। যা উল্লেখ করা হয়েছে=উল্লিখিত, কিন্তু যা অন্যকে দিয়ে উল্লেখ করানো হয়েছে তা 'উল্লেখিত'।

AMARBOI.COM

৪.৫ ■ তদ্ভব শব্দ (সংস্কৃত-প্রাকৃত ব্যাকরণে 'তজ্জ' শব্দটিও ব্যবহৃত হয়েছে)

এবারে আমরা আসি তদ্ভব শব্দে। 'তৎ' মানে এখানেও ওই সংস্কৃত। সংস্কৃত থেকে যা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এসেছে তা-ই হল তদ্ভব। এই বিবর্তন একাধিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ঘটেছে। 'কার্য' পরিবর্তিত হয়ে প্রাকৃতে হল 'কজ্জ'। এই 'কজ্জ' আবার রূপান্তরিত হয়ে হল 'কাজ'। তদ্ভব শব্দ :

আঁক < অঙ্ক, আজ < অদ্য, আট < অষ্ট, আর < অপর, আরতি < আরাত্রিক, উঁচা-উঁচু < উচ্চ, উনান, উনুন < উষ্ণাপন, কাঠ < কাষ্ঠ, কাজ < কার্য, কাজল < কজ্জল, কামার < কর্মকার, কুমার < কুম্ভকার, কেয়া < কেতক, খাট < খট্টা, খেত < ক্ষেত্র, গা < গাত্র, গোয়ালা < গোপাল, ঘর < গৃহ, চাকা < চক্র, চামার < চর্মকার, চোখ < চক্ষুঃ, ছা < শাব, ছাতা < ছত্র, জামাই < জামাতৃ, জুয়া < দ্যূত, জেলে < জালিক, ঝি < দুহিতা, ঠাঁই < স্থান, তামা < তাম্র, তেল < তৈল, থাম < স্তম্ভ, থাল < স্থাল, দই < দধি, দিঘি < দীর্ঘিকা, ননদ < ননান্দৃ, নাচ < নৃত্য, পাতা < পত্র, পাঁতি < পঙ্‌ক্তি, পাখি < পক্ষী, পাহাড় < পর্বত, পিসি < পিতৃস্বসৃ, পুথি < পুস্তিকা, পুকুর < পুষ্কর, ফুল <

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুল্ল, বেত < বেত্র, বেয়াই < বৈবাহিক, ভাই < ভ্রাতৃ, ভাজ < ভ্রাতৃজায়া, ভাত < ভক্ত, ভুঁই < ভূমি, মা < মাতৃ, মাছ < মৎস্য, মাছি < মক্ষিকা, মামা < মামক, মাসি < মাতৃস্বসৃ, শাঁখ < শঙ্খ, ষাঁড় < ষণ্ড, সাঁই < স্বামিন্, সাত < সপ্ত, সাঁওতাল < সামন্তপাল, হাট < হট্ট, হাতি < হস্তিন্ ইত্যাদি।

বিপুলসংখ্যক তদ্ভব শব্দ বাংলা ভাষার সম্পদ। তৎসম শব্দের পাশে এই তদ্ভব শব্দ স্থান করে নেয় অনায়াসে। বহু তদ্ভব শব্দই মূল তৎসম শব্দগুলোকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। অদ্য-কল্য-পরশ্ব স্থান করে দিয়েছে আজ-কাল-পরশুকে।

তদ্ভব শব্দের মধ্যে আমরা শুনি বাংলার প্রাণস্পন্দন। মা মাটি ভাই বোন ফুল পাতা, এ-সব শব্দের সঙ্গে কেমন একটা মন-কেমন-করা অনুভব জড়িয়ে আছে।

আমি, তুমি, আপনি, তুই এসব যে পরিবর্তিত তৎসম শব্দ তা আজ বোঝাই যায় না।

কিছু তদ্ভব শব্দ সংস্কৃতে মূল অর্থ থেকে সরে এসেছে। 'পর্ণ' মানে পাতা, কিন্তু তদ্ভব 'পান' বিশেষ এক ধরনের পাতা। 'দণ্ড' মানে যষ্টি, কিন্তু 'দাঁড়ের' অর্থ দাঁড়াল 'বৈঠা'।

আর একটি বিষয় লক্ষ করবার মতো : মূল শব্দে অনুনাসিক বর্ণ নেই কিন্তু তদ্ভবতে চন্দ্রবিন্দু এসেছে, যেমন ইষ্টক > ইঁট, উচ্চ > উঁচু, পুস্তিকা > পুঁথি, যূথিকা > জুঁই ইত্যাদি। ধ্বনিপরিবর্তন প্রসঙ্গে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

AMARBOI.COM

৪.৬ ■ অর্ধতৎসম বা ভগ্নতৎসম শব্দ

আর এক ধরনের সংস্কৃতজাত শব্দ আমরা ব্যবহার করি, একে আমরা বলি অর্ধতৎসম শব্দ বা ভগ্নতৎসম শব্দ। এই সব শব্দ তৎসম শব্দ থেকে সরাসরি এসেছে উচ্চারণবিকৃতিতে। এই উচ্চারণবিকৃতিতে বাংলার ধ্বনিপরিবর্তনের বিশেষ রীতিগুলো কাজ করছে। 'শ্রী' আমাদের মুখে 'ছিরি' হয়ে ওঠে, 'বৈষ্ণব' হয় 'বোষ্টম'। তেমনি :

অঘ্রাণ < অগ্রহায়ণ, অবিশ্যি < অবশ্য, আউশ < আশু, ইচ্ছে < ইচ্ছা, অব্যেস < অভ্যাস, আদিখ্যেতা < আধিক্যতা (অশুদ্ধ), উচ্ছুগ্গু < উৎসর্গ, কোবরেজ < কবিরাজ, কেত্তন < কীর্তন, খিদে < ক্ষুধা, গিন্নি < গৃহিণী, গেরাম < গ্রাম, গেরস্ত < গৃহস্থ, গেরাহ্যি < গ্রাহ্য, ঘেন্না < ঘৃণা, চন্দর < চন্দ্র, চিকিচ্ছে < চিকিৎসা, চিত্তির < চিত্র, ছেদ্দা < শ্রদ্ধা, জোছনা < জ্যোৎস্না, তন্তর < তন্ত্র, নিশ্চিন্দি < নিশ্চিন্ত, পথ্যি < পথ্য, পিচেশ < পিশাচ, পুত্তুর < পুত্র, পেতনী < প্রেতিনী, পেল্লাদ <প্রহ্লাদ, পেল্লায় < প্রলয়, প্রাচিত্তির < প্রায়শ্চিত্ত, বিষ্টি < বৃষ্টি, বেস্পতি < বৃহস্পতি, ভাদ্দর < ভাদ্র, মন্তর < মন্ত্র, মাগ্গি < মহার্ঘ, মিত্তির < মিত্র, মোচ্ছব < মহোৎসব, যজ্ঞি < যজ্ঞ, রোদ্দুর < রৌদ্র, শত্তুর < শত্রু, শুদ্দুর < শূদ্র, শোলোক < শ্লোক, সত্যি < সত্য, সূয্যি < সূর্য, সোমত্ত < সমর্থ, সোয়াস্তি < স্বস্তি, সোয়াদ < স্বাদ, হত্তুকি < হরীতকী, হবিষ্যি < হবিষ্য, হাসি < হাস ইত্যাদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতায় : যতন < যত্ন, রতন < রত্ন, মুকুতা < মুক্তা ইত্যাদি তদ্‌ভব শব্দ।

অর্থ পরিবর্তন এখানেও লক্ষ করা যায়। 'শ্রী' আর 'ছিরি' তো ঠিক এক নয়। প্রীতি থেকে যে পিরিতি বা পিরিত তার অর্থও অন্য। 'সমর্থ' মানে যা, 'সোমত্ত' সে-অর্থ থেকে দূরে সরে গিয়েছে।

আলালি-হুতোমি ভাষায় এ ধরনের শব্দের ছড়াছড়ি। নাটক গল্প বা উপন্যাসের সংলাপে চরিত্র অনুযায়ী অর্ধতৎসম শব্দের ব্যবহার খুবই ব্যাপক।

৪.৭ ■ একই শব্দ থেকে তদ্‌ভব-তৎসম

একই তৎসম থেকে তদ্‌ভব ও অর্ধতৎসম শব্দ আসতে পারে। প্রথমটি ক্রমবিবর্তনের ফল, দ্বিতীয়টিতে উচ্চারণ বিকৃতি :

তৎসম	তদ্‌ভব	অর্ধতৎসম
কৃষ্ণ	কান, কানু, কানাই	কেষ্ট
গাত্র	গা	গতর
গৃহিণী	ঘরনি	গিন্নি
পুত্র	পুত, পো	পুত্তুর
শ্রদ্ধা	সাধ	ছেদ্দা

অর্ধতৎসম শব্দে অনেক ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যঙ্গ বা তির্যক্ কটাক্ষের ভাব প্রকাশ পায়। তাই আদিখ্যেতা, পিরিত, সোয়াস্তি সংবাদ-শিরোনামায় দেখা যায়।

AMARBOI.COM

৪.৮ ■ বিদেশি শব্দ

বাংলায় তুরকি আক্রমণের সূত্রে ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। আর ফারসির সূত্রেই আরবি। পোর্তুগিজ, ওলন্দাজ ফরাসিরা ব্যবসা-সূত্রে এসে ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা করেছিল, শেষ পর্যন্ত কায়েম হল ইংরেজ শাসন। বাংলায় সবচেয়ে বেশি এসেছে আরবি ফারসি শব্দ, সংখ্যায় প্রায় হাজার তিনেক। পোর্তুগিজ শব্দ শ'খানেক, আর কয়েকটি ফরাসি ও ওলন্দাজ শব্দ। সংস্কৃতিসূত্রে কিছু চিনা ও জাপানি শব্দও পেয়েছি আমরা।

আরবি

অকু, আক্কেল, আখের, আজব, আজান, আদাব, আদায়, আর্জি, আল্লা, আসবাব, আসল, আসামি, আহাম্মক, ইজ্জত, ইমান, ইমারত, ইসলাম, ইস্তফা < ইস্তিফা, ঈদ, উকিল, উশুল, এলাকা, ওজন, ওয়াদা, কদর, কাজি, কাবাব, কায়দা, কায়েম, কুর্সি, কেচ্ছা < কিস্‌সা, খত, খতম, খাতির, খারিজ, খাস, গজল, গায়েব, গোঁসা < গুস্‌সা, জবাই < জবেহ্, জব্দ (জব্‌ৎ), জরিমানা < জুর্‌মানা, জ্বালাতন < জলাওয়্‌তন, জিলা, তবলা, তুলকালাম, দাবি, দৌলত, নকল, নগদ, ফকির, বদল, বাকি, মওকা, মজুত < মওজুদ, মতলব, মেজাজ, মেহনত, রদ, রায়, লায়েক, লোকসান < নুকসান, শরিক, শহিদ, শুরু, সই < সহিহ্, সাফ, সাহেব, সুফি, হাকিম, হামলা, হাল, হাসিল, হিসাব, হুকুম ইত্যাদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফারসি

আন্দাজ, ইয়ার, কারদানি, কারসাজি, কোমর, খরচ < খর্চ, খরিদ, খরিদ্দার, খাসা, খুব, খুশি, খোরাক, খোশামোদ < খুশ্‌আমদ্‌, গরম < গর্ম্‌, গর্দান, গোস্ত, চর্বি, চশমা, চাকর, চামচে, চালাক, চেহারা < চিহ্‌রা, জমানা, জান, জুলপি < জু.লফ্‌, জোর, জোলাপ < জুল্লাব, তক্তা, তাজা, দম, দরখাস্ত, দরগা, দরজা < দর্‌ওয়াজ.া, দরদ < দর্দ, দরবার, দাগ, দিস্তা, দুশমন, দেরি < দের, দোকান, দোস্ত, নরম < নর্ম, নাস্তানাবুদ < নেস্তওয়্‌নাবূদ, পছন্দ < পসন্দ, পয়গম্বর, পর্দা, পশম, পাখোয়াজ, পাঞ্জা, পালোয়ান < পহল্‌বান, পেয়াদা, পেয়ালা, পির, পোশাক, বজ্জাত <বদ-জাত, বনিয়াদ, বন্দর, বন্দোবস্ত, বরদাস্ত, বাজার, বেহেস্ত < বিহিশ্‌ৎ, মগজ, মালিশ, মিহি, মোরগ < মুর্গ্‌, রুমাল, রোজ, রোশনাই, লাগাম, শরম < শর্ম্‌, শাগরেদ < শাগির্দ্‌, শানাই < শাহ্‌নায়, সঙ্গীন, সাবাস, সবুজ < সব্‌জ্‌., সরকার, সরঞ্জাম, সরাই < সরা, সর্দি, সিন্দুক, সুর্কি < সুর্‌খি, সেপাই < সিপাহ্‌, হপ্তা, হরেক, হামেশা, হিন্দু, হুঁশ < হোশ, হেস্তনেস্ত < হস্তওয়্‌নীস্ত্‌ ইত্যাদি। (৭) আরবি-ফারসি শব্দের জ (Z) ধ্বনি বাংলায় জ. (J) ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে। আর উষ্মীভূত ক. খ. গ. যথাক্রমে ক খ গ হয়েছে।

তুরকি

আলখাল্লা, উজবুক, উর্দি, কাঁচি, কাবু, কুলি, কুর্নিশ < কোর্নিশ, কোর্তা, ক্রোক <কুর্ক, খাঁ < খান, চাকু, তোপ, দারোগা, বাবুর্চি, বাবা, বারুদ < বারুত, বোচকা < বুক্‌চহ্‌, মুচলেকা < মুচলখা, লাশ, সুলতান ইত্যাদি।

এই সব আরবি-ফারসি-তুরকি শব্দ দীর্ঘদিন ব্যবহার করার ফলে বাংলার নিজস্ব সম্পদ হয়ে গিয়েছে।

কবি নজরুল ইসলাম কবিতায় বহু আরবি ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন : 'আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ', 'ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মত', 'বাঙালির খুনে লাল হল যেথা ক্লাইবের খঞ্জর'। এ সব পঙ্‌ক্তিতে কুর্নিশ, হিম্মত, খুন, খঞ্জর সুন্দর প্রয়োগ। এগুলোকে বাংলা শব্দ বলতে বাধে না, কিন্তু 'মুজদা (সুসংবাদ) এনেছে অগ্রহায়ণ'-এ মুজদা কখনও বাংলা হয়ে উঠবে না। ভারতচন্দ্র ব্যবহৃত আয়েব, কংগুরা, সুরাখ কিংবা হবাস ('ঘেসেড়া মরিল ডুবে তাহার হবাসে') এগুলো নিশ্চয় বাংলায় চলবে না। একবার প্রয়োগ হলেই তা বাংলা হয়ে ওঠে না।

যে-কোনও সংবাদপত্রে প্রতিদিন অন্তত শ'খানেক আরবি-ফারসি শব্দ থাকে। গুরুত্বপূর্ণ হেডিংয়েও দেখা যায় আরবি-ফারসি শব্দের সুন্দর প্রয়োগ : 'অ্যাসেম্ব্লিতে তুলকালাম', 'পশ্চিমবঙ্গে সচিবস্তরে রদবদল' (আ. বা. ১৪.৫.৯৩), 'কেশপুরে দফায় দফায় সংঘর্ষ, জখম ১৭' (আ. বা. ১৬.৫.৯৩), 'গান্ধীজির স্বপ্ন সফল করতে জানকবুল মার্কসভক্তদের' (আ. বা. ১৬.৫.৯৩), কিন্তু অবস্থা 'সঙিন' তো চলবে না। ফারসি শব্দটি 'সংগীন' < সংগ্‌ঈন, সঙ্গ্‌=প্রস্তর, সঙ্গিন=প্রস্তরময় > কঠিন।

'রাজীব গান্ধীর জমানাতে' (আ. বা. ১৫.৫.৯৩) কেমন কানে লাগে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জমানাতে'র জায়গায় 'আমলে' কথাটিই বাগ্‌বিধিসম্মত। 'জমানা' কথাটিতে তেমন সম্ভ্রম প্রকাশ পায় না।

আরবি-ফারসি শব্দেও অর্থ পরিবর্তন ঘটে। যেমন দর্দ মানে বেদনা, বাংলায় 'দরদ' অন্য অর্থে ব্যবহৃত। 'বুজু র্গ' মান্য ব্যক্তি, কিন্তু 'বুজরুক' সম্পূর্ণ অন্য অর্থে চলে।

বহু আরবি-ফারসি শব্দ তৎসম-তদ্‌ভবকে নির্বাসনে পাঠিয়েছে। কলম, কাগজ, জামা, লাগাম, সবুজ, হাওয়া, পশম, পরদা এসব শব্দের বদলে তৎসম বা তদ্‌ভব শব্দ প্রায় কল্পনাই করা যায় না।

ইংরেজি

হাজার দেড়েক ইংরেজি শব্দকে আমরা আপন করে নিয়েছি। এর মধ্যে কিছু শব্দে মূল উচ্চারণ অনেকটা বজায় আছে, যেমন—

অর্ডার, ইস্যু, ইমপিচমেন্ট, উল, এস্রেন্স, কপি (Copy), কফি, কলেজ, কাটলেট, কার্পেট, কেরোসিন, ক্রিকেট, চেক, চেয়ার, ইত্যাদি।

আর এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলোকে আমরা এমনভাবে বদলে নিয়েছি যে ইংরেজি বলে চেনাই যায় না, যেমন—আপিল, আপেল, ইঞ্চি, গিল্টি (Guild), জাঁদরেল (General), টেবিল, ডাক্তার, পলস্তরা (Plaster), বুরুশ (Brush), বেঞ্চি, রংরুট (Recruit), লজেঞ্চুস (Lozenges), সান্ত্রি (Sentry), ইস্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদি।

পল্লীগ্রামে অনেক ইংরেজি শব্দ এমন রূপ নিয়েছে যে ইংরেজরাও মূল শব্দটি ধরতে পারবে না। যেমন—ল্যাম্ফো < Lamp, ইস্টিলি < registry, গিরিমেন্টো < agreement ইত্যাদি।

সংবাদপত্র খুললেই দেখা যাবে ইংরেজি শব্দের ছড়াছড়ি : বাড়ি ভেঙে পড়ায় চার্জশিট (আ. বা. ১৪.৫.৯৩), মহিলা ওয়ার্ডারদের বদলি নিয়ে ক্ষোভ (আ. বা. ১৪.৫.৯৩), বাণিজ্যিক অঞ্চলে পার্কিং বাড়ছে (আ. বা. ১৪.৫.৯৩), বসুর কনভয়ে বাড়তি পুলিশ (আ. বা. ১৫.৫.৯৩)। ইংরেজির পাশে আরবি-ফারসি শব্দও দিব্যি ঠাঁই করে নেয় : ইম্‌পিচ্‌মেন্ট প্রস্তাব খারিজ হলেও রামস্বামীর ইস্তফা দেওয়ার ঘটনা...ইত্যাদি, বৈঠকে শোরগোল রামস্বামী ইস্যুতে (আ. বা. ১৬.৫.৯৩)।

পোর্তুগিজ শব্দ

আনারস < ananas, আলকাতরা < alcutrus, আলমারি < armario, ইস্তিরি < istirar, ইস্পাত < espada, চাবি < chave, জানালা < janela, পেঁপে < papaia, পেরেক < prego, বারান্দা < varandah, বেহালা < viola, বোতাম < batao, রেস্ত < resto, সাগু < sago, সাবান < saban কিরিচ < curis, জালা jarra, সাঁকালি < sacula (দুটি থলেওয়ালা ব্যাগ) ইত্যাদি।

এগুলোকে আর পোর্তুগিজ বলে চেনবার উপায় নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফরাসি শব্দ

আঁতাত < entente, ইংরেজ < Anglaise, ওলন্দাজ < Hallandaise, কাফে < Cafe, কার্তুজ < Cartouch, কুপন < Coupon, গ্যারাজ < Garage, বুর্জোয়া < bourgeois, ম্যাটিনি < matinee, রেস্তরাঁ < restaurant ইত্যাদি।

ওলন্দাজ শব্দ

ইস্কাবন < Schopen, ইস্কুরুপ < Schroef, তুরুপ < troef, রুইতন < ruiton, হরতন < harton ইত্যাদি। 'চিড়েতন' ওলন্দাজ নয়, রুইতনের আদলে গড়া।

৪.৯ ■ নানা দেশের শব্দ

অন্য কিছু বিদেশি শব্দও বাংলায় এসেছে, জেব্রা (দঃ আফ্রিকা), ক্যাঙারু (অস্ট্রেলিয়া), কুইনাইন (পেরু), ফাসিস্ট (ইতালি), নাৎসি (জার্মান), জুজুৎসু-রিকশ-হাসনুহানা-হারিকিরি (জাপান), ইয়াক, লামা (তিব্বত), চা-লিচু-সাম্পান (চিনা) ইত্যাদি।

৪.১০ ■ দেশি শব্দ : (সংস্কৃতে পারিভাষাটি 'দেশ্য')

AMARBOI.COM

আর এক ধরনের শব্দকে আমরা বলেছি দেশি—যা আর্যেতর, মূলত দ্রাবিড় বা অস্ট্রিক শব্দ। ১—কালো, কুলো, খড়, খোঁয়া, চিংড়ি, ঝিঙা, ঝাঁকা, ডাগর, ডিঙি, ডাঁশ, ঢেঁকি, ঢোঁড়া, ধুচুনি, ফিঙে, বাদুড় পাঁঠা, ভিড়, ঢিল, ঢাল, ঢোল ইত্যাদি। √এড়া, √বিলা, √টাকা প্রভৃতি ধাতুকেও এই পর্যায়ে ফেলা যায়।

বহু সাঁওতালি শব্দও এসেছে বাংলায়। যেমন ওত, আড়, খাড়া, উল্টা, √কুড়া, √কুলা ইত্যাদি।

৪.১১ ■ প্রাদেশিক শব্দ

ভারতের অন্য প্রদেশের কিছু শব্দও বাংলায় এসেছে। হরতাল < গুজরাটি হটতাল, চুরুট < তামিল শুরুট্টু, রুটি < হিন্দি রোটি, পুরি, মিঠাই, তরকারি, বটুয়া, লাগাতার, কামাই, জলদি, সমঝোতা < সমঝৌতা, ঝুটমুট < ঝুঠমুঠ, দেখভাল, জাদুঘর, তারাঘর ইত্যাদি।

শব্দসম্ভারের আলোচনায় অভিধানের কথা এসে পড়ে। অভিধানে অনেক ক্ষেত্রে বিদেশি শব্দকেও সংস্কৃত মূল ধরে নিয়ে ব্যুৎপত্তি দেওয়া হয়, যেমন 'হিন্দু' এই ফারসি শব্দটিকে সংস্কৃত ধরে নিয়ে ব্যুৎপত্তি দেখানো হয়েছে—হীনং দূষয়তি ইতি হীন-দূষ্+ডু।

অস্ট্রিক 'হাঁড়ি'র উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে 'হণ্ডিকা'কে। তেমনি 'লুচি'র উৎস ধরা হয়েছে 'লোচিকা'কে। খাঁটি বাংলা ধাতু থেকে গড়ে ওঠা শব্দের মূল হিসেবেও সংস্কৃতের আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে যেমন বঙ্গীয় শব্দকোষে 'লাটাই' শব্দের মূল ধরা হয়েছে 'নর্তকী'কে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪.১২ আঞ্চলিক শব্দ

বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার নিজস্ব কিছু শব্দ আছে। পারস্পরিকতার ফলে তা অনেক ক্ষেত্রে অন্য অঞ্চলেও গৃহীত হয়েছে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এ সব শব্দের কিছু আরবি-ফারসি থেকে এসেছে, কিছু তৎসম বা তদ্ভব শব্দের ধ্বনিগত রূপান্তর, কিছু অজ্ঞাতমূল বা দেশি যেমন : বিচরা=বাড়ির সংলগ্ন আবাদযোগ্য জমি, হাড়=ষাঁড়, বুলি=শূন্য, হৌড়=শ্বশুর [কান্দী]; ফাঁপসা=ফুসফুস প্যাঙা=বাঁ হাত ব্যবহারকারী ; লিপানো=চমকানো (বারাসত, দেগঙ্গা) ; ড্যানা=হাত, টিশ=গোরু মোষের সিঙ-এর গুঁতো [উঃ দিনাজপুর]।

৪.১৩ ■ মিশ্র শব্দ

আলোচিত শ্রেণীগুলির যে কোনও দুটি ভিন্ন শ্রেণীর শব্দ মিশিয়ে জোড়া-শব্দ তৈরি করলে তাকে আমরা বলি মিশ্র বা সংকর শব্দ। যেমন মাস্টারমশাই (ইং+তদ্ভব), বাপপিতামহ (তদ্ভব+তৎসম), রাজাবাদশা (তৎসম+ফারসি), শ্রমিকমালিক (তৎসম+আরবি), শাকসব্জি (তৎসম+ফারসি), আইনজীবী (আরবি+তৎসম)।

এক শ্রেণীর শব্দের সঙ্গে অন্য শ্রেণীর প্রত্যয় যুক্ত হলেও তা মিশ্র শব্দ বলে ধরা হবে। যেমন, হিন্দুত্ব (ফা.+সং প্রত্যয়), কহতব্য (তদ্ভব ধাতু+সং প্রত্যয়), অকাট্য (তদ্ভব ধাতু+সং প্রত্যয়), ইত্যাদি।

জীবনানন্দের 'নিটল'ও ('শতাব্দীর বিরহীর মন নিটল নিথর'—পিরামিড) মিশ্র শব্দের মধ্যে পড়বে। 'নি' (বাংলা উপসর্গ)+টল (তৎসম)।

মিশ্র শব্দও বাংলার বাগ্‌ধারার মধ্যে পড়ে। 'গো-যান' বা 'গো-শকটে'র জায়গায় মিশ্র শব্দ হিসেবে 'গো-গাড়ি' চলবে না। অথচ ১৯.৫.৯৩ তারিখের আনন্দবাজারে প্রথম লেখাটিতেই 'গো-গাড়ি' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'গোরুরগাড়ি' বলতে বাধল কেন? ওটি তো কৌতুক-রচনা ছিল না।

৪.১৪ ■ সাদৃশ্য বা প্রভাবজাত শব্দ

'বিধবা' শব্দের প্রভাবে যেমন 'সধবা' শব্দ গড়ে উঠেছিল 'সধবা'র প্রভাবেই তেমনি আমরা পেয়েছি 'অধবা' শব্দ (কুমারী অর্থে)। তেমনি ফারসি না-বালিগ্ শব্দের প্রভাবজাত 'সাবালক' থেকেই পেয়েছি 'না-বালক' শব্দ।

৪.১৫ ■ অনুবাদ শব্দ

মূল ইংরেজি শব্দ বা শব্দগুচ্ছ থেকে অনুবাদ করা কিছু শব্দ বাংলায় এসেছে সংবাদপত্রের মাধ্যমে। যেমন, গণমাধ্যম, পুনর্বাসন, চিরুনি অভিযান, নির্জোট বা জোটনিরপেক্ষ, নলজাতক, বিধায়ক, সাংসদ, তৃণমূল, প্রতিবেদন, প্রতিবেদক, নীলনক্সা, সরবচিন্তা, সবুজসংকেত, বাতানুকূল, বিক্ষুব্ধগোষ্ঠী, নজরদারি, হুলিয়াদেশ, মুক্তিপণ, মৌলবাদ, মৌলবাদী, উগ্রপন্থী, উড়ালপুল, সীমিত ওভার, গড়াপেটা, চরিত্রহনন, ভাবমূর্তি ইত্যাদি। সম্প্রতি দেখা গেল বর্ণময় ব্যক্তিত্ব (আ. বা. ১৬.৫.৯৩)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্লান্ট, বক্স-অফিস, লক-আউট, ইম্‌পিচমেন্ট্‌, লে-অফ, মনিটারিং, ফ্লাডলাইট, নোট (রাজনীতিতে ধর্ম রুখতে নোট তৈরি—আ. বা. ১৬.৫.৯৩) এগুলো অবশ্য এখনও অনুবাদের অপেক্ষায় আছে।

৪.১৬ ■ দো-আঁশলা শব্দ

ইংরেজি smog (smoke + fog), tigon (tiger + lion), potato+tomato (potato-tomato), emergicenter (emergency+centre) জাতীয় শব্দ বাংলাতেও আছে। যেমন, মিনতি (মিনৎ + বিনতি), ধোঁয়াশা (ধোঁয়া + কুয়াশা), হিন ভারমীয় (ভারতীয়+ইয়োরোপীয়) ইত্যাদি। এরকম শব্দকেই আগের পরিচ্ছেদে হাঁসজারু শব্দ বলেছি।

এ জাতীয় শব্দের জনক লুইস কেরল। Through the looking glass-এ jabberwock, কবিতায় তিনি বেশ কিছু এ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করেছিলেন : যেমন, slime + lithe = slthy ইংরেজিতে এ জাতীয় শব্দের নাম portmanteau words.

৪.১৭ ■ অপশব্দ বা লঘুশব্দ

ছিনতাই, চোট, ঝাড়, ধোলাই, রেলা, আঁতেল, ঢপ, চামচে ইত্যাদি শব্দ ঢুকে পড়েছে বাংলার শব্দসম্ভারে। এগুলোকে আমরা বলছি অপশব্দ বা লঘুবুলি। ইংরেজিতে এ ধরনের শব্দকে বলা হয় Slang. এই সব শব্দের জন্ম প্রধানত অপরাধজগতে। এগুলো প্রথমে আসে যুবকদের মুখে, তারপর ছড়িয়ে পড়ে সবার মুখে, সাহিত্যে ও সংবাদপত্রে। এই সব শব্দের সৃষ্টি-আটপৌরে শব্দের বেড়া ডিঙিয়ে একটু চটক সৃষ্টির জন্যে অথবা বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে গোপনীয়তা রক্ষার জন্যে। নানাভাবে এই সব শব্দ তৈরি হয়। (৮)

- কখনও চেনা শব্দের মানে বদলে দেওয়া হয়। যেমন, রং=মেজাজ, রেলা=ধাপ্পা, ওষুধ=গাঁজা বা মদ, কদমা=বোমা, কাকা=শাগরেদ, খাপ খোলা=মেজাজ দেখানো, ছারপোকা=সামান্য অর্থ। কাঁচকলা=নাবালিকা, ডবল ডেকার, ডবল টোন=মোটা মেয়ে, সাইনবোর্ডওয়ালা বাবু=বিবাহিত মহিলা। মামা, টুপি, গার্জেন, যুধিষ্ঠির=পুলিস।
- কখনও শব্দের বর্ণগুলো উল্টে-পাল্টে নেওয়া হয়, কখনও বা একটি ব্যঞ্জনের জায়গায় অন্য ব্যঞ্জন আসে। যেমন, পেন > নেপ, কবুল > বকুল, ফেরারি > রেফারি, বন্দুক > সোন্দুক।
- কখনও শব্দকে ছেঁটে ছোট করে নেওয়া হয়। যেমন, হসপিটাল > হসপি, প্রিন্সিপ্যাল > প্রিন্সি, অ্যাপরেটাস=অ্যাপো। ইংরেজিতে পপ, অ্যাড, ল্যাব জাতীয় শব্দের সংখ্যা প্রচুর।

এই সব স্ল্যাং নতুন আমদানি। পুরনো দিনেও এ জাতীয় শব্দ চলত। যেমন আঁত (পেট), আম্বা (স্পর্ধা), গেঁতো (অলস), চিটিংবাজ (প্রতারক), চৈতনচুটকি (টিকি), ট্যা-ফোঁ (সামান্যতম প্রতিবাদ), তিলেখচ্চর (খুব পাজি), নিজ্জস (নিশ্চয়), ফুটানি (গর্ব প্রকাশ), বারফট্টাই (বড়াই), মাইফেল (নাচগানের আসর), মেদা মারা (অলস), রূপচাঁদ (টাকা), হেপা (ঝামেলা)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগুলোর অধিকাংশই অভিধানে গৃহীত হয়েছে। নতুন উদাহরণগুলোর কিছু আসি-আসি করছে।

শব্দবিজ্ঞানের নানা রহস্য এই সব শব্দের মধ্যে ধরা পড়ে। সমাজজীবনের অবক্ষয়ের নানা সংকেতও মেলে এগুলোর মধ্যে। গ্রহণ বর্জন কোন নিরিখে হবে তা ঠিক করাও কঠিন।

ইংরেজি অভিধানে আগের সংস্করণে যা Sl. (Slang) বলে চিহ্নিত ছিল, পরবর্তী সংস্করণে দেখছি 'Sl' বর্জিত হয়েছে। অর্থাৎ সে-সব শব্দ জাতে উঠে গেল। উদাহরণ হিসেবে 'OK' শব্দটির উল্লেখ করা যেতে পারে। (৯) বাংলা ব্যাকরণে যা অশিঃ (অশিষ্ট) বলে একদা-চিহ্নিত তা চির-চিহ্নিত হয়ে থাকছে। কারণ আমাদের অভিধানগুলির নূতন মুদ্রণ থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই নূতন সংস্করণ নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫

অর্থ পরিবর্তন

[বাচ্যার্থ লক্ষ্যার্থ ব্যঙ্গ্যার্থ—অর্থ পরিবর্তনের নানা ধারা—পরিবর্তনের কারণ]

শব্দসম্ভারের আলোচনায় আমরা দেখেছি পরিবর্তিত শব্দগুলো অনেক ক্ষেত্রে মূল অর্থ থেকে সরে আসছে। আগের পরিচ্ছেদে শব্দের উপাদান আলোচনাই আমাদের লক্ষ্য ছিল, তাই অর্থ পরিবর্তনের কিছু ইঙ্গিত সেখানে থাকলেও আমরা এ বিষয়টি নিয়ে তেমন আলোচনা করিনি। এই পরিচ্ছেদে এই অর্থ-পরিবর্তনের দিকগুলোই আমাদের আলোচ্য। বলা বাহুল্য অর্থই শব্দের সর্বস্ব। সেই অর্থ সর্বদাই চায় তার মূল অর্থকে ছাড়িয়ে যেতে।

৫.১ ■ বাচ্যার্থ লক্ষ্যার্থ-ব্যঙ্গ্যার্থ

কোনও শব্দ উচ্চারণ করা মাত্রই যে ছবিটি আমাদের মনের মধ্যে ফুটে ওঠে তাই হল এর মূল অর্থ। একে মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থও বলা হয়। আমরা একে আক্ষরিক অর্থও বলি। ইংরেজিতে একে আমরা বলি literal meaning অর্থাৎ the meaning which directly comes from the combination of particular letters. 'মাথা' বললে শরীরের উর্ধ্বাংশে স্থিত যে অবয়বটির ছবি আমাদের মনে ফুটে ওঠে তা-ই হল এর বাচ্যার্থ। কিন্তু যদি বলি 'লোকটা গ্রামের মাথা' তখুনি আমরা লক্ষ্যার্থে পৌঁছব। লক্ষ্যার্থ হল রূপকার্থ। 'যা উঁচুতে থাকে' এই অর্থ নিয়ে 'গ্রামের মাথা' 'গ্রামের প্রধান'-অর্থে উপনীত হয়। আবার যখন বলব 'মাথা গুনে দেখো' তখন 'মাথা' লোককে বোঝাবে, অর্থাৎ অংশ সমগ্রকে বোঝাবে। এটিও মাথার লক্ষ্যার্থ। আবার যখন বলব 'ওর মাথা নেই অঙ্কে' তখন লক্ষ্যার্থকে ছাপিয়ে তা হয়ে উঠবে ব্যঙ্গ্যার্থ বা সংকেতিত অর্থ (suggested sense.)। 'সে গোলমালের মধ্যে মাথা ঠিক রাখতে পারেনি' বললেও আমরা ব্যঙ্গ্যার্থের গণ্ডির মধ্যে পড়ব। লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ অনেক সময় সমীকৃত হয়ে যেতে পারে। লক্ষ্যার্থ ধরব না ব্যঙ্গ্যার্থ ধরব সেটা নির্ভর করবে অন্য পদের সঙ্গে শব্দটির মিলিত সম্পর্কের উপরে। 'মাথা ঘামানো' লক্ষ্যার্থ-ব্যঙ্গ্যার্থ হয়ে উঠতে পারে। আসলে লক্ষ্যার্থের মধ্যে দিয়েই আমরা ব্যঙ্গ্যার্থে পৌঁছই।

৫.২ ■ অর্থ পরিবর্তনের নানা ধারা

অর্থ পরিবর্তনের ধারায় লক্ষ্যার্থ ব্যঙ্গ্যার্থকে ঘিরে, অথবা ওই সীমারেখাকে অতিক্রম করে আরও নানারকম শব্দ পরিবর্তন ঘটতে পারে ভাষার চলতি পথে। এই পরিবর্তন আপনা-আপনিইও হতে পারে, অথবা অন্য কোনও ভাষার প্রভাবেও হতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থের বিস্তার বা প্রসার

অর্থের পরিধি যদি বেড়ে যায় তা হলে তাকে আমরা বলি অর্থের বিস্তার বা প্রসার (expansion)। গোয়াল শব্দটা গোরু রাখবার জায়গা বোঝাত শুধু, কিন্তু যখন বললাম ভেড়ার গোয়াল তখন তা ভেড়া রাখারও জায়গা এই অর্থে বিস্তারিত বা প্রসারিত হল। গৌরচন্দ্রিকা গৌরচন্দ্রের অর্থাৎ গৌরাঙ্গের লীলাবিষয়ক পালার উদ্বোধন সঙ্গীত; কিন্তু অর্থ সম্প্রসারিত হয়ে তার অর্থ দাঁড়াল 'যে কোনও বিষয়ের গোড়ার কথা'।

আগে ইং virtue মানে ছিল পৌরুষ, পরে মানে দাঁড়াল যে কোনও সদ্‌গুণ। বিশেষ এক ধরনের কুকুর না বুঝিয়ে dog পরে যে-কোনও কুকুর বোঝাল। এইরকম মার্গ : মৃগ চলার পথ > যে-কোনও পথ।

অর্থের সংকোচন

ঠিক উল্টোটা হল অর্থসংকোচন (Restriction or narrowing)। অর্থাৎ অর্থের বড় পরিধিটা ছোট করে আনা।

হিন্দু শব্দটি আগে বোঝাত হিন্দ্-এর অধিবাসী, অর্থাৎ ভারতবাসী, এখন তা বিশেষ সম্প্রদায় বোঝায়। মৃগ আগে যে-কোনও পশুকে বোঝাত, তারপর তা বিশেষ পশু হরিণ অর্থে সংকুচিত হল। ইং deer শব্দটিও তাই। এইরকম অন্ন : খাদ্য > ভাত

অর্থের উৎকর্ষ বা উন্নতি

অর্থের উৎকর্ষ বা উন্নতি (Elevation) বলতে আমরা বুঝি, যে-অর্থ মন্দ বা সাধারণ ছিল তা উত্তম বা উচ্চভাবের অর্থ প্রকাশ করছে 'মন্দির' শব্দটি আগে সাধারণ গৃহবাচক ছিল, কিন্তু এখন তা দেবালয় বোঝাচ্ছে। 'সাহস' মানে ছিল 'হঠকারিতা', এখন তা নির্ভীকতা অর্থে উন্নীত।

Knight (পুরনো ইংরেজি Cniht) মানে ছিল 'চাকর', পরে অর্থ দাঁড়াল সামন্ততন্ত্রের যুগের সম্মানিত ব্যক্তি।

অর্থের অপকর্ষ বা অবনতি

বিপরীতক্রমে, অর্থের অপকর্ষ বা অবনতি (Pejoration) বলতে আমরা বুঝি যে অর্থ ছিল সম্ভ্রমবাচক বা উচ্চভাববাচক তা হয়ে উঠল তুচ্ছার্থক। যেমন, ইতর (অপর) > ইতর (নীচ), তেমনি বিরক্ত (নিরাসক্ত) > বিরক্ত (উত্ত্যক্ত), ফারসি বুজুর্গ (মান্য ব্যক্তি) > বুজরুক (শঠ), ইং Knave (boy) > Knave (rogue)। এইরকম অর্বাচীন : পরবর্তী > নির্বোধ।

অর্থসংশ্লেষ বা অর্থসংক্রম

এ ছাড়া, এমন হতে পারে, মূল অর্থটা কিছুটা বজায় থেকেও অন্য অর্থ এসেছে তাতে। একে আমরা বলি অর্থসংশ্লেষ বা অর্থসংক্রম (associated sense), শুশ্রূষা (শোনবার ইচ্ছা) > শুশ্রূষা (সেবা), শোনবার ইচ্ছেটা সেবার মধ্যে আছে, সেবক সব সময় সেবিতের কী প্রয়োজন তা শোনবার জন্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎকর্ণ হয়ে থাকে (সেবকা হি সেব্যে দত্তকর্ণা ভবন্তি)। এই উৎকর্ণতাই 'সেবা' অর্থে রূপান্তরিত।

এইরকম বিবেক (পৃথক করা) > বিবেক (বিচারবোধ—মূলত সু ও কু-কে পৃথক করা), 'ঘর্ম' মানে গ্রীষ্ম, তার থেকে অর্থ দাঁড়াল গ্রীষ্মজনিত স্বেদস্রুতি, Sun (সূর্য) > Sun (রৌদ্র) [Move him into the Sun—Owen]

রূপান্তর

অর্থের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটতে পারে। যেমন 'সুতরাং' মানে ছিল অত্যন্ত [সু+তরাং (অতিশায়নে)]। এখন অর্থ দাঁড়িয়েছে অতএব। 'এবং' মানে এইরূপে, এইভাবে। এখন তা সমুচ্চয়ী অব্যয়। 'সামান্য' শব্দের মূল অর্থ 'সমানতা', অর্থ দাঁড়িয়েছে 'অল্প'। 'অভিসম্পাত' এর মূল অর্থ যুদ্ধের জন্য পরস্পর মুখোমুখি হওয়া, এখন তা 'অভিশাপ' অর্থে চলে।

৫.৩ ■ অর্থ পরিবর্তনের কারণ

● ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে আমরা অর্থ বদলে দিই। খুব বোকা বোঝাতে বিদ্যের জাহাজ, অসচ্চরিত্রা বোঝাতে বিদ্যেধরী, অধার্মিক বা পাপী বোঝাতে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির।

সংবাদ শিরোনামে এই ধরনের বিপরীতার্থক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ দেখা যায়। শিরোনাম 'সাবাস !' সংবাদটি দুষ্কর্মের বিবরণের। 'সত্যমেব জয়তে' শিরোনাম একটি মিথ্যার জয় বোঝাতে।

● মঞ্জুভাষণে বা অপ্রিয়তা-নিবারণেও শব্দার্থ পরিবর্তন ঘটে, ঘুষ হয়ে ওঠে 'জলপানি', 'সেলামি' বা 'পাগড়ি' ইত্যাদি, স্ত্রীর বড় ভাই 'শালা' হয়ে ওঠেন 'সম্বন্ধী'।

● সংস্কারের ফলেই 'নেই' হয়ে ওঠে 'বাড়ন্ত', 'যাই' হয়ে ওঠে 'আসি', 'বসন্ত' হয়ে ওঠে 'মায়ের দয়া'।

বাংলা বাগ্‌বিধি (ইডিয়ম)-তেও শব্দার্থ-পরিবর্তনের নানা ধারা লক্ষণীয়। 'তুলসীতলা হয়ে ওঠে ভাশুরঠাকুরতলা (শ্বশুরের নাম তুলসী বলে), 'চোর' হয়ে ওঠে 'কুটুম' (কাল রেতের বেলা কুটুম এয়েছিল) রাতে অপদেবতা বা ভূত হয়ে ওঠে 'তেনারা' (তেঁতুলতলায় 'তেনারা' সব নামেন), এমনকী হুগলী জেলায় 'বেলমুড়ি' গ্রাম হয়ে ওঠে শ্রীফল-চালভাজা (শ্রীফল=বেল, চালভাজা=মুড়ি)

● সামাজিক প্রথাও শব্দার্থ-পরিবর্তন ঘটায়, ফলে 'সতী' হয়ে ওঠে 'পতির চিতায় উৎসর্গিতা'।

● বাড়িয়ে বলার প্রবণতা থেকেও শব্দ নতুন বা বিশেষ অর্থ পায়। যেমন 'ভীষণ' মানে ভয়াবহ, কিন্তু 'ভীষণ খুশি', 'ভীষণ ভাল' না বলে আমাদের তৃপ্তি নেই।

৫.৪ ■ অর্থের জড়তা বা জীবাশ্মতা (fossilization)

● কিছু শব্দ বা শব্দগুচ্ছ আছে, যা কোনও এক সময়ে বিশেষ কোনও অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু পরে তার প্রয়োগ হয়নি, প্রয়োগই হয়নি তাই অর্থান্তর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে কেমন করে ? এই রকমের শব্দকে অর্থের জড়তা বা জীবাশ্মতা বলা হয়। যেমন বাংলায় দম্ আর জম্ শব্দটি দম্পতি বা জম্পতি শব্দে 'গৃহ' (>গৃহিণী) অর্থে ধরা রইল কিন্তু পরে আর তাকে দেখা গেল না। 'স্ত্রী' পত্নী অর্থে 'জানি' শব্দেরও সেই দশা। যুবজানি শব্দে তাকে পেলাম, তারপরই সে হয়ে গেল জীবাশ্ম ইংরেজিতে from অর্থে 'fro' ব্যবহৃত হল 'to and fro' তে। তারপর fro আর ভাষায় এলই না। ইংরেজি spear অর্থে 'gar' এল শুধু garlic (রসুন-এ), garlicএর পাতাগুলো বর্শার মতো বলে। তারপর 'gar' আর এলই না।

৫.৫ ■ দেরিদা (Derrida)র মতে শব্দের মধ্যে যে অর্থটা থাকেই না, থাকলে তা আংশিকমাত্র বা আভাসমাত্র তা আমাদের অর্থের সন্ধানে আরও আগে পাঠিয়ে দেয়। একে উনি বলেন দেফেরাঁস।

বাংলা বাগ্‌বিধি (ইডিয়ম)-তেও শব্দার্থ-পরিবর্তনের নানা ধারা লক্ষণীয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬

বাগ্‌বিধি

[বাগ্‌বিধি কী—বাংলায় প্রচলিত সংস্কৃত বাগ্‌বিধি—কিছু স্বল্পব্যবহৃত বাংলা বাগ্‌বিধি—পূর্বসূরিদের প্রয়োগ—অধুনা প্রচলিত নতুন ধরনের বাগ্‌বিধি]

৬.১ ■ বাগ্‌বিধি কী

অর্থ পরিবর্তনের ধারাপথেই আমরা অনিবার্যভাবে বাগ্‌বিধির আঙিনায় এসে পড়ি। বাংলার বিশিষ্টার্থক বাগ্‌গুচ্ছ, বাগ্‌বিধি বা প্রবাদ-প্রবচন বোঝাতে ইংরেজি idiom শব্দটি ব্যবহার হয়। শব্দটির মূল অর্থ :

'আমি এইভাবেই বলি'

'এ আমারই'

ইংরেজ যুবক হেনরি বাংলা শিখে একটা প্রবচনে এসে ধাক্কা খেল। জিজ্ঞেস করল : Isn't cocoanut harder than jackfruit?

আমি হতচকিত হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকি। বলি, 'হ্যাঁ, কাঁঠালের চেয়ে নারকেলই শক্ত।' হেনরির জিজ্ঞাসা, 'পরের মাথায় কাঁঠাল না ভেঙে, নারকেল ভাঙা চলে কি না।'

আমি তাকে পাল্টা প্রশ্ন করি, 'Can you replace 'nut' in 'a hard nut to crack', by anything harder?'

হেনরি এবারে প্রাণখোলা হাসি হাসল।

তবে ব্যাকরণগত ভাবে যা অনড়, সাহিত্যের প্রয়োজনে তার হেরফেরও হতে পারে, কৌতুক-কটাক্ষে তো হয়ই। প্রচলিত বাগ্‌বিধি আমাদের ভাবপ্রকাশে যে মাধুর্য বা বৈচিত্র্য আনে তাতে সন্দেহ নেই।

যে কোনও একদিনের খবরের কাগজে অন্তত একশো পঁচিশ-ত্রিশটা বাগ্‌বিধি থাকে—সম্পাদকীয় থেকে শুরু করে, অতিসাধারণ সংবাদেও। আর ওই বাগ্‌বিধির ছোঁয়ায়—মরা সংবাদও জ্যান্ত হয়ে ওঠে। 'ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়'—এক হেডিংয়েই বাজি মাত; এমনিতে যে সংবাদ কেউ পড়তই না 'আক্কেল সেলামি' হেডিং দেখে সে না পড়ে যায় কোথায়? এই সব প্রবাদপ্রবচন যে বাঙালির শিরায় ধমনীতে। বাংলায় ব্যবহৃত সংস্কৃত প্রবাদও দারুণ লাগসই। যেমন শঠে শাঠ্যং, ঋণং কৃত্বা ইত্যাদি। আনন্দবাজারে একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আলোকচিত্রের পরিচিতিতে 'রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ'—সুন্দর প্রয়োগ, তবে শুধু প্রথম অংশটুকু থাকলেই হত। রাজদ্বারে শ্মশানে চ। সংস্কৃত প্রবাদে বানানটা— মানে ং ঃ বা সন্ধি যেমন আছে তেমনি রাখাই ভাল। একদিনের সম্পাদকীয়তে দেখলাম অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণঃ, 'ভক্ষ্যো' বললে ক্ষতি কী ছিল? তেমনি, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় (আ. বা.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২২.৬.৯৪)—'শ্রেয়'তে বিসর্গ নেই কেন ? অবশ্য বঙ্গীকরণে কিছু ত্রুটি ঘটে যাওয়াই হয়তো স্বাভাবিক।

৬.২ ■ বাংলায় ব্যবহার্য সংস্কৃত বাগ্‌বিধির একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা

অচিন্ত্যচিন্তা চমৎকারা, অন্যে পরে কা কথা, অধিকন্তু ন দোষায়, অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু, অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্‌, অলমতিবিস্তারেণ, অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ, কা কস্য পরিদেবনা (বা পরিবেদনা), কিমাশ্চর্যমতঃপরম্‌, ন যযৌ ন তস্থৌ, ন স্থানং তিলধারণম্‌, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়, পাদমেকং ন গচ্ছামি, প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ, বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া, বিষকুম্ভং পয়োমুখম্‌, বিষস্য বিষমৌষধম্‌, মধুরেণ সমাপয়েৎ, মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ, মা ফলেষু কদাচন, মুনীনাং চ মতিভ্রমঃ, মৌনং সম্মতিলক্ষণম্‌, যঃ পলায়তি স পলায়তে স জীবতি, যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী, যেন তেন প্রকারেণ, রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ। শতং বদ মা লিখ, শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ ইত্যাদি।

৬.৩ ■ কিছু বাংলা প্রবাদ সংস্কৃত থেকে এসেছে। উৎসটি আমরা ভুলেই গিয়েছি। যেমন 'যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে' এই প্রবাদটির উৎস মহাভারত সম্বন্ধে একটি উক্তি :

যন্নেহাস্তি, ন তৎ ক্বচিৎ।

অথবা আদার ব্যাপারীর আবার জাহাজের খবর দিয়ে দরকার কী—এই প্রবাদটির উৎস : কিমার্দ্রক বণিজাং বহিত্রচিন্তনেন (উদয়নাচার্য। আত্মবিবেক)।

অনেক সময় সংস্কৃতের মূল অর্থ বাংলায় এসে বদলেও যায়। যেমন তীর্থকাক বা তীর্থের কাক এর এখনকার অর্থ দাঁড়িয়েছে ধর্না দেওয়া, অথচ সংস্কৃতে অর্থ ছিল অন্যরকম। পতঞ্জলি মুনির ব্যাখ্যা অনুযায়ী এর অর্থ—কাকেরা যেমন তীর্থে গিয়ে বেশিক্ষণ থাকে না, সেইরকম গুরুগৃহে গিয়ে যে বেশিদিন থাকে না তাকে তীর্থকাক বলা হয় : যথা তীর্থে কাকা ন চিরং স্থাতারো ভবন্তি, এবং যো গুরুকুলানি গত্বা ন চিরং তিষ্ঠতি স উচ্যতে তীর্থকাক ইতি।

৬.৪ ■ স্বল্পব্যবহৃত কিছু বাগ্‌বিধি

বহু বাংলা প্রবচনই তো প্রতিদিন সংবাদপত্রে দেখি। যেগুলোর ব্যবহার কম অথচ যা রাজনৈতিক, সামাজিক বা নৈতিক যে কোনও বিষয়ে খাটতে পারে এমন একটি প্রবচনের তালিকা দিচ্ছি বর্ণানুক্রমে, অর্থ সহ—

অস্থির পঞ্চক (সংকটে পড়ে অস্থির ও উদ্‌ভ্রান্ত)

আখর দেওয়া (বক্তব্য বিশদ করবার জন্যে অতিরিক্ত শব্দ যোগ করা)

ইঁদুরকলে পড়া (সংকটময় অবস্থায় পড়া)

ইঁদুর মারতে ঘর পোড়ানো (পরের সর্বনাশ করার জন্যে নিজের সর্বনাশ করা)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উচোট খেয়ে প্রণাম (উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে প্রকৃত ব্যাপার গোপন করা)

উলটে চোরা মশান গায় (নিজের দোষ স্বীকার না করে পরের দোষ প্রমাণের চেষ্টা)

উনকোটি চৌষট্টি (বহুরকম আয়োজন, যাতে খুঁটিনাটি কিছুই বাদ যায়নি)

এ ওর পিঠ চুলকে দেয় (যারা কোনও সম্মান বা প্রশংসা পায় না এমন অবহেলিত ব্যক্তিদের পরস্পর গুণগান)

এক ব্যঞ্জন নুনে বিষ ! (যে বস্তুটি একমাত্র সম্বল কোনও বিশেষ দোষের দরুন তা অব্যবহার্য)

এড়িয়ে গড়িয়ে (গদাইলস্করি চালে)

কাকভুশুণ্ডী (অতি প্রাচীন জ্ঞানী ব্যক্তি, যিনি অতীতের সাক্ষী)

গোলেমালে চণ্ডীপাঠ (এমনভাবে গোঁজামিল দিয়ে কাজ করা যাতে ফাঁকি না ধরা পড়ে)

ঘোর কীর্তনে মৃদং ভঙ্গ (তুমুল উৎসাহের মধ্যে বিঘ্ন উপস্থিত হয়ে কাজ পণ্ড হওয়া)

চড়ুকে পিঠ সড় সড় করে (অভ্যাস ত্যাগ করা শক্ত)

চরণবাবুর জুড়ি (পায়ে হেঁটে যাওয়া)

চিত বাজান্ বাজানো (নিজের ভুল-ত্রুটির জন্য অপ্রস্তুত না হয়ে বাহাদুরি নেবার চেষ্টা)

পচা আদার ঝাল বেশি (অধমের বিক্রম বেশি)

পড়ে পড়ে লেজ নাড়া (অলস নিশ্চেষ্টভাবে সময় কাটানো)

ভরাডুবির মুষ্টিলাভ (যথা লাভ)

ভরায় মেনে সরায় শোধে (বেশি দেবার আশা দিয়ে অল্পমাত্র দেওয়া)

ভাঙা ঘরের লোহার আগড় (তুচ্ছ জিনিস রক্ষা করার জন্যে অত্যধিক সাবধানতা)

ভাঙা হাটে কাড়া দেওয়া (সুযোগ চলে গেলে সব চেষ্টাই ব্যর্থ)

ভাঙে উচ্ছে বলে পটোল (প্রকৃত ব্যাপার গোপন করা, বড়মানুষি চাল দেখানো)

ভিন্ন ভাতে বাপ পড়শি (পৃথগন্ন হলে নিবিড় সম্পর্ক আর থাকে না)

মশালচি আপনি কানা (যে অন্যকে সদুপদেশ দেয় সে নিজে তা মেনে চলে না)

মাগনা খেয়ে ঢেঁকুরের ধুম (গরিবের বড়মানুষি দেখানো)

রামচাঁদে তেঁতুল খায়, শ্যামচাঁদের জ্বর (একজনের কাজের ফলে আর একজনের দুর্ভোগ)

লেজকাটা শিয়াল (যে অপরকে নিজের মতো উপহাসাস্পদ হতে পরামর্শ দেয়)

সভা বুঝে কীর্তন (শ্রোতার যোগ্যতা ও রুচির উপযোগী কথা বলা)

সাত দিনের ভানুমতী (স্বল্পকালস্থায়ী হুজুগ)

হাল বায় না তেড়ে গুঁতোয় (কাজে অপটু, কেবল কুকাজ করে)

ইংরেজিতে এ ধরনের অজস্র idiom আছে কিন্তু এগুলো কথায় ব্যবহার হলেও লেখায় খুব কমই ব্যবহার করা হয়। অধিকাংশই cliche বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতিব্যবহারে জীর্ণ বলে তা বর্জনই করা হয়। কোনও কোনও সময়ে প্রসঙ্গত একটু বদলেও নেওয়া হয়। আর ঠিক ওজন বুঝে ব্যবহার করতে না পারলে কোথাও তা হাস্যকরও হয়ে উঠতে পারে। Idiomকে 'the life and spirit of language' বললেও (L.P. Smith) ব্যবহার সম্বন্ধে হুঁশিয়ার করেছেন অনেকেই। ইডিয়মের প্রামাণ্য বইয়ে Frederick T. Wood বলেছেন 'My own experience is that the practice should be discouraged.' তবে ইংরেজিতে preposition নিজেই idiom যা অজস্র prepositional verb গড়ে তুলেছে।

বাংলাতেও ব্যবহারজীর্ণ বাগ্‌বিধি আমরা নিশ্চয় এড়াতে চাই। সেই কারণেই কিছু স্বল্প ব্যবহৃত বাগ্‌বিধির উদাহরণ দিয়েছি।

আরও নানা ধরনের বাগ্‌বিধি বাংলায় আছে। যেমন, বিশেষ্যের সঙ্গে বিভিন্ন ক্রিয়াপদ যোগ করে : হাত করা (স্বপক্ষে আনা), হাত লাগানো (কাজে প্রবৃত্ত হওয়া), হাত পাকানো (অভ্যাস করে পটু হওয়া) ইত্যাদি। একই বিশেষণ বিভিন্ন শব্দের সঙ্গে যোগ করে : কাঁচা কাজ (বোকামি), কাঁচা বয়স (অল্প বয়স), কাঁচা লেখা (দুর্বল রচনা) ইত্যাদি। বিশিষ্ট অর্থপ্রকাশক অব্যয়ও বাগ্‌বিধির অন্তর্গত : যেমন ওর মুখের উপর (=সামনাসামনি), একথা কী করে বললি ? মল্লার রাগের উপর (অবলম্বনে) সুর দিয়েছি গানটিতে, জ্বরের উপর (জ্বর থাকতে), খেতে ভাল।

চলিত বাগ্‌বিধির সাধুভাষায় রূপান্তর

অনেক সময়ে চলিত ইডিয়মটি সাধুভাষায় রূপান্তরিত করে কৌতুক-কটাক্ষে আরও কিছুটা বিদ্যুৎ-সঞ্চার করা চলে, যেমন 'কোথা হইতে এক চক্ষুখাদিকা, ভর্তার পরমায়ুহন্ত্রী, অষ্টকুষ্ঠীর পুত্রী উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিবে, ইহা কোন্ সৎকুলপ্রদীপ কনকচন্দ্র সন্তান সহ্য করিতে পারে।'

[রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা। রবীন্দ্রনাথ]

বলা বাহুল্য এখানে উদ্দিষ্ট বাগ্‌বিধিগুলি যথাক্রমে চোকখাকি, ভাতার-খাকি, আঁটকুড়ের বেটি ও সোনার চাঁদ।

জনসাধারণের **প্লীহার চমক** কমিবার পূর্বেই শোনা গেল সংবাদটি সত্য নহে। (আ. বা. ৯.৪.৯৪)

৬.৫ ■ পূর্বসূরিদের প্রয়োগ

মনীষী, সাহিত্যিক ও কবিদের কিছু প্রয়োগ বাংলায় প্রবাদপ্রবচনের মতো হয়ে গিয়েছে। এগুলো ব্যবহারে বক্তব্যের চারুতা বাড়ে। যেমন—অচলায়তন, আমার ভাণ্ডার আছে ভরে, এ তরঙ্গ রোধিবে কে ? উঠিলেও নিয়ম নামিলেও নিয়ম, ধীরে রজনী ধীরে, সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল ইত্যাদি।

সম্প্রতি একটি সম্পাদকীয়ের শিরোনাম 'অতি অল্প হইল' দেখে ভাল লাগল। 'কস্যচিৎ ভাইপোস্য'ও কোথাও চলতে পারে।

কারক-বিভক্তি সমাস সব প্রকরণেই এই ইডিয়মের রাজত্ব। 'লোকে বলে' না বলে 'লোক বলে' কি বলা চলে ? 'ওকে ডাক্তার দেখা' না বলে ওকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ডাক্তারকে দেখা' কি বলা যায় ? তেমনি সমাসেও 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' না বলে কেউ যদি 'কিংকর্তব্যবিভ্রান্ত' বলেন তাঁকেই বিভ্রান্ত বলে মনে হবে না কি ?

৬.৬ ■ অধুনা প্রচলিত নতুন ধরনের বাগ্‌বিধি

• হিন্দি বা আরবি-ফারসি শব্দের সঙ্গে বাংলা ক্রিয়াপদ জুড়ে : সমঝোতায় আসা, সমঝোতা করা, মোকাবিলা করা, মদত দেওয়া, শামিল হওয়া, নজর কাড়া, জেহাদ ঘোষণা করা ইত্যাদি।

• ইংরেজির সঙ্গেও এইরকম ক্রিয়া দেখা যাচ্ছে, ইমপিচ করা ; শো কজ করা ইত্যাদি। 'শো কজ করা' তো চলতেই পারে, টেনশন করা বা না করা কি চলবে ? চিকিৎসকেরা এখন তাঁকে টেনশন না করতে এবং বিশ্রাম নিতে নির্দেশ দিয়েছেন (আ. বা. ৬.৫.৯৩)।

• কল্পিত ইংরেজি idiom-এর বঙ্গানুবাদ : বীরভূমে জার্সিবদলের হিড়িক যথাপূর্বম্ তথা পরম্। (আ. বা. ১৭.৫.৯৩)

• নতুন বাংলা বাগ্‌বিধি তৈরির প্রবণতা : ধন্দ কাটা, আন্দোলন ওঠা (প্রত্যাহৃত হল অর্থে), সাড়া ফেলা (রীতিমতো সাড়া ফেলিয়া দিয়াছে, আ. বা. ২৪.৪.৯৩)। আগে শুনতাম সাড়া জাগানো বা সাড়া তোলা।

• ইংরেজি Slang idiom-এর অনুবাদ : কেকের ভাগের জন্যে প্রতিযোগী ৮.৬.৯৩ (Set one's share of the cake Dic. of Slang, Partridge) রীতিমতো কেক-ওয়াক ৮.৬.৯৩ (Cake-walk—Military Slang, A raid or attack that turns on to be unexpectedly easy—Dic. of Slang, Partridge.)

• অনেক সময় ইংরেজি সম্পূর্ণ প্রবাদটির হুবহু অনুবাদ ভালই লাগে, যেমন—'এই জন্যই বোধ হয় বলে নিজে কাচের ঘরে বাস করিয়া অন্যকে লক্ষ করিয়া ঢিল ছুঁড়িতে নাই। (আ. বা. ১০.৬.৯৩) অথবা, রাজপরিবারের নোংরা কাপড় প্রকাশ্যে আনিয়া কাচিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু মসৃণভাবে সাত গোলে হারিয়াছে—বাংলা নয়। (by clean seven goals-এর জায়গায় 'পরিষ্কার সাত গোলে' কথাটিই বাগ্‌বিধিসম্মত। তাহারাও কেহ মসৃণভাবে নির্বাচনী বৈতরণী পার হইবার আশা করিতেছেন না (আ. বা. ৭.৪.৯৩)—এও বাংলা নয়। Smoothlyর অনুবাদ এখানে 'অনায়াসে' বা 'চোখ বুঁজিয়া'। মসৃণভাবে কথাটা ঝালেঝোলে অম্বলে ব্যবহার করা হচ্ছে, প্রয়োগগুলো খুব 'মসৃণ' নয়। আমি 'দাবি রাখা', 'বক্তব্য রাখা'র ওপর কোনও 'অভিশাপ রাখছি না', তবে মাত্রাহীন 'মাত্রা'য় বড় বিব্রত বোধ করছি। ইংরেজি dimension এর অনুবাদ হিসেবে এসেছে 'মাত্রা'। ইংরেজিতে give a dimension to (or a new dimension to) something একটি সুন্দর প্রবচন। কিন্তু কোনও কিছুতে নূতন মাত্রা যোগ না করতে পারলে আমাদের ঘুম হয় না। সম্পাদকীয়তে 'নূতন মাত্রা' দিয়ে যদি কোনও বাক্য থাকে, শুক্রবারের কাগজ হলে সঙ্গীত সমালোচনায় নূতন মাত্রা যুক্ত হবে স্বরবিস্তারে, চিত্রসমালোচনায় সেই নূতন মাত্রা যুক্ত হবে 'জলরঙের উপস্থাপনায়'। অভিনয়-সমালোচনাতেও এই বাগ্‌বিধি যুক্ত হবে, সে স্বল্পপ্রক্ষেপেই হোক, মঞ্চনির্দেশনাতেই হোক, বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংলাপ রচনাতেই হোক। এই ধরনের বাগ্‌বিধির একটা সুবিধা আছে, বৈশিষ্ট্যটা কী (fresh aspect—Chambers) তা বলতে হচ্ছে না বা এড়ানো যাচ্ছে। শুধু মাত্রা যোগের stunt দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, stunt-এর একটা বাংলো হওয়া দরকার।

লাগাতার বা সোচ্চার শুনতে শুনতে শ্রুতিদোষ ঘটেছে, বোধহয় এইটিই অনিবার্য 'ফলশ্রুতি'! তার ওপর ধোলাই দেওয়া, ঢপ দেওয়া ইত্যাদি তো আছেই।

একেকবার মনে হয় পুরনোকেই সোনালি দেখছি, নতুনকে বরণ করার মনটা হারিয়ে ফেলেছি। নতুন শব্দ তো আসবেই শব্দভাণ্ডারে প্রবেশের দাবি রাখতে। এ তরঙ্গ রোধিবে কে? মনে পড়ে ডঃ জনসনের উক্তি: 'Tongues, like Governments, have a natural tendency to degeneration.'

হরি ওম্।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭

সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা

[সাধুচলিতের রূপগত ও গঠনগত পার্থক্য—পদসংস্থান—সাধুচলিতের রকমফের—সাধুচলিতের দোষ—সাধুভাষা কি প্রত্নগৃহে যাবে? —আনন্দবাজারের সম্পাদকীয়তে সাধুভাষা কি উঠে যাবে?]

আমাদের ভাষাতরুর ডালে দুটি পাখি। একটি স্থির, আর-একটি কিছুটা চঞ্চল। দুটির মুখেই কূজন—দু'রকমের,—একটি গম্ভীর আর-একটি চটুল। তবে আলোর বন্দনায় দুটিই সমান মুখর, সমান পুলকিত।

বাংলার দুটি রীতিকে আমার এই রূপ-কল্পের মধ্য দিয়েই দেখতে ইচ্ছে করে। একটি রীতিকে আমরা বলছি **সাধু**, আর-একটিকে **চলিত**। একটি গড়ে উঠেছিল সংস্কৃতের প্রচ্ছায়ে ইওরোপীয় মিশনারি ও মুনশিদের হাতে। সাধুভাষা নামটি সম্ভবত রামমোহনই দিয়েছিলেন। (১০) এই ভাষাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর তিনিই স্থাপন করলেন। বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের হাতে সে-ভাষা প্রাণ পেল। সাধারণের মুখের ভাষা বোঝাতে চলত 'অপর ভাষা' কথাটি। আলালি-হুতোমি ভাষায় এই অপর ভাষার শক্তিকে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম। বিদ্যাসাগর তাঁর কথামালায় কুঠার ও জলদেবতা গল্পে একটি পঙ্‌ক্তিতে লিখলেন—হঠাৎ কুঠারখানি তাহার হাত 'ফস্কিয়া' নদীর জলে পড়িল। বলতে ইচ্ছে হয়, ওই ফস্কানো কুঠার তুলে নিয়েই যেন ভাষাকাঠিন্যের জটিল বেড়ার বাঁধন কাটলেন প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্ন।

প্রশ্ন দাঁড়াল এই অপর ভাষা বা চলিত ভাষা তো অঞ্চলভেদে নানারকম, সাহিত্যের ভাষায় কোনটি গৃহীত হবে, এ নিয়ে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি, আপনা থেকেই যার প্রভাব বেশি তাকেই বরমাল্য দেওয়া হল। কলকাতা ও ভাগীরথী তীরের মুখের ভাষাকেই লেখ্য ভাষা হিসেবে নির্বাচন করা হল। একে এখন বলা হচ্ছে মান্য চলিত ভাষা (Standard Colloquial Bengali)। বিবেকানন্দ এই ভাষারই সপক্ষে জোরালো রায় দিলেন। (১১) তাঁর রচনায় এ ভাষার শক্তির স্বাক্ষর পাওয়া গেল।

১৯১৪-তে এল সবুজপত্রের আহ্বান। এই আহ্বানে সাড়া দিলেন রবীন্দ্রনাথ। সবুজপত্রের বাণী ছিল 'ওঁ প্রাণায় স্বাহা'। বোঝা গেল প্রাণধর্মে বিশ্বাসী এই পত্র—বক্তব্যের নূতনত্বের সঙ্গে চলিত ভাষার জয়যাত্রা শুরু হল। রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপের ডাইরিতে প্রথম চলিত ভাষা ব্যবহার করলেও সেটা ছিল পরীক্ষামূলক। সবুজপত্রই তাঁকে চলিত ভাষার আঙিনায় নিয়ে এল।

৭.১ ■ গঠনগত পার্থক্য

দুই রীতির পার্থক্যের দিকে তাকালে আমরা সহজেই দেখতে পাব সাধুভাষায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গের রূপ পূর্ণাঙ্গ, চলিতভাষায় সংক্ষিপ্ত। শুনিতেছে > শুনছে, শুনিল > শুনল, শুনিতেছিল > শুনছিল, শুনিত > শুনত, শুনিবে > শুনবে, শুনিতে থাকিবে > শুনতে থাকবে। বুঝিবার > বোঝবার, শুনিবার > শোনবার, সামান্য বর্তমানে শোনে—শোনো—শুনি উভয় ক্ষেত্রেই এক।

অসমাপিকা : শুনিতে > শুনতে, শুনিয়া > শুনে।

সর্বনাম : আমি—আমরা, তুমি—তোমরা, তুই—তোরা, আপনি—আপনারা উভয় ক্ষেত্রেই এক। তেমনি আমাকে—তোমাকে—তোকে—আপনাকে উভয় ক্ষেত্রেই এক।

আমাদিগকে > আমাদেকে, আমাদেরকে, আমাদের, তোমাদিগকে > তোমাদেকে, তোমাদেরকে, তোমাদের, তাহারা > তারা, তাহাদিগকে > তাদেকে, তাদেরকে, তাদের, আমাদিগের > আমাদের, তাহাদিগের, তাহাদের > তাদের, তাহার > তার, তোমাদিগের > তোমাদের। ইহা > এ, ইহারা > এরা, উহা > ও, ওটি, উহারা > ওরা, যাহা > যা, যাহারা > যারা, কাহারা > কারা, কাহাকে > কাকে, কাহাদের > কাদের।

কিছু অব্যয় ও ক্রিয়াবিশেষণের প্রয়োগে

এক্ষণে > এখন, পশ্চাৎ > পরে, পশ্চাতে > পিছনে, পিছু, তৎপর, তাহার পর > তারপর, তদ্রূপ > সেইরকম, যেরূপ > যেমন, সেরূপ > তেমন, অতঃপর > এর পর, এই নিমিত্ত > এর জন্য, জন্যে, তথায় > সেখানে, এস্থলে > এখানে, যদি চ > যদিও, যদ্যপি > যদিও, ন্যায় > মতো, তথা চ > তবু, তবুও, তথাপি > তবু, তবুও, পুনঃপুনঃ > বারবার, পুনর্বার > আবার।

AMARBOI.COM

অন্যান্য শব্দে

সন্ধ্যা > সন্ধে, বিদ্যা > বিদ্যে, দুয়ার > দুয়োর, ফিতা > ফিতে, হিসাব > হিসেব, মিঠা > মিঠে, জিজ্ঞাসা > জিজ্ঞেস, সুবিধা > সুবিধে, জন্য > জন্যে, ফিকা > ফিকে, কুয়া > কুয়ো। [সন্ধ্যা বিদ্যা ইত্যাদি শব্দও যে চলিতভাষায় ব্যবহার্য তা বলা বাহুল্য]

৭.২ ■ পদসংস্থান

• সরলবাক্যে উভয় রীতিতেই, সাধারণত কর্তা আগে, কর্ম থাকলে তা কর্তার পরে, সবশেষে ক্রিয়া। কর্তার বিবর্ধক থাকলে তা কর্তার আগে বিশেষণের মতো ব্যবহার হবে। কর্মের বিশেষণ থাকলে তা কর্মের আগে ব্যবহার হবে। ক্রিয়াবিশেষণ সাধারণত ক্রিয়ার আগে বসে। সাধুভাষায় এর ব্যতিক্রম কমই দেখা যায়, কিন্তু চলিতভাষায় এ নিয়মের বহু ব্যতিক্রম দেখা যায়। একটি পাখি ডালের উপর বসিয়া মিষ্টস্বরে গান গাহিতেছে। সাধুভাষায় এই পদবিন্যাসকে একটি পাখি ডালের উপর বসিয়া গান গাহিতেছে মিষ্টস্বরে—এমনটি চলবে না। কিন্তু চলিতভাষায় একটি পাখি ডালের উপর বসে গান গাইছে মিষ্টি সুরে বা একটি পাখি মিষ্টি সুরে গান গাইছে ডালের উপরে বসে—এমন বিন্যাস চলতে পারে। আমি তাহাকে যাইতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলিলাম—এই গড়নটি বদলে যদি বলি আমি তো তাহাকে বলিলাম যাইতে, তা হলে কান ঠিক সায় দেয় না, কিন্তু চলিতভাষায়, 'আমি তো তাকে বললাম যেতে' অনায়াসে চলবে। কথা বলতে বলতে আমরা চললাম এগিয়ে। সাধুভাষায় রূপান্তর করলে বলতে হয়—কথা বলিতে বলিতে আমরা আগাইয়া চলিলাম।

● জটিলবাক্যে উভয় ক্ষেত্রেই সাধারণত প্রধান বাক্যের পরে বিশেষ্যস্থানীয় অঙ্গবাক্য। আমরা জানিতাম সে না-ও আসিতে পারে > আমরা জানতাম সে না-ও আসতে পারে। ক্রম বদলে যাবে যদি এভাবে বলি—সে যে না-ও আসিতে পারে তাহা আমরা জানিতাম। বঙ্কিমচন্দ্র অনেক সময় প্রত্যক্ষ উক্তির আগে 'যে' ব্যবহার করেছেন। উদ্ধারচিহ্ন ব্যবহার করেননি। এই প্রত্যক্ষ উক্তিকে 'বলিলেন', 'কহিলেন' ইত্যাদি ক্রিয়ার কর্মস্থানীয় অঙ্গবাক্য হিসেবেই ধরতে হবে—উপযুক্ত সময়ে নবকুমারের প্রতি আদেশ করিলেন যে কপালকুণ্ডলাকে স্নান করাইয়া আন। *(কপালকুণ্ডলা)* এই ধরনের বাক্যে এখন আমরা অবশ্যই 'যে' বাদ দিয়ে লিখব—উপযুক্ত সময়ে নবকুমারের প্রতি আদেশ করিলেন, 'কপালকুণ্ডলাকে স্নান করাইয়া আন।' উদ্ধারচিহ্ন অবশ্য আবশ্যিক নয়। সাধুতে প্রত্যক্ষ উক্তিতে চলিতের রেওয়াজ বঙ্কিমচন্দ্রেও দেখা যায় কোথাও কোথাও : 'ও ভাই—এ তো বড় কাজটা খারাবি হলো—এখন বারদরিয়ায় পড়লেম—কি কোন্ দেশে এলেম, তা যে বুঝতে পারি না।' *(কপালকুণ্ডলা)*

বিশেষণস্থানীয় অঙ্গ-বাক্য উভয় ক্ষেত্রেই আগে বসে, বাক্যটি শুরু হয় যে, যাহা (যা), যাহারা (যারা) ইত্যাদি দিয়ে—যে রক্ষক সেই ভক্ষক। 'যিনি এই সমস্ত চিত্তবিদারক ব্যাপার আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন তাঁহার আর প্রজাদের দারুণ দুর্দশার কারণ জিজ্ঞাসার অপেক্ষা নাই।' (পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থাবর্ণন, অক্ষয়কুমার দত্ত)। চলিত ভাষাতেও এই বিন্যাসই অনুসৃত : যিনি এই-সব চিত্তবিদারক ব্যাপার আদ্যোপান্ত পাঠ করবেন তাঁর আর প্রজাদের দারুণ দুর্দশার কারণ জিজ্ঞাসা করার দরকার হবে না।

ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় অঙ্গ-বাক্য ব্যবহারে সাধু চলিতের একই রীতি। (বাক্য শুরু যদি, যখন, যেমন ইত্যাদি নিয়ে, কারকপদ বা সম্বন্ধপদ বসতে পারে।) 'যদি বলি উচ্চশিক্ষা, তাহা হইলে ভদ্রসমাজে খুব একটা উচ্চহাস্য উঠিবে।' (লোকহিত/ রবীন্দ্রনাথ) 'ইহাদের যেমন মুখে অগ্নি জ্বলিবে তেমনি জঠরেও অগ্নি জ্বলিবে।' (বাবু/ বঙ্কিমচন্দ্র)

● যৌগিক বাক্যের গঠনও উভয় রীতিতে একই। তবে চলিত ভাষায় আমরা মূল বিন্যাস অটুট রেখে শুধু ক্রিয়াপদের স্থান পরিবর্তন ঘটাতে পারি : আমার শরীর খুব খারাপ ছিল, তবুও আমাকে সেখানে কর্মস্থলে যাইতে হইয়াছিল। খুব খারাপ ছিল আমার শরীর, তবুও কর্মস্থলে যেতে হয়েছিল আমাকে।

● অনুজ্ঞা বাক্যেও তুলনায় চলিত ভাষায় কিছুটা স্বাধীনতা দেখি—

সা : মন দিয়া তাহার কথা শোনো বা শুনিয়ো।

চ : মন দিয়ে তার কথা শোনো বা শুনো, মন দিয়ে কথা শোনো তার বা কথা শুনো তার। বা তার কথা শোনো মন দিয়ে। বা কথা শুনো মন দিয়ে।

এ-সব উদাহরণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় চলিতভাষা সাধুভাষার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিন্যাস-বাঁধন কোনও কোনও জায়গায় মেনেও সে বাঁধন ভাঙতে পারে।

'যাকে খুঁজছেন, তার কালচারের কথাটা একবার ভেবে দেখুন'—এ হল প্রচলিত বিন্যাস, কিন্তু বাক্যটির যদি মনে হয় একো'হং বহু স্যাম্, তা হলে সে তা হতে পারে :

খুঁজছেন যাকে তাঁর কালচারের কথাটা একবার ভেবে দেখুন।

যাকে খুঁজছেন একবার ভেবে দেখুন তার কাল্চারের কথাটা।

যাকে খুঁজছেন তার কাল্চারের কথাটা ভেবে দেখুন একবার ইত্যাদি।

সাধুভাষা এসব দেখে হয়তো বলবে, 'মোর শকতি নাহি উড়িবার।'

৭.৩ ■ সাধু-চলিতের রকমফের

সাধুভাষা

১. তৎসম শব্দ বাহুল্য

তাহারা এইরূপ দুঃসহ দুঃখার্ণবে নিমগ্ন থাকিয়া কী প্রকারে জীবিতবান্ থাকে! পরমেশ্বর তাহারদিগকে লোকাতীত তিতিক্ষাশক্তি প্রদান করিয়াছেন সন্দেহ নাই। উত্তপ্ত লৌহদণ্ড হৃদয়মধ্যে প্রবেশিত হইলেও সেই দুর্জ্জয় তিতিক্ষাকে পরাভব করিতে পারে না। (পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা-বর্ণন। অক্ষয়কুমার দত্ত)

সমাসবাহুল্য : দেখিলেন যেন আকাশমণ্ডলে নবনীরদনিন্দিত মূর্তি। গলবিলম্বিত নরকপালমালা হইতে শোণিতস্রুতি হইতেছে; কটিমণ্ডল বেড়িয়া নরকররাজি দুলিতেছে—বামে করে নরকপাল—অঙ্গে রুধিরধারা, ললাটে বিষমোজ্জ্বল-জ্বালাবিভাসিতলোচনপ্রান্তে বালশশী সুশোভিত। [*কপালকুণ্ডলা* / বঙ্কিমচন্দ্র]

(সমাসভূয়স্ত্ব সংস্কৃতে গৌড়ী রীতির লক্ষণ। আলোচ্য অংশটিতে সমাসের অনুপ্রাসজনিত মাধুর্য লক্ষণীয়। তান্ত্রিকবর্ণনায় এই গুরুগম্ভীর ভাষা যথার্থই উপযোগী)

২. তৎসম বহুলতা সত্ত্বেও সহজ

'মানবজাতি উত্থান কর; দিবাকর উদিত হইয়াছেন। দিবাকরের রথচক্র মহাকালের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছে। উত্তর হইতে দক্ষিণে, দক্ষিণ হইতে উত্তরে তাঁহার রথচক্র প্রবর্তিত হইয়া মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর মহাকালদেহে অঙ্কিত করিয়া চলিয়াছে। উত্তরায়ণের পর দক্ষিণায়ন; দক্ষিণায়নের পর উত্তরায়ণ; যাত্রার পর পুনর্যাত্রা। অদ্য আষাঢ়ী শুক্লদ্বিতীয়া। গ্রীষ্মঋতুর অবসান হইয়াছে; বর্ষার বারিধারায় বসুধার তপ্ত দেহ সিক্ত ও স্নিগ্ধ হইতেছে।' (প্রকৃতিপূজা। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী)

সহজতর : 'তখনকার দিনে এ পৃথিবী বস্তুটার রস কী নিবিড় ছিল, সেই কথাই মনে পড়ে। কী মাটি কী গাছপালা, কী আকাশ সমস্তই তখন কথা কহিত—মনকে কোনমতেই উদাসীন থাকিতে দেয় নাই। পৃথিবীকে কেবলমাত্র উপরের তলাতেই দেখিতেছি, তাহার ভিতরের তলাটা দেখিতে পাইতেছি না, ইহাতে কতদিন যে মনকে ধাক্কা দিয়াছে তাহা বলিতে পারি না।' (*জীবনস্মৃতি* / রবীন্দ্রনাথ)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. চলিতের কাছাকাছি :

'আমি এই প্রথম কলিকাতায় আসিলাম, এত বড় জমকাল শহর পূর্বে কখনও দেখি নাই। মনে ভাবিলাম, যদি এই প্রকাণ্ড গঙ্গার উপর কাঠের সাঁকোর মাঝামাঝি, কিংবা ওই যেখানে একরাশ মাস্তুল খাড়া করিয়া জাহাজগুলা দাঁড়াইয়া আছে, সেই বরাবর যদি একবার তলাইয়া যাই, তাহা হইলে আর কখনও বাড়ি ফিরিয়া যাইতে পারিব না। কলিকাতায় আমার একটুও ভাল লাগিল না। এত ভয়ে কি ভালবাসা হয় ?' (বাল্যস্মৃতি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

অনেক সময় একই লেখকের লেখায় পরপর অনুচ্ছেদে বিভিন্ন ধারা চোখে পড়ে :

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিড়াল' রচনা থেকে একটি অংশ : 'আমি সেই চিরাগত প্রথায় অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুলের কুলাঙ্গারস্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নয়। কি জানি এই মাজরী—যদি কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে। অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া সকাতর চিত্তে হস্ত হইতে হুঁকা নামাইয়া, অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্বে মাজরীর প্রতি ধাবমান হইলাম।'

পরবর্তী অংশ : 'মাজরী কমলাকান্তকে চিনিত, সে যষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ করিল না। কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া হাই তুলিয়া একটু সরিয়া বসিল। বলিল, 'মেঁও।' প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া যষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনরপি শয্যায় আসিয়া হুঁকা লইলাম। তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া মার্জারের বক্তব্য সকল বুঝিতে পারিলাম।'

এর পরবর্তী অংশ : বুঝিলাম যে বিড়াল বলিতেছে "মারপিট কেন ? স্থির হইয়া হুঁকা হাতে একটু বিচার করিয়া দেখ দেখি..."' ইত্যাদি।

এইরকম শ্রীকান্তের প্রথম পর্বে ইন্দ্র ও শ্রীকান্তের নৈশ অভিযানের সূচনায় রাত্রির যে বর্ণনা আছে তার সঙ্গে পরবর্তী অংশের বর্ণনা মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে সাধুভাষারই কত হেরফের একই লেখনীতে।

এবারে নানা ধরনের **চলিত ভাষার উদাহরণ—**

১. তৎসম শব্দবহুল

'বশিষ্ঠাদি দ্বিজগণ ঋষ্যশৃঙ্গকে পুরোবর্তী করে শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞের সকল কর্ম আরম্ভ করলেন। হোতৃগণকে আহ্বান করে যথাযোগ্য হবির্ভাগ দিলেন।' (বাল্মীকিরামায়ণ। সারানুবাদ রাজশেখর বসু) এখানে শুধু 'করলেন' আর 'করে' আছে বলেই একে চলিত বলে চেনা যাচ্ছে, না হলে শব্দগ্রহণে তা সাধুই বলা চলে।

২. তৎসম-তদ্ভবের সুসমঞ্জস গ্রন্থন

'পল্লীগ্রামে শহরের মত গায়ক বাদক নর্তক না থাকলেও তার অভাব নেই। চারিদিকে কোকিল, দোয়েল, পাপিয়া প্রভৃতি পাখির কলগান, নদীর কুলুকুলু ধ্বনি, পাতার মরমর শব্দ, শ্যামল শস্যের ভঙ্গিমা, হেলাদোলা প্রচুর পরিমাণে শহরের অভাব এখানে পূর্ণ করে দিচ্ছে। ঘাটেমাঠে, পল্লীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোবাতাসে, পল্লীর প্রত্যেক পরতে পরতে সাহিত্য ছড়িয়ে আছে।' (পল্লীসাহিত্য। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্)

'এ কথাটা শ্রুতিকটু হলেও সত্য যে, গুরুভক্তি না থাকলে যেমন সনাতন বিদ্যা অর্জন করা যায় না, তেমনি গুরুমারা বিদ্যে না শিখলেও নূতন সাহিত্যের সর্জন করা যায় না। প্লেটো অ্যারিস্টট্লের যুগ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি সকল দেশের সকল যুগের সাহিত্যের ইতিহাস এই সত্যের পরিচয় দিয়ে আসছে। অতএব বইয়ের ভাষার সঙ্গে মুখের ভাষার যুদ্ধটা নিরর্থকও নয়, নিষ্ফলও নয়।' (বাংলার ভবিষ্যৎ। প্রবন্ধ সংগ্রহ। প্রমথ চৌধুরী)

সমন্বয়ের সঙ্গে বুদ্ধির চমক যুক্ত হয়ে এ ভাষা একদিন নূতন পথের দিশারি হয়েছিল।

৩. **সহজ সরল হালকা চালের শব্দবন্ধন**

'এক নিবিড় অরণ্য ছিল। তাতে ছিল বড়-বড় বট, সারি সারি তাল, তমাল, পাহাড় পর্বত, আর ছিল ছোট নদী। মালিনীর জল নিথর—আয়না, তাতে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, উড়ন্ত পাখির রাঙা মেঘের ছাদ—সকলি দেখা যেত, আর দেখা যেত গাছের তলায় কতকগুলি কুটিরের ছায়া।' (শকুন্তলা। অবনীন্দ্রনাথ)

এ যেন ছবি দিয়ে দিয়ে কথার ফুল ফোটানো।

মুখের ভাষা আর লেখার ভাষাকে এক করে তুলেছিলেন বিবেকানন্দ।

"আর্যবাবাগণের জাঁকই কর প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর; আর যতই কেন তোমরা 'ডম্মম্' বলে 'ডম্ফাই' কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্ছ হাজার বছরের মমি।" (ভারত—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। স্বামী বিবেকানন্দ)

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা। কথামৃতের অমৃতত্ব শুধু বচনে নয় বাচনেও: "কিন্তু কথা কি জান? খরিদ্দার আসবার পর যে বলেছিল, 'কেশব! কেশব!' তার মানে এই, এরা কারা? অর্থাৎ যে খরিদ্দাররা এল এরা সব কে? যে বলল 'গোপাল! গোপাল!' তার মানে এরা দেখছি গোরুর পাল। যে বললে 'হরি! হরি!' তার মানে এই, যে কালে দেখছি গোরুর পাল, সে স্থানে হরি অর্থাৎ হরণ করি। আর যে বললে, 'হর! হর!' তার মানে এই, যে কালে গোরুর পাল দেখছ, সেকালে সর্বস্ব হরণ কর। এই তারা পরম ভক্তসাধু।" (কথামৃত ৫ম, পরিশিষ্ট)

'যে বললে...তার মানে'...এই ধরনের শব্দবন্ধের ত্রুটি কট্টর ব্যাকরণিয়ার কানেও ধরা পড়বে না, কারণ তাঁর কানের মধ্যে দিয়ে মরমে প্রবেশ করবার মতো জাদু ওই বচনে আছে। এই সব নানা রকমের ভাষা দেখে বলতে ইচ্ছে করে—ভাষার নাম মহাশয়, যা সওয়াও তাই সয়।

৭.৪ ■ সাধুচলিতের দোষ

এবারে সাধু ও চলিতভাষার কোনগুলো গুণ আর কোনগুলো দোষ (১২) তা বলা যাক। বরং দোষের কথাই বলি, তার থেকেই বোঝা যাবে গুণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনগুলো। লুকমান পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি গুণী হলেন কী করে ? জবাবে উনি বললেন, 'অন্যেরা যে-সব দোষ করে তা খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে সেগুলো এড়াতে চেষ্টা করলাম, দেখলাম লোকে আমাকে গুণী বলতে শুরু করেছে।' তাই বলছিলাম দোষের কথাই বলি। গুণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করবে ওই দোষগুলোই। **দুই রীতির স্বরূপে বা স্বধর্মে না থাকাই সবচেয়ে বড় দোষ**। সাধু যদি একেবারে চলিত হতে চায়, আর চলিত যদি একেবারে সাধু হতে চায়, তা হলেই মুশকিল। সাবলীলতার অভাব দুই রীতিরই বড় দোষ। এবারে দোষের কথা একটু স্পষ্ট করেই বলি।

সাধুভাষার দোষ

● পরপর তৎসম বা সমাসবদ্ধ শব্দ এমন করে গেঁথে যাওয়া যাতে তার চলচ্ছক্তিই নষ্ট হয়, এ ধরনের উদাহরণ আমরা আগে দিয়েছি।

● অধুনাবর্জিত শব্দগুলো ব্যবহার করা : যেমন, এতদ্ব্যতিরেকে, যৎপরোনাস্তি, মদীয়, ত্বদীয়, অস্মদীয়, শ্রবণ করতঃ ইত্যাদি।

এখন যদি আমরা সাধুভাষায় কিছু লিখি এসব শব্দ নিশ্চয় আমরা ব্যবহার করব না।

● পদবন্ধনে গম্ভীর ও হালকা চালের শব্দের অসমঞ্জস প্রয়োগ। বাত্যাতাড়িত হইয়া কদলীবৃক্ষ ধপাস করিয়া পড়িল। একেই আমরা গুরুচণ্ডালী বলি।

● নিজস্ব গঠনরীতির নিয়ম ভঙ্গ (গঠনরীতির আলোচনা দ্রষ্টব্য)

● চলিত ভাষার সর্বনাম অনুসর্গ ক্রিয়া ইত্যাদি মিশিয়ে ফেলা।

যেমন : জানিত না কায়দাকানুন কাকে বলে (তোতাকাহিনী)। বলাবাহুল্য, এখানে 'কাকে' নয় 'কাহাকে' ঈপ্সিত।

● অস্থানপদতা

যেখানে যে-শব্দটি বসানো উচিত তার ব্যতিক্রম। পিতামাতার কথায় কর্ণপাত না করিয়াই সে স্থির করিল তাহাকেই করিবে বিবাহ। স্বীকৃত ক্রম : ...তাহাকেই বিবাহ করিবে।

'অতএব' শব্দটি বাক্যের (অথবা যৌগিকবাক্যের দ্বিতীয়াংশের) প্রথমেই বসে। বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ সবাই এই ক্রমই মেনে চলেছিলেন।

'পরিশেষে কেবল সমধিক ক্ষোভ পাইতে হইবেক : অতএব ও কথায় আর কাজ নাই।' (শকুন্তলা/বিদ্যাসাগর)

'দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও সেই অধিকার।' (বিড়াল/বঙ্কিমচন্দ্র)

'সমাজে দয়ার চেয়ে দায়ের জোর বেশি। অতএব সর্বপ্রথমে দরকার...'ইত্যাদি (লোকহিত/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যেও ছিল এইটিই স্বীকৃতক্রম) কিন্তু এখন দেখছি আ.বা. পত্রিকায় 'অতএব' শব্দটিকে একটি শব্দ টপকে পরে বসানো হচ্ছে :

'সরকার অতএব সতর্ক হোন'

'প্রশ্ন অতএব চার্লস্ ডায়না কী করিতেছেন বা অ্যানড্রু এবং সারা কোন্ ধরনের জীবনযাপন করিতেছেন তাহা লইয়া নয়' ইত্যাদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

The Govt, therefore, should be careful and alert.

The question, therefore, is not etc.: এ ধরনের construction ইংরেজিতে চলে।

'অতঃপর'-এর অবস্থানেও একই দশা দেখছি।

লিতভাষার দোষ

● বেশি-ভার তৎসম শব্দের মিছিলের পর একটি ক্রিয়াপদ—

'পুনর্বাসনপ্রকল্পের অব্যবস্থাজনিত ক্রটিবিচ্যুতি এতদঞ্চলের বাতাবরণে অসন্তোষের ছায়া ফেলেছে।'

● তৎসম বর্জন করে চলার প্রবণতা। এতে বিশেষ করে প্রবন্ধে অনেক সময় অতিতরলতা দেখা দেয়।

এগিয়ে চল। এ ছাড়া রাস্তা নেই। চলতে চলতেই মিষ্টি মেওয়া। এই চলার ডাক দিয়েছে পুরনো দিনের সন্তেরা। থামলেই মুশকিল, জড়িয়ে ধরবে কালো আঁধার।'

'গতির বাণী' এই শিরোনামের দার্শনিক প্রবন্ধে এ ধরনের বাগ্‌বিন্যাস কি প্রযোজ্য?

● বড় বাক্য ও জটিল বিন্যাস :

'ভোটের হাওয়া সি পি এমের দিকে কিছুটা ঘুরছে ঠিকই, কিন্তু সেই হাওয়া বামফ্রন্ট ও তার দুই সহযোগী জনতা দল ও ত্রিপুরা পার্বত্য জনদলের পক্ষে ব্যালট বাক্সে ভোটে কতটা রূপান্তরিত হয়, তা জানা যাবে একমাত্র ভোটগণনার সময়।' (আ.বা. ৯.৫.৯৩)

ত্রাহি মধুসূদন!

● করলুম, করলেম, করলে ('করল'র জায়গায়), করতেম—এসব ক্রিয়াপদের প্রয়োগ। এতে আঞ্চলিকতার ছোঁয়া লাগে।

● যেরূপ, সেরূপ, সাথে, নচেৎ, নতুবা, সকল, সহিত, অপেক্ষা ইত্যাদির ব্যবহার।

'ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট অপেক্ষাও সি.পি আই এম অনেক বেশি একচ্ছত্র।'

এই বাক্যে 'বামফ্রন্টের চেয়ে' ঈপ্সিত। এখানে 'একচ্ছত্র' শব্দটি তুলনাত্মক হতে পারে কি না সে প্রশ্ন অবশ্য স্বতন্ত্র।

● বাগ্‌বিধি লঙ্ঘন :

'শান্তিনিকেতন পাঠভবনে তার বৈদ্যালয়িক জীবনের সূচনা।' (আ. বা. ২৩.৪.৯৩)

'বিদ্যালয়-জীবন' কথাটিই কি বাগ্‌বিধিসম্মত নয়?

"ইহা সত্যই 'হাস্যকর কথা'।"

এ বাক্যের বাগ্‌বিধিসম্মত রূপ হওয়া উচিত 'কথাটি সত্যই হাস্যকর'।

● অর্থ-ভ্রান্তি বা অপেতার্থতা : 'প্রায়োপবেশন' কথাটি সম্পাদকীয়তে শুধু উপবাস বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ এর অর্থ তো 'আমরণ অনশন'।

বন্‌ধ প্রসঙ্গে : 'এই সাধারণ মানুষ বিশেষত তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা দরিদ্রতম তাঁহাদের একদিনের রুজি বন্ধ হয়। প্রায়োপবেশনে তাঁহাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিন কাটাইতে হয়।' (আ. বা. ৪.৬.৯৩)

বলাবাহুল্য 'প্রায়োপবেশন' এখানে ভ্রান্ত প্রয়োগ।

'প্রত্যেকেই নিজস্ব কর্মাদি সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালন করছে তো?' (আ. বা. ৩০.৫.৯৩ প্রথম কলামে)

কর্ম কি আমরা প্রতিপালন করি? কর্ম করি বা সম্পাদন করি। কর্তব্যও প্রতিপালন করি না, পালন করি, প্রতিপালন অর্থ 'লালনপালন'। কর্ম প্রতিপালন আদৌ বাংলা নয়।

মঙ্গলবার বিকেলে তিনি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রশিদের সঙ্গে একান্তভাবে দেখা করেন। (আ. বা. ৬.৫.৯৩)

'একান্তে' আর 'একান্তভাবে' কি এক?

ইন্দ্রজিৎ বললেন, জেলা কমিটি চৌবেকে বহিষ্কারের কে? (আ. বা. ১৮.৪.৯৩)

'বহিষ্কারের কে'? না, 'বহিষ্কার করার কে'?

'রহস্যজনক হাসত', 'ক্লান্তিহীন খেলে যাচ্ছিল'—বাগ্‌বিধি তো 'রহস্যজনকভাবে', 'ক্লান্তিহীনভাবে'। নাকি সব বিশেষণকে ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় করে নেওয়া হচ্ছে?

'কাজের কাজ কিছুই হইবে কি না সেই বিষয়েই প্রশ্নচিহ্ন থাকিয়া যায়'। (আ. বা. ৫ই জ্যৈষ্ঠ)

প্রশ্ন থাকিয়া যায়, না প্রশ্নচিহ্ন থাকিয়া যায়? (ইংরেজি idiomও তো The question remains whether.)

AMARBOI.COM

- অনেক সময় ক্রিয়াপদের অভাবের দরুন একই রচনাংশ সাধু বা চলিত হিসেবে ধরা যায়। এই জাতীয় বাক্যবিন্যাস খুব বেশিক্ষণ না চলাই ভাল। অবশ্য, কখনও কখনও ক্রিয়াপদহীন প্রায় সমমাত্রিক পদবন্ধনে কবিতার আমেজ পাওয়া যায়। যেমন—'অরণ্য এখানে ঘন নয়, ফাঁকা ফাঁকা—বনের গাছের মাথায় মাথায়, সুদূর চক্রবালরেখায়, নীল শৈলমালা, বোধ হয় গয়া কি রামগড়ের দিকের—যতদূর দৃষ্টি চলে শুধুই বনের শীর্ষ, কোথাও উঁচু বড় বড় বনস্পতিসংকুল, কোথাও নিচু, চারা শাল ও চারা পলাশ।' (আরণ্যক। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

  এখানে 'চলে' সাধু ও চলিতের যৌথ সম্পত্তি বলে এ ধরনের রচনায় ভাষার প্রকৃতিটি ধরা পড়ে না। অবশ্য বর্ণনার মাধুর্যে অংশটি এত সুন্দর যে তার জাতি নির্ণয়ের কথা মনেই আসে না।

বলা বাহুল্য, নিয়ম-বাঁধার কোনও চেষ্টাই চলতে পারে না। বিষয়বস্তু অনুযায়ী কোন রীতি বা কোন ঢঙে লিখবেন, তা লেখকেরাই ঠিক করবেন। স্টাইলটা তাঁর একেবারেই নিজস্ব। আসলে সব ব্যাপারেই যা ভাষার ব্যাপারেও তা-ই—শ্রিয়া দেয়ম্, সংবিদা দেয়ম্—শ্রীমণ্ডিত করে দিতে হবে, অন্তর দিয়ে দিতে হবে। আমীর খাঁ বা যশরাজ প্রমুখ সঙ্গীতশিল্পীদের খেয়ালগানে বিশেষ বিশেষ স্বর-সংযোগ বা স্বর-প্রক্ষেপে ঠুংরির আদল দেখা যায়, যাতে খেয়ালে এক বিশেষ মাধুর্যের সৃষ্টি হয়, কিন্তু পরিমিতির অভাব হলেই জাত খোয়াবার ভয়। সাধু চলিতের বেলাতেও তা-ই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭.৫ ■ সাধু ভাষা কি উঠে যাবে ?

এখন সব সাহিত্যিকই চলিত ভাষায় লেখেন। নীরদ সি. চৌধুরী ছাড়া। তাঁর লেখা থেকে একটু উদ্ধৃতি দেওয়া যাক—

> 'নদ, জল, উন্মুক্ত উদার নীল আকাশ, কাজলকালো বা মরালশুভ্র মেঘ, দিগন্ত প্রসারিত ক্ষেত ও ঘনশ্যাম বনানী বাঙালি জীবনে প্রাণের অবলম্বন। ইহাদের ছাড়িয়া জীবন্ত বাঙালি কল্পনা করা যায় না। বাঙালি আজ এই প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষ করিয়া জলের কথা স্মরণও করে না তাহা দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারি, তাহাদেরকে কেন আমার কাছে চলন্ত মমির মত মনে হয়। আমি যে সত্তর বৎসর বয়সেও সজীব আছি, তাহারও কারণ এই, আমি বাংলার জলরাশিকে ভুলি নাই।' (*বাঙালিজীবনে রমণী*, পৃ. ১১৫)

লক্ষ করলে দেখা যাবে শব্দ সাজানোয় লেখক সযত্ন, লেখায় ছন্দ-স্পন্দও অনুভব করা যায়, তাতে প্রকৃতিচিত্রণের সঙ্গে তাঁর হৃদয়াবেগ ভাষায় প্রাণ পেয়েছে।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত পত্রিকায় সুবোধ সেনগুপ্ত মহাশয়ের সাধু ভাষায় লেখা একটি প্রবন্ধ পড়লাম, সহজ স্বচ্ছ, চলিত ভাষার কাছাকাছি :

> 'রাজলক্ষ্মী পদের জন্য সব চেয়ে বড় candidate হইলেন নিরুপমা দেবী, তাঁহার জীবদ্দশায় কৌতূহলী পাঠকেরা তাঁহাকে উত্যক্ত করিয়াছেন এবং তিনি এই বিষয়ে অতি সুন্দর জবাব দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমি সেই প্রশ্নে যাইব না। আমি পূর্বে নিরুপমা দেবীর দুইখানা বই পড়িয়াছিলাম। তাঁহার অন্য বইয়ের সন্ধান রাখিতাম না। ইদানীং এই দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় আমি তাঁহার অন্যান্য উপন্যাস পড়িতে আরম্ভ করি। তাঁহার উপন্যাস এত দুষ্প্রাপ্য যে বহু চেষ্টা করিয়া তাহা সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। অথচ পড়িয়া দেখি তিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।' (বাংলা সমালোচনা সাহিত্য প্রসঙ্গে)।

অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তও সাধু ভাষায় প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর লেখা কৌতুকে কটাক্ষে সরস।

খবরের কাগজগুলো এখন সবই চলিত ভাষায় লেখা হয়। শুধু আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় অংশটুকু সাধু ভাষায় রচিত হয়। একটু পুরনো দিনের দিকে তাকানো যাক। ৭০ বছর আগে লেখা আনন্দবাজার পত্রিকার একটি সম্পাদকীয়ের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি :

> বাংলার যুবকশক্তি যতীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাধকের মন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া স্বদেশী যুগে ভৈরবী-লীলায় মাতিয়াছিল, মরণকে উপহাস করিয়াছিল, আর আজ সত্যাগ্রহ-যুগে বিনম্রদৃঢ়তা সংযত শুভ্রজীবন লইয়া বাঙালী যুবক কি আর একবার আত্মশক্তির পরিচয়ে বিশ্বকে বিস্মিত করিবে না ? যে বিলাসব্যসনকে সমাজের অস্থিমজ্জা চর্বণ করিতেছে সভ্যতার আচরণে সেই ইন্দ্রিয় লালসার প্রতিবাদ কি ঐ যুগের বাঙালী যুবক করিবে না ? জন্মভূমির বন্ধনশৃঙ্খল তখন যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে—যতীন্দ্রনাথের মুক্ত আত্মার বিজয়-মহিমা বাঙালী যুবককে সেই কথাই অবিরত শুনাইতেছে। (৯.৯.২৩)

'বাঙালীবীর যতীন্দ্রনাথ'-শীর্ষক এই সম্পাদকীয়ের জন্য ১৯২৩-এ আনন্দবাজার পত্রিকাটি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং সম্পাদক ও মুদ্রাকর গ্রেপ্তার হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংবাদ জগতে তখন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট সাংবাদিকেরা গদ্যরচনার ক্ষেত্রে বিশেষ একটি আবেগমিশ্র গতির সঞ্চার করেন। আর এই উৎকর্ষের সহযোগী হয়েছিল সাহিত্য, নারায়ণ, প্রবাসী, কল্লোল, কালিকলম, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, শনিবারের চিঠি প্রভৃতি সাময়িকপত্র।

এখন অনেকেই বলছেন সাধু ভাষা কৃত্রিম ভাষা, আজকের জগতে তা অচল। পশ্চিমবঙ্গের একদা-ব্যবহৃত ভাষাকে কৃত্রিম বলা উচিত হবে কি না তা বিচার্য। সুনীতিকুমারের ভাষাতেই বলি—'এই ভাষার ব্যাকরণের রূপগুলি (বিশেষতঃ ক্রিয়াপদে) প্রাচীন বাঙ্গলার—তিন চারিশত বৎসর পূর্বেকার বাঙ্গালার রূপ ; আবার এই ভাষা মুখ্যত পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন মৌখিক ভাষার উপরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও পূর্ববঙ্গের বহু রূপ এবং বৈশিষ্ট্যের প্রভাব ইহার উপর পড়িয়াছে।' (*ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, পৃ. ৬। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়)

সাধু ভাষায় লেখা গদ্যসাহিত্য উনবিংশ শতকের সূচনা থেকে শুরু করে বিংশ শতকের ষষ্ঠ-সপ্তম পাদ পর্যন্ত অজস্র সোনার ফসল ফলিয়েছে। চলিত ভাষা প্রচলিত হবার পরও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধু ভাষাতেও লিখেছেন। উপন্যাস-ছোটগল্প ছাড়াও চিন্তাশীল প্রবন্ধাদিতে এবং হাস্যরসদীপ্ত বিভিন্ন ধরনের রচনায় প্রকাশমাধ্যম হিসেবে সাধু ভাষা অনন্য শক্তির পরিচয় দিয়েছে। আজ চলিত ভাষার শক্তির স্বাক্ষর আধুনিক গদ্যসাহিত্যের সর্বত্র। কিন্তু সাধু ভাষায় লিখিত ঐতিহ্যবাহী বিপুল সাহিত্যের পঠনপাঠনের যুগ তো শেষ হয়নি, তার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার প্রয়োজনে লেখকদের সাধু ভাষাতেও কিছু কিছু লেখা দরকার, বিশেষ করে প্রবন্ধ—সাধু ভাষার প্রত্যাবর্তনের জন্যে নয়, সাধু ভাষার আধুনিক পরিশীলিত উদাহরণ হিসেবে। মাধ্যমিক স্তর থেকে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত কিছু ছাত্রছাত্রী (যদিও সংখ্যাটি খুবই কম) সাধু ভাষায় লেখে। তাদের সামনে আধুনিক সাহিত্যিকদের সাধু ভাষার কিছু নিদর্শন রাখার প্রয়োজন আছে। (১৩) এই সব লেখা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে সব চেয়ে ভাল হয়, তা হলে সকলেরই সহজে চোখে পড়বে। সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষ যদি এ বিষয়ে কোনও পরিকল্পনা নেন তাকে সফল করতে সাহিত্যিকেরাও আশা করি সহযোগিতা করবেন।

৭.৬ ■ আনন্দবাজারের সাধু ভাষায় লেখা সম্পাদকীয় কি উঠে যাবে ?

এখনও সাধু ভাষার দীপটি টিমটিম করে জ্বলছে আনন্দবাজারের সম্পাদকীয়তে। অনেকেই বলেন সম্পাদকীয়তে সাধু ভাষা রাখার কোনও মানেই হয় না, জনমনের সঙ্গে তার কোনও যোগই নেই। কেউ কেউ বলেন, আহা, আছে, থাক না। না, করুণা করে সাধু ভাষার সপক্ষে রায় না দেওয়াই ভাল। উপযোগিতার দিকটাই দেখতে হবে। মনে হয় আনন্দবাজার পত্রিকা ঐতিহ্যের সঙ্গে একটা যোগ রাখতে চেয়েছেন। সাধারণ সংবাদ থেকে সম্পাদকীয়কে কিছুটা পৃথক করার জন্যেও বটে। তা ছাড়া স্মিতহাস্যের উৎসারণে চলিত ভাষা অক্ষম না হলেও এ ব্যাপারে বোধ হয় সাধুভাষার শব্দবন্ধন ও পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদ বেশি উপযোগী। কৌতুক-কটাক্ষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্যুদ্দীপ্তিপ্রকাশেও সাধুভাষার সম্পাদকীয় বেশি কার্যকর হবে বলেই হয়তো সম্পাদকমহাশয় মনে করেন। আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় ছাড়াও গত ১৯৯৫-এর নভেম্বর থেকে শ্রীনিরপেক্ষর 'ঘরে বাইরে' শীর্ষক সন্দর্ভে সাধুভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে দলীয় রাজনীতি বিশ্লেষণে যে সব মন্তব্য ও কটাক্ষপাত অনিবার্য হয়ে পড়ে তার প্রকাশ সাধুভাষাতেই উপাদেয় হয়ে ওঠে! এই বিভাগটির রচনায় বিষয়-অনুযায়ী সাধুভাষার শৈলীভেদের পরীক্ষণও চোখে পড়ে। তা ছাড়া বর্ণনায় যেখানে কিছুটা grandeur বা solemnity আনা দরকার, সেখানেও সাধুভাষাকে আমন্ত্রণ জানানোই স্বাভাবিক। প্রয়োজনে ধ্বনিতরঙ্গসৃষ্টিতেও সাধুভাষার সামর্থ্য সন্দেহাতীত। সাধুভাষার সংস্কার অর্থাৎ পূর্বপরিচয়জনিত সংবেদন যাঁদের আছে সাধুভাষায় একটি বিশেষ আস্বাদ্যতা তাঁদের থাকবেই, আর যাঁরা অনেক পরবর্তী, চলিত ভাষার লেখার সঙ্গেই যাঁদের বেশি যোগ বা যাঁরা নবসাক্ষর তাঁদের কাছে সাধুভাষায় লেখা সম্পাদকীয় হয়তো কৃত্রিম বলে মনে হতে পারে। কিন্তু একটি সুবৃহৎ পরিসরে সব রচনা তো সবার জন্যে নয়। তাই সাধুভাষার সীমিত অস্তিত্বটা যেমন চাই, তেমনি চাই, চলিত ভাষার ধারা কলোচ্ছ্বাসে বহু খাতে বয়ে গিয়ে আমাদের চিত্তভূমিকে সরস করুক।

১৯৬৪ সালে ছোটদের জন্যে লেখা বইয়ে সাধু ভাষা বর্জন করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্রকে চলিত ভাষায় রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। এই ধরনের যে-কোনও পরিকল্পনা 'ইতিহাসে বিলম্বিত হউক।'

উপসংহারে বলি—each is best in its own place—সাধু ও চলিত ভাষা যার যার ক্ষেত্রে অটল হয়ে আছে। যে-কোনও একটিকে বর্জন করা হবে আমাদের শক্তির নির্বাসন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় ভাগ : প্রথাগত ব্যাকরণ

ধ্বনিতত্ত্ব

আট ☐ ধ্বনি-বর্ণ-উচ্চারণ
নয় ☐ ধ্বনি পরিবর্তনের ধারা
দশ ☐ নতি : ণত্ববিধি ও ষত্ববিধি
এগারো ☐ সন্ধি
বারো ☐ ঝোঁক-অন্তর্যতি-সুর
তেরো ☐ ছেদচিহ্ন

রূপতত্ত্ব

চোদ্দ ☐ শব্দ
পনেরো ☐ প্রত্যয় : কৃৎ ও তদ্ধিত
ষোলো ☐ উপসর্গ
সতেরো ☐ পুরুষ
আঠারো ☐ বচন
উনিশ ☐ লিঙ্গ
কুড়ি ☐ পদ
একুশ ☐ বিশেষ্য
বাইশ ☐ সর্বনাম
তেইশ ☐ বিশেষণ
চব্বিশ ☐ অব্যয়
পঁচিশ ☐ ক্রিয়া
ছাব্বিশ ☐ বাচ্য
সাতাশ ☐ বাংলা ধাতুর গণবিভাগ
আঠাশ ☐ কারক-বিভক্তি-অনুসর্গ
উনত্রিশ ☐ বিভক্তি ও শব্দরূপ
ত্রিশ ☐ সমাস
একত্রিশ ☐ শব্দদ্বৈত

বাক্যতত্ত্ব

বত্রিশ ☐ বাক্য
তেত্রিশ ☐ পদবিন্যাস
চৌত্রিশ ☐ বাক্যবিন্যাস

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধ্বনিতত্ত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮

ধ্বনি বর্ণ উচ্চারণ

[ধ্বনিপ্রতীক বর্ণ—স্বর ও ব্যঞ্জন—স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ ও বৈশিষ্ট্য—উচ্চারণের গুরুত্ব]

বহু পর্ব পেরিয়ে আমরা বর্ণমালা পেয়েছি। মানুষ বোঝাতে মানুষের ছবিই এঁকেছি, তারপর সম্পূর্ণ ছবি থেকে আংশিক ছবি, তারপর ভাবলিপি-অক্ষরলিপি হয়ে সবশেষে পৌঁছেছি বর্ণমালায়।

ক্ষুদ্রতম ধ্বনি বোঝানোর জন্যে পেলাম এক-একটি বর্ণ। ধ্বনির প্রতীক হল বর্ণ। ২৬টি বর্ণ ইংরেজি বর্ণমালায়, তাই দিয়ে হাজার হাজার কথার ফুল ফোটানো :

ছাব্বিশ লশ্‌কর কী বুকের পাটা।
নিমেষে মুঠোয় পোরে গোটা দুনিয়াটা।

আমাদের ২৬ নয়, তার দ্বিগুণ বর্ণের প্রয়োজন হল আমাদের ধ্বনি ধরতে। স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জন দিয়ে আমাদের বর্ণমালায় প্রায় ৫০টি বর্ণ।

AMARBOI.COM

৮.১ ■ স্বরবর্ণ

যে ধ্বনি অন্য ধ্বনির সাহায্য ছাড়াই অবাধে উচ্চারিত হতে পারে, এবং যাকে আশ্রয় করে অন্য ধ্বনি প্রকাশিত হয় তাকে বলা হয় স্বরধ্বনি, আর ওই স্বরধ্বনির যা প্রতীক তাকে বলা হয় স্বরবর্ণ—ইংরেজিতে বলা হয় vowel. Vowel মানে যা vocal, তাৎপর্যগত অর্থে self-vocal, অর্থাৎ যা স্বয়ম্‌-উচ্চারিত। এই ধ্বনি উচ্চারণের সময় তা কণ্ঠ বা মুখের ভিতরকার কোনও বাক্‌-প্রত্যঙ্গে বাধা পায় না। এই স্বরধ্বনির প্রতীক স্বরবর্ণ।

মূল স্বরধ্বনি অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা—এ ৭টি হলেও বাংলা স্বরবর্ণমালা—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ এই ১৪টি বর্ণ নিয়ে। অবশ্য নবম ও দশম বর্ণ এখন আর বর্ণমালায় অন্তর্ভুক্ত নয়, ঋ-ৠকেও আর স্বরবর্ণের তালিকায় রাখা হচ্ছে না। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করছি।

৮.২ ■ ব্যঞ্জনবর্ণ

যে ধ্বনি স্বরধ্বনিকে আশ্রয় করে উচ্চারিত হয় তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। ইংরেজিতে তাকে বলা হয় consonant মানে 'sounding with another' (এখানে another মানে vowel).এই ধ্বনি উচ্চারণের সময় তা ঠোঁটে বা মুখের ভিতরকার বাক্‌-প্রত্যঙ্গে বাধা পায়। ব্যঞ্জনধ্বনির প্রতীক হল ব্যঞ্জনবর্ণ।

আমাদের বর্ণমালায় রয়েছে মোট ৩৮টি ব্যঞ্জনবর্ণ :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

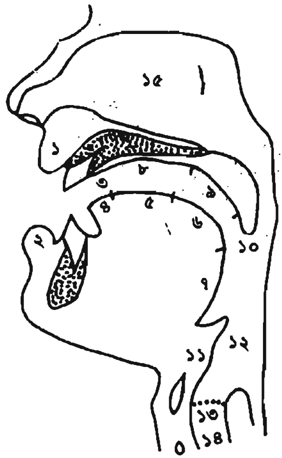

১ ওষ্ঠ	২ অধর	৩ দন্তমূল	৪ জিহ্বামুখ	৫ অগ্রজিহ্বা
৬ পশ্চজিহ্বা	৭ জিহ্বামূল	৮ তালু	৯ নিম্নতালু	১০ অলিজিহ্বা
১১ কণ্ঠমূল	১২ উর্ধ্বকণ্ঠ	১৩ কণ্ঠতন্ত্রী	১৪ কণ্ঠনালী	১৫ মস্তিষ্ক

ক খ গ ঘ ঙ
চ ছ জ ঝ ঞ
ট ঠ ড ঢ ণ
ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম
য র ল ব
শ ষ স হ
ড় ঢ় য়
ং ঃ

স্বর ও ব্যঞ্জন নিয়ে আমাদের বর্ণমালা উচ্চারণস্থান ও ধ্বনিপ্রকৃতি অনুযায়ী বিন্যস্ত। বর্ণ বিন্যাসের ক্ষেত্রে এটি একটি বিস্ময়কর অবদান। এবারে আমাদের আলোচ্য ধ্বনি ও বর্ণ বিশ্লেষণ।

৮.৩ ■ ধ্বনিবিশ্লেষণ বা বর্ণবিশ্লেষণ

'কলিকাতা' এই শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে পাব ক্অল্ইক্আত্আ, এই কয়েকটি বর্ণ (মোট ৮টি বর্ণ)। অক্ষর (syllable) বিশ্লেষণ করলে পাব চারটি অক্ষর : ক-লি-কা-তা

হিব্রু আরবি প্রভৃতি সেমীয় (semitic) ভাষায় স্বরবর্ণের ব্যবহার ছিল না। মুখে স্বরসংযোগ করেই তা উচ্চারিত হত কিন্তু লেখায় নয়। ব্যঞ্জনে বিশেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিহ্ন (ওপরে-নীচে) দিয়ে স্বরোচ্চারণ বোঝানো হত : আরবি ক্‌ত্‌ব্‌ কখনও উচ্চারিত হত 'কাতাবা', কখনও বা 'কুতুব্‌', কখনও 'কাত্তাবা'। আমাদের স্বরবর্ণ অনেকগুলি, তবু সব ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট উচ্চারণে পৌঁছনো সম্ভব হয় না। আমরা এবারে স্বরবর্ণ এবং তার উচ্চারণ নিয়ে আলোচনা করব।

৮.৪ ■ স্বরবর্ণ ও তার উচ্চারণ

অ-এর প্রকৃত উচ্চারণ

অ—অ-এর প্রকৃত উচ্চারণ ইংরেজি fall এর 'a'র মতো। এই 'অ' কণ্ঠজাত বর্ণ।

যখন বলছি 'অতুলনীয়' তখন 'অ'য়ের প্রকৃত উচ্চারণ বজায় থাকছে। কিন্তু যে-ই 'অতুল' বলে কাউকে ডাকছি অমনি অতুলের 'অ'য়ের উচ্চারণ হয়ে যাচ্ছে 'ও' অর্থাৎ অতুল > ওতুল। এই 'ও' 'অ'-এর বিকৃত উচ্চারণ।

এই 'অ'-এর প্রকৃত উচ্চারণ কোথায় বজায় থাকবে আর কোথায় তা বিকৃত হয়ে যাবে তার কিছু নিয়ম :

আদ্য অ

- একাক্ষর হলন্ত শব্দে আদ্য 'অ' প্রকৃত উচ্চারণে থাকবে। ফল, জল, মল, কল, রস ইত্যাদি। এদের সঙ্গে আ-কার যুক্ত হলেও প্রকৃত উচ্চারণ বজায় থাকবে : ফলা, জলা, মলা, কলা, রসা ইত্যাদি। এ ছাড়া প্রকৃত উচ্চারণ বজায় থাকবে—
- সহ শব্দের 'স'-তে সজল, সফল, সকল, সস্ত্রীক, সপুত্র, সহোদর ইত্যাদিতে।
- সম্‌ উপসর্গের স-তে : সংগ্রহ, সঞ্চয়, সমাদর, সম্রাট, সমবায়, সম্মোহ ইত্যাদিতে।
- নঞর্থক অ-তে : অবিরাম, অনৃত, অধীর, অস্বস্তি, অবশ্য ইত্যাদিতে।
- ধ্বনিবাচক শব্দের আদ্য অক্ষরে : মড়্‌মড়্‌, মর্মর, কড়্‌কড়্‌, ঝম্‌ঝম্‌, ছম্‌ছম্‌, গম্‌গম্‌, দপ্‌দপ্‌ ইত্যাদিতে।

বিকৃত উচ্চারণ (অ > ও)

- আদ্য অক্ষরের পর ই-ঈ, উ-ঊ, য-ফলা থাকলে—গতি, সতী, মতি, অতি, ক্ষতি, নদী, গদি, যদি, কটূক্তি, অত্যুক্তি, অভ্যুদয়, সত্য, সত্যি ইত্যাদি।
- ক্ষ বা খ্য পরে থাকলে—বক্ষ, সখ্য, রক্ষা ইত্যাদি।
- আদ্য অ রফলাযুক্ত বর্ণের অঙ্গ হলে—ব্রজ, ভ্রম, ব্রত, ব্রণ, শ্রবণ, শ্রম, গ্রহণ, গ্রহ, প্রকৃত, প্রভু ইত্যাদি।
- ঋ-ফলা যুক্ত বর্ণ পরে থাকলে—বক্তৃতা, ভর্তৃহরি, মসৃণ, প্রভৃতি, প্রকৃষ্ট, প্রসৃত ইত্যাদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যবর্তী অ

মধ্যবর্তী 'অ' অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'ও' হয়।

অন্ত্য অ

অন্ত্য 'অ' উচ্চারিত হলে 'ও' হবে।

- বড়, ছোট, কাল (কৃষ্ণবর্ণ), ভাল (উত্তম) ইত্যাদি। এগুলোকে ও-কার দিয়েও লেখা হয় : বড়ো, ছোটো, কালো, ভালো ইত্যাদি।
- যত, তত, এত, কেন ইত্যাদি সর্বনাম শব্দ।
- এগারো থেকে আঠারো পর্যন্ত সংখ্যা।
- খাওয়ান, দেখান, শোনান, পড়ান—ইত্যাদি ক্রিয়াবিশেষ্য পদে এগুলো ওকার দিয়ে লেখাই ভাল। খাওয়ানো, দেখানো, শোনানো ইত্যাদি।
- দ্বিরুক্ত বিশেষণ শব্দে—ছলছল, কলকল, মরমর ইত্যাদি। এগুলো 'ও' দিয়েও লেখা হয় কিন্তু ঝর্‌ঝর্‌, সব্‌সব্‌ (অ-ধ্বনি লোপ হল বলে)।
- তুল্য অর্থে 'মত'—মতো লেখাই ভাল।
- পদান্তে যুক্ত বর্ণ থাকলে বা 'হ' থাকলে অন্ত, সূর্য, বস্ত্র, পূর্ব, দাহ, প্রবাহ ইত্যাদি।
- অন্য অক্ষরের আগে ং, ঃ থাকলে—অংশ, ধ্বংস, দুঃখ, নিঃস্ব।
- ত, ইত, তর, তম প্রত্যয় যুক্ত বিশেষণে—গত, শ্রুত, শীত, অভ্যর্থিত, মহত্তর, মহত্তম ইত্যাদি।
- ঢ়-কারান্ত বিশেষণে—গাঢ়, মূঢ়, দৃঢ় ইত্যাদি।
- ইকার বা একারের পর য় থাকলে—প্রিয়, দেয়, নির্ণেয় ইত্যাদি।
- অন্ত্যবর্ণের আগে ঋ, ঐ, ঔ থাকলে—তৃণ, বৃষ, শৈল, দৈব, মৌন ইত্যাদি।

অনুচ্চারিত অ

এ ছাড়া অন্যত্র 'অ' প্রায়ই অনুচ্চারিত। একাক্ষর : ফল জল ইত্যাদি। দ্ব্যক্ষর : শ্রবণ, দর্শন, পতন ইত্যাদি। ত্র্যক্ষর : মহাবল, অবশেষ ইত্যাদি।

এরকম একাক্ষর শব্দ সমাসের পূর্বপদ হলে অ > ও হবে। ফল (ফল্‌) কিন্তু ফলবান্‌ (ফলোবান্‌), লোক (লোক্‌) কিন্তু লোকলজ্জা (লোকোলজ্জা), লোক (লোক্‌) কিন্তু লোকগীতি (লোকোগীতি), তেমনি লোকসঙ্গীত (লোকোসঙ্গীত), জলমগ্ন (জলোমগ্ন) ইত্যাদি।

আ—কণ্ঠ্যবর্ণ

উচ্চারণ ইং far এর 'a'র মতো। সংস্কৃতে দীর্ঘস্বর হলেও বাংলায় হ্রস্বস্বর। মাতা—**দ্ব্যক্ষর** দু'মাত্রার শব্দ। হলন্ত হলে অবস্থান অনুযায়ী দীর্ঘ ও দু'মাত্রার হতে পারে। আশ্চর্য (আশ্‌চর্‌য)—এখানে 'আ' 'মাতা'র 'আ'-র চেয়ে দীর্ঘতর, তবে দু'মাত্রা ধরা হবে কিনা, তা অবস্থানের উপর নির্ভর করে। ভারতভাগ্যবিধাতা এখানে সব আকারই দীর্ঘ ও দু'মাত্রা-পরিমিত। 'আ' বর্ণের প্রতিরূপ বা চিহ্ন='া'। ম্‌আ=মা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ই—তালব্য বর্ণ

উচ্চারণ ইং dig, sick ইত্যাদির 'i'এর মতো। প্রতিরূপ ি—বিলিতি।

ঈ—তালব্য বর্ণ

উচ্চারিত হয় ই-এর মতোই। তালব্য বর্ণ। সংস্কৃতে দীর্ঘস্বর ধরা হলেও বাংলায় ই-এর মতোই হ্রস্বস্বর। প্রতিরূপ ী—নদী। হলন্ত হলে সামান্য দীর্ঘায়িত। নদীর (নদীর্—এই 'র্' দী কে 'যদি'র 'দি'র চেয়ে সামান্য দীর্ঘ করে তুলেছে। দু'মাত্রা ধরা হবে কি না তা প্রয়োগের উপর নির্ভর করে। নীলসিন্ধুজলধৌতচরণতল এই পঙ্‌ক্তিতে 'নী'—দীর্ঘ ও দু'মাত্রার।

উ—ওষ্ঠ্য বর্ণ

হ্রস্বস্বর। উচ্চারণ ইং 'put'-এর 'u'-এর মতো। হলন্ত হলে বা এর পর ং ঃ থাকলে দীর্ঘ হতে পারে। উল্ উঃ উং এই সব উচ্চারণে কিছুটা দীর্ঘ। প্রতিরূপ ' ু '—মুকুল। 'মুকুতা'র 'কু'য়ের চেয়ে 'মুকুল'-এর 'কু'-এর দৈর্ঘ্য সামান্য বেশি।

ঊ—ওষ্ঠ্য বর্ণ

'উ'-র মতোই উচ্চারণ, একই উচ্চারণ স্থান। 'উ'-এর মতোই হ্রস্বস্বর হলন্ত হলে দীর্ঘ হতে পারে। অনেক সময় অর্থে জোর দেবার প্রয়োজনে দীর্ঘ ও দু'মাত্রার উচ্চারণ দেখা যায় : বিমূঢ় বিস্ময়ে। প্রতিরূপ ' ূ '।

AMARBOI.COM

ঋ—মূর্ধন্য বর্ণ

ঋ উচ্চারণ সংস্কৃতে 'র্‌র্'-এর মতো ছিল। এখন এর উচ্চারণ 'রি'—রিষি রিন। পরের দিকে সংস্কৃতেও যে উচ্চারণ বদলে গিয়েছিল তা বোঝা যায় বিকল্প বানান থেকে, ঋক্‌থ—রিক্‌থ। শব্দের আদিতে থাকলে ঋ-উচ্চারণ নিয়ে গণ্ডগোল নেই—কৃতার্থ (ক্রিতার্থ), বৃথা (ব্রিথা) ইত্যাদি। গণ্ডগোলটা ঘটে ঋ-ফলাযুক্ত শব্দ মাঝখানে থাকলে। যেমন, অমৃত, আবৃত্তি উচ্চারিত হয় 'অম্‌মৃত', 'আব্‌বৃত্তি'। 'আবৃত্তি'র উপর বক্তৃতা দিচ্ছেন যিনি তাঁকেও 'আব্বৃত্তি' উচ্চারণ করতে শুনেছি ('আব্বৃত্তি'ও শোনা যায়)। যিনি 'অমৃত', 'আবৃত'-র 'ঋ' আলতোভাবে উচ্চারণ করছেন, তিনিও 'চরণামৃত'-কে 'চরণাম্মৃত' করে ফেলেন। এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক হতে হবে। মাঝখানে যে ঋ তাকে দ্বিত্ব না করে আলতোভাবে উচ্চারণ করতে হবে। অভ্যাস করার জন্যে একটি ছন্দে গাঁথা ঋ-কারান্ত পদগুচ্ছ দেওয়া গেল—

অমৃত-বৃষ্টি-বিধৃত গগন
নিভৃত পৃথিবী মৌনমগন
তৃষিত সৃষ্টি বিবৃত প্রাণ
প্রকৃতি-হৃদয়ে ধ্বনিত গান।

ৠ—উচ্চারণ মূর্ধা

ৠ ৠ-কারে দীর্ঘ উচ্চারণ। উচ্চারণ স্থান মূর্ধা। কেবল 'পিতৄ ণ' শব্দটিই ৠ-কার দিয়ে লেখা হয়। এই বর্ণটিকে বাংলা বর্ণমালায় রাখতে চান না অনেকেই। না থাকলে তেমন ক্ষতি নেই, কিন্তু তৄ, দৄ, জৄ, কৄ প্রভৃতি দীর্ঘ ৠকারান্ত কয়েকটি ধাতু আছে যা দিয়ে তীর্ণ দীর্ণ জীর্ণ ইত্যাদি শব্দ গঠিত,—শুধু প্রত্যয় ভেঙে ধাতুটি দেখানোর সময়েই এই দীর্ঘ ৠফলার প্রয়োগ।

ঌ ও দীর্ঘ ৡ—এ দুটি বর্ণ বাংলায় নিষ্প্রয়োজন। ঌ-দিয়ে লেখা একটি শব্দই বাংলায় আছে 'কৢপ্ত', ওই শব্দটিকে 'ক্লিপ্ত' লিখলেও কোনও দোষ হয় না।

এ—কণ্ঠতালব্য বর্ণ

একারের উচ্চারণও বাংলা দু'রকম—একটি প্রকৃত, আর একটি বিকৃত। প্রকৃত উচ্চারণ ইংরেজির bed শব্দের 'e'র মতো—কেকা, রেখা ইত্যাদি। বিকৃত উচ্চারণ ইংরেজির bad শব্দের 'a'র মতো। যেমন দেখা (দ্যাখ্যা), একা (অ্যাকা) ইত্যাদি। এই ধ্বনিটির প্রতিরূপক বর্ণ বাংলায় নেই। 'অ্যা' দিয়ে লেখা হয়, আর ফলা হিসেবে চলে '্যা' (য-ফলা আকার) যেমন প্যাঁচা।

৮.৫ ■ এ-কারে উচ্চারণ

AMARBOI.COM

এ-কারের প্রকৃত উচ্চারণ বা স্বাভাবিক উচ্চারণ কোথায় হবে এবারে তা দেখা যাক—

- তৎসম শব্দের আদ্য 'এ'-কারে : লেখা, রেকা, একক, কেশ, মেষ, দেশ, বেদনা, বেষ্টিত ইত্যাদি।
- অভিশ্রুতি-জনিত এ অর্থাৎ ইয়া > এ—মেঠো, টেকো, হেটো, গেছো, খেয়ে, নেয়ে ইত্যাদি।
- সর্বনামে—এ, যে, সে যেখানে সেখানে।
- ফারসি 'বে' উপসর্গে : বেকার, বেঠিক, বেবন্দোবস্ত, বেদম ইত্যাদি।
- বিকৃত উচ্চারণকে নিয়মে বাঁধা যায় না। একটা বর্ণানুক্রমিক তালিকা অবশ্য দেওয়া যায় :

এক, একটা, একলা, এত, এমন, এলানো, কেনো, *খেপা, কেমন, খেলা, খেল্না, গেল (গেলো), ঘেঁষা, চেঁচা, চেপটা, চেলা, *ছেঁকা, ছেনা, *জেঠা, *টেঁক, ঠেকা (বাধা পাওয়া), *ঠেঙ, *ঠেঙা, *ঠেলা, ভেলা, তেমন, তেলাপোকা, *থেঁতলা, *থেবড়া, *দেখা, দেওর, *ধেবড়া, *নেংচানে (লেংচানো), নেঙড়া, *নেকড়া, *নেকা, *লেজ, *লেজা, *নেপা, *পেঁচা, *ফেকাসে, *ফেটানো, ফেঁটানো, *ফেন, ফেনা, ফেলা, ফেলনা, *ফেসাদ, *বেঙ, *বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, বেচা, বেড়া, বেড়ানো, *বেদড়া, বেলা, বেসাতি, ভেলা, *ভেস্তানো, মেলা (fair), *লেঙড়া, *লেংচানো, *সেঁকড়া, সেঁকা, *হেপা, হেলা, হেস্তনেস্ত।

(* চিহ্নিত শব্দগুলো '্যা' দিয়েও লেখা হয়। যেমন, খ্যাপা, চ্যাপটা, ছ্যাঁকা, ট্যাঁক, ঠ্যাঙ ইত্যাদি।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ-কারের প্রকৃত উচ্চারণ বজায় আছে এমন অতৎসম শব্দের তালিকা : এই, এঁড়ে, এঁদো, এঁধো, কেস্নো, কেয়ারি, খেয়া, খেয়াল, গেরুয়া, গেরো, গেলা, ঘেন্না, ঘেরা, ঘেরাও, চেনা, চেয়ে, চেরা, চেলি, চেহারা, ছেনি, নেতা, জের, জেরা, জেল, জেলি, টেক্কা, টেড়ি, টেপা, টের, ঠেকা (তবলাদির সঙ্গত), ডেগ, ডেঁপো, ডেরা, তেজ, তেতো, তেপায়া, তেহাই, তেহারা, থেই (নৃত্যভঙ্গি), থেঁতো, থেলো, দেউল, দেস্তুলে, দেওয়ালি, দেড়, দেদার, দেনা, দেমাক, দেয়া, দেয়ালা, দেরাজ, দেরি, ধেইধেই, নেকড়ে, নেকনজর, নেবা (নেভা), নেবু, নেহাই, নেশা, নেহাত। পেটা, পেটাও, পেটুক, পেঁপে, পেয়াদা, পেয়ালা, পেরনো, পেশ, পেশা, ফেরা, ফেরি, বেগনি, বেগুন, বেজি, বেঁটে, বেরাল, বেশ, ভেড়ি, ভেল, মেঝে, মেঠাই, মেথি, মেনি, মেলা (মিলিত হওয়া), মেশা, মেহনৎ, যেত, যেই, রেওয়াজ, রেকাব, রেজাই, রেল, রেলিং, রেহাই, লেচি, লেফাফা, লেবু, শেয়াল, সেঁউতি, সেগুন, সেতার, সেমুই, সেলাই, সেলাম, হেঁচকি, হেঁজিপেঁজি, হেঁট, হেঁয়ালি, হেঁশেল।

ও—কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ

উচ্চারণ ইংরেজি 'no' এর 'o'র মতো। সংস্কৃতে দীর্ঘস্বর বাংলায় হ্রস্বস্বর। বাংলার মৌলিক স্বরের অন্যতম। হলন্ত শব্দে 'ও' দীর্ঘ হতে পারে। 'ওলো'তে 'ও' হ্রস্ব, কিন্তু 'ওল' (ওল)-এ তুলনায় দীর্ঘ।

ঐ, ঔ—যথাক্রমে ও+ই, ও+উ [সংস্কৃতে ছিল আ+ই, আ+উ] (১৪) ঐ কণ্ঠতালব্য, ঔ কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ। এই দুটি ধ্বনিকে বলে **যৌগিক** বা **যুগ্মস্বর**। ইংরেজিতে বলে dipthong: di (=দ্বি) pthong (=স্বর)। আই, আউ ইত্যাদি ২৪ রকমের যুগ্মস্বর হতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ :

৮.৬ ■ দ্বিস্বর (dipthong)

অয়—হয়, নয়, রয়, সয় : আই—খাই, যাই, পাই, নাই : আউ—দাউদাউ, ঝাউ, হাউহাউ : আও—খাও, যাও, নাও, দাও।

ত্রিস্বর (tripthong): আউই—হাউই, তাউই : ইয়াও—দিয়াও, মিঞাও।

চতুঃস্বর (tetrapthong): আওয়াই—হাওয়াই, দাওয়াই।

পঞ্চস্বর (pentapthong): আওয়াইয়া—খাওয়াইয়া, যাওয়াইয়া।

ঐ, ঔ স্থানবিশেষে হ্রস্ব-দীর্ঘ বা একমাত্রা-দু'মাত্রার হতে পারে।

৮.৭ ■ জিভের অবস্থান অনুযায়ী মৌলিক স্বরের শ্রেণীবিন্যাস

ই এ অ্যা

এই তিনটি মৌলিক স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভ সামনের দিকে প্রসারিত হয়। এই জন্যে এদের সম্মুখ স্বরধ্বনি বলে (Front vowels)।

ই এ অ্যা ধ্বনিতে জিভের উচ্চতা ক্রমশ কমতে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

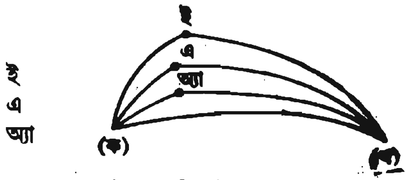

উ ও অ আ এই মৌলিক ধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় জিভ পিছনদিকে আকৃষ্ট হয়। তাই এগুলিকে পশ্চাৎ স্বরধ্বনি (Back vowels) বলা হয়। উ-উচ্চারণে জিভ বেশি উঁচুতে ওঠে, ও-তে একটু নিচে, অ-তে মাঝামাঝি এবং আ-তে প্রায় স্বাভাবিক।

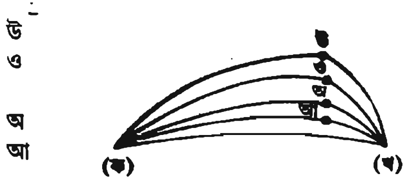

'আ'—

এ ছাড়া সুনীতিকুমার আর-এক ধরনের 'আ'-ধ্বনিকে মৌলিক স্বরধ্বনির মধ্যে রাখতে চেয়েছেন। এ ধ্বনিটি প্রাদেশিক উচ্চারণে ধরা পড়ে। এই স্বর মুখের অগ্রভাগে উচ্চারিত। একে উনি নাম দিয়েছেন তালব্য আ (palatal অ্)। এই আ-কে আ' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কাইল > কা'ল, চাইর > চা'র ইত্যাদি। কিন্তু সাধারণ 'আ'-এর সঙ্গে এই 'আ'-এর পার্থক্য এত সূক্ষ্ম যে একে পৃথক মৌলিক স্বরের মধ্যে না-আনলেও বোধ হয় তেমন ক্ষতি হয় না।

AMARBOI.COM

৮.৮ ■ ব্যঞ্জন ধ্বনির উচ্চারণ

আমাদের ব্যঞ্জন বর্ণমালায় বর্ণগুলি উচ্চারণস্থান অনুযায়ী বিন্যস্ত।

ক বর্গ—

ক খ গ ঘ ঙ জিভের মূল বা পিছনের দিক দিয়ে কণ্ঠের তালুর কোমল অংশ স্পর্শ করে উচ্চারিত। এগুলিকে কণ্ঠ্যবর্ণ বলে। ঙ অনুনাসিক বর্ণ। উচ্চারণ করার সময় নাক দিয়ে বায়ু বার হয়। উচ্চারণ ইং ngর মতো।

চ বর্গ—

চ ছ জ ঝ ঞ জিভের মাঝের অংশ দিয়ে তালুর সামনের অংশ বা কঠিন অংশ স্পর্শ করে উচ্চারিত। এগুলিকে তালব্য বর্ণ বলে। জিভ আর তালুর স্পর্শের পরে দু'য়ের মাঝখানে বায়ুর ঘর্ষণ ঘটে। তাই একে ঘৃষ্টবর্ণ (affrication) বলে। 'ঞ' অনুনাসিক বর্ণ। মিঞা (মিয়াঁ) শব্দে এর উচ্চারণ মেলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ট বর্গ—

ট ঠ ড ঢ ণ বর্ণগুলি জিভের ডগাকে উলটিয়ে মূর্ধা আর তালুর কঠিন শীর্ষদেশের কাছে কঠিন অংশটি স্পর্শ করে উচ্চারিত। তাই এগুলিকে মূর্ধন্য বর্ণ বলে। জিভের অগ্রাংশ প্রতিবেষ্টিত করে (উল্টে দিয়ে) উচ্চারণ করা হয় বলে একে প্রতিবেষ্টিত (retroflex) ধ্বনি বলে।

ড, ঢ—

শব্দের মধ্যে বা শেষে এই দুটি বর্ণ যথাক্রমে ড় ও ঢ় হয়ে যায়। নূতন উচ্চারণে এ দুটি বর্ণে বিন্দু যোগ করা হয়েছে। প্রাচীন বাংলায় এ দুটি ছিল না।

জিভের নীচের অংশ দিয়ে দন্তমূল তাড়ন করে উচ্চারিত হয় বলে এ দুটিকে তাড়নজাত ধ্বনি (flapped) বলে। বাড়ি, কাপড়, ঝড় ইত্যাদি শব্দে ড়-এর উচ্চারণ ধরা আছে। তেমনি 'ঢ়'-এর উচ্চারণ ধরা আছে রূঢ়, আষাঢ়, রাঢ়ী ইত্যাদি শব্দে। (ড়+হ্=ঢ়)।

পূর্ববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গের কোনও কোনও জায়গায় 'ড়' 'র'-এর মতো উচ্চারিত হয়। তার ফলে ঘরভাড়া হয়ে পড়ে ঘড়ভারা। 'ড়'-এর উচ্চারণ ঠিকমতো করা দরকার। এ জন্যে সুকুমার রায়ের দাঁড়কাকের ছড়ার অংশ বিশেষ বারবার আবৃত্তি করা যেতে পারে :

এক ছিল দাঁড়ি মাঝি—দাড়ি তার মস্ত,
দাড়ি দিয়ে দাঁড়ি তার দাঁড়ে তার ঘষত,
সেই দাঁড়ে একদিন দাঁড়কাক দাঁড়াল,
কাঁকড়ার দাঁড়া দিয়ে দাঁড়ি তারে তাড়াল।

আর র-ড় কাছাকাছি রেখে উচ্চারণ অভ্যাস করেও উপকার পাওয়া যেতে পারে। ঘরভাড়া, পড়িমরি, ধরপাকড় ইত্যাদি।

'ঢ়' শিথিল উচ্চারণে ড় হয়ে ওঠে। একেবারে 'র'ও হয়ে পড়ে। সঠিক উচ্চারণে 'ড়'-এর উচ্চারণকে হ-এর দিকে ঠেলে দিতে হবে। মূঢ়, দৃঢ়, আষাঢ়, রাঢ়ী ইত্যাদি শব্দ বারবার উচ্চারণ করে 'ঢ়' সঠিক উচ্চারণ আয়ত্ত করতে হবে।

ণ—

মূর্ধন্য 'ণ'-এর প্রাচীন উচ্চারণ ছিল ড়ঁ-এর মতো, বাংলায় দন্ত্য ন-এর সঙ্গে এর উচ্চারণ অভিন্ন।

ত বর্গ—

ত, থ, দ, ধ, ন। এগুলি দন্ত্য বর্ণ (dentals)। জিভের আগের দিককে পাখার মতো প্রসারিত করে তা দিয়ে দাঁতের নিচু অংশ স্পর্শ করে এই ধ্বনিগুলি উচ্চারিত।

ত থ দ ধ-এর আগে থাকলে (ন্ত, ন্থ, ন্দ, ন্ধ) ন-উচ্চারণে জিভ দাঁতের উপরে গিয়ে ঠেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ন' অনুনাসিক বর্ণ।

'ধ'-এর উচ্চারণে সাবধান হওয়া দরকার, অনেক সময় তা 'দ'-এর মতো হয়ে যায়।

ধাঁধা, সাধ্যসাধনা, ধরাধাম, বিধৃত, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, বসুধা ইত্যাদি শব্দ বারবার উচ্চারণ করে 'ধ'-এর উচ্চারণ ঠিক করতে হবে।

অনেক গায়কের সরগমে সা নি সা ধা ধা নি সা ইত্যাদি স্বরগ্রামে শুদ্ধ ধা 'দা' হয়ে পড়ে। কোমলধৈবতকে 'দা' উচ্চারণ করাই যেতে পারে—সেটা অন্য কথা।

প বর্গ—

প ফ ব ভ ম এগুলো ওষ্ঠ্যবর্ণ (labials)। ওষ্ঠ (উপরের ঠোঁট) আর অধর (নিচের ঠোঁট) স্পর্শ করে এই বর্ণগুলি উচ্চারিত হয়। ওষ্ঠ-অধরের স্পর্শ ঠিকমতো না হলেই বায়ু নির্গত হয়ে উষ্মধ্বনি আসবে। ফলে ফ উচ্চারণ 'ph' না হয়ে, হবে 'f'-এর মতো। 'ফুল' হয়ে উঠবে full, প্রফুল্ল হয়ে উঠবে Prafulla অথচ হওয়া উচিত Praphulla লেখাও উচিত 'ph' দিয়ে 'f' দিয়ে নয়।

'ম' অনুনাসিক বর্ণ, উচ্চারণের সময়ে নাক দিয়ে বায়ু বেরিয়ে আসে। নাক বন্ধ থাকলে 'ম' 'ব' হয়ে ওঠে। ফলে 'মামা' 'বাবা' হয়ে উঠতে পারে। একজন ভাল আবৃত্তিকারের সর্দি হয়েছিল, তার ফলে শোনা গেল—

বরিতে চাহিনা আবি সুন্দর ভুবনে
বানবের বাঝে আবি বাঁচিবারে চাই।

বলাবাহুল্য এখানে 'ম' 'ব' হয়ে উঠেছে।

ক থেকে প পর্যন্ত বর্ণকে স্পর্শ বর্ণ (stops) বলে কারণ এই বর্ণগুলি উচ্চারিত হবার সময় জিভ মুখের কোনও-না-কোনও অংশ স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়।

য-র-ল-ব—

এগুলি অন্তঃস্থ বর্ণ। স্পর্শ বর্ণ আর উষ্মবর্ণের (শ ষ স হ) মাঝখানে এদের অবস্থান বলে এই নাম।

'য' ও 'ব'-এর মূল উচ্চারণ ছিল যথাক্রমে 'ইয়' ও 'উঅ'। তাই এদের নাম ছিল অর্ধস্বর (semi vowel), ইংরেজি y ও w-র মতো। কিন্তু এখন উচ্চারণ বদলে গিয়েছে। 'য' এর উচ্চারণ 'জ' এর মতো, অন্তঃস্থ ব এর উচ্চারণ এখন বর্গীয় ব-এর মতো অর্থাৎ ইংরেজি 'b'-এর মতো।

বাংলায় তৎসম নামের বানানে অন্তঃস্থ ব-এর উচ্চারণে 'V' ব্যবহার করা হয়। যেমন, Vidyasagar, Vivekananda, Visva-Bharati ইত্যাদি। এর ব্যতিক্রমও অবশ্য যথেষ্ট আছে।

বানানে 'য়' থাকলে তা আমরা y দিয়ে লিখি—প্রিয়নাথ=Priyanath.

র—ল—'র' ও 'ল' কে উচ্চারণে প্রলম্বিত করা যায় বলে (র্‌র্‌র্‌র্, ল্‌ল্‌ল্‌ল্) এ-দুটিকে তরল স্বর বলে। 'র'-কে কম্পনজাত (trilled) ধ্বনি বলা হয়। কারণ জিভের ডগা দাঁতের গোড়ায় একাধিকবার দ্রুত আসাতে এর উচ্চারণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর উচ্চারণ ইংরেজি 'r'-এর চেয়ে নরম।

ল—জিভের ডগাকে মুখের মাঝামাঝি দাঁতের গোড়ায় ঠেকিয়ে রেখে জিভের দু'পাশ দিয়ে মুখের বাতাস বের করে দিয়ে এই বর্ণের উচ্চারণ ঘটে বলে এটিকে পার্শ্বধ্বনি (lateral) বলে। উচ্চারণ ইংরেজি 'l'-এর চেয়ে একটু নরম।

শ ষ স হ—এগুলি উষ্মবর্ণ (Spirant)। এদের উচ্চারণের সময় জিভ, তালু, দাঁত সম্পূর্ণভাবে যুক্ত হয়েও নিশ্বাসবায়ুকে কখনও একেবারে রুদ্ধ করে না।

শ ষ স—এই তিনটির ধ্বনি শিশের মতো বলে এদের শিশধ্বনি (Sibilant) বলে।

যথাক্রমে তালু, মূর্ধা ও দন্ত স্পর্শ করে শ্বাসবায়ুকে সংকীর্ণ পথে বের করে দেয় এই বর্ণগুলি। এই জন্য এই তিনটি বর্ণকে বলা হয় তালব্য শ, মূর্ধন্য ষ আর দন্ত্য স।

এদের উচ্চারণ ছিল যথাক্রমে ইং Sh, Kh আর 'S'-এর মতো। কিন্তু এখন তিনটির উচ্চারণই তালব্য 'শ'-এর মতো 'Sh'. বিশেষ=Bishesh. শ-ষ একই উচ্চারণ। শব আর সব—দুই উচ্চারণই এক—Shab. আজকে 'সেদিন'কে Sedin উচ্চারণ করা চলবে না। শশীবাবু কখনই Sasibabu হলে চলবে না। বাংলায় ইং S-এর মতো স-উচ্চারণ সম্বন্ধে আচার্য সুনীতিকুমার বলেন, 'ভদ্রসমাজের অনুমোদিত উচ্চারণে ইহা বর্জনীয়, এবং এ বিষয়ে কলিকাতা অঞ্চলের ছাত্রদের অবহিত হওয়া উচিত।'

এখানে 'ছাত্রদের' সঙ্গে যোগ করা চলে 'শিক্ষক-অধ্যাপক সকলেরই'। কোনও কোনও অঞ্চলের উচ্চারণে S=Sh, Sh=S. Seat হয়ে ওঠে Sheet, Shelf হয়ে ওঠে Self. অভ্যাসেই এ অভ্যাস দূর করা যায়। Sh উচ্চারণে জিভকে তালুর দিকে তুলতে হবে। আর 'S' উচ্চারণে জিভকে দাঁতের দিকে ঠেলতে হবে। এই অনুশীলনে ইংরেজির একটি বিখ্যাত tongue twister স্মরণীয় :

She sells sea-shells on the sea-shore.
The shells she sells are sea-shells, I am sure.
For if she sells sea shells on the sea-shore,
Then I'm sure she sells sea-shore shells.

আর বাংলায় 'Sh' উচ্চারণের বিশুদ্ধিচর্চায় বারবার আবৃত্তি করা যেতে পারে—

সেদিন শুভ্র পাষাণ ফলকে পড়িল রক্তলিখা,
সেদিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদ কাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপপাদমূলে নিভিল চকিতে
শেষ আরতির শিখা।

বাংলায় 'S' ধ্বনি অবশ্য শোনা যায় ত, থ, ন, র ও ল-এর সঙ্গে—স্তোত্র (Stotra), স্থান (Sthan), স্নেহ (Sneha), শ্রেয় (Sreyo), শ্লেষ (Slesh) প্রভৃতি শব্দে। এখানে আবার Shtotra, Shthan ইত্যাদি উচ্চারণ চলবে না।

হ—উষ্মবর্ণ। কণ্ঠনালীতে উৎপন্ন, শ, ষ, স-এর মতো একেও প্রলম্বিত করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায় (হ্ হ্ হ্)। এই 'হ'-এর নাম প্রাণ অর্থাৎ বায়ু। [পরবর্তী 'ঘোষ ও প্রাণ' আলোচনা দ্রষ্টব্য]

কণ্ঠনালীর মধ্যেকার শ্বাসপথ চেপে ধরে 'হ' উচ্চারণ করতে গেলে এক-ধরনের স্পৃষ্ট ধ্বনি উচ্চারিত হয়, 'হ' উচ্চারিত হয়েও পরে 'অ'-এর মতো হয়ে যায়। এই 'অ'-কে 'অ লেখা হয়।

পূর্ববঙ্গে 'হ' এবং জায়গায় অনেক ক্ষেত্রে এই 'অ' ধ্বনি শোনা যায়—হয় > অয় (অয়, Zানতি, পার না) আবার পূর্ববঙ্গে স্পষ্ট 'হ' উচ্চারিত হয় 'শ'-এর জায়গায়। শালা > হালা।

এ বঙ্গের একজন ও বঙ্গের একজনকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি 'শোনা'কে 'হোনা বলেন কেন?' তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'আমি তো হোনারে হোনাই কই, তুমি হুনতে হোনো হোনা (আমি তো 'শোনা'কে 'শোনাই' বলি, তুমি শুনতে শোনো 'হোনা')।

কিন্তু এই 'শ' 'হ' হয়ে ওঠে কেন?

'শ' উষ্মধ্বনি সেদিক থেকে 'হ'য়ের সঙ্গে এর কুটুম্বিতা আছে, 'জিভ'কে তালুর দিকে না রেখে উল্টিয়ে একেবারে জিভের গোড়ায় আনলে তা 'হ' হয়ে উঠবে।

ং (অনুস্বার)—বাংলা ঙ'র মতো উচ্চারণ। সংস্কৃত > সঙ্স্কৃত। এই জন্যে বানানে একটির বদলে অন্যটি দেখা যায়—রঙ—রং, সঙ—সং, বাঙলা—বাংলা।

ঃ (বিসর্গ)—এই বর্ণটি এক ধরনের 'হ' ধ্বনি। সাধারণ 'হ' একটু খোলতাই, এটি একটু চাপা।

মুলের উচ্চারণ ধরা পড়ে আঃ (আহ্) উঃ (উহ্), ওঃ (ওহ্) ইত্যাদি বিস্ময়সূচক অব্যয়ে।

সাধারণ উচ্চারণে বিসর্গ প্রায়ই অনুপস্থিত।

বিশেষতঃ, প্রধানতঃ, স্পষ্টতঃ, এ সব উচ্চারণে ঃ (বিসর্গ) অনুচ্চারিত, তাই আধুনিক বানানেও একে বিসর্জন দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছে।

পদের মধ্যে থাকলে কিন্তু বিসর্গ বিশেষ একটি ভূমিকা নেয়, দ্বিত্ব করে তোলে পরবর্তী ব্যঞ্জনকে। যেমন, অতঃপর—অতপ্পর, দুঃখ—দুখ্খ, নিঃশেষ—নিশ্শেশ।

এই জন্যে বিদেশি শব্দ মফস্সল বানান 'মফঃসল' লেখা হত।

ঁ (চন্দ্রবিন্দু) এই ধ্বনি স্বরধ্বনিকে অনুনাসিক করে তোলে অঙ্ক > আঁক, শঙ্খ > শাঁখ, ক্রন্দন > কাঁদা, অঞ্চল > আঁচল ইত্যাদি।

পূর্ববঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গেও দু-একটি অঞ্চলে এই অনুনাসিক উচ্চারণ বাদ পড়ে যায়। কাঁটা হয়ে ওঠে কাটা, দাঁড়ানো হয়ে ওঠে দাড়ানো।

সুকণ্ঠী গায়িকা, কিন্তু গাইছেন—'দাড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে'।

এই লেখা উচ্চারণেরই অনুকরণ করে, তাই শতকরা ৬০ ভাগ ছাত্রছাত্রীদের লেখায় 'খোজা', 'দাড়ানো', 'পৌছনো' প্রভৃতি শব্দে চন্দ্রবিন্দু বাদ পড়ে।

চন্দ্রবিন্দু উচ্চারণ অনুশীলনের জন্যে আগে-লেখা সুকুমার রায়ের দাঁড়ের কবিতাটি আবৃত্তি করা যেতে পারে, অথবা এই ছড়াটি—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিমি ওঠে গাঁগাঁ করে
চিঁচিঁ করে চিংড়ি
ইলিস বেহাগ ভাঁজে
যেন মধু নিংড়ি। (খাপছাড়া, রবীন্দ্রনাথ)

৮.৯ ■ ঘোষ ও প্রাণ

ব্যঞ্জনের উচ্চারণ কখনও একটু চাপা, কখনও বা বেশ খোলতাই, কখনও বা হালকা, কখনও বা গম্ভীর। ধ্বনির এই স্বননগত দিক থেকে ব্যঞ্জনকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়।

অঘোষ বর্ণ—

যেসব বর্ণের উচ্চারণে কণ্ঠে স্বরতন্ত্রীর অনুরণন বা ঘোষণ নেই, তাদের অঘোষ বর্ণ (voiceless) বলে। বর্গের প্রথম বর্ণ (ক-চ-ট-ত-প), দ্বিতীয় বর্ণ (খ-ছ-ঠ-থ-ফ) অঘোষ।

ঘোষবর্ণ—

যেসব বর্ণের উচ্চারণে কণ্ঠে স্বরতন্ত্রীর অনুরণন বা ঘোষণ ঘটে তাদের ঘোষ বর্ণ বা সঘোষ বর্ণ বলে (voiced) বলে।

বর্গের তৃতীয় বর্ণ (গ-জ-ড-দ-ব), চতুর্থ বর্ণ (ঘ-ঝ-ঢ-ধ-ভ) এবং পঞ্চম বর্ণ (ঙ-ঞ-ণ-ন-ম) ঘোষবর্ণ। বর্গের পঞ্চম বর্ণগুলি অনুনাসিক বর্ণ-ও বটে, কারণ উচ্চারণের সময়ে নাক দিয়ে বায়ু নির্গত হয়।

অল্পপ্রাণ বর্ণ—

যে বর্ণের উচ্চারণে প্রাণ বা হ্ ধ্বনির স্বল্পতা থাকে, তা হল অল্পপ্রাণ। এই সব বর্ণের উচ্চারণে শ্বাস সজোরে নির্গত হয় না। বর্গের প্রথম বর্ণ (ক-চ-ট-ত-প) ও তৃতীয় বর্ণগুলি (গ-জ-ড-দ-ব) অল্পপ্রাণ।

মহাপ্রাণ বর্ণ—

যে বর্ণের উচ্চারণে প্রাণ বা হ্ ধ্বনির প্রাধান্য তা হল মহাপ্রাণ। এইসব বর্ণের উচ্চারণে শ্বাস সজোরে নির্গত হয়। বর্গের দ্বিতীয় (খ ছ ঠ থ ফ) এবং চতুর্থ বর্ণগুলি (ঘ-ঝ-ঢ-ধ-ভ) মহাপ্রাণ। ইংরেজিতে খ লেখা হয় Kh দিয়ে, ওই 'h'ই প্রাণ বা হ্ ধ্বনি। তেমনি ঘ লিখতে 'gh'. উর্দুতে খ লেখা হয় কাফ্-এর (ক) সঙ্গে 'হে' ধ্বনি (হ) মিশিয়ে। কারণ ক্+হ্=খ, এই জন্যে মহাপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণে আমাদের সতর্ক হতে হবে, একটু 'হ্'-এর ভাগ কম হলেই তা অল্পপ্রাণ হয়ে উঠবে, অর্থাৎ ঘ ঝ ঢ ধ ভ হয়ে উঠবে গ জ ড দ ব।

৮.১০ ■ যুক্তবর্ণের উচ্চারণ

এবারে আমরা এমন কয়েকটি যুগ্মবর্ণের উচ্চারণ নিয়ে আলোচনা করব, যেসব বর্ণের উচ্চারণে কোনও না কোনও বৈশিষ্ট্য আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষ—'ক্'-এর সঙ্গে 'ষ্' জুড়ে এই বর্ণ, উচ্চারণ ছিল ক্ষ। হিন্দিতে মূল উচ্চারণ বজায় আছে—ক্ষতি=ক্ষতি, শিক্ষক=শিক্ষক। কিন্তু বাংলায় কোথাও 'খ' কোথাও 'ক্খ'। ক্ষেত্র > খেত, রক্ষা > রোক্খা।

জ্ঞ—জ্+ঞ। প্রাচীন উচ্চারণে জ্-এর উচ্চারণ বজায় রেখে ঞ-কে 'ঙ' বা 'ন' করে নেওয়া হত। 'বিজ্ঞান' উচ্চারণে শোনাত অনেকটা 'বিজ্ঙান' বা 'বিজনাঁনে'র মতো। বাংলা উচ্চারণে গ্গঁ। 'বিজ্ঞান' বাংলা উচ্চারণে বিগ্গাঁন। এইরকম আজ্ঞা=আগ্গাঁ, জ্ঞান=গ্গ্যাঁন।

ক্ব—ক্+ব (অন্তঃস্থ) মূল উচ্চারণ কুও বা কোও। নিক্বণ=নিক্ওয়ন্। কিন্তু বাংলায় উচ্চারণ 'ক্ক', তাই উচ্চারণে নিক্বণ=নিক্কন।

ক্ম—ক্+ম। মূল উচ্চারণে উভয় বর্ণের উচ্চারণ অবিকৃত—রুক্মিণী=রুক্মিণী কিন্তু বাংলায় ক্ক বা ক্কঁ রুক্মিণী বাংলা রুক্কিণী বা রুক্কিঁণী।

ত্ম—ত্+ম্। মূল উচ্চারণে উভয় বর্ণই অবিকৃত। মহাত্মা=মহাৎমা, কিন্তু বাংলা ত্তঁ মহাত্মা=মহাত্তাঁ।

শ্ম—শ্+ম, মূল উচ্চারণে উভয় বর্ণই অবিকৃত। বাংলায় শ বা শঁ, তাই 'শ্মশান' উচ্চারণে 'শশান' বা 'শঁশান' > শশাঁন।

ষ্ম—ষ্+ম, মূল উচ্চারণে উভয় বর্ণই পৃথকভাবে উচ্চারিত। ভীষ্ম=ভীষ্মো। বাংলায় ভীশ্শোঁ অর্থাৎ ষ্ম=শ্শঁ।

স্ম—স্+ম, মূল উচ্চারণে উভয় বর্ণই পৃথকভাবে উচ্চারিত, অকস্মাৎ বাংলায় অকশ্শাৎ অর্থাৎ স্ম=শ্শঁ।

হ্ম—হ্+ম, মূল উচ্চারণে দুই বর্ণই বিন্যাস অনুযায়ী পৃথকভাবে উচ্চারিত—ব্রাহ্মণ='ব্রাহ্মন', বাংলায় ব্রাম্হন্ অর্থাৎ বর্ণবিপর্যয়—হ্ম=ম্হ।

ঞ্চ=ঞ্+চ, মূল উচ্চারণ অনেকটা ঙঁ মতো, সঞ্চয়=সঙঁচয়, বাংলায় সন্চয় অর্থাৎ বাংলায় ঞ্চ=ন্চ, তেমনি 'ঞ্ছ' ও বাংলায় ন্ছ, বাঞ্ছা=বান্ছা। তেমনি ঞ্ঝ=ন্ঝ, ঝঞ্ঝা=ঝন্ঝা।

হ্ব=হ্+ব, মূল উচ্চারণ অনেকটা ছিল হ্ওয়্। আহ্বান=আহ্ওয়ান বাংলায় 'আওভান', অর্থাৎ হ্ব=ওভ বা উভ, বিহ্বল=বিউভল, 'বিয়হভল' নয়। অনেকেই 'আহ্বান', 'বিহ্ভল' উচ্চারণ করেন, এটা ঠিক নয়, উচ্চারণ করা উচিত 'আওভান', 'বিউভল'।

য-ফলা ব-ফলাযুক্ত বর্ণ

য-ফলাযুক্ত বর্ণেও সাধারণত ওই ধ্বনির দ্বিত্ব হয়। যেমন—বাক্য > বাক্কো, রৌপ্য > রৌপ্পো, অব্যয় > অব্বয়, সভ্য > সব্ভো, 'হ্য'র উচ্চারণ 'জ্ঝ'। বাহ্য > বাজ্ঝো, উহ্য > উজ্ঝো।

য-ফলা যুক্তবর্ণের পরে অ বা আ 'অ্যা' উচ্চারিত হয় : অন্যায়=অন্ন্যায়, অভ্যাস=ওব্ভ্যাস, ব্যয়=ব্যায়, ব্যবস্থা=ব্যাবস্থা। ব্যথা=ব্যাথা কিন্তু ব্যক্তি=বেক্তি।

আদিতে না হলে ব-ফলা যোগেও এইরকম দ্বিত্ব হয়। আদিতে দ্বার=দার, দ্বিধা=দিধা কিন্তু হরিদ্বার=হরিদ্দার আদিতে শ্বেত=শেত, কিন্তু মহাশ্বেতা=মহাশ্শেতা। স্বাগত=সাগতো, কিন্তু আস্বাদ=আস্সাদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮.১১ ■ কয়েকটি যুক্তবর্ণের উচ্চারণে সতর্কতা

জ্র—উচ্চারণ jjra, বজ্র=bajjro 'বজ্‌রো' এই বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ চলবে না, ঠিক উচ্চারণ হবে অত্যন্ত সংশ্লিষ্ট, জ্‌-এর দ্বিত্বও ঈপ্সিত। বজ্‌জ্রো।

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি =Bajjre

অনেক সময় বজ্র উচ্চারণে উষ্মীভবন (উষ্মীভবন দ্রষ্টব্য) দেখা যায়। বজ্র হয়ে ওঠে bazro, এবং তা কানে বজ্রাঘাতই করে।

র্দ্র—দ্‌-এর আগে র্‌ পরে র-ফলা, উচ্চারণ হবে 'আর্‌দ্রো' (ardro)। উচ্চারণে কখনও 'র্‌' বাদ পড়ে হয়ে ওঠে 'আর্দ', কখনও বা 'রেফ্‌' বাদ পড়ে হয় 'আদ্র'। বলা বাহুল্য দুটোই ভুল উচ্চারণ। বারবার উচ্চারণ করে জড়তা কাটাতে হবে।

একটা গল্প বলি। মহাকবি কালিদাসের নামে প্রচলিত এই গল্পটি। রাজকন্যার সঙ্গে তো বিয়ে হল মূর্খ কালিদাসের। দু'জনে একসঙ্গে বসে আছেন। বাইরে কী যেন ডেকে উঠল।

বধূ জিজ্ঞেস করলেন—কো রৌতি অর্থাৎ কী ডাকছে ?

কালিদাস বললেন—'উষ্টঃ'।

রাজকন্যা বিচলিত কণ্ঠে বললেন, 'কিমিতি কিমিতি—কী বললে, কী বললে ?'

কালিদাস সংশোধন করে বললেন—'উট্রঃ'।

অর্থাৎ একবার 'র' লোপ করলেন, একবার ষ।

বধূ সখেদে বললেন—

উষ্ট্রে লুম্পতি রং বা ষং বা
তস্মৈ দত্তা নিবিড়নিতম্বা !

অর্থাৎ হায়, উষ্ট্রে যে একবার র আর একবার ষ লোপ করে তার হাতেই কিনা পড়ল আমার মতো সুন্দরী !

কালিদাসের সম্বন্ধে এই গল্পটার তাৎপর্য আমরা নিশ্চয় গ্রহণ করব। উচ্চারণ আমাদের ঠিকমতো করতেই হবে। মান্য ভাষায় যেমন আমরা লিখব তেমনি মান্য উচ্চারণও আমরা ঠিকমতো করব। ইংরেজিতে fun হিসেবে বা pastime হিসেবে অনেক tongue twister আছে। কিছু বাংলাতেও আছে। 'শাখাপ্রশাখা'য় সত্যজিৎ রায় একটি tongue-twister ব্যবহার করেছেন—জলে চুন তাজা তেলে চুল তাজা। দ্রুত উচ্চারণে বলতে গিয়ে বর্ণ বিপর্যয় ঘটছে,—সকলে হেসে উঠছেন।

কিন্তু এই twister গুলো ঠিকমতো উচ্চারণ করতে করতে জিভের একটা ব্যায়ামও হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

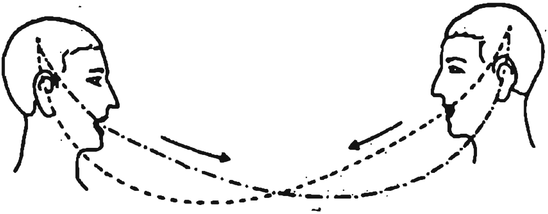

৮.১২ ■ উচ্চারণে স্পষ্টতা সৌজন্যও বটে

উচ্চারণে স্পষ্টতা বিশেষ প্রয়োজন। আমরা অনেক সময় জড়িয়ে বা অস্পষ্টভাবে কথা বলি বলেই যে শুনছে তাকে বলতে হয় 'pardon' 'দয়া ক'রে যদি আবার বলেন।' এতে অনেক সময় বক্তা রুষ্ট হন, অথচ যথাযথ শ্রমে উচ্চারণ না করে তিনি যে শ্রোতাকে অসম্মান করছেন সে কথা তিনি ভাবেন না। আর উচ্চারণ শুধু ঠিক হলেই হবে না, উচ্চারণে স্পষ্টতা চাই। উচ্চারণের এই অস্পষ্টতাকে প্রাচীন বৈয়াকরণেরা 'দগ্ধ' দোষ আখ্যা দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে বক্তা আর শ্রোতা দুজনকে নিয়েই বাগ্‌ব্যবহার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯

ধ্বনি পরিবর্তনের ধারা

[শিশুর উচ্চারণ ও বয়স্কদের কণ্ঠে ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ—ধ্বনি পরিবর্তনের বিভিন্ন রীতি—সংজ্ঞাদি বিশ্লেষণ—মান্য চলিতভাষা ও ধ্বনি পরিবর্তন—ধ্বনি পরিবর্তনের সম্ভাব্য বহু ধারা]

৯.১ ■ শিশুর উচ্চারণ ও বয়স্কদের কণ্ঠে ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ

সুষ্ঠু উচ্চারণের কথা আমরা আলোচনা করলাম, এবারে উচ্চারণ কেন বদলায়, কীভাবে বদলায়—এসব নিয়ে এই পরিচ্ছেদটি পরিকল্পিত।

শিশুদের উচ্চারণ পর্যালোচনা করলে আমরা ধ্বনিপরিবর্তনের রহস্যের কিছুটা আভাস পাই।

মার কোলে উঠব > মা কোয়ে উব্ব। 'র্' ও 'ল্' ধ্বনি উচ্চারণে সত্যিই খুব সহজ নয়। এর জন্যে র্ ও ল্-এর জায়গায় আসে স্বরবর্ণ। শিশুকণ্ঠে শুনি—খোপাই চাপাই ফুই (=খোপায় চাঁপার ফুল), 'ল্' স্বরবর্ণ হয়েছে আর 'য়' হয়েছে ই—যা বড়দের উচ্চারণেও লভ্য। 'র' পল্লী উচ্চারণে অনুচ্চারিত দেখি : ওসিক এতের বেলা এয়েছিল (রসিক রাতের বেলা এসেছিল)। বিড়াল যে 'বিলাই' হয়ে ওঠে, শিশুদের কলধ্বনিতেই আছে তার উৎস। রামকানাইকে খোকাবাবু বলল—'চন্ন ফু'। রাইচরণ খোকাবাবুর এই 'চন্ন' উচ্চারণে বিস্ময়প্রকাশ করে বলেছিল, 'মাকে বলে মা...আমাকে বলে চন্ন।' ভাষাতাত্ত্বিকেরাও খুবই খুশি হবেন। সঙ্গে সঙ্গে অঙ্ক কষবেন, চরণে ব্যঞ্জন-সমরূপতার দৃষ্টান্ত দেখে অবাক হবেন। চন্ন, ফু—ফুল > ফু ধ্বনিলোপের সহজ দৃষ্টান্ত। শিশু গল্প শোনাচ্ছে—তার উচ্চারণে 'মুনিদের পেট চিরে হল মুনদে পেচ্চে, ধ্বনি পরিবর্তনের তিন-চারটি রহস্য ওইটুকুর মধ্যে। শিশুকণ্ঠে 'উঠব' যখন উব্ব হল, 'চশমা' যখন চপ্পা হল, তখন তার মধ্যে বর্ণ পরিবর্তন, পারস্পরিক সমরূপতা ইত্যাদি বহু রহস্যই ধরা পড়ল।

উদাহরণ আর বাড়াব না। শিশুর কথা আনলাম এই জন্যেই যে উচ্চারণের ব্যাপারে আমরা বড়রাও শৈশবকে বয়ে চলি। শিশুদের বাগ্‌যন্ত্র অপরিণত, তাই বহু ধ্বনিই তাতে ঠিকমতো ধরা দেবে না। বড় হয়েও বাগ্‌যন্ত্র অপরিণত রয়ে যেতে পারে, তা ছাড়া জিভের আলসেমি, অনবধান, অনিচ্ছা ইত্যাদি নানা কারণে ধ্বনিপরিবর্তন ঘটে। এক ধ্বনির জায়গায় অন্য ধ্বনি আসে, পরের ধ্বনিকে আগেই উচ্চারণ করা হয়, যুক্তাক্ষর ভেঙে দেওয়া হয়, মূল শব্দে বাড়তি কোনও ধ্বনি আনা হয়, ধ্বনির ওলটপালট ঘটে। এইসব প্রবণতা শুধু বাংলায় নয়, সব দেশের সব ভাষাতেই ঘটে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯.২ ■ ধ্বনি পরিবর্তনের ধারা

বিপ্রকর্ষ

উচ্চারণের সুবিধার জন্যে যুক্ত-অক্ষরের মধ্যে আমরা স্বরধ্বনি এনে ফেলি। যেমন,

অ ॥ রত্ন > রতন, যত্ন > যতন, মূর্তি > মূরতি; গর্ব > গরব, খর্চ্ > খরচ ইত্যাদি।

আ ॥ আর্ম (চেয়ার) > আরাম (কেদারা), আ ফর্ক > ফারাক।

এলার্ম > এলারাম। 'এলারামের ঘড়িটা যে চুপ রয়েছে কই সে বাজে'
(খাপছাড়া/রবীন্দ্রনাথ)

ই ॥ স্নান > সিনান, প্রীতি > পিরীতি, film > ফিলিম।

উ ॥ ভ্রূ > ভুরু, মুক্তা > মুকুতা through > থুরু ইত্যাদি।

এ ॥ গ্রাম > গেরাম, glass > গেলাস।

ও ॥ শ্লোক > শোলোক, slow > সোলো।

ঋ-কারান্ত শব্দ আগে থাকলেও এই ধরনের পরিবর্তন ঘটে। তৃপ্ত > তিরপিত।

এই সব পরিবর্তিত শব্দগুলোর মধ্যে কিছু কথ্য ভাষায় এসেছে, কিছু গিয়েছে কবিতার অঙ্গনে। যেমন : **মুকুতাফলের** লোভে ডুবেরে অতল জলে **যতনে** ধীবর। —মধুসূদন।

কথ্য ভাষাতে কৌতুকে-কটাক্ষে অতিপরিচয়ে এই সব শব্দের ব্যবহার হয়। এখন গিয়ে যদি ওর দেখা না পাই, তা হলেই তো চিত্তির।

কী গো মিস্তির, তুমি যে ডুমুরের ফুল হয়ে গেলে।
খুব যে পিরিত দেখছি বড়বাবুর সঙ্গে।

ধ্বনি পরিবর্তনের এই ধারাটির নাম বিপ্রকর্ষ অর্থাৎ ব্যবধান সৃষ্টি করা, 'স্বরভক্তি' এর আর-একটি নাম, অর্থাৎ স্বরের বিভাজন (ভক্তি=বিভাগ)। ইংরেজিতে একে বলে vowel insertion, পোশাকি নাম Anaptyxis (আক্ষরিক অর্থ unfolding).

স্বরসঙ্গতি

এক স্বরের প্রভাবে অন্য স্বরের পরিবর্তন ঘটে। আর একটু বিশেষভাবে বললে বলা যায়, উচ্চস্বরের প্রভাবে নিম্নস্বর উপরে ওঠে, অথবা নিম্নস্বরের প্রভাবে উচ্চস্বর নীচে নামে।

ক) উচ্চস্বরের প্রভাবে নিম্নস্বরের উপরে উঠে আসা : বুড়া > বুড়ো, দেশি > দিশি, বিলাতি > বিলিতি, কুড়াল > কুড়ুল ইত্যাদি।

খ) নিম্নস্বরের প্রভাবে উচ্চস্বরের নীচে নেমে আসা : লিখা > লেখা, শুনা > শোনা, ছুটে > ছোটে ইত্যাদি।

লক্ষণীয় : ক-উদাহরণে প্রত্যেকটি পূর্ববর্তী স্বরের প্রভাবে পরবর্তী স্বরের পরিবর্তন।

খ-উদাহরণে পরবর্তী স্বরের প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরের পরিবর্তন।

এই ধরনের পরিবর্তনকে বলা হয় স্বরসঙ্গতি। ইংরেজিতে বলে vowel

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

harmony.

বিলিতি, কুড়ুল ইত্যাদি শব্দে স্বরসঙ্গতির একটি মধ্য স্তর আছে :

বিলাতি > বিলেতি > বিলিতি, কুড়াল > কুড়োল > কুড়ুল।

অপিনিহিতি

শব্দে যদি ই বা উ থাকে তাকে আমরা অনেক সময়ে আগেই উচ্চারণ করে ফেলি।

ই-কে আগে উচ্চারণ : আজি > আইজ, রাতি > রাইত, বাজি > বাইজ > বাইচ, দেখিয়া > দেইখিয়া > দেইখ্যা, রাখিয়া > রাইখিয়া > রাইখ্যা ইত্যাদি।

উ-কে আগে উচ্চারণ : সাধু > সাউধ, আশু > আউশ, কারু > কাউর ইত্যাদি। 'অপিনিহিতিকে সাধারণত পূর্ববঙ্গের উচ্চারণরীতি বলা হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গেও অপিনিহিতির উদাহরণ মেলে উপভাষায়। যেমন, দাঁড়িয়ে > দেঁইড়ে > ডেঁইড়ে, পালিয়ে > পেইলে ইত্যাদি। য-ফলার অন্তর্নিহিত ই-কারের অপিনিহিতি একান্তভাবে পূর্ববঙ্গেরই। যেমন— সত্য > সইত্ত, কাব্য > কাইব্ব। ক্ষ ও জ্ঞ উচ্চারণেও ইকারের অপিনিহিতি হয়, যেমন লক্ষ > লইক্‌খ, যজ্ঞ > যইগ্‌গ।

পরবর্তী স্বরধ্বনিকে আগেই উচ্চারণ করে ফেলার এই রীতির নাম দেওয়া হয়েছে **অপিনিহিতি**। অপি মানে পূর্বে, নিহিতি মানে স্থাপন।

মাগধী প্রাকৃতেও অপিনিহিতি দেখা যায় : কুসুমানি > কুসুমাইং।

ইংরেজিতে এই রীতির নাম Epenthesis. Epen গ্রিক উপসর্গ, এর অর্থ পূর্ব বা প্রাক্ thesis=স্থাপন। Epen=epi+en. নামকরণটিতে মূল প্রবণতাটির মোটামুটি একটা আভাস মেলে, সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। 'অপিনিহিতি' শব্দটির ব্যুৎপত্তিও দুরূহ। 'স্বরের পূর্বনিপাত' বললে কেমন হয়। এর সমর্থন পাওয়া যাবে সংস্কৃত ব্যাকরণের 'পরনিপাত' শব্দটিতে। অপিনিহিতি অবশ্য ই-কার বা উ-কারের আগম নয়, আগে-থেকেই আবাহন। এ এক ধরনের স্বর ও ব্যঞ্জনের বিপর্যাসও বটে।

অভিশ্রুতি

এই যে আগেই উচ্চারণ করে ফেলা ই বা উ তার সঙ্গে ঠিক তার আগের স্বরের মিলন হয়। যেমন : আজি > আইজ > আজ, রাতি > রাইত > রাত, এখানে আ আর ই মিলে শুধু 'আ' হয়েছে। রাখিয়া > রাইখিয়া > রাইখ্যা > রেখে, দেখিয়া > দেইখিয়া > দেইখ্যা > দেখে। এখানে অপিনিহিত অর্থাৎ আগেই উচ্চারণ করে ফেলা 'ই'-এর সঙ্গে ঠিক তার আগের স্বরের মিল হয়ে 'রে' এবং 'দে' হয়েছে। এই 'রে' এবং 'দে'-র প্রভাবে 'খ্যা' 'খে' হয়েছে। এটা হয়েছে স্বরসঙ্গতির প্রভাবে। সাথি+উয়া=সাথুয়া > সাউথুয়া (অপিনিহিতি) > সাইথুয়া (উ>ই) সেথুয়া > সেথো। এখানেও স্বরসঙ্গতির প্রভাব। ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই বিশেষ রীতির নাম অভিশ্রুতি। ইংরেজিতে vowel mutation বা umlaut. Mutation=change. তা হলে vowel mutation মানে ধ্বনির রূপান্তর। Umlaut শব্দটি জার্মান, Um উপসর্গের অর্থ 'about' আর laut=sound (ধ্বনি বা স্বর)। অর্থাৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

turning-about of a sound। ইং man থেকে men এসেছে এই রীতিতে। manni (বহুবচন) > mainn (অপিনিহিতি) > menn (অভিশ্রুতি) > men.

অপশ্রুতি ১৫.২ অনুচ্ছেদ দেখুন

য়-শ্রুতি ও অন্তঃস্থ ব-শ্রুতি

শব্দে পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি থাকলে প্রথমটির উচ্চারণ গড়িয়ে গিয়ে দ্বিতীয় স্বরধ্বনিতে যায়। তাতে 'য়'-ধ্বনির একটু আভাস পাওয়া যায়। যেমন মা+এর=মা(য়্)এর > মায়ের, ভাই+এ=ভাই(য়্)এ > ভায়ে, বাবু+আনি=বাবু(য়্)আনি > বাবুয়ানি।

ঠিক য়্-এর ধ্বনির মতো অন্তঃস্থবর্ণ-এর ধ্বনিও শোনা যায়। যেমন, যা+আ=যাওয়া, ছা+আ=ছাওয়া। 'য়্' যেমন শ্রুত হয় তেমনি লিখিতও হয়, কিন্তু অন্তঃস্থ ব লেখা হয় না, তার বদলে 'ওয়্' লেখা হয় : খাআ > খাওয়া। 'ওয়্' অন্তঃস্থ 'ব' ধ্বনির প্রতীক। দুই স্বরের মধ্যবর্তী এই য়্ ও ওয়্ ধ্বনিকে বলে য়-শ্রুতি (Y-glide) ও ব-শ্রুতি (W-glide)। ইংরেজিতে বলে euphonic glides. (গ্রিক উপসর্গ eu=well, easily)। এই শ্রুতির আর একটি প্রাচীন পরিভাষা 'অন্তর'।

বর্ণদ্বিত্ব

আমরা জোর দেবার জন্যে অনেক সময় বিশেষ ব্যঞ্জনধ্বনিকে দ্বিত্ব করে বলি, যেমন, বড় > বড্ড, ছোট > ছোট্ট, সবাই > সব্বাই, সকালবেলা > সক্কালবেলা, হদ > হদ্দ, কিছু > কিচ্ছু ইত্যাদি। একে বর্ণদ্বিত্ব বলে (gemination)। তুলনীয় : হিন্দি বড্ডী, ছুট্টী, চন্দর, বুড্ঢা ইত্যাদি।

AMARBOI.COM

স্বরাগম ও ব্যঞ্জনাগম

আমাদের জিভ একটু আয়েসপ্রিয়। উচ্চারণের সুবিধার জন্যে শব্দের আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে আমরা স্বরবর্ণ আনি।

আদিতে—স্কুল > ইস্কুল, স্টেশন > ইস্টেশন, ইস্টিশন, স্পর্ধা > আস্পর্ধা।

প্রথমেই যুক্তাক্ষর উচ্চারণ একটু কষ্টকর। তাই স্বর এনে উচ্চারণকে সহজ করা হল।

মধ্যে—মুক্তা > মুকুতা (বিপ্রকর্ষ দ্রষ্টব্য)

অন্তে—বেঞ্চ > বেঞ্চি, হাস > হাসি, সত্য > সত্যি।

এই ধরনের আগে বা শেষে স্বর আনার রীতিকে বলে যথাক্রমে, prothesis (আদ্যস্বরাগম) ও catathesis (অন্ত্যস্বরাগম)।

জিভ যে শুধু আয়েস চায় তা নয়, পছন্দমতো ধ্বনি এনে সে উচ্চারণকে বদলেও দেয়। তাই অম্ল হয়ে ওঠে অম্বল, nimel হয়ে ওঠে nimble. এখানে ব্যঞ্জনাগম (consonant insertion) হয়েছে : যথাক্রমে ব ও b।

এই ব্যঞ্জনাগমের প্রাচীন পরিভাষা 'অন্তঃপাত' : 'প্রত্যঙ্ [ক্] স বিশ্বাঃ।'

ধ্বনিবিপর্যয় বা ধ্বনিবিপর্যাস :

শব্দের মধ্যে ধ্বনির স্থান পরিবর্তনও আমরা করে ফেলি। যেমন, ব্রাহ্মন >

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রাম্‌হন, বাক্‌স > বাস্ক, পিশাচ > পিচাস, লাফ > ফাল, রিক্‌সা > রিস্‌কা, মুকুট > মুটুক, বাতাসা > বাসাতা। আ. কুফ্‌ল্‌ > কুলুপ (=তালা)। ইংরেজরাও elapsedকে elasped বলে ফেলেন, whiskyও হয়ে ওঠে whiksy. এই ধরনের ধ্বনি পরিবর্তনের রীতির নাম ধ্বনিবিপর্যয়। ইংরেজিতে বলে metathesis. বারাণসী ইংরেজিতে হয়ে উঠল Benaras.

অনেক সময় মূল শব্দ ও পরিবর্তিত শব্দ দুয়েরই সহাবস্থান দেখা যায়, যেমন নারিকেল, নালিকের।

নাসিক্যধ্বনিরও বিপর্যয় ঘটে, যেমন—আত্মা=আত্তা > আঁত্তা, গোস্বামী > গোসাই > গোঁসাই। এই প্রক্রিয়াটিকে **ধ্বনিবিপর্যয়ও** বলা চলে।

ধ্বনিলোপ

শব্দের অন্তর্গত একটি ধ্বনি বা একাধিক ধ্বনি বাদ দিয়ে আমরা শব্দটাকে একটু ছোট করে আনি, উচ্চারণের সুবিধাও এতে হয়। আটমেসে > আটাসে, কুটুম্ব > কুটুম, ব্যামোহ > ব্যামো, উদুম্বর > ডুমুর, অতিথি > অতিথ ইত্যাদি। একে আমরা বলি **ধ্বনিলোপ**। এইসব উদাহরণে যে সব শব্দে ধ্বনিলোপ হয়েছে সেগুলি সবই অর্ধতৎসম শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু ধ্বনিলোপের এমন উদাহরণও আছে যেখানে ধ্বনিলোপ সত্ত্বেও তা তৎসম যেমন, সুবর্ণ > স্বর্ণ (উ-লোপ), ভগিনী > ভগ্নী (ই-লোপ)।

আর, একই ধ্বনি বা অক্ষর (Syllable) পাশাপাশি থাকলে যদি একটির লোপ হয় তাকে বলা হয় **সমাক্ষর লোপ** (haplology): যেমন বড়দাদা > বড়দা, ছোড়দিদি > ছোড়দি, ছোটকাকা > ছোট্‌কা ইত্যাদি। লাতিন Stipipendiun > Stipend, Cannot > Can't, Simplely > Simply, humblely > humbly, February > Feb'ry, Englaland > England. কৃষ্ণনগর ইংরেজিতে হয়ে উঠেছিল Krishnagar.

সমীকরণ

শব্দে বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনি পাশাপাশি থাকলে উচ্চারণের সুবিধার জন্যে ধ্বনিদুটিকে এক করে নেওয়া হয়। যেমন : পাঁচ জন > পাঁজ্জন। এখানে চ্‌-জ মিলে 'জ্জ' হয়ে গেল। ইংরেজিতে in+moral=immoral, এখানে n+m=mm, একে বলে সমীকরণ অর্থাৎ সম বা সমরূপ করে তোলা। ইংরেজিতে বলে assimilation, অর্থ making alike. 'assimilation' শব্দটিতে সমীকরণ আছে : ad+similation=assimilation.

আগের ধ্বনি পরের ধ্বনির সমতা আনলে তাকে বলা হয় **প্রগত সমীকরণ** (progressive assimilation) পদ্ম > পদ্দ, বিল্ব > বিল্ল ইত্যাদি।

যখন পরের ধ্বনি আগের ধ্বনির সমতা সাধন করে তখন তাকে বলে **পরাগত সমীকরণ** (Regressive assimilation). কর্তা > কত্তা, সৎ+জন=সজ্জন, সম্‌+নিভ=সন্নিভ ইত্যাদি।

আর, যখন পাশাপাশি দুটি ধ্বনি মিলে পরস্পর অন্য ধ্বনিতে পরিণত হয়, তখন তাকে বলে **অন্যোন্য সমীকরণ** বা mutual assimilation, যেমন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্+শিষ্ট > উচ্ছিষ্ট, এখানে দ্ ও শ মিলে সম্পূর্ণ অন্য বর্ণ হল : চ্ছ।

আর-এক ধরনের সমীকরণ হতে পারে, যেমন মাখন > মাখম, চংগীজ > জংগীজ। একে আমরা **ব্যবহিত সমীকরণ** বলতে পারি।

বিষমীভবন

পাশাপাশি বা কাছাকাছি একই ব্যঞ্জনধ্বনির একটিকে পরিবর্তন করে উচ্চারণ করি আমরা। পোর্তুগিজ আরমারিও থেকে এল আলমারি, আমরা দুটি র্-এর একটিকে 'ল্' করে নিলাম। পোর্তুগিজ 'আনানস'কে করে তুললাম আনারস। আরবি 'ইসরার' হয়ে উঠল 'ইসরাজ'। 'রবার' হল রবাট। এই রকমের ধ্বনিপরিবর্তনকে বলে বিষমীভবন (dissimilation).

ঘোষীভবন, অঘোষীভবন, মহাপ্রাণীভবন, অল্পপ্রাণীভবন

আমরা অনেক সময় অঘোষধ্বনিকে ঘোষধ্বনি করে নিই, আবার ঘোষধ্বনিকে অঘোষ করি, তেমনি অল্পপ্রাণ ধ্বনিকে করি মহাপ্রাণ বা মহাপ্রাণকে করি অল্পপ্রাণ। উদাহরণ যথাক্রমে : কাক > কাগ, গুলাব > গোলাপ, পাশ > ফাঁস, ভগিনী > বোন। এই পরিবর্তনকে আমরা যথাক্রমে বলি ঘোষীভবন, অঘোষীভবন, মহাপ্রাণীভবন, অল্পপ্রাণীভবন। ইংরেজিতে যথাক্রমে voicing, de-voicing, aspiration, de-aspiration.

ধ্বনিবিকার

লেবু যখন নেবু হয়, নামা যখন নাবা হয় তখন তাকে আমরা বলি ধ্বনিবিকার। অবশ্য ঘোষীভবনাদি অনেক প্রক্রিয়াই মূলত ধ্বনিবিকার।

হ্-কার-লোপ প্রবণতা

ফলাহার > ফলার, মহিষ > মোষ, মহাশয় > মশাই। এ সব উচ্চারণ পরিবর্তনে বদলি বাংলায় আমরা 'হ'কে বাদ দিতে চাই। একে আমরা বলি হ্-কার-লোপ প্রবণতা।

দ্বিমাত্রিকতা

আর একটি প্রবণতা আমরা বাংলা উচ্চারণে দেখি। তিন মাত্রার বা চার মাত্রার শব্দকে আমরা দু' মাত্রার করে নিই। যেমন ভগিনী > ভগ্নী, ভাগিনেয় > ভাগনে, অপরাজিতা > অপ্‌রাজিতা। এই প্রবণতাকে আমরা বলি দ্বিমাত্রিকতা (bi-morism).

এই প্রবণতাকে দ্ব্যক্ষরতাও (bi-syllabism) বলা হয়ে থাকে।

আসলে এটি দ্বিতীয় স্বরলোপ প্রবণতা।

নাসিক্যীভবন

তৎসম শব্দে ঙ ঞ ন ণ ম এই অনুনাসিক ধ্বনি থাকলে আমরা তদ্ভব শব্দে অনুনাসিক ধ্বনির বদলে পূর্বস্বরে ँ চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করি। যেমন, কঙ্কণ >

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঁকন (ঙ্ > ঁ), কণ্টক > কাঁটা (ণ্ > ঁ), রন্ধন > রাঁধা (ন্ > ঁ)। এ রীতিটিকে আমরা নাম দিয়েছি নাসিক্যীভবন, অর্থাৎ নাকিসুর হয়ে ওঠা। ইংরেজিতে এর নাম nasalization.

স্বতোনাসিক্যীভবন

শব্দে অনুনাসিক ধ্বনি না থাকলেও আমরা অকারণে ঁ যোগ করি। হাসি > হাঁসি, হাসপাতাল > হাঁসপাতাল, কাচ > কাঁচ হুকা > হুঁকা। এইরকম জুঁই, পুঁথি, কাঁকড়া, শেঁওলা, সুঁই, হুঁশ, খোঁজ ইত্যাদি। হিন্দিতে সাঁপ, হঁসী, খাঁসী ইত্যাদি। এই অকারণে চন্দ্রবিন্দু আনাকে আমরা বলি স্বতোনাসিক্যীভবন। ইংরেজিতে spontaneous nasalization.

অ-নাসিক্যীভবন (de-nasalization)

পূর্ব বাংলার উচ্চারণে অথবা উচ্চারণের দোষে অনুনাসিকতা বর্জিত হয়। কাঁটা > কাটা, দাঁড়ানো > দাড়ানো, পাঁচ > পাচ ইত্যাদি। উচ্চারণের দোষে এই ধরনের ঁ (চন্দ্রবিন্দু) লোপকে অনাসিক্যীভবন বলা চলে।
(আ. বা. পত্রিকায় জাতপাঁতের জায়গায় লেখা হচ্ছে 'জাতপাত'।)

উষ্মীভবন

স্পৃষ্টধ্বনিকে কখনও কখনও উষ্মধ্বনি করে তুলি আমরা। যেমন, ফুল > ফ়ুল (full), মেজদা > মেজ়দা (mezda). একে বলি উষ্মীভবন, spirantization (spirant=উষ্ম) এই উষ্মীভবনের উদাহরণ মেলে চট্টগ্রামের ভাষায়—যেখানে 'কালী পূজা' 'খালী ফূ.জা' হয়ে ওঠে।

AMARBOI.COM

সকারীভবন

কোথাও বা 'ছ'কে স্ করে তুলি আমরা। যেমন, গাছতলা > গাসতলা, আগাপাছতলা > আগাপাসতলা। এই ধ্বনি পরিবর্তনকে বলে সকারীভবন, (assimilation).

মান্য চলিত ভাষা ও ধ্বনি পরিবর্তন

ধ্বনিপরিবর্তন ভাষার একটি প্রবণতা। অনেক সময়ে এই ধরনের পরিবর্তন উচ্চারণবিকৃতি আনতে পারে। আমরা যেমন জাঁল্লে (জানলে), পোঁরো মিঁট (পনরো মিনিট) ইত্যাদি বলছি, ইংরেজরাও তেমনি Howza (How is that), Izzatso (Is that so), Whassamatter (What's the matter) বলছেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ধ্বনিপরিবর্তনজনিত বিকৃতি বানানেও আসছে। যেমন, 'আগাপাছতলা' লেখা হচ্ছে 'আগাপাস্তলা' ইত্যাদি।

মান্য চলিত ভাষার লেখ্যরূপকে কথ্য চলিত ভাষার রূপ কিছুটা বদলে দিতেই পারে, এই বদলে দেবার ব্যাপারে আমাদের ধ্বনিপরিবর্তনের প্রবণতাগুলো কাজ করে। এই পরিবর্তনে মনস্তাত্ত্বিক দিকও অনেকটা প্রভাব বিস্তার করে। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথোপকথনে আমরা তেমন সতর্কতা অবলম্বন করতে চাই না, তেমনি যাকে আমরা তেমন গুরুত্ব দিই না তার সঙ্গে কথা বলার সময়েও একটা অবজ্ঞা বা অনিচ্ছাজনিত শৈথিল্যের শিকার হই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু মনে রাখা দরকার উচ্চারণবিশুদ্ধির দিকে অনবধানতার ফলে প্রয়োজনের সময় আমাদের উচ্চারণে ঠিকমতো ধ্বনিন্যাস না-ও আসতে পারে।

ভাষা বদলে যাবেই, তবে 'যখনকার যা তখনকার তা' এই নীতি নিয়ে সাম্প্রতিক বাংলা ভাষার যে রূপ সে রূপকে কথায় ও লেখায় প্রকাশের ব্যাপারে আমাদের কিছুটা সতর্ক হতেই হবে।

৯.৩ ■ ধ্বনিপরিবর্তনের সম্ভাব্য বহু ধারা

ধ্বনিপরিবর্তনের এই সব ধারা দিগ্‌দর্শন মাত্র। আরও অনেক রকম প্রক্রিয়াই তো ধ্বনিপরিবর্তনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিশেষ করে উপভাষা বা লোকভাষায়, যেমন, তেল > ত্যাল, দংশানো > ডংশানো, রস > অস, উমুনা > রুমুনা, চোর > চুর, লাল > নাল, ব্যবহার > ব্যাভার ইত্যাদি। শুধু বর্ণবিকার বললে তো বৈশিষ্ট্যগুলো ধরা পড়ে না। তা ছাড়া শুধু অ-শ্রুতি-বশ্রুতি নয়, স্বর ও ব্যঞ্জনের আরও নানাধরনের শ্রুতি লক্ষ করা যায়। যেমন, পশ্চিম দিনাজপুরে চাল > শাইল (দাঁড়কে শাইল, চ্যাঙা শাইল) ইত্যাদি। এই 'ই' শ্রুতিমাত্র, একে 'ই' দিয়ে লেখা চলে। কুচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরের ভাওয়াই গানে হ-শ্রুতির তারতম্য আছে, কোথাও তা অতি সূক্ষ্ম কোথাও স্পষ্ট : ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে > ফাহান্দে পহ্ড়িয়া বগা কাহ্ন্দে রে। এই উচ্চারণেই হ-শ্রুতির হেরফের আছে কিছু। এই প্রসঙ্গে ফার্সি ওয়াহ্ ওয়াহ্ > 'বাহবা' শব্দটি উল্লেখযোগ্য। এখানে প্রথম 'হ'টি হ-শ্রুতি জনিত, আর শেষের 'হ'টি লুপ্ত।

প্রচলিত অপিনিহিতি অভিশ্রুতি ইত্যাদি পরিভাষাগুলো চলতেই থাকবে কি না তা-ও নতুন করে ভাবা দরকার। কারণ, এগুলো গড়ে উঠেছিল গ্রিক-লাতিন পরিভাষার বঙ্গানুবাদ হিসেবে। ওইসব শব্দে পরিবর্তনের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য সব জায়গায় ধরা পড়ে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০

নতি : ণত্ববিধি ও ষত্ববিধি

[ণত্ব-ষত্ব—কোথায় 'ণ' 'ন' হবে—স্বাভাবিক ণত্ব—কোথায় 'স্' 'ষ্' হবে—স্বাভাবিক ষত্ব—অতৎসম বানানে 'ষ' 'শ' 'স']

১০.১ ■ ণত্ব-ষত্ব

ণত্ব ও ষত্ববিধির প্রাচীন পরিভাষা 'নতি'। নতি মানে 'ন'-এর 'ণ'-এ পরিণতি এবং স্-এর ষ-এ পরিণতি। 'নম্' ধাতুর পরিভাষিক অর্থ ছিল মূর্ধন্যীভবন।

যদিও বাংলায় 'ন' ও 'ণ' দুটি বর্ণের উচ্চারণই এক এবং 'স' ও 'ষ' উচ্চারণেও কোনও তফাত নেই তবু বানানের বেলায় সে তফাত আছে বলে কোথায় 'ন' 'ণ' হয়ে যায়, আর কোথায় 'স' 'ষ' হয়ে যায় তা জানা দরকার। এই 'ন' বা 'ণ' এবং 'স' বা 'ষ'-কে ঠিকমতো লেখাকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তার প্রমাণ বাংলা ইডিয়মে 'ণত্বষত্ব জ্ঞান' কথাটির অন্তর্ভুক্তি। 'ফাল্গুন' 'গগন' আর 'ফেন' লিখতে যারা 'ণ' ব্যবহার করে তারা বর্বর এমন শক্ত কথাও ছন্দে গাঁথা হয়েছে—ফাল্গুনে গগনে ফেনে ণত্বমিচ্ছন্তি বর্বরাঃ।

আমাদের কারও ণত্বষত্ব জ্ঞান নেই বা আমরা বর্বর এমন কথা যাতে কেউ না বলেন তার জন্যে কোথায় 'ন' 'ণ' হবে আর কোথায় 'স' 'ষ' হবে তা জেনে নেওয়াই ভাল। (১৫)

AMARBOI.COM

১০.২ ■ কোথায় 'ন' 'ণ' হবে

● ঋ ঋৃ র ষ—এই ক'টি বর্ণের পরে যদি প্রত্যয়ের দন্ত্য স্ আসে তবে তা ণ হয়ে যাবে : ঋণ, পিতৃ ণ, বর্ণ (বর্‌ন>ণ), বিষ্ণু (বিষ্‌নু>ণু)। বাংলায় একটি মজার ছড়া প্রচলিত আছে :

ঋকার রকার ষকারের পর
ন-কার যদি থাকে,
খ্যাঁচ ক'রে তার কাটবে মাথা
কোন্ বাপ তার রাখে।

মাথা কাটা মানে মাত্রা উড়িয়ে দেওয়া, অর্থাৎ 'ন' কে 'ণ' করা।

● একই পদের মধ্যে প্রথমে ঋ ঋৃ ষ্-র্-এর পরে যদি স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, য-ব-হ এবং অনুস্বারের ব্যবধান থাকে তা হলেও 'ন' 'ণ' হয়ে যাবে।

রণ (র্অণ—এখানে 'অ' ব্যবধান)

বক্ষ্যমাণ (ব্অক্ষ্য্অম্আণ—এখানে ষ্-এর পর য্ অ ম্ আ ব্যবধান)

রুক্মিণী (র্উক্ম্ইণ্+ঈ—এখানে র্-এর পর উ ক্ ম্ ই ব্যবধান)

স্পৃহণীয় (স্প্ঋহ্অণ্ঈয়্অ—এখানে 'ঋ'-এর পর হ্ অ ব্যবধান)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই নিয়মেই অপেক্ষমাণ, ম্রিয়মাণ। **অন্য বর্ণ ব্যবধান থাকলে 'ণ' হবে না।** অর্চনা, অর্জন, দর্শন, কীর্তন [এই সব শব্দে যথাক্রমে র্-এর পর চ্, জ্, শ্ ও ত্ ব্যবধান আছে]

● মনে রাখতে হবে এ দুটি নিয়ম এক পদেই প্রযোজ্য। যেখানে দুটি পদ নিয়ে শব্দটি সেখানে এ দুটি নিয়ম খাটবে না। তাই দুর্ণাম নয়, দুর্নাম, হরিণাম নয়, হরিনাম, ত্রিণয়ন নয়, ত্রিনয়ন, বীরাঙ্গণা নয় বীরাঙ্গনা।

শূর্পণখা শব্দটি অবশ্য 'ণ' দিয়ে লিখতে হবে, কারণ এটি ব্যক্তিবিশেষের নাম বোঝাচ্ছে। নাম না বোঝালে 'ণ' হবে না। নাম বোঝানোর জন্যে শব্দটিকে একপদ হিসেবে ধরা হয়েছে। 'তাম্রনখ' মানে যখন তাম্রের মতো নখ যার, তখন 'ন', কিন্তু তাম্রনখ যদি কারও নাম হয় তা হলে 'ণ' হবে। মাসের নাম বোঝানোর জন্যেই 'অগ্রহায়ণে' 'ণ'।

● প্র পরা পরি নির্ এই চারটি উপসর্গ ও অন্তর্ শব্দের পরে নদ্, নম্, নশ্, নহ্, নী, নু, নুদ্, অন্ ও হন্ ধাতুর 'ন্' ণ হবে।

নশ্—প্রণাশ, পরিণাশ। ব্যতিক্রম : প্রনষ্ট, পরিনষ্ট। সুনীতিকুমার ণত্ববিধানে উদাহরণ হিসেবে 'প্রণষ্ট' লিখেছেন, কিন্তু পাণিনি ব্যাকরণে প্রনষ্ট শব্দটিকে ব্যতিক্রম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সূত্র : নশেঃ ষান্তস্য অর্থাৎ নশ্ ধাতুর তালব্য শ মূর্ধন্য হলে দন্ত্য 'ন্' মূর্ধন্য ণ হবে না।

নহ্—পরিণাহ
নী—প্রণয়, পরিণয়, নির্ণয়
নু—প্রণব
নুদ—প্রণোদ, প্রণোদিত
অন্—প্রাণ
হন্—অন্তর্হণন

যদিও 'অন্তর্হণন' বাংলায় প্রচলিত নয়, তবে অন্তর্ঘাতের প্রতিশব্দ হিসেবে শব্দটি প্রযুক্ত হতে পারে।

● অগ্র ও গ্রাম শব্দের পরবর্তী 'নী' ধাতুর 'ন' 'ণ' হয় : অগ্রণী, গ্রামণী।

● প্র. পরা পূর্ব অপর—এগুলির পর 'অহ্ন' শব্দ থাকলে 'ন্' 'ণ' হয়—প্রাহ্ণ, পরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ।

মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন শব্দে যে ণ হবে না কারণ এখানে 'অহ্ন' 'মধ্য' ও 'সায়' শব্দের পরে আছে।

● আম্রবণ, শরবণ, ইক্ষুবণ ইত্যাদি শব্দে বিকল্পে 'ণ' হয়।

আমরা অবশ্যই আম্রবন, শরবন, ইক্ষুবন লিখব।

প্র, পরা, পরি, নির্—এই চারটি উপসর্গ এবং অন্তর্ শব্দের পর কৃৎ প্রত্যয়ের দন্ত্য 'ন্' মূর্ধন্য ণ হয়। যদি সেই প্রত্যয়ের আগে স্বরবর্ণ থাকে।

যা—প্রয়াণ (প্র-√যা+অন)
আপ্—প্রাপণীয় (প্র-√আপ্+অনীয়)
মা—প্রমাণ (প্র-√মা+অন), নির্মাণ (নির্-√মা+অন)।

এখানে অন ও অনীয় দুটি প্রত্যয়ের আগেই স্বরবর্ণ আছে।

● পর, পার, উত্তর, চান্দ্র, নার, রাম শব্দের পর 'আয়ন' প্রত্যয় থাকলে ওই প্রত্যয়ের 'ন্' 'ণ' হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরায়ণ, পারায়ণ, উত্তরায়ণ, চান্দ্রায়ণ, নারায়ণ, রামায়ণ।

- ময়ট্ (ময়) প্রত্যয়ের মৃ-যোগে ত্ স্থানে যে 'ন্' হয় তা মূর্ধন্য ণ হবে না। মৃন্ময় (মৃদ্+ময়)।
- ট ঠ ড-এর আগে বসেছে এমন ন ণ হয় : কণ্টক, লুণ্ঠন, তাণ্ডব। ট ঠ ড মূর্ধন্য বর্ণ তাই এদের সঙ্গ লাভ করে ন ণ না হয়ে পারে না।

১০.৩ ■ স্বাভাবিক ণত্ব

কতগুলি শব্দে কোনও বর্ণের প্রভাব ছাড়াই ণ হয়। একে স্বাভাবিক ণত্ব বলে। যেমন—অণু, কল্যাণ, পাণি, মাণবক ইত্যাদি। 'মানব'-এ 'ন' কিন্তু 'মাণবক'-এ মূর্ধন্য 'ণ'। আমাদের মানবকই লিখতেই ইচ্ছে হয়, কিন্তু উপায় নেই। তৎসম শব্দের বানানে নড়চড় নেই। 'মাণবক' মানে বালক। (১৬)

স্বভাবতই ণ হয় এমন কতগুলি শব্দকে মনে রাখার সুবিধার জন্যে পয়ারে গেঁথে দিলাম। অর্থের পারম্পর্য খুঁজবেন না, এ শুধু শব্দবিন্যাস মাত্র—

বাণিজ্য ভণিতা ভাণ লাবণ্য শোণিত,
আপণ কঙ্কণ কোণ গণনা গণিত।
চাণক্য নিক্বণ তৃণ কফোণি নিপুণ
লবণ বণিক স্থাণু গুণী গুণ তূণ।
বীণা কণা মণি পাণি বাণ পণ্য পণ
মাণিক্য নৈপুণ্য গণ্য ফণী পুণ্য গণ ॥

একটি প্রশ্ন—পরিবহণ না পরিবহন

স্পষ্টত নির্ণায়ক সূত্র নেই। সংস্কৃতে পরিবহণ বলে কোনও শব্দই নেই, আছে 'পরিবহ'। কিন্তু শব্দই নেই তাই নির্দেশ থাকবে কেন। এই শব্দটি পরিভাষা হিসেবে আমরা তৈরি করেছি। জ্ঞানেন্দ্রমোহনে ও চলন্তিকায় 'পরিবহন' গৃহীত, 'পরিবহণ' নয়। কিন্তু 'সংসদ' ব্যবহারিক শব্দকোষ পরিবহণ লিখেছেন, কিন্তু তার ভিত্তি কী ? যেখানে ণত্বের নির্ণায়ক সূত্র নেই সেখানে 'ন' লেখাই তো সমীচীন বলে মনে করি।

অতৎসম শব্দে ণত্ব নয়

বলাবাহুল্য ণত্ববিধি তৎসম শব্দেই প্রযোজ্য অতৎসম শব্দে নয়। তাই 'র'-এর পর থাকলেও আমরা সেখানে 'ণ' লিখব না। আমরা লিখব—পুরনো, ঠাকরুন, ঝরনা, কোরান, কুর্নিশ, জার্মানি, দূরবিন, ট্রেন ইত্যাদি। আর কর্ণ, পর্ণ, স্বর্ণ ভেঙে যেসব তদ্ভব শব্দ গঠিত হয়েছে তাতেও 'ণ' নয় 'ন'। কর্ণ > কান, পর্ণ > পান, স্বর্ণ > সোনা।

১০.৪ ■ কোথায় 'স্' 'ষ্' হবে

যে-সমস্ত নিয়ম অনুসারে দন্ত্য স মূর্ধন্য ষ হয় তাকে ষত্ববিধান বলে।

- ঋ-কারের পরে মূর্ধন্য 'ষ' হয় : ঋষি, ঋষভ ইত্যাদি।
- অ-আ ভিন্ন স্বর, ক্ এবং র্-এর পরবর্তী বিভক্তি বা প্রত্যয়ের স্ মূর্ধন্য ষ হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক) বিভক্তির 'স্'

শ্রীচরণে+সু=শ্রীচরণেষু, কিন্তু সুচরিতা+সু=সুচরিতাসু

এখানে 'সু' 'আ'-কারের পরে আছে, তাই ষত্ব হল না।

খ) প্রত্যয়ের 'স্'

জিগীষা (জি+সন্=জিগীস্>ষ্+আ)

বুভুক্ষা (ভুজ্+সন্=বুভুক্+স্>ষ্+আ)

কিন্তু পিপাসা, জিজ্ঞাসা ইত্যাদি শব্দে স্ প্রত্যয়ের ষ্ হয় না, কারণ ওই 'স্' আকারের পরে আছে।

- 'সাৎ' প্রত্যয়ের স্ ষ্ হয় না : ধূলিসাৎ।
- ই-কারের পর সিচ্, সিধ্, সদ্ প্রভৃতি ধাতুর 'স্' 'ষ্' হয় :

সিচ্—নিষেক, নিষিক্ত

সদ্—বিষাদ, বিষণ্ণ

সিধ্—প্রতিষেধ, নিষেধ, নিষিদ্ধ

- সু ও বি উপসর্গের পর 'সম' শব্দের 'স্' 'ষ্' হবে।

সুষম, বিষম

- সমাস হলে মাতৃ ও পিতৃ শব্দের পরবর্তী স্বসৃ শব্দের প্রথম স্ ষ্ হয়।

মাতৃষ্বসা, পিতৃষ্বসা।

- দুটি পদে সমাসযুক্ত হয়ে একটি শব্দ হলে প্রথম পদের শেষে ই, উ ও ঋ থাকলে পরবর্তী পদের প্রথম দন্ত্য 'স্' 'ষ্' হয়।

যুধি+স্থির=যুধিষ্ঠির, অগ্নি+স্তোম=অগ্নিষ্টোম, সু+স্থু=সুষ্ঠু।

এই সূত্র অনুযায়ী 'সুস্থ' আর 'পরিস্থিতি' যথাক্রমে হয়ে ওঠে 'সুষ্ঠ' আর 'পরিষ্ঠিতি'। কী জটিল পরিস্থিতি! শেষ পর্যন্ত 'সুস্থ'কে গণপাঠের মধ্যে নিয়ে বার্তিককারের স্বস্তি, আর মুগ্ধবোধে রামতর্কবাগীশের টীকায় সুস্থাদিগণের মধ্যে 'পরিস্থিতি'কে ছাড়পত্র দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হল।

[ষ্-এর পর ত্, থ থাকলে যথাক্রমে ত্ ও থ ট ও ঠ হয়]

সু+সেন=সুষেণ

হরি+সেন=হরিষেণ

'স্' 'ষ্' হয়ে যাবার ফলে 'সেন' এর 'ন' 'ণ' হয়ে গেল]

- শাস্ ধাতুজাত শব্দে 'স্' 'ষ্' হবে। শব্দে 'ত' থাকলে তা 'ট' হবে। শিষ্য (শাস্+য), শিষ্ট (শাস্+ত)।
- নি পূর্বক স্যন্দ্ ধাতুর 'স্' বিকল্পে 'ষ্' হবে।

নিস্যন্দ, নিষ্যন্দ

- 'নি' পূর্বক 'স্না' ধাতু 'স্' 'কুশল' অর্থে ষ্ হবে।

নি+স্নাত=নিষ্ণাত। তিনি ব্যাকরণে নিষ্ণাত।

কুশল অর্থ না হলে 'নিস্নাত' = যিনি স্নান করেছেন।

- ট বর্গের আগে সর্বদাই ষ্ হয়। দুষ্ট, কনিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, স্পষ্ট। ট, ঠ, মূর্ধন্য বর্ণ, তাই তার সান্নিধ্যে 'স্'-এর মূর্ধন্যীভবন।

১০.৫ ■ স্বাভাবিক ষত্ব

কতগুলি শব্দে স্বভাবতই 'ষ' হয়। তাকে স্বাভাবিক ষত্ব বলে। এই রকম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বভাব-ষ শব্দের দৃষ্টান্ত : আষাঢ়, ঈষৎ, ঈষা, পুরুষ, পাষাণ, পৌষ ইত্যাদি।

মনে রাখবার সুবিধার জন্য শব্দগুলিকে পয়ার ছন্দে গেঁথে দেওয়া হল :

আষাঢ় ঈষৎ ঈষা উষর নিকষ
বিশেষণ ভাষা উষা বিশেষ ষোড়শ
বিষাণ ও শোণ বিষ পুষ্প দোষ রোষ
মহিষ মূষিক পূষা পুরুষ প্রদোষ।
প্রত্যূষ ভূষণ কোষ ভূষা শষ্প শেষ,
বাষ্প ষট্ ভাষ্য পোষ্য অভিলাষ মেষ ॥

১০.৬ ■ অতৎসম শব্দে ষত্ব

তৎসম শব্দের 'ষ' তদ্ভব শব্দে যেমন স্ বা শ্ হয়, তেমনি বজায়ও থাকে।

পিতৃষ্বসা > পিসি, মাতৃষ্বসা > মাসি, অমিষ > আঁশ, আ-বৃষ্ > আউষ > আউশ। কিন্তু ষোল, মোষ, ষণ্ডা, ষাঁড়, ষাট (ষষ্টি), পোষা, পেষা শব্দের 'ষ' এখনও অপরিবর্তিত। ঘুষি, ঘষি, ঘুষ—এরা যেন অতৎসম শব্দের স্বাভাবিক ষত্ব। অবশ্য এ শব্দে 'স'ও এখন দেখা যাচ্ছে। বিদেশি শব্দে ষ এর জায়গায় স্ বা শ্ হবে। ষ্টিমার নয়, স্টিমার, ষ্টেষণ নয়, স্টেশন, ষ্ট্রিট নয় স্ট্রিট, পোষাক নয়, পোশাক, জিনিষ নয় জিনিশ, বারকোষ নয় বারকোশ ইত্যাদি।

এখন 'সাবান', 'জিনিস'-এর সঙ্গে 'শাবান', 'জিনিশ'-ও চলছে। আমাদের যে-কোনও একটাকে রাখতে হবে। দ্বিতীয়টির পক্ষেই বোধ হয় বেশি ভোট।

আশীষ আশিস প্রসঙ্গে

জ্ঞানেন্দ্রমোহন 'আশীষ'কেই প্রাধান্য দিয়েছেন। চলন্তিকায় শুধু 'আশিস' রাখা হয়েছে। সংসদ শুধু হসন্তযুক্ত 'আশিস্' রেখে 'আশীষ'কে অশুদ্ধ বলেছেন। বিষয়টা একটু ভেবে দেখা যেতে পারে। বাংলায় আমরা সাধারণত প্রাতিপদিক না নিয়ে প্রথমার একবচনটিকেই নিই। 'বণিজ্' নিই না, 'বণিক্' নিই তার পর তাকে 'বণিক' করে তুলি হসন্ত বাদ দিয়ে। গুণীকেই নিই, 'গুণিন্'কে নয়। তাহলে, প্রাতিপদিকই বাংলায় গ্রহণীয়, প্রথমার একবচনজাত বিশেষ একটি শব্দ বর্জনীয় এ কথা কি জোর দিয়ে বলা চলে? বিশেষ করে সমাসবদ্ধ পদের পূর্বপদে যখন 'আশিস্' নয়, 'আশীঃ'ই প্রাতিপদিক হয়ে উঠছে। এই 'আশীঃ', বিসর্গ নিয়ে মুশকিলে পড়েছে, 'ঃ'কে স বা ষ করে নিতে চেয়েছে। শব্দটি আশিস্ শব্দের 'স্'কে যেমন নিয়েছে, আবার শব্দরূপের সর্বত্র আশিষঃ, আশিষা ইত্যাদি ষ-কারান্ত রূপের প্রভাবও সে এড়াতে পারেনি। তাই বঙ্গীয় শব্দকোষে আশীষ, আশীস, আশিষ, আশিস এই চারটি বানানই সসম্মানে ঠাঁই পেয়েছে। চারটিই চলুক এমন আমরা বলি না, শুধু 'আশিস'ই চলুক। সংসদ যখন অবাক্ ও অবাক রেখেছেন, তখন একমাত্র 'আশিস্' রাখলেন কেন, আশিস-ও তার পাশে একটু জায়গা করে নিতে পারত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১
সন্ধি

['সন্ধি'র সংজ্ঞা—স্বরসন্ধি—ব্যঞ্জনসন্ধি—বিসর্গসন্ধি—নিয়মবহির্ভূত সন্ধি, খাঁটি বাংলা মৌলিক সন্ধি—হিন্দি সন্ধির কয়েকটি প্রবণতা বিশ্লেষণ—বাংলায় সন্ধির ব্যবহার—বিদেশি শব্দের সঙ্গে সন্ধি]

১১.১ ■ 'সন্ধি'র সংজ্ঞা

একান্ত সন্নিহিত বা অব্যবহিত দুটি ধ্বনির মিলনের নাম সন্ধি। ধ্বনিপরিবর্তনের ক্ষেত্রে 'সন্ধি'র একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। বর্ণমিলন বোঝাতে ইংরেজিতে liaison বা assimilation-এর মতো কিছু শব্দ থাকলেও পাশ্চাত্যের ধ্বনিতাত্ত্বিকেরা আমাদের 'সন্ধি' শব্দটিকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ব্লুমফিল্ডের ভাষায়, 'This term like many technical terms of linguistics come from the ancient Hindu grammarians. Literary it means putting together.' ব্লুমফিল্ড 'সন্ধির' তাৎপর্য সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন—'putting together'. ব্যুৎপত্তি ঠিক এই কথাই বলে—সম্+ধি(ধা+ই), সম্=একসঙ্গে, ধি=ধরে রাখে যা। (১৭)

বহু ভাষাতেই সন্ধি দেখা যায়।
ইংরেজি : in+mortal=immortal do+on=don
ফরাসি : le+homme=l'homme, si+il=s'il
ফারসি : উ+অস্ত্=উস্ত্
আরবি : আব্দ্+আল্+সালাম=আবদুস্সালাম

সন্ধি শুধু ধ্বনি পরিবর্তনই নয়, ভাষায় মাধুর্য বাড়াতেও সন্ধির একটি বিশেষ ভূমিকা আছে।

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী
অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী

এই যে মনোমোহিনী (মনঃ+মোহিনী) আর সূর্যকরোজ্জ্বল (সূর্যকর+উজ্জ্বল) এ শুধু দুটি ধ্বনিযোজনামাত্র নয়, ধ্বনিমাধুর্যসৃষ্টিও বটে।

লিখতে গেলে সন্ধি করার প্রয়োজন আমাদের মাঝে মাঝেই হবে, তাই নিয়মগুলো জানা দরকার। সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করে রবীন্দ্রনাথও যথেষ্ট সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। 'মথুরায়' কবিতায় (কড়ি ও কোমল) রবীন্দ্রনাথ 'মনোসাধ' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। এতে সেই সময়কার 'মিঠেকড়া' পত্রিকায় লেখা হয়—

একবার রাধে রাধে ডাক্ বাঁশি মনোসাধে,
শুনে ব্যাকরণ কাঁদে হেন সন্ধি শুনি নাই।

শুদ্ধ পদটি হবে মনঃসাধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাকরণ কাঁদবে আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে এ ধরনের উদাহরণ দিই : এতদ্সত্ত্বেও, অন্তর্কলহ। বলাবাহুল্য শুদ্ধ প্রয়োগ হবে : এতৎসত্ত্বেও, অন্তঃকলহ। সংবাদপত্রে এক সময়ে নভোচারী ও নভোচরও দীর্ঘদিন চলেছিল।

তাই বলছিলাম সন্ধির নিয়মগুলো জেনে নেওয়াই ভাল। আসলে সন্ধি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। দ্রুত উচ্চারণে স্বাভাবিকভাবেই পর-পর উচ্চারিত ধ্বনির মধ্যে কিছু পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন নানা ধরনের হতে পারে : **মিলনমাত্র** : স্ব+অধীনতা=স্বাধীনতা, **পূর্ববর্ণের বিকৃতি** : তদ্+মাত্র=তন্মাত্র, **পরবর্ণের বিকৃতি** : রাজ্+নী=রাজ্ঞী, **পূর্ববর্ণের লোপ** : অতঃ+এব=অতএব, **উভয় বর্ণের বিকৃতি** : উদ্+শৃঙ্খল=উচ্ছৃঙ্খল।

সন্ধি তিনরকম : স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি ও বিসর্গসন্ধি। প্রথমে স্বরসন্ধির কথা।

১১.২ ■ স্বরসন্ধি

একই শব্দে পাশাপাশি দুটি স্বরবর্ণ মিলিত হয়ে নতুন রূপ পেলে তাকে আমরা স্বরসন্ধি বলি, অর্থাৎ স্বরে স্বরে সন্ধিই স্বরসন্ধি।

● অকার কিংবা আকারের পর অ কিংবা আকার থাকলে দুইয়ে মিলে 'আ' হবে। ওই আ আগের বর্ণে যুক্ত হবে।

ক) অ+অ=আ

অপর+অপর=অপরাপর, চর+অচর=চরাচর, বর+অভয়=বরাভয়, ইষ্ট+অনিষ্ট=ইষ্টানিষ্ট, মধ্য+অহ্ন=মধ্যাহ্ন, সায়+অহ্ন=সায়াহ্ন, অপর+অহ্ন=অপরাহ্ণ, প্র+অহ্ণ=প্রাহ্ণ, পূর্ব+অহ্ন=পূর্বাহ্ণ। শেষের তিনটি শব্দে অহ্নের 'হ্ন' কেন 'হ্ণ' হয়ে গেল তার নিয়ম ণত্ববিধি দেখুন (সূত্র ৬)। স্নেহ+অন্ধ=স্নেহান্ধ, সম+অন্তরাল=সমান্তরাল, তদন্ত+অধীন=তদন্তাধীন, সিদ্ধ+অন্ত=সিদ্ধান্ত, ক্ষেপণ+অস্ত্র=ক্ষেপণাস্ত্র, মানব+অধিকার=মানবাধিকার, স্ব+অধীন=স্বাধীন, শরণ+অর্থী=শরণার্থী, উত্তর+অধিকার=উত্তরাধিকার, পরম+অণু=পরমাণু ইত্যাদি।

খ) অ+আ=আ

যাত+আয়াত=যাতায়াত, স্ব+আয়ত্ত=স্বায়ত্ত, স+আনন্দ=সানন্দ, বিবেক+আনন্দ=বিবেকানন্দ, পূর্ব+আভাস=পূর্বাভাস, হত+আশ=হতাশ, সর্ব+আধুনিক=সর্বাধুনিক, রাষ্ট্র+আয়ত্ত=রাষ্ট্রায়ত্ত, চির+আচরিত=চিরাচরিত, পরম+আশ্চর্য=পরমাশ্চর্য, কোষ+আগার=কোষাগার, ভট্ট+আচার্য=ভট্টাচার্য।

গ) আ+অ=আ

ত্বরা+অন্বিত=ত্বরান্বিত, মহা+অরণ্য=মহারণ্য, মহা+অর্ঘ=মহার্ঘ, নানা+অর্থ=নানার্থ, পরা+অস্ত=পরাস্ত।

ঘ) আ+আ=আ

মহা+আকাশ=মহাকাশ, মহা+আশয়=মহাশয়, কারা+আগার=কারাগার, শিলা+আসন=শিলাসন, দয়া+আর্দ্র=দয়ার্দ্র, ভাষা+আচার্য=ভাষাচার্য, ব্যথা+আতুর=ব্যথাতুর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

● ই বা ঈ-র পর ই বা ঈ থাকলে দুয়ে মিলে ঈ হয়, ওই ঈ আগের বর্ণে যুক্ত হয়।

ক) ই+ই=ঈ

অতি+ইন্দ্রিয়=অতীন্দ্রিয়, প্রতি+ইতি=প্রতীতি, অতি+ইত=অতীত, অভি+ইষ্ট=অভীষ্ট।

খ) ই+ঈ=ঈ

প্রতি+ঈক্ষা=প্রতীক্ষা, অভি+ঈপ্সা=অভীপ্সা, ক্ষিতি+ঈশ=ক্ষিতীশ।

গ) ঈ+ই=ঈ

সুধী+ইন্দ্র=সুধীন্দ্র, শচী+ইন্দ্র=শচীন্দ্র, অবনী+ইন্দ্র=অবনীন্দ্র।

ঘ) ঈ+ঈ=ঈ

সতী+ঈশ=সতীশ, শ্রী+ঈশ=শ্রীশ, কাশী+ঈশ্বর=কাশীশ্বর, অর্ধনারী+ঈশ্বর=অর্ধনারীশ্বর।

'তারই নীচে শুয়ে থাকি
যেন আমি অর্ধনারীশ্বর।
—জীবনানন্দ।

● উ বা ঊ-র পর উ বা ঊ থাকলে দুয়ে মিলে ঊ হয়। ঊ আগের বর্ণে যুক্ত হয়।

ক) সু+উক্তি=সূক্তি, মরু+উদ্যান=মরূদ্যান, অনু+উদিত=অনূদিত।

খ) উ+ঊ=ঊ

লঘু+ঊর্মি=লঘূর্মি, অনু+ঊহ=অনূহ (=পশ্চাদ্‌বিতর্ক)।

গ) ঊ+উ=ঊ

বধূ+উৎসব=বধূৎসব।

ঘ) ঊ+ঊ

সরযূ+ঊর্মি=সরযূর্মি, ভূ+ঊর্ধ্ব=ভূর্ধ্ব।

● ঋ-কারের পর ঋ-কার থাকলে উভয়ে মিলে দীর্ঘ ঋ-কার হয়, দীর্ঘ ঋ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। পিতৃ+ঋণ=পিতৄণ (দীর্ঘ-ঋ)।

এই সব নিয়মকে একটি সূত্রে গেঁথেছেন পাণিনি : অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ অর্থাৎ অ, ই, উ, ঋ-এর পর সবর্ণ (একই উচ্চারণ স্থান যাদের) থাকলে উভয়ে মিলে দীর্ঘ হয়। এ শুধু দিগ্‌দর্শনমাত্র, মুষ্টিমেয় সূত্রে বহু নিয়মকে বেঁধে আশ্চর্য ধ্বনিতত্ত্ববোধের সাক্ষ্য রেখেছেন পাণিনি।

একে আমরা সবর্ণসন্ধি বলতে পারি।

● অ, আ+ই, ঈ=এ, একারের পূর্ববর্ণে যুক্তি (যোজনা)

ক) অ+ই=এ

শুভ+ইচ্ছা=শুভেচ্ছা, অন্ত্য+ইষ্টি=অন্ত্যেষ্টি, প্র+ইত=প্রেত, স্ব+ইচ্ছা=স্বেচ্ছা।

খ) অ+ঈ=এ

গণ+ঈশ=গণেশ, পরম+ঈশ্বর=পরমেশ্বর।

গ) আ+ই=এ

রমা+ইন্দ্র=রমেন্দ্র, মহা+ইন্দ্র=মহেন্দ্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘ) আ+ঈ=এ

মহা+ঈশ্=মহেশ, উমা+ঈশ=উমেশ।

- অ, আ+উ, ঊ=ও, ওকারের পূর্ববর্ণে যুক্তি।

ক) অ+উ=ও

শারদ+উৎসব=শারদোৎসব, শিল্প+উন্নত=শিল্পোন্নত, দেব+উপম=দেবোপম, স্বগত+উক্তি=স্বগতোক্তি, সহ্+উদর=সহোদর, বৃষ+উৎসর্গ=বৃষোৎসর্গ, আদ্য+উপান্ত=আদ্যোপান্ত, সর্ব+উচ্চ=সর্বোচ্চ, পদ+উন্নতি=পদোন্নতি, উত্তর+উত্তর=উত্তরোত্তর, মুখ+উপাধ্যায়=মুখোপাধ্যায়, বন্দ্য+উপাধ্যায়=বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গ+উপাধ্যায়=গঙ্গোপাধ্যায়। প্রায় (=মৃত্যু)+উপবেশন=প্রায়োপবেশন।

খ) অ+ঊ=ও

চল+ঊর্মি=চলোর্মি, নব+ঊঢ়া=নবোঢ়া, এক+ঊনবিংশ=একোনবিংশ।

গ) আ+উ=ও

কথা+উপকথন=কথোপকথন, গঙ্গা+উদক=গঙ্গোদক, যথা+উচিত=যথোচিত, মহা+উৎসব=মহোৎসব, .বিদ্যা+উৎসাহী=বিদ্যোৎসাহী।

ঘ) আ+ঊ=ও

মহা+ঊর্মি=মহোর্মি, মহা+ঊর্ধ্ব=মহোর্ধ্ব, আ+ঊত=ওত, প্র+ঊত=প্রোত।

আমরা 'ওতপ্রোত' একসঙ্গেই ব্যবহার করি। বৃহদারণ্যক উপনিষদে অবশ্য 'ওত' আর 'প্রোত' পৃথকভাবেও পাই।

ঙ) অ, আ+ঋ=অর্

রাজ+ঋষি=রাজর্ষি, হিম+ঋতু=হিমর্তু।

উত্তম+ঋণ=উত্তমর্ণ।

অধম+ঋণ=অধমর্ণ।

এই সব সন্ধিকে পাণিনি '**আদ্‌গুণঃ**' এই সূত্রে বেঁধেছেন। আমরা দেখছি এখানে পরবর্তী স্বরের গুণ হচ্ছে। তাই এগুলোকে আমরা '**গুণসন্ধি**' বলতে পারি।

- অ, আ, + এ, ঐ=ঐ

ক) অ+এ=ঐ

জন+এক=জনৈক, হিত+এষী=হিতৈষী, হিত+এষণা=হিতৈষণা, সর্ব+এব=সর্বৈব।

খ) আ+এ=ঐ

তথা+এব=তথৈব, তথা+এবচ=তথৈবচ।

গ) আ+ঐ=ঐ

মহা+ঐশ্বর্য=মহৈশ্বর্য, মহা+ঐক্য=মহৈক্য, মহা+ঐরাবত=মহৈরাবত।

- অ, আ+ও, ঔ=ঔ

ক) অ+ও=ঔ

জল+ওকা=জলৌকা

খ) মহা+ওষধি=মহৌষধি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ) অ+ঔ=ঔ

পরম+ঔষধ=পরমৌষধ।

ঘ) আ+ঔ=ঔ

মহা+ঔৎসুক্য=মহৌৎসুক্য।

এই সব সন্ধির ক্ষেত্রে পাণিনি সূত্র **'বৃদ্ধিরেচি'**। দেখা যাচ্ছে এগুলিতে পরবর্তী স্বরের বৃদ্ধিই মূল ব্যাপার। আমরা এই নিয়মগুলিকে **বৃদ্ধি-সন্ধি'** বলতে পারি।

- ই, ঈ + ই, ঈ ছাড়া অন্য বর্ণ=ই, ঈ স্থানে য। ওই য-য়ের পূর্ববর্ণে যুক্তি!

ক) অতি+অন্ত=অত্যন্ত, অভি+উদয়=অভ্যুদয়, অধি+উষিত=অধ্যুষিত, শুদ্ধি+অশুদ্ধি=শুদ্ধ্যশুদ্ধি, পরি+অবেক্ষণ=পর্যবেক্ষণ, পরি+আপ্ত =পর্যাপ্ত, পরি+উদস্ত =পর্যুদস্ত, পরি+আলোচনা =পর্যালোচনা, পরি+আয় =পর্যায়, নদী+অম্বু =নদ্যম্বু।

- উ, ঊ + উ, ঊ ছাড়া অন্য বর্ণ=উ স্থানে ব্ (অন্তঃস্থ)। ওই ব-য়ের পূর্ববর্ণে যুক্তি।

সু+অল্প=স্বল্প, সু+অচ্ছ=স্বচ্ছ, পশু+অধম=পশ্বধম, সু+আগত=স্বাগত, অনু+ইত=অন্বিত, বহু+আরম্ভ=বহ্বারম্ভ, বধূ+আগম=বধ্বাগম।

- ঋ+অ=র, পিতৃ+অনুমতি=পিত্রনুমতি, ঋ+আ=রা, পিতৃ+আলয়=পিত্রালয়, পিতৃ+ইচ্ছা=পিত্রিচ্ছা।

এই সব সন্ধিকে আমরা যথাক্রমে য-সন্ধি, ব-সন্ধি ও র-সন্ধি (ঋ > র্) বলতে পারি।

- একারের পর স্বরবর্ণ থাকলে এ-কার স্থানে অয্ হয়।

বে+অন=বয়ন (বে > বয্+অন)

শে+অন=শয়ন (শে > শয্+অন)

নে+অন=নয়ন (নে > নয্+অন)

- ঐ এর পর স্বরবর্ণ থাকলে ঐ-কারের স্থানে 'আয্' হয়।

নৈ+অক=নায়ক (নৈ > নায্+অক)

গৈ+অক=গায়ক (গৈ > গায্+অক)

- ও-কারের পর স্বরবর্ণ থাকলে ও স্থানে অব্ হয়।

পো+অন=পবন (পো > পব্+অন)

ভো+অন=ভবন (ভো > ভব্+অন)

গো+আদি=গবাদি (গো > গব্+আদি)

- ঔ-কারের পর স্বরবর্ণ থাকলে ঔ-কারের স্থানে আব্ হয়।

পৌ+অক=পাবক (পৌ > পাব্+অক)

নৌ+ইক=নাবিক (নৌ > নাব্+ইক)

ভৌ+উক=ভাবুক (ভৌ > ভাব্+উক)

এই সব সূত্রে এ > অয্, ঐ > আয্, ও > অব্, ঔ > আব্ হচ্ছে, তাই মনে রাখার ফর্মুলা হতে পারে **'অয্-আয্-অব্-আব্'**, পাণিনির সূত্রটিতেও আছে এই ইঙ্গিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশেষ কথা

যে-সব নিয়মের কথা আমরা আলোচনা করলাম তা শুদ্ধ বা তৎসম শব্দ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, খাঁটি বাংলা বা বিদেশি শব্দ সম্বন্ধে নয়। কর্তা যদি ভৃত্যকে বলেন—'ওরে, কচ্বাদা আনতে ভুলিস্ নে' ভৃত্যটি ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে প্রভুর দিকে তাকিয়ে থাকবে। প্রভু যে কচু+আলু+আদায় সন্ধি করলেন তা তো তার বোঝার কথা নয়।

এই চলতি বাংলা শব্দের অনেক সন্ধি-কৌতুক চালু আছে। একজন বলল, 'ও পানে খুব আসক্ত।' আর একজনের সংযোজন, হ্যাঁ, একটু বেশ্যাসক্ত। (বেশি+আসক্ত)।

সে ভার্যাপদে পতিত হয়ে বলল, মা আমায় রক্ষা করো—সমাধান করো। এ হল বরযাত্রী ঠকানো প্রশ্ন। সমাধান ভারি+আপদে=ভার্যাপদে।

এই প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায়ের কৌতুক ছড়া স্মরণীয় :

কে আছে রে জলদি করে চান্তে বল্,
নিত্য বলে ফুর্তি করে চাসছে, (চা+আনতে=চান্তে৷ চা+আসছে=চাসছে৷)

১১.৩ ■ স্বরসন্ধির ক্ষেত্রে কিছু নিয়মবহির্ভূত সন্ধি

কুল+অটা=কুলটা (হওয়া উচিত কুলাটা), সার+অঙ্গ=সারঙ্গ (হওয়া উচিত সারাঙ্গ), প্র+ঊঢ়=প্রৌঢ় (হওয়া উচিত প্রোঢ়), অক্ষ+ঊহিণী=অক্ষৌহিণী (হওয়া উচিত অক্ষোহিণী), শুদ্ধ+ওদন=শুদ্ধোদন (হওয়া উচিত শুদ্ধৌদন), প্র+এষণ=প্রেষণ (হওয়া উচিত প্রৈষণ), গো+অক্ষ=গবাক্ষ (হওয়া উচিত গবক্ষ), গো+ইন্দ্র=গবেন্দ্র (হওয়া উচিত গবিন্দ্র), বিম্ব+ওষ্ঠ=বিম্বোষ্ঠ, বিম্বৌষ্ঠ (হওয়া উচিত শুধু বিম্বৌষ্ঠ)।

AMARBOI.COM

স্বরসন্ধিগত ভুল

ব্যাতিক্রম, ভূম্যাধিকারী, অনুমত্যানুসারে ব্যাবস্থা, ব্যাবসায়, ব্যাবধান, ব্যাক্তি, ব্যাক্ত, ব্যাষ্টি, ব্যাঞ্জন, ব্যাঞ্জনা, ব্যাভিচার, ব্যাস্ত, ব্যাতিহার, ব্যাথা—এ-সব বানান প্রায়ই চোখে পড়ে। শুদ্ধ পদগুলি যথাক্রমে—ব্যতিক্রম, ভূম্যধিকারী, অনুমত্যনুসারে ব্যবস্থা, ব্যবসায়, ব্যবধান, ব্যক্তি, ব্যক্ত, ব্যষ্টি, ব্যঞ্জন, ব্যঞ্জনা, ব্যভিচার, ব্যস্ত, ব্যতিহার, ব্যথা। কারণ বি+অতিক্রম=ব্যতিক্রম, ভূমি+অধিকারী=ভূম্যধিকারী, বি+অবস্থা=ব্যবস্থা, বি+অবসায়=ব্যবসায়, বি+অক্ত=ব্যক্ত, বি+অষ্টি=ব্যষ্টি, বি+অঞ্জন=ব্যঞ্জন, বি+অঞ্জনা=ব্যঞ্জনা, বি+অভিচার=ব্যভিচার, বি+অস্ত=ব্যস্ত, বি+অতিহার=ব্যতিহার। এখানে দ্বিতীয় পদটি 'অ', তাই 'বি' উপসর্গের সঙ্গে যুক্ত হলে তা হবে 'ব্য', 'ব্যা' নয়। আর 'ব্যথা' শব্দটিতে ধাতুটি √ব্যথ্, √ব্যাথ্ নয়, তাই √ব্যথ্+অ+আ=ব্যথা।

১১.৪ ■ ব্যঞ্জনসন্ধি

ব্যঞ্জনে ব্যঞ্জনে বা ব্যঞ্জনে স্বরে যে মিলন তাকে আমরা ব্যঞ্জন সন্ধি বলি। ব্যঞ্জনসন্ধি আসলে ধ্বনি পরিবর্তনের ধারাগুলির অন্তর্গত। যথাস্থানে তা উল্লিখিত হবে। ব্যঞ্জনসন্ধিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি আমরা :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক) ব্যঞ্জনে ব্যঞ্জনে সন্ধি, খ) ব্যঞ্জনে স্বরে সন্ধি, গ) স্বরে ব্যঞ্জনে সন্ধি।

ব্যঞ্জনে ব্যঞ্জনে সন্ধি

সূত্র ১ : যদি চ্ বা ছ্-এর পরে থাকে তা হলে ত্ বা দ্-এর স্থানে চ্ হয়।

ক) ত্+চ=চ্চ

চলৎ+চিত্র=চলচ্চিত্র (চলৎ > চলচ্+চিত্র)

সৎ+চিন্তা=সচ্চিন্তা (সৎ > সচ্+চিন্তা)

শরৎ+চন্দ্র=শরচ্চন্দ্র (শরৎ > শরচ্+চন্দ্র)

শরৎকালীন চন্দ্র অর্থে শরচ্চন্দ্র, কিন্তু নামের বেলায় আমরা সন্ধি না-ও করতে পারি—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

খ) দ্+চ=চ্চ

উদ্+চারণ=উচ্চারণ

তদ্+চিত্র=তচ্চিত্র

গ) ত্+ছ্=চ্ছ

চলৎ+ছবি=চলচ্ছবি

ঘ) দ্+ছ্=চ্ছ

উদ্+ছিন্ন=উচ্ছিন্ন

উদ্+ছেদ=উচ্ছেদ

এই সব উদাহরণে যে **সমীকরণ** ঘটেছে তা আমরা বুঝতেই পারছি।

সূত্র ২ : যদি জ্ ঝ ঝ্ পরে থাকে তা হলে ত্ বা দ্ স্থানে জ হয়।

ক) ত্+জ=জ্জ

যাবৎ+জীবন=যাবজ্জীবন

সৎ+জন=সজ্জন

কৎ+জল=কজ্জল

[কু স্থানে কৎ। কজ্জলের বিকল্প বানান কজ্জ্বল, সেক্ষেত্রে কৎ+জ্বল]

খ) দ্+জ=জ্জ

তদ্+জন্য=তজ্জন্য

উদ্+জ্বল=উজ্জ্বল

গ) দ্+ঝ=জ্ঝ

বিপদ্+ঝঞ্ঝা=বিপজ্ঝঞ্ঝা

সমীকরণ এই সূত্রেও লক্ষণীয়।

সূত্র ৩ : যদি পদের অন্তস্থিত ত্ বা দ্-এর পর তালব্য শ থাকে তা হলে ত্-দ্ স্থানে চ্ এবং শ স্থানে ছ হয়।

ক) ত্+শ=চ্ছ

চলৎ+শক্তি=চলচ্ছক্তি

খ) দ্+শ=চ্ছ

উদ্+শিষ্ট=উচ্ছিষ্ট

উদ্+শ্বাস=উচ্ছ্বাস

মৃদ্+শকটিকা=মৃচ্ছকটিকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সূত্রে অন্যোন্য সমীকরণ ঘটেছে।

সূত্র ৪ : যদি পদের অন্তে স্থিত ত্-দ্-এর পর হ্ থাকে তা হলে ত্-দ্ স্থানে দ্ এবং হ স্থানে ধ্ হয়।

ক) ত্+হ্=দ্ধ
মহৎ+হিম=মহদ্ধিম

খ) দ্+হ্=দ্ধ
তদ্+হিত=তদ্ধিত
উদ্+হত=উদ্ধত
এই সূত্রটিও অন্যোন্য সমীকরণের উদাহরণ।

সূত্র ৫ : চ বর্গের পর ন্ থাকলে ন্-স্থানে ঞ্ হয়।

ক) চ্+ন=চ্ঞ
যাচ্+না=যাচ্ঞা
যজ্+ন=যজ্ঞ
রাজ্+নী=রাজ্ঞী

সূত্র ৬ : ট্-ঠ্ পরে থাকলে ত্-দ্ স্থানে ট্ হয়।
মহৎ+টঙ্কার=মহট্টঙ্কার, তদ্+টীকা=তট্টীকা।

সূত্র ৭ : যদি ড-ঢ পরে থাকে তা হলে ত্-দ্ স্থানে ড্ হয়।

ক) মহৎ+ডঙ্কা=মহড্ডঙ্কা
খ) উদ্+ডীন=উড্ডীন
গ) মহৎ+ঢাল=মহড্ঢাল
ঘ) এতদ্+ঢক্কা=এতড্ঢক্কা

৬ ও ৭ নং সূত্রের শব্দগুলির মধ্যে এক উড্ডীন ছাড়া বাংলায় অন্য শব্দগুলির ব্যবহার নেই বলাই বাহুল্য, ব্যবহার হলেও হয়তো কোনও কৌতুক রচনায় হতে পারে। এই দুটি নিয়মেই সমীকরণ-প্রক্রিয়া লক্ষণীয়।

সূত্র ৮ : যদি ল্ পরে থাকে তা হলে ত্-দ্ স্থানে ল্ হয়।

ক) বিদ্যুৎ+লেখা=বিদ্যুল্লেখা
খ) উদ্+লেখ=উল্লেখ
উদ্+লিখিত=উল্লিখিত [সমীকরণ]

সূত্র ৯ : বর্গের প্রথম বর্ণের পর স্বরবর্ণ, যে কোনও বর্গের তৃতীয় বর্ণ অথবা য্-ব্-হ্ থাকলে প্রথম বর্গের স্থানে সেই বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয়। অর্থাৎ ক্ > গ্, চ্ > জ্, ট্ > ড্, ত্ > দ্, প্ > ব্।

ক) ক্+গ=গ্গ
দিক্+গজ=দিগ্গজ, বাক্+জাল=বাগ্জাল, বাক্+দত্তা=বাগ্দত্তা, দিক্+বলয়=দিগ্বলয়, বাক্+যন্ত্র=বাগ্যন্ত্র, দিক্+হস্তী=দিগ্হস্তী।

খ) চ্ > জ্ অচ্+গুণ=অজ্গুণ
গ) ট্ > ড্ ষট্+গুণ=ষড়্গুণ
ঘ) ত্ > দ্ জগৎ+বন্ধু=জগদ্বন্ধু, ভগবৎ+গীতা=ভগবদ্গীতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঙ) প্ > ব্ অপ্+জ=অব্জ

এ সূত্রের উল্লিখিত বর্গের প্রথমবর্ণের পর স্বরবর্ণের উদাহরণ ব্যঞ্জনে-স্বরে সন্ধির মধ্যে দেওয়া হয়েছে। এই সূত্রের ক থেকে ঙ পর্যন্ত উদাহরণ ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে **ঘোষীভবনের** উদাহরণ, অর্থাৎ অঘোষবর্ণের ঘোষবর্ণে পরিণতি।

সূত্র ১০ : ন্ কিংবা ম্ পরে থাকলে পূর্বপদের ক্ স্থানে ঙ, ট্ স্থানে ণ্, দ্ স্থানে ন্ এবং প্ স্থানে ম্ হয়। বিকল্পে যথাক্রমে গ, ড, দ্ ও ব্ হয়।

ক) দিক্+মণ্ডল=দিঙ্‌মণ্ডল (ক্ > ঙ্), দিগ্‌মণ্ডল (ক্ > গ্)

খ) ষট্+মাস=ষণ্মাস (ট্ > ণ্), ষড়্মাস (ট্ > ড়্)

গ) জগৎ+নাথ= জগন্নাথ জগদ্‌নাথ

ঘ) অপ্+ময়=অম্ময় (প্ > ম্), অব্‌ময় (প্ > ব্)

এগুলি **ঘোষীভবনের** উদাহরণ।

সূত্র ১১ : দ্-ধ্-এর পর চ-বর্গ ও ট্ বর্গ ভিন্ন বর্গের ১ম বা ২য় বর্ণ কিংবা স্ থাকলে দ্-ধ্ স্থানে ত্ হয়।

বিপদ্+কাল=বিপৎকাল, মৃদ্+পাত্র=মৃৎপাত্র, উদ্+সর্গ=উৎসর্গ, এতদ্+সম্বে=এতৎসম্বে, ক্ষুধ্+পিপাসা=ক্ষুৎপিপাসা।

এগুলি **অঘোষীভবনের** উদাহরণ।

সূত্র ১২ : ক-খ-গ-ঘ পরে থাকলে পূর্বপদের ম-স্থানে 'ং' বা 'ঙ্' হয়। কিম্+কর=কিংকর, কিঙ্কর, অহম্+কার=অহংকার, অহঙ্কার, সম্+খ্যা=সংখ্যা, সঙ্খ্যা, সম্+গীত=সংগীত, সঙ্গীত, সম্+ঘ=সংঘ, সঙ্ঘ। এখন প্রথমটির ব্যবহারই বেশি।

AMARBOI.COM

সূত্র ১৩ : চ্ থেকে ম্ পর্যন্ত কোনও বর্ণ পরে থাকলে পূর্বপদের ম্-স্থানে পরবর্তী বর্গীয় বর্ণটির পঞ্চম বর্ণ হয়। সম্+চয়=সঞ্চয়, সম্+জয়=সঞ্জয়, কিম্+তু=কিন্তু, সম্+ধি=সন্ধি, কিম্+নর=কিন্নর।

সূত্র ১৪ : অন্তঃস্থ বর্ণ (য-র-ল-ব) ও উষ্মবর্ণ (শ স হ) পরে থাকলে পূর্বপদের ম্ স্থানে ং হয়। সম্+যোগ=সংযোগ, সম্+রক্ষণ=সংরক্ষণ, সম্+লগ্ন=সংলগ্ন, সম্+বাদ=সংবাদ। কিন্তু সম্+রাজ=সম্রাজ, সংরাজ নয়।

সূত্র ১৫ : মূর্ধন্য 'ষ'-কারের পর ত স্থানে ট এবং থ স্থানে ঠ হয়। তুষ্+ত=তুষ্ট, বৃষ্+তি=বৃষ্টি, ষষ্+থ=ষষ্ঠ।

সূত্র ১৬ : উদ্ উপসর্গের পর স্থা ধাতু থেকে জাত স্থান, স্থিত, স্থিতি, স্থাপন ইত্যাদি শব্দ থাকলে উদ্ উপসর্গের দ্ স্থানে ত্ এবং স্থা ধাতুর স্ লোপ হয়। উদ্+স্থান=উত্থান, উদ্+স্থিত=উত্থিত, উদ্+স্থিতি=উত্থিতি, উদ্+স্থাপন=উত্থাপন। এগুলি **ধ্বনিলোপের** উদাহরণ।

সূত্র ১৭ : ম্-এর পর কৃ ধাতু নিষ্পন্ন কৃত, কার, করণ, কৃতি ইত্যাদি শব্দ থাকলে ম্ স্থানে ং হয়, এবং স্ আগম হয়। সম্+কৃত=সংস্কৃত, সম্+কার=সংস্কার, সম্+করণ=সংস্করণ, সম্+কৃতি=সংস্কৃতি। [**ধ্বন্যাগম**]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূত্র ১৮ : উষ্মবর্ণ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তে স্থিত ন্ ং-এ পরিবর্তিত হয়। হিন্+সা=হিংসা, দন্+শন=দংশন, সিন্+হ=সিংহ।

ব্যঞ্জনবর্ণে স্বরবর্ণে সন্ধি

সূত্র ১৯ : বর্গের প্রথম বর্ণের পর স্বরবর্ণ থাকলে প্রথম বর্ণ স্থানে সেই বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয়। পরের স্বর ওই তৃতীয় বর্ণে যুক্ত হয়। দিক্+অন্ত=দিগন্ত, বাক্+আড়ম্বর=বাগাড়ম্বর, বাক্+ঈশ্বরী=বাগীশ্বরী, ণিচ্+অন্ত=ণিজন্ত, ষট্+অঙ্গ=ষড়ঙ্গ, ষট্+আনন=ষড়ানন, সৎ+ইচ্ছা=সদিচ্ছা, জগৎ+ঈশ=জগদীশ, অপ্+অগ্নি=অবগ্নি, অপ্+ইন্ধন=অবিন্ধন। **[পূর্ববর্ণের ঘোষীভবন]**

স্বরবর্ণে ব্যঞ্জনবর্ণে সন্ধি

সূত্র ২০ : ক) স্বরবর্ণের পর ছ থাকলে স্বরবর্ণের পরে তার আগে চ্ আগম হয়। প্র+ছদ=প্রচ্ছদ (প্রচ্ছদ=প্রচ্ছদ), পূর্ণ+ছেদ=পূর্ণচ্ছেদ, অ+ছ=অচ্ছ, স্ব+ছন্দ=স্বচ্ছন্দ, আ+ছন্ন=আচ্ছন্ন, পরিচ্ছদ=পরি+ছদ, পরি+ছন্ন=পরিচ্ছন্ন, তরু+ছায়া=তরুচ্ছায়া, বট+ছায়া=বটচ্ছায়া, রবি+ছবি=রবিচ্ছবি। **[ধ্বন্যাগম]**

খ) আ ব্যতীত অন্য দীর্ঘস্বরের পর বিকল্পে চ্ আগম হয়। নদী+ছবি=নদীচ্ছবি, নদীছবি, গায়ত্রী+ছন্দ=গায়ত্রীচ্ছন্দ, গায়ত্রীছন্দ।

১১.৫ ■ ব্যঞ্জনসন্ধির ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত সন্ধি

তদ্+কর=তস্কর (হওয়া উচিত তৎকর), পতৎ+অঞ্জলি=পতঞ্জলি (হওয়া উচিত পতদঞ্জলি), বন+পতি=বনস্পতি (স্ আগম), পর+পর=পরস্পর (স্ আগম), আ+পদ=আস্পদ (স্ আগম), গো+পদ=গোষ্পদ (স্ আগম), হরি+চন্দ্র=হরিশ্চন্দ্র (স্ আগম), বৃহৎ+পতি=বৃহস্পতি (হওয়া উচিত বৃহৎপতি), বাক্+ঈশ্বরী=বাগেশ্বরী (হওয়া উচিত বাগীশ্বরী)।

১১.৬ ■ বিসর্গ সন্ধি

সূত্র ১ : স্‌জাতবিসর্গ যুক্ত 'অ'-এর পর 'অ' থাকলে আগের অ-কার ও বিসর্গ মিলে ও-কার হয় এবং ওই ও-কার আগের বর্ণে যুক্ত হয় এবং 'অ' লোপ পায়। ততঃ+অধিক=ততোধিক (সংস্কৃতে লুপ্ত অকারের একটি চিহ্ন রাখা হত—ততোঽধিক। বাংলায় এই চিহ্ন পরিত্যক্ত।) যশঃ+অভিলাষ=যশোভিলাষ, মনঃ+অভীষ্ট=মনোভীষ্ট (কৈকেয়ীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ এত দিনে : কৃত্তিবাস)

সূত্র ২ : স্‌জাত বিসর্গের 'অ'কারের পর অ-ছাড়া অন্য কোনও স্বর থাকলে বিসর্গ লোপ পায়, অন্য কোনও রদবদল হয় না। অতঃ+এব=অতএব, শিরঃ+উপরি=শিরউপরি। [বাংলা সন্ধিতে আবার সন্ধি করে 'শিরোপরি']

সূত্র ৩ : র্‌-জাত বিসর্গ যুক্ত স্বরবর্ণের পর স্বরবর্ণ থাকলে বিসর্গ স্থানে 'র্' পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। নিঃ+অন্ন=নিরন্ন (ঃ > র্), প্রাতঃ+উত্থান=প্রাতরুত্থান,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্যোতিঃ+ইন্দ্র=জ্যোতিরিন্দ্র, জ্যোতিঃ+ইঙ্গন=জ্যোতিরিঙ্গন, পুনঃ+রুক্তি=পুনরুক্তি, পুনঃ+আগমন=পুনরাগমন, পুনঃ+উত্থান=পুনরুত্থান, দুঃ+অন্ত=দুরন্ত, দুঃ+অবস্থা=দুরবস্থা, প্রাতঃ+আশ=প্রাতরাশ। [আ. বা.-তে প্রাতঃরাশ লেখা হয়েছে ৫.৬.৯৪]

সূত্র ৪ : স্-জাত বিসর্গযুক্ত অ-কারের পর বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ, অন্তঃস্থ বর্ণ বা হ্ থাকলে 'অ'-কারে ও স্-জাত বিসর্গ মিলে ও-কার হয়। মনঃ+ভাব=মনোভাব, সদ্যঃ+জাত=সদ্যোজাত, পুরঃ+হিত=পুরোহিত, শিরঃ+ধার্য=শিরোধার্য, যশঃ+লিপ্সা=যশোলিপ্সা, সরঃ+বর=সরোবর, তেজঃ+রাশি=তেজোরাশি, পয়ঃ+ধর=পয়োধর।

সূত্র ৫ : স্-জাত বা র্-জাত যে-কোনও বিসর্গের পর চ্ কিংবা ছ থাকলে ওই বিসর্গের স্থানে তালব্য শ হয়, ত থাকলে স্ হয়, ট্ থাকলে ষ্ হয়। নভঃ+চর=নভশ্চর, শিরঃ+ছেদ=শিরশ্ছেদ, নিঃ+ছিদ্র=নিশ্ছিদ্র, নভঃ+তল=নভস্তল, ইতঃ+ততঃ=ইতস্ততঃ, দুঃ+তর=দুস্তর, ধনুঃ+টঙ্কার=ধনুষ্টংকার।

সূত্র ৬ : অ-কার কিংবা আ-কার ভিন্ন অন্য স্বরের পরবর্তী যে-কোনও বিসর্গের পর বর্ণের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ কিংবা অন্তঃস্থ বর্ণ থাকলে বিসর্গ স্থানে র্ হয়। ওই র্ রেফ হয়ে পরবর্ণে যুক্ত হয়। নিঃ+গমন=নির্গমন, নিঃ+জন=নির্জন, আবিঃ+ভাব=আবির্ভাব, জ্যোতিঃ+ময়=জ্যোতির্ময়, আশীঃ+বাদ=আশীর্বাদ, ধনুঃ+ভঙ্গ=ধনুর্ভঙ্গ।

সূত্র ৭ : অ-কারের পরবর্তী র্-জাত বিসর্গের পর বর্ণের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ, অন্তঃস্থ বর্ণ কিংবা হ থাকলে ওই বিসর্গ স্থানে র্ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। অন্তঃ+গত=অন্তর্গত, অন্তঃ+ঘাত=অন্তর্ঘাত, অন্তঃ+নিহিত=অন্তর্নিহিত, প্রাতঃ+ভ্রমণ=প্রাতর্ভ্রমণ, পুনঃ+যাত্রা=পুনর্যাত্রা, পুনঃ+বিবেচনা=পুনর্বিবেচনা।

সূত্র ৮ : অ, ই এবং উ-এর পরবর্তী বিসর্গ স্থানে র্ হলে এবং তার পর র থাকলে সেই র-এর লোপ হয় এবং পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয়। (অ > আ, ই >ঈ, উ > ঊ) স্বঃ+রাজ্য=স্বারাজ্য (বিসর্গ লোপ, স্ব >স্বা), নিঃ+রব=নীরব, নিঃ+রস=নীরস, নিঃ+রক্ত=নীরক্ত (নীরক্ত দেহে হাড় দিয়ে রণ—নজরুল), জ্যোতিঃ+রূপ=জ্যোতীরূপ, চক্ষুঃ+রোগ=চক্ষূরোগ। [**ধ্বনিলোপ ও ক্ষতিপূরক দীর্ঘায়ণ**]

বাংলায় স্বারাজ্য (=স্বর্গরাজ্য) শব্দটির প্রয়োগ নেই। জ্যোতীরূপ আর চক্ষূরোগের দীর্ঘ ঈ ও দীর্ঘ ঊ লোপও বাংলায় প্রায় অনিবার্য।

সূত্র ৯ : নিঃ, আবিঃ, দুঃ, চতুঃ ও বহিঃ শব্দের পর ক, খ, প, ফ থাকলে বিসর্গের স্থানে ষ হয়। নিঃ+কাম=নিষ্কাম (ঃ > ষ্), নিঃ+পত্র=নিষ্পত্র, নিঃ+ফল=নিষ্ফল, আবিঃ+কারি=আবিষ্কার, দুঃ+কার্য=দুষ্কার্য, দুঃ+পাচ্য=দুষ্পাচ্য, চতুঃ+কোণ=চতুষ্কোণ, বহিঃ+কার=বহিষ্কার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূত্র ১০ : বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে নমঃ, তিরঃ, পুরঃ, শ্রেয়ঃ, মনঃ, অয়ঃ ইত্যাদি শব্দের বিসর্গ স্থানে স্ হয়। নমঃ+কার=নমস্কার, তিরঃ+কার=তিরস্কার, পুরঃ+কার=পুরস্কার, শ্রেয়ঃ+কর=শ্রেয়স্কর, মনঃ+কামনা=মনস্কামনা, অয়ঃ+কান্ত=অয়স্কান্ত। তেজঃ+কর=তেজস্কর, তেজঃ+ক্রিয়া=তেজস্ক্রিয়া

বিসর্গের অক্ষুণ্ণতা

সূত্র ১১ : বিসর্গের পর ক, খ, প, ফ, ষ থাকলে বহু ক্ষেত্রে বিসর্গ অক্ষুণ্ণ থাকে। প্রাতঃকৃত্য, মনঃকষ্ট, মনঃক্ষুণ্ণ, মনঃসাধ, মনঃপূত, নিঃশঙ্ক, নিঃশেষ ইত্যাদি।

বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র 'ভ্রাতুষ্কন্যা' ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এই সূত্র অনুসারে তা ভ্রাতুঃকন্যা হওয়া উচিত। বাংলায় ভ্রাতুঃকন্যার চেয়ে 'ভ্রাতুষ্পুত্রী'ই শুনতে ভাল। তাতে উভয়দিক রক্ষিত হয়।

'অন্তর্কোন্দিল ইহার কারণ হইতে পারে' (আ. বা. ৩১.৫.৯৪)। কোনওমতেই এ ধরনের প্রয়োগ সমর্থনীয় নয়।

১১.৭ ■ বিসর্গ সন্ধির ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম

গীঃ+পতি=গীষ্পতি, গীর্পতি, অহঃ+পতি=অহর্পতি, অহন্+অহন্=অহরহঃ, অহন্+নিশ=অহর্নিশ, অহন্+রাত্র=অহোরাত্র।

এখানে অহন্ এর জায়গায় অহঃ হয়েছে (ন্ > র্)। বাংলায় সরাসরি অহঃ+অহঃ=অহরহঃ, অহঃ+রাত্র=অহোরাত্র এইভাবেই সন্ধি বিচ্ছেদ করা হয়। এতে দোষ না ধরাই ভাল।

AMARBOI.COM

বিসর্গ সন্ধির ক্ষেত্রে লক্ষণীয়

ক. বিসর্গ কোথাও লুপ্ত হচ্ছে (অতঃ+এব), খ. বিসর্গ লুপ্ত হবার পর পূর্ববর্তী অ-স্বর 'ও' হচ্ছে (মনঃ+ভাব=মনোভাব), গ. বিসর্গ কোথাও 'র্' (পুনঃ+জীবন=পুনর্জীবন), ঘ. কোথাও বা স্ (মনঃ+কামনা=মনস্কামনা), ঙ. কোথাও বা শ্ (মনঃ+চক্ষুঃ=মনশ্চক্ষুঃ), চ. কোথাও বা ষ্ (দুঃ+কর=দুষ্কর), ছ. কোথাও তা লুপ্ত হয়ে পূর্বস্বরকে দীর্ঘ করে দিয়ে যাচ্ছে (নিঃ+রব=নীরব), জ. কোথাও বিসর্গ অক্ষুণ্ণ থাকছে (মনঃ+ক্ষুণ্ণ=মনঃক্ষুণ্ণ)।

১১.৮ ■ খাঁটি বাংলা মৌখিক সন্ধি

সূত্র ১ : ঘোষ ও অঘোষ ভেদে ভিন্ন শ্রেণীর দুটি ব্যঞ্জন পাশাপাশি থাকলে, দ্বিতীয়টি যদি ঘোষবর্ণ হয়, প্রথমটি (অঘোষ হলে), উচ্চারণে ঘোষবর্ণ হয়। এক+ঘা=অ্যাগ্ঘা (ক্ > ঘ্), মুখ+ধোয়া=মুগ্ধোয়া (খ্ > গ্), কাঁচ+ঘর=কাঁজ্ঘর (চ্ > জ্), বট+গাছ=বড়্গাছ (ট > ড়্), রাত+দিন=রাদ্দিন (ত্ > দ্)

সূত্র ২ : আগে ঘোষবর্ণ থাকলে, পরেরটি অঘোষ হলে আগেরটি অঘোষে পরিণত হয়—রাগ+করা=রাক্করা (গ্ > ক্), কাজ+করা=কাচ্করা (জ্ > চ্), সব+পাওয়া=সপ্পাওয়া (ব > প্)।

সূত্র ৩ : চ বর্গের সঙ্গে শ্ ষ্ স্ থাকলে চ পরবর্তী শ বা স-ধ্বনিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবর্তিত হয়। পাঁচ+শ=পাঁশ্‌শো (চ্‌ > শ্‌), পাঁচ+সিকা=পাঁশ্‌সিকা, পাঁচ্‌+সের=পাঁস্‌সের।

সূত্র ৪ : ত-বর্গের পরে চ-বর্গের ধ্বনি অনেক সময় চ বর্গের সঙ্গে বিকল্পে মিশে যায়। সাত+জন=সাদ্‌জন, সাজ্জন, নাতি > নাত্‌+জামাই=নাদ্‌জামাই, নাজ্জামাই, বাদ+যাবে=বাজ্জাবে, হাত+ছানি=হাচ্ছানি।

সূত্র ৫ : আগে র্‌ এবং পরে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে র-কার পরের ব্যঞ্জনের সমরূপ হয়। তর্ক > তক্ক, কর্তা > কত্তা, পার ত >পাত্তো, ধর্ম > ধম্ম, চার লাখ > চাল্লাখ, আলুর দম > আলুদ্দম, চারটি > চাট্টি, ঘোড়ার ডিম > ঘোড়াড্ডিম, বাপের জন্মে > বাপেজ্জম্মে।

সূত্র ৬ : ত্‌-এর পর স্‌ থাকলে ত্‌-এর স্থানে চ্‌ এবং থ-এর স্থানে ছ হয়। বৎসর > বচ্ছর (ত্‌ > চ্‌, স্‌ > ছ্‌), মহোৎসব > মোৎসব=মোচ্ছব। অন্যোন্যসমীকরণের উদাহরণ :

সূত্র ৭ : স্বরের পরে চ্‌, ছ থাকলে মধ্যে চ্‌ আগম হয়। দুই > দু+চার=দুচ্চার, যা+চলে=যাচ্চলে, জুয়ো > জো+চোর=জোচ্চর, ব্যাটা+ছেলে=ব্যাটাচ্ছেলে, সাড়ে+ছয়ানা=সাড়েচ্ছয়ানা, হত+ছাড়া=হতচ্ছাড়া।

সূত্র ৮ : পাশাপাশি দুটি স্বর থাকলে আগের বা পরের কোনও একটি স্বর লুপ্ত হয়। খানি+এক=খানেক (ই-লোপ), খানি+এক=খানিক (এ-লোপ), মেয়ে+আলি=মেয়েলি (আ-লোপ), গুটি+এক=গুটিক (এ-লোপ), যা+ইচ্ছে=যাচ্ছে (এ-লোপ)।

তুলনীয় পালি স্বরসন্ধি : যেন+ইসে=যেন'সে (ই-লোপ), সুতা+এব=সুতা'ব (এ-লোপ), কুতো+এথ=কুতেথ (ও-লোপ)।

AMARBOI.COM

সূত্র ৯ : স্বরবর্ণের পর ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে অনেক সময় স্বরবর্ণ লুপ্ত হয়। ধ্বনি পরিবর্তনের ধারায় একে **সম্প্রকর্ষ** বলে। এখানে **দ্বিমাত্রিকতার** প্রভাবও বর্তমান। ঘোড়া+দৌড়=ঘোড়্‌দৌড়, কাঁচা+কলা=কাঁচ্‌কলা, ছোট+কাকা=ছোট্‌কাকা > ছোট্‌কা, বড়+দাদা=বড়্‌দাদা > বড়্‌দা, পানী+কৌড়ি=পান্‌কৌড়ি, বেশি+কম=বেশকম, বোকা+চন্দর=বোক্‌চন্দর।

১১.৯ ■ প্রসঙ্গত হিন্দির নিজস্ব সন্ধির কয়েকটি প্রবণতা বাংলা সন্ধির সঙ্গে তুলনীয়

ঘোষীভবন : পোত+দার=পোদ্দার
মহাপ্রাণীভবন : জব+হী=জভী, তব+হী=তভী
হ্রস্বীকরণ বা স্বরলোপ : লড়কা+পন=লড়কপন
ব্যঞ্জনলোপ : দুধ+হাঁড়ী=দুধাঁড়ী
স্বরব্যঞ্জনলোপ : ওয়্‌হাঁ+হী=ওয়্‌হীঁ,
দ্বিমাত্রিকতা : হঁসী+মুখ=হঁসমুখ
য়-শ্রুতি : কবি+ওঁ=কবিয়োঁ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১.১০ ■ বাংলায় সন্ধির ব্যবহার

সংস্কৃতে বাক্যে পাশাপাশি আছে এমন যে-কোনও পদের সঙ্গেই সন্ধি হতে পারে। যেমন : অহম্ অপি এতৎ জানামি=অহমপ্যেতজ্জানামি। পদে পদে সন্ধির অবকাশ থাকলেই যে সন্ধি করতে হবে এমন অবশ্য নয়, আলোচ্য ক্ষেত্রে সংস্কৃতে অংশত সন্ধি করা চলে : অহমপি এতজ্জানামি। কিন্তু একই পদের মধ্যে সন্ধির অবসর থাকলে সংস্কৃতে সন্ধি করতেই হবে। যেমন : সূর্য+আলোকঃ=সূর্যালোকঃ, সপ্ত+উদধিঃ=সপ্তোদধিঃ। কিন্তু বাংলায় সূর্য-আলোক, সপ্ত-উদধি এভাবে সন্ধিবিযুক্ত পাঠও রাখা চলে, ইচ্ছে করলে সন্ধি করাও চলে। যেমন : দেব-আকাঙ্ক্ষিত ভানু (মধুসূদন)। কে পারে হিংসিতে রঘুবংশ-অবতংসে (মধুসূদন)। মোদের মৃত্যু লেখে মোদের জীবন-ইতিহাস (নজরুল)। শরৎ-আলোর আঁচল টুটে (রবীন্দ্রনাথ)। আবার সন্ধি বজায় রাখার উদাহরণও প্রচুর। নমি আমি কবিগুরু তব পদাম্বুজে। শূন্যপ্রায় দেবাঙ্গন (রবীন্দ্রনাথ)। অস্পষ্ট নক্ষত্রালোকে বাদুড়ের শ্রেণী (যতীন্দ্রনাথ বাগচী)।

১১.১১ ■ বিদেশি শব্দের সঙ্গে সন্ধি

আইনানুসারে, হিসাবাদি, সার্টিফিকেটাদি, গ্যাসালোক, ক্রিকেটাড্ডা পুনর্বহাল ইত্যাদি শব্দ বাংলায় ঠাঁই করে নিয়েছে।

শ্রুতিকটু বা দুরুচ্চার্য হলে আমরা সন্ধি করি না। সন্ধ্যা-আহ্নিক, যথা-অভিরুচি, পিতৃ-আজ্ঞা, পিতৃ-ঋণ, প্রীতি-উপহার, নদী-উপকূল ইত্যাদি।

সন্ধ্যাহ্নিক বা যথাভিরুচি চলতে পারে কিন্তু পিত্রাজ্ঞা, পিতৃণ, স্ত্র্যাচার, প্রীত্যুপহার, নদ্যুপকূল বাংলায় অচল।

বিসর্গ যেখানে 'র্'-এ পরিণত হবে সেখানে সন্ধি না করে 'ঃ' রেখে দেওয়া ঠিক নয়, যেমন আন্তঃদলীয় (আ. বা. ২৯.১২.৯৩) আন্তর্দলীয় লেখাই সমীচীন। তেমনি, প্রাতঃভ্রমণ না লিখে (আ. বা. ২৭.৬.৯৪) 'প্রাতর্ভ্রমণ' লেখাই উচিত।

আমরা শ্রী শ্রীযুক্ত বা শ্রীযুক্তা-কে নামের সঙ্গে সন্ধি করি না, বিযুক্তই রাখি। নাম বোঝাতে শরৎ চন্দ্রও বিযুক্তভাবে লিখি, অবশ্য নামেও শরচ্চন্দ্র প্রচলিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২

ঝোঁক-অন্তর্যতি-সুর

[বাংলা শব্দে শ্বাসাঘাত বা ঝোঁক—শ্বাসপর্ব ও আভ্যন্তর যতি—বাংলা ও ইংরেজি শ্বাসাঘাতের পার্থক্য—বাক্যের সুর]

১২.১ ■ শ্বাসাঘাত বা ঝোঁক

এবারে ধ্বনির একটি বিশিষ্ট দিক আলোচনা করব আমরা। কথা বলতে গিয়ে আমরা একটা ধ্বনির প্রবাহ গড়ে তুলি, অবশ্য সে প্রবাহ হয়তো একটানা নয়, ক্ষণবিচ্ছিন্ন। কোনও কোনও ভাষায় এই উচ্চারিত শব্দধ্বনিতে স্বরের একটা বিশেষ ঝোঁক পড়ে, একে আমরা 'শ্বাসাঘাত' বা 'বল' বলি, ইংরেজিতে যেমন এই stress বা accent আছে, বাংলাতেও তেমনি আছে। তবে এই দুটি ভাষায় ঝোঁক বা accent-এর তফাত আছে। ইংরেজিতে সাধারণত সহায়ক ক্রিয়া is-am-are বা preposition ও conjunction ছাড়া একাক্ষর noun, adjective এবং মূল verb-এ accent পড়বেই। দ্ব্যক্ষর বা ত্র্যক্ষর শব্দ হলে বিশেষ জায়গায় তার স্থান নির্দিষ্ট হয়ে আছে, বাক্যের যে কোনও জায়গায় তার অবস্থান হোক না কেন, accent ওই নির্দিষ্ট জায়গাতেই পড়বে। যেমন character, accomplish, account এই তিনটি শব্দের মধ্যে প্রথমটিতে প্রথম অক্ষরে, দ্বিতীয়টিতে দ্বিতীয় অক্ষরে এবং তৃতীয়টিতে দ্বিতীয় অক্ষরে accent পড়বে ; বাক্যের মধ্যে যে কোনও জায়গায় এই শব্দগুলি থাকুক না কেন এদের accent-এর কোনও হেরফের হবে না। কিন্তু বাংলায় তা নয়।

১২.২ ■ শ্বাসপর্ব ও আভ্যন্তর যতি

বাংলায় শব্দের শুধু প্রথম অক্ষরেই ঝোঁক পড়ে : যেমন কলকাতা, বাড়ি বাঙালি, সেদিন, যখন। কিন্তু এরা যখন বাক্যে বাঁধা পড়বে তখন এ-ঝোঁক তাদের বজায় না-ও থাকতে পারে। সেদিন যখন সে এসেছিল আমি বাড়ি ছিলাম না। এখানে সেদিনের 'সে'র উপরে ঝোঁক, আর 'আমি'র 'আ'র উপরে ঝোঁক। তা হলে নিয়মটা কী দাঁড়াল ? নিয়মটা হল, একেকটা শ্বাসপর্বের প্রথমে যে অক্ষর শুধু তার ওপরই ঝোঁকটা পড়বে। অর্থের খাতিরে যতটুকু আমরা এক শ্বাসে উচ্চারণ করি তা-ই হল একেকটা শ্বাসপর্ব বা শুধু পর্ব। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের মধ্যে যে ক্ষণবিরতি তাকেই আমরা আভ্যন্তর যতি বা অন্তর্যতি বলি। এবারে আগের বাক্যটিকে ভাগ করে দেখানো যাক : সেদিন যখন সে এসেছিল ✳ আমি বাড়ি ছিলাম না। ✳ চিহ্নটি অন্তর্যতি। এখানে দুটি পর্বের প্রথমটির প্রথম অক্ষরে এবং দ্বিতীয়টির প্রথম অক্ষরে ঝোঁক বা শ্বাসাঘাত পড়েছে।

একটি বড় বাক্য নিই :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে কেউ রেলিং বানিয়ে দেয় না, হরেকরকম সাইনবোর্ড দুদিকের পাহাড়ে সেঁটে দেয় না; বিশেষ সংকীর্ণ সংকট পেরবার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দুদিকের মোট আটকানো হয়।

এই বাক্যটিকে পর্বে ভাগ করলে দাঁড়াবে এই রকম :

এখানে কেউ ✳ রেলিং বানিয়ে দেয় না ✳ হরেকরকম সাইনবোর্ড ✳ দুদিকের পাহাড়ে সেঁটে দেয় না ✳ বিশেষ সংকীর্ণ সংকট পেরবার জন্য ✳ সময় নির্দিষ্ট করে ✳ দুদিকের মোট আটকানো হয়। এখানে ছোট বড় সাত-সাতটি পর্ব। এই পর্বগুলির প্রতিটির অক্ষরে ঝোঁক পড়েছে। পর্ববিভাগে মতান্তর ঘটতে পারে, কিন্তু যে-ভাবেই ভাগ করা হোক না কেন পর্বের প্রথম অক্ষরে জোর দেওয়া বাংলার স্বভাবধর্ম। (১৮)

১২.৩ ■ বাংলা ও ইংরেজি শ্বাসাঘাতের পার্থক্য

বাংলায় শ্বাসাঘাত ও ইংরেজি accent-এর পার্থক্যটা সুনীতিকুমারের কথাতেই বলি : "বাংলায় বাক্যস্থ শ্বাসপর্ব বা অর্থপর্বগুলি যেন একান্নবর্তী পরিবার—মাথার উপর কর্তা, স্বরাঘাতরূপ মর্যাদা তাঁহারই, এবং পরে কতকগুলি অক্ষর বা পদ, স্বরাঘাত বিষয়ক নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বা স্বাধীনতা স্বেচ্ছায় বর্জন করিয়া থাকে। কিংবা যেন কতগুলি রেলগাড়ির সমষ্টি, স্বরাঘাতযুক্ত প্রথম অক্ষর যেন ইঞ্জিন গাড়ি, বাক্যখণ্ডের অন্য অক্ষরগুলিকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে; আর ইংরেজি বাক্য যেন সিপাহীদের কুচ করিয়া হাঁটিয়া যাওয়া, প্রত্যেক প্রধান শব্দের বল বা স্বরাঘাত বন্দুকের উপরে সঙ্গীনের ন্যায় নিজ স্বাতন্ত্র্যে বিদ্যমান, কেও কারো অধীন নহে।" (ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ)

সুনীতিবাবুর রূপক অনুসারে বলা যায়, আগে যে বাক্যটি উদ্ধৃত করেছি তার মধ্যে এ, রে, হ, দু, বি, স, দু, এ এই পর্বগুলির প্রথম অক্ষরগুলো 'যেন যৌথপরিবারের কর্তা বা স্বর-শকটের ইঞ্জিনগাড়ি।

১২.৪ ■ সুর

বাক্যে আর-এক ধরনের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য আছে, তা স্বরের উঁচুনিচু ভাবকে আশ্রয় করে প্রকাশিত। একেই আমরা বলি সুর, ইংরেজিতে একেই বলে pitch accent, 'musical accent বা intonation. ইংরেজি accent শব্দটির মধ্যেও কিন্তু সুরের অর্থটি লুকোনো আছে। সংস্কৃতে এই সুরকে বলে **কাকু**—ভিন্নকণ্ঠধ্বনির্ধীরৈঃ কাকুরিত্যভিধীয়তে। বৈদিক স্বরপ্রক্রিয়ায় উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিনটি সুর উচ্চ-নীচ ভাবের প্রকাশক—ইংরেজি পরিভাষায় বোধ হয় অর্থ সুন্দর ভাবে প্রকাশ পায়—high pitch, low pitch আর combined rise and fall. সামবেদে ঋক্‌গুলি এই ত্রি-স্বর সন্নিবেশে গাওয়া হত। এই প্রক্রিয়ায় অর্থের যোগ এবং গীত-ধর্মের সম্পর্কটি বেশ জটিল। আমরা এই ত্রিস্বর থেকে শুধু এই তাৎপর্যই গ্রহণ করি যে স্বরের ওঠানামার ব্যাপারটি সুপ্রাচীন। আদিবাসীদের বাক্য উচ্চারণেও বিশেষ একটি সুর বা স্বর-ন্যাস আমরা লক্ষ করি। এই সুর-চয়নের ব্যাপারে একেকটি ভাষার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে অন্য ভাষার গরমিল থাকতেই পারে, নানা কারণে। তবে একটা বিষয় বোধ হয় স্পষ্ট—আমাদের ভয়, রাগ, অভিমান ইত্যাদি আবেগ বা প্রশ্ন, বিস্ময়াদি থেকেই এই সুরের তারতম্য ঘটে।

ফুলটি সুন্দর—এই বাক্যে 'সুন্দর'-এর স্বরের যে আন্দোলন তা বেড়ে যায় 'কী সুন্দর ফুলটি' এই বাক্যে। আবার ফুলটি সুন্দর কি না জানতে চেয়ে কেউ যদি প্রশ্ন করে 'ফুলটি কি সুন্দর ?' তা হলে 'সুন্দর'-এর সুরে পরিবর্তন আসে। শিশুরা ভাষা না জেনেও কোন বাক্যে তাকে আদর করা হচ্ছে আর কোন বাক্যে তাকে ধমকানো হচ্ছে তা বোঝে। ও ও ও—মিষ্টি সুরে বললে শিশুটি খুশিই হবে। অনুকরণে 'ও' বলতেও চেষ্টা করবে। কিন্তু ওই 'ও' যদি ধমকের সুরে উচ্চারিত হয় শিশুটি কেঁদে ফেলবে, অথবা ঠোঁট ফোলাবে। শব্দে জোর দেবার ব্যাপারেও সুরের পরিবর্তন হয়। 'দাদু কি খাবে ?' দাদু খাবে কি না জিজ্ঞাসা করলে 'খাবে'র উপর জোর হবে, কিন্তু 'দাদু কী খাবে ?' বললে অর্থাৎ 'কী'-এর ওপর জোর পড়লে অর্থও বদলে যাবে।

এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ কি ও কী দুটি বানান আলাদা ব্যবহার করতেন। আমরাও বানানে এই পার্থক্য বজায় রাখার পক্ষপাতী। বিশেষ জোর দেবার জন্যে অর্থাৎ অর্থগত প্রয়োজনে বিশেষ শব্দের ওপর গুরুত্ব দেবার একটি আশ্চর্য উদাহরণ দিই রবীন্দ্রনাথের 'গুরুবাক্য' থেকে। এখানে ঝোঁক আর সুর একসঙ্গে মিলেছে।

বদনের মনে একটা প্রশ্নের উদয় হয়েছে কাল মশারি ঝাড়তে ঝাড়তে—বিহগরাজ জটায়ু রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে কেন নিহত হলেন ? এ ব্যাপারে বদনের সতীর্থ কার্তিক, খগেন্দ্র, অচ্যুত সবাই গুরুদেবের নিষ্পত্তি শুনতে উদ্‌গ্রীব। গুরুদেব বললেন, প্রথমে দেখতে হবে **রাবণেরই** সঙ্গে যুদ্ধ হয় কেন, তার পরে দেখতে হবে রাবণের সঙ্গে **যুদ্ধই** বা হয় কেন, তারপরে দেখতে হবে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে **জটাউই** বা মরে কেন, সব শেষে দেখতে হবে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে জটাউ **মরেই** বা কেন ?

শিরোমণি মশাইয়ের এই বাক্যের পর, অন্য উদাহরণের বোধ হয় আর প্রয়োজন নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩

ছেদচিহ্ন

[ছেদচিহ্ন বা যতিচিহ্ন—পুরনো ছেদচিহ্ন—সাম্প্রতিক ছেদচিহ্ন ও তার প্রয়োগ—রূপ ও রূপান্তর—অমিত্রাক্ষরে ছেদচিহ্ন—উদ্ধৃতিচিহ্ন প্রসঙ্গে]

১৩.১ ■ যতিচিহ্ন বা ছেদচিহ্ন

আমরা যখন কথা বলি তখন অর্থ অনুসারে আমরা কোথাও অল্প থামি, কোথাও তুলনায় একটু বেশি থামি, কখনও কণ্ঠে প্রশ্ন, বিস্ময়, খেদ ইত্যাদির সুর ফুটিয়ে তুলি। আমাদের এই ক্ষণবিরাম বা নানা সুরের প্রতীক হচ্ছে **ছেদচিহ্ন বা যতিচিহ্ন**। সংস্কৃত যতি বা ছেদ, ইংরেজি punctuation বা আরবি ফারসি তন্‌কিত্‌ ব্যুৎপত্তিগত ভাবে শুধু ক্ষণবিরতিকেই বোঝায়, অর্থের পরিধি বাড়িয়ে তাকে সুর ধরার অর্থে নিয়ে যেতে হয়।

১৩.২ ■ পুরনো ছেদচিহ্ন

AMARBOI.COM

প্রাচীন ভাষাগুলোতে এইসব ছেদচিহ্ন খুব কমই ব্যবহার করা হত। বৈদিক সংস্কৃতে দাঁড়ি আর দুই-দাঁড়িই ছিল একমাত্র ছেদচিহ্ন। বাংলা ছন্দোবদ্ধ লেখায় এই চিহ্নই অনুকরণ করা হয়েছে—প্রথম চরণের শেষে দাঁড়ি, দ্বিতীয় চরণের শেষে দুই-দাঁড়ি। বাংলার পুরনো পুথিতে শব্দগুলোকেও আলাদা করা হত না—সীতাহারাআমিয়েনমণিহারাফণী। পরে যখন শব্দের মধ্যে ফাঁক দেওয়া শুরু হল তখন এই ফাঁকটাই হয়ে উঠল এক ধরনের প্রতীক চিহ্ন।

বাংলা গদ্যের সূচনা হল সাহেবদের প্রয়োজনে, মুদ্রণের সূত্রপাতও হল তাঁদের হাতেই। গদ্য-রচনাকে পাঠযোগ্য করে তুলতে তাঁরা ইংরেজি যতিচিহ্নকে কাজে লাগালেন, এল কমা, সেমিকোলন, ফুল্‌স্টপ ইত্যাদি। পদ্যের বিস্তীর্ণ সমুদ্রে গদ্যের ডাঙা জেগেছে অনেক পরে, তাই এসব চিহ্নের তাৎপর্য বুঝতেও অনেকটা সময় লাগল।

এবারে যে-সব ছেদচিহ্নের সঙ্গে ধ্বনি বা সুরের সম্পর্ক প্রধানত সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক।

১৩.৩ ■ সাম্প্রতিক ছেদচিহ্ন ও তার প্রয়োগ

পাদচ্ছেদ (comma): চিহ্ন (,)।

অল্প বিরাম বোঝাতে এই চিহ্ন। দুই বা ততোধিক পদ, পদগুচ্ছ বা বাক্যাংশে। সে ধন, মান, যশ কিছুই চায় না, চায় ভালবাসা। এই ধরনের শব্দপরম্পরায় কমা-র ব্যবহার কমে যাচ্ছে যেমন—রূপ রস গন্ধ স্পর্শ।

জড় নই, মৃত নই, নই অন্ধকারের খনিজ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ।

শুধু সংকেত হিসেবে :

১. সালের উল্লেখে তারিখযুক্ত মাসের পরে—১৫ই বৈশাখ, ১৩৯০। ১৫ই আগস্ট, ১৯৯৫

২. বড় রাশিতে হাজার, লক্ষ ইত্যাদিকে স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্যে : ২,০৪,০৮,৫৯৬

অর্ধচ্ছেদ (semi-colon): চিহ্ন (;)

পাদচ্ছেদের বিরতির চেয়ে অর্ধচ্ছেদের বিরতি সামান্য একটু বেশি।

এই বালক জন্মাবধি জননী ভিন্ন আপনার কাহাকেও দেখে নাই ; নিয়ত জননীর নিকটেই থাকে ; এই নিমিত্ত নিতান্ত মাতৃবৎসল। (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)

পূর্ণচ্ছেদ (full stop): চিহ্ন (।)

যেখানে একটি পূর্ণবাক্য বা প্রসঙ্গ শেষ হয় সেখানে দাঁড়ি।

'অভাগীর জীবন নাট্যের শেষ অঙ্ক পরিসমাপ্ত হইতে চলিল।' (শরৎচন্দ্র)

'মূঢ় ওরা, ব্যর্থ মনস্কাম।' (কামিনী রায়)

দৃষ্টান্তচ্ছেদ (colon): চিহ্ন (:)

বিষয়ান্তরের অবতারণার জন্যে ! পূর্ব প্রসঙ্গের পরিণতি অথবা তার দৃষ্টান্ত দেখানোর জন্যে এই চিহ্নের ব্যবহার :

'জয়ধ্বনি কিশলয়ে : সম্বর্ধনা জানাবে সকলে।' (সুকান্ত ভট্টাচার্য)

এই সংগঠনের উদ্দেশ্য হল : শান্তি, প্রগতি ও জনকল্যাণ।

পরবর্তী বিষয় উল্লেখে এই কোলনের সঙ্গে 'ড্যাস'-এর ব্যবহার করা হয়। যে কোনও দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও :—

(এর পর দুয়ের অধিক প্রশ্নের সমাবেশ)

প্রশ্নচিহ্ন (note of interrogation): (?)

কোথায় যাচ্ছ ? কতদূরে ?

'হিন্দু না ওরা মুসলিম ? ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন ?' (নজরুল ইসলাম)

সন্দেহ আছে এমন কোনও শব্দের বা অংশের শেষে ব্র্যাকেটের মধ্যে এই চিহ্ন দেওয়া হয়। তিনি ১৭৭২ (?) সালে জন্মগ্রহণ করেন। অবশ্য ধ্বনির সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই।

প্রশ্নটাকে জোরালো করবার জন্যে দ্বৈত প্রশ্নচিহ্নের ব্যবহারও দেখা যায় বিশেষ বিশেষ রচনার বাক্যবন্ধনে : কোথায় গেল ছেলেটি ? কার হাতে গিয়ে পড়ল ?? (একটি গোয়েন্দা কাহিনী)

একটা বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। 'তাকে জিজ্ঞেস করলাম সে কোথায় যাচ্ছে।' এই বাক্যটিতে 'সে কোথায় যাচ্ছে'র পরে যদি কেউ (?) (প্রশ্নচিহ্ন) দেন, তাঁকে বলব : 'কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিস্ময়চিহ্ন (note of exclamation): (!)

বিস্ময়, শোক, ভয়, আনন্দ ইত্যাদি বোঝাতে এই চিহ্নের ব্যবহার হয়।

'মরি মরি ! এই অপূর্ব রূপের প্রস্রবণ আর কবে কে দেখিয়াছে।' (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

কী ভয়ঙ্কর সেই ঝড়ের রাত !

হায় ! বিধবা তার শিবরাত্রির সল্‌তেটিকে ধরে রাখতে পারল না !

সম্বোধনেও এই চিহ্নের প্রয়োগ হয়। 'কাস্তেটা ধার দিয়ো, বন্ধু !' (দিনেশ দাস)

সবিস্ময় প্রশ্নের জায়গায় প্রশ্নচিহ্নের বদলে শুধু ! চিহ্ন চলে : 'সে হৃদয়কে কি দিয়া গড়িয়া দিয়াছিল !' —শরৎচন্দ্র

রেখা চিহ্ন (dash): (—)

একটি বিষয় তুলে অন্য প্রসঙ্গ শুরু করার আগে, কোনও বিষয়ের উদাহরণ দেবার আগে, কখনও বা প্রত্যক্ষ উক্তির আগে এই চিহ্নের প্রয়োগ হয়।

'শৈল আবির্ভূত হল—নক্ষত্রমণ্ডলে চন্দ্রকলার মতো।' (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়)

আপনি তো সব-ডেপুটি সাহেব—
বন্যার মুখে বাংলা মুলুকে ভেসে বেড়াচ্ছেন—
আমরা কলকাতায় যাচ্ছি সে খবর রাখেন কি ? (রবীন্দ্রনাথ)

১ নং ধারা—পার্থিব আকর্ষণে বস্তুমাত্রই নিম্নগামী হয়।

২ নং ধারা—তরল ও বায়বীয় পদার্থের চাপে বস্তুমাত্রই উর্ধ্বগামী হয়। (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী)

নমি আমি প্রতিজনে—আদ্বিজচণ্ডাল, প্রভু ক্রীতদাস। (অক্ষয়কুমার বড়াল)

স্বরকে প্রলম্বিত দেখাবার জন্যেও এ চিহ্ন চলে। রুদ্ধ দ্বারের ভিতর থেকে কাতর স্বর উঠেছে, রবি বাবু—উ—উ—উ। (রবীন্দ্রনাথ)

শব্দগুচ্ছ প্রক্ষেপে (parenthesis) : আমি ওকে—সত্যি কথা বলতে কি—মিথ্যে আশ্বাসই দিয়েছি।

আমাদের অধিকাংশ অভিধানে মুখশব্দের পরে '—' চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। বিদেশি অভিধানে মুখ শব্দের পর এই চিহ্ন বর্জিত। আমরাও অনায়াসে এই চিহ্ন বর্জন করতে পারি।

উদ্ধৃতিচিহ্ন (inverted commas): " "

প্রত্যক্ষ উক্তি বোঝাতে এই চিহ্নের ব্যবহার হয়। আমি বললাম, "ওকে যেতে দাও।" দুদিকে দুটো করে কমার বদলে একটি করে 'কমা'ও চলে : যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে আপনি সৌম্য ?' (রাজশেখর বসু)

উদ্ধৃতিচিহ্ন না দিয়েও প্রত্যক্ষ উক্তি বোঝানো চলে : মা বলিত—দ্যাখো দ্যাখো ছেলের কাণ্ড দ্যাখো।

আগে ড্যাস ব্যবহার করেও উক্তি-প্রত্যুক্তি বোঝানো যায় :

—কোথায় যাচ্ছিস ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—বাজারে।

দ্বৈত উদ্ধৃতি-চিহ্ন : আমি বললাম, "তুমিই বলেছ 'ব্রহ্মসত্য জগৎ মিথ্যা', এখন তাহলে উল্টোটা বলছ কেন ?"

কোনও গ্রন্থ বা রচনার নাম বোঝাতে বা কোনও শব্দকে পৃথক্‌ভাবে বোঝাতে এ চিহ্ন ব্যবহার হয়। 'বলাকা' পড়েছ ? একে 'তর্ক' বলছ কেন ?

পদযোজক চিহ্ন (hyphen): (-)

সমাসে : অগুরু-চন্দন-ধূপে অলস সমীর। (অক্ষয়কুমার বড়াল) রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ সবই চাই। বহুপদময় সমাসে : কালকে-হারিয়ে-যাওয়া কলমটা খুঁজে পেয়েছি।

ধ্বনিগত তেমন কোনও পরিবর্তন আনে না এই চিহ্ন। তবে না-ই বা গেলে, যা পেয়েছি তা-ই বা মন্দ কী ? এখানে না ও তা-কে একটু টেনে উচ্চারণ করা যেতে পারে, নাই আর তাই থেকে এদের পৃথক করবার জন্যে।

দু'টি বিল এই অধিবেশনে (আ. বা. ১৯.৪.৯৪)—এখানে প্রথম শব্দটিতে উর্ধ্বকমা না দিয়ে হাইফেনও ব্যবহার করা চলে (দু-টি)। এক সঙ্গে লিখলেও কোনও ক্ষতি নেই (দুটি)।

কোনও শব্দ ডান দিকের মার্জিনে না আঁটলে তাকে যে অংশে ভাগ করা হয় সেই অংশে এই চিহ্ন দেওয়ার রীতি : যেমন 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' কথাটির 'কিংকর্তব্য' পর্যন্ত যদি কোনও লাইনে আঁটে, তার পর হাইফেন হবে। অর্থাৎ কিংকর্তব্য-। 'বিমূঢ়' বসবে পরের লাইনে বাঁ মার্জিনে। কিন্তু অঙ্গচ্ছেদটা ঠিক মতো হওয়া চাই। 'কিংক' আর 'র্তব্যবিমূঢ়' এমন বিভাজন হাস্যকর হবে।

ধ্বনির সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন চিহ্ন আরও অনেক আছে। (১৯) ধ্বনিতত্ত্বের পর্যায়ে যে-সব চিহ্নের কথা আলোচনা করলাম না।

১৩.৪ ■ রূপ ও রূপান্তর

ইংরেজি punctuation শব্দটির মূলে আছে গ্রিক 'punctus' যার অর্থ 'বিন্দু'। এই বিন্দু ব্যবহৃত হত হিব্রু পাণ্ডুলিপিতে ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির সঙ্কেত হিসেবে (হিব্রুতে তথাকথিত স্বরধ্বনি বলতে কিছু ছিল না)। ফলে, পরের দিকে Vowel আর Point প্রায় সমার্থক হয়ে Vowel-point কথাটির সৃষ্টি হয়। এই pointই ১৫ শতকে period বা full-stop হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কমা, কোলন (সেমি-কোলন), হাইফেন শব্দগুলি ছেদ বা অঙ্গচ্ছেদবাচক। 'ড্যাস' কথাটিতে আছে হঠাৎ সরে যাওয়ার ইঙ্গিত। অন্যান্য চিহ্নগুলি এসেছে অনেক পরে। কিছু চিহ্ন স্বরলিপি-চিহ্নের পরিবর্তিত রূপ, যাদের তাৎপর্যও কালক্রমে বদলে গিয়েছে। গ্রিক-লাতিন পাণ্ডুলিপিতে সেমিকোলন (;) ছিল প্রশ্নাত্মক। আজ তো অন্য অর্থ বহন করে। আমাদের দেশে বৈদিক সাহিত্যে একদা-ব্যবহৃত বজ্রাদি চিহ্ন (⌣ ঁ) এখন আর নেই। ধ্বনিগত পরিবর্তনের ফলেই এরা লুপ্ত হয়েছে। তবে আমাদের পাণ্ডুলিপিতে (।) দাঁড়ি, আর ডবল-দাঁড়ি (॥) ছাড়াও ০।, ০॥, ০।০, ০॥০ ইত্যাদি চিহ্ন ছিল, পূর্ণচ্ছেদের প্রতীক হিসেবে। এগুলো সবই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুগ্ম-যতিচিহ্ন, ইংরেজিতে যেমন :— বা, —, (?), (!), (!!!) ইত্যাদি। প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে পঙ্‌ক্তিপূরক হিসেবে '—' ড্যাসের ব্যবহার ছিল। এই '—' চিহ্ন হ্রস্ব-দীর্ঘ হত পঙ্‌ক্তি-পূরণের প্রয়োজনে। ত্রিবিন্দুর (ইং hiatus) চলও ছিল প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে। আরবি সাহিত্যে বিশেষ বিশেষ হরফের ব্যবহার ছিল বিভিন্ন 'বিরতি' বা 'কণ্ঠধ্বনি' বোঝাতে। এ-সবই ভাবলিপি (idogram)।

বাংলা বানানে যেমন অরাজকতা, ছেদচিহ্নের ব্যবহারেও তেমনি। এ বিষয়ে কেউ অতিকৃপণ, কেউ বা দিলদরিয়া, কেউ বা বেপরোয়া। বানানে যেমন সমতা চাই, তেমনি যতিচিহ্ন-ব্যবহারেও। কিন্তু তা হয়তো সম্ভব নয় কারণ একেকজনের স্টাইলের সঙ্গে ছেদচিহ্ন ব্যবহারের যোগ আছে। রবীন্দ্রনাথ 'কড়ি ও কোমল'-এর বেশ কিছু কবিতায় প্রতিটি স্তবকের পর দুটো দাঁড়ি (॥) ব্যবহার করেছেন। আধুনিক কবিতা ছেদ-চিহ্ন ক্রমশ কমিয়ে আনছেন। নতুন মুদ্রণব্যবস্থা টাইপবিন্যাসে বৈচিত্র্য এনে কিছু কিছু ছেদচিহ্ন হয়তো বাদ দিতে পারবে। composer ও compositor মনে হয় আরও কাছাকাছি আসবেন।

১৩.৫ ■ অমিত্রাক্ষরে ছেদ-চিহ্ন

অমিত্রাক্ষর ছন্দের নামটাই বিভ্রান্তিকর, কারণ চরণান্তিক মিল থাকা-না-থাকা এ ছন্দের ধর্মই নয়। পয়ারের পূর্ণযতি-অর্ধযতির নিয়মের বেড়ি ভাঙাই এ ছন্দের মূল কথা। অর্থানুসারে কবি যেখানে ছেদ নির্দেশ করলেন ছেদ-চিহ্নও সেইভাবে বসালেন।

রক্ষোবধূ মাগে রণ ; দেহ রণ তারে
বীরেন্দ্র।—

এখানে প্রথম পঙ্‌ক্তিতে চরণান্তে কোনও ছেদচিহ্ন নেই কারণ বাক্যবন্ধন 'বীরেন্দ্র' শব্দে এসে শেষ হচ্ছে। তাই সেখানেই দাঁড়ি। এই ধরনের বাক্যবন্ধে দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে হঠাৎ পূর্ণচ্ছেদ ঘটিয়ে কখনও দাঁড়ি দিয়েছেন, কখনও সেমিকোলন, কখনও বা কমা, কখনও বা ড্যাশ। যেমন

নাচিছে নর্তকীবৃন্দ, গাইছে সুতানে
গায়ক ;

অথবা,

হেনকালে হনু সহ উত্তরিলা দূতী
শিবিরে—ইত্যাদি।

১৩.৬ ■ উদ্ধৃতি চিহ্ন প্রসঙ্গে

সংস্কৃতে প্রত্যক্ষ উক্তির পর 'ইতি' শব্দটা থাকত ; যেমন—রামো' বদৎ নাহং গমিষ্যামীতি। বোঝা যেত reporting verb 'অবদৎ' আর 'ইতি'র মাঝখানকার অংশটি রামের প্রত্যক্ষ উক্তি। বাংলায় এই ইতি উঠে গেল। সামান্য দু-একটি উদাহরণ ছাড়া গদ্যের উন্মেষকাল থেকেই ইংরেজি inverted comma অর্থাৎ উদ্ধৃতি-চিহ্ন ব্যবহার হতে থাকল। গোলক শর্মা, রামরাম বসু, চণ্ডীচরণ মুনসি, উইলিয়ম কেরি, রামমোহন, ফেলিক্স কেরি সবাই উদ্ধৃতিচিহ্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবহার করেছেন। উদ্ধৃতিচিহ্নের আগে কেউ কমা দিয়েছেন, কেউ কোলন। উক্তি প্রত্যুক্তি যেখানে নাট্যাকারে লেখা সেখানে উদ্ধৃতি ছাড়া বাক্যের শুরুতে '—' ব্যবহার করা হয়েছে। যেখানে বক্তাদের নাম আছে সেখানে নামের পর '—' বাক্যে কোনও উদ্ধৃতিচিহ্ন নেই, যেমন ব্রজমোহন মজুমদারের 'পৌত্তলিক প্রবোধ' (১৮৪৬) রচনায়, প্রাজ্ঞ ও পৌত্তলিকের কথোপকথনে।

'কমা'ই নীচে থেকে প্রমোশন পেয়ে উপরে উঠে এল প্রত্যক্ষ উক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখাতে ('কমা' মানেই বাক্য বা বাক্যাংশকে কেটে দেখানো)। একটির মাথা উঁচুই রইল, আর একটির মাথা রইল নীচে। যোগব্যায়ামের বিশেষ ভঙ্গি যেন! এখন অবশ্য মুণ্ডহীন শুধু দুটো স্ট্রোকেই উদ্ধৃতিচিহ্ন প্রকাশ করা হয়। উদ্ধৃতিচিহ্নে হাতের পাক ঘোরাতে আর স্ট্রোক হবার ভয় নেই। আমরা এখন inverted comma যুক্ত portion-এর আগে quote আর শেষ হবার পর un-quote কথাটা ব্যবহার করি। আগে তা করা হত না। বক্তাদের স্বরভঙ্গির বিশেষ আদলে তা বোঝানো হত, (oraculor বা elocutional punctuation-এর সমস্যাও ছিল)। এই প্রসঙ্গে ছোট্ট একটা গল্প বলি।

দু বন্ধু গেল সভায়। একজন সভাপতি আর-একজন শ্রোতা। বক্তৃতা ও অনুষ্ঠান শেষ হল। বক্তা-বন্ধু হাততালিও পেল ভালই। শ্রোতা-বন্ধু বক্তা-বন্ধুকে বলল, 'বেশ বলেছিস্। তবে একেবারে রবীন্দ্রনাথকে ঝেড়ে দিলি! কেউ অবশ্য বুঝতে পারেনি।' বক্তা-বন্ধু বলল, 'সেই জন্যেই তো, দেখলি না শুরু করার আগে একটা হাত এক পাক ঘোরালাম, শেষ হবার পর আর-একটা। তার মানে নিজের কাছে সৎ রইলাম, এই আর কী।'

শ্রোতা-বন্ধুর আক্কেল গুড়ুম!

এখানে বিস্ময়বোধক চিহ্নটাকে দ্বিগুণ (!!) ত্রিগুণ (!!!) করলেও ব্যাকরণ অশুদ্ধ হবে না বোধ হয়। আপনারা কী বলেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপতত্ত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৪

শব্দ

[শব্দ কী—শব্দের গঠনগত বিভাগ—অব্যয় কি শব্দ ?—
শব্দের অর্থগত বিভাগ]

শব্দের উৎসগত শ্রেণীবিভাগ (অথাৎ যা নিয়ে বাংলা শব্দভাণ্ডার) নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি (চতুর্থ পরিচ্ছেদ)। এবারে শব্দের গঠন ও রূপান্তর নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

শব্দের এই গঠন ও রূপান্তর নিয়ে রূপতত্ত্ব (morphology)। তাই প্রথমেই আমাদের আলোচ্য 'শব্দ'।

১৪.১ ■ শব্দ কাকে বলব ?

● অর্থপ্রকাশক ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি অথবা তার লিখিত রূপকে শব্দ বলে। 'আকাশ' বললে নীলিমা, ব্যাপ্তি ইত্যাদি নিয়ে মনে যে-ছবি ফুটে ওঠে তাকেই আমরা বলি শব্দার্থ। 'আকাশ' সেই অর্থের বাহক তাই তা শব্দ।

● পাণিনীয় শাখার বৈয়াকরণেরা অনেকেই শব্দের এই অর্থ-প্রকাশনশক্তিকে 'স্ফোট' আখ্যা দেন। তাঁরা বলেন যেই 'গো' এই ধ্বনি হল অমনি তা থেকে প্রতিধ্বনির মতো অন্য একটি নিঃশব্দ শব্দ জন্মায়। ওই সূক্ষ্ম 'গো' শব্দই 'স্ফোট' এবং তা নিত্য। এরই শক্তিতে পশুবিশেষের প্রতীতি হয়। এই স্ফোটবাদ ব্যাকরণের গণ্ডি ছেড়ে দর্শনের আঙিনায় পৌঁছেছে, আমরা সে-আলোচনায় যাচ্ছি না।

● পাণিনি শব্দকে '**প্রাতিপদিক**' বলেছেন। সুনীতিকুমার বলেছেন—'প্রতিপদ শব্দের অর্থ 'আরম্ভ'; ইহা হইতেই বিভক্তিযুক্ত পদের আরম্ভ বা সূত্রপাত, এই জন্য ইহাকে প্রাতিপদিক বলে।' (পৃ ১২৪, *ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ।*)

সুনীতিকুমার 'প্রতিপদে'র অর্থ 'আরম্ভ' ধরেছেন। বৈয়াকরণেরা এও বলেন—'পদে পদে' ইতি প্রতিপদম্, যৎ প্রতিপদম্ উপস্থিতং তৎ প্রাতিপদিকম্।' এর অর্থ যা প্রতি-পদেই লভ্য, তাই প্রাতিপদিক। অর্থাৎ প্রতিটি পদের মধ্যে যা **মূল** রূপে বর্তমান তা-ই প্রাতিপদিক। পদত্বের আরম্ভ প্রাতিপাদিক থেকেই। এই অর্থেই হয়তো প্রাতিপাদিক 'প্রারম্ভিক'। 'আকাশে' এই পদের মূল 'আকাশ', এই 'আকাশ'ই প্রাতিপাদিক।

১৪.২ ■ মৌলিক ও সাধিত শব্দ

শব্দ বা প্রাতিপদিক **মৌলিক** বা **সাধিত** দুই-ই হতে পারে।

যে শব্দকে ভাঙা যায় না তা-ই '**মৌলিক**', যেমন জল, নাক, কান ইত্যাদি

যা প্রত্যয়যোগে সিদ্ধ বা **সমাসের ফলে** পাওয়া তা-ই হল **সাধিত**। যেমন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাঠি+আল=লাঠিয়াল > লেঠেল। লেঠেল তদ্ধিতান্ত শব্দ। √কৃষ্‌+তি=কৃষ্টি. কৃদন্ত শব্দ। আর, রাজার পুত্র='রাজপুত্র' সমাসবদ্ধ শব্দ। পদ না বলে আমরা সমাসবদ্ধ শব্দই বলছি। কারণ বাক্যে ব্যবহার করার আগে তা পদ-বাচ্য হতে পারে না। তদ্ধিতান্ত, কৃদন্ত বা সমাসান্ত এ-সবই সাধিত শব্দ।

১৪.৩ ■ অব্যয় কি শব্দ ?

হ্যাঁ, অব্যয়ও শব্দ। কারণ—'এবং' বললেই তার যোজকতার অর্থটি ফুটে ওঠে, তেমনি 'আঃ' আরাম বা বিরক্তি ইত্যাদি ভাবের আভাস দেয়।

পাণিনি মূলভূত (মৌলিক), কৃদন্ত, তদ্ধিতান্ত ও সমাসবদ্ধ শব্দকে 'প্রাতিপদিক' বলেছেন। বার্তিককারেরা অব্যয়কেও প্রাতিপদিকের মধ্যে ধরেছেন। তা ছাড়া গুণবচন (শৈত্য, সৌন্দর্যাদি), সর্বনাম, জাতি, সংখ্যা ও সংজ্ঞা (পারিভাষিক শব্দাদি)-কেও প্রাতিপদিকের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

'উণাদ্যন্তং কৃদন্তং চ তদ্ধিতান্তং সমাসজম্।
শব্দানুকরণঞ্চেতি নাম পঞ্চবিধং স্মৃতম্।'

এই প্রচলিত বচন অনুযায়ী শব্দানুকরণও প্রাতিপদিক বলে গণ্য হবে। শব্দানুকরণ বলতে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বোঝায়।

শব্দ বা প্রাতিপদিকের এই-যে মৌলিক বা সাধিত রূপ এ তার গঠনগত রূপ। এবারে আমরা শব্দের অর্থগত শ্রেণীবিভাগ নিয়ে আলোচনা করব।

অর্থের দিক থেকে দেখতে গেলে তিন-রকমের শব্দ আমরা পাই। এদের নাম **যৌগিক, যোগরূঢ় ও রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ**। আমরা নামকরণে যখন বিশেষণ শব্দই ব্যবহার করছি তখন রূঢ়ি না বলে 'রূঢ়' বলাই সমীচীন মনে করি।

AMARBOI.COM

১৪.৪ ■ যৌগিক শব্দ

'যৌগিক' শব্দটির মূলে আছে 'যোগ', অর্থাৎ প্রকৃতি-প্রত্যয়ের যোগে যে অর্থ ঈপ্সিত তাই যৌগিক শব্দ।

কৃদন্ত শব্দ যৌগিক—√গম্‌+অন=গমন, যাওয়া বা যাওয়ার ভাব—এই ঈপ্সিত অর্থই শব্দটিতে বর্তমান।

তদ্ধিতান্ত যৌগিক শব্দ : জল+ঈয়=জলীয়। 'ঈয়' প্রত্যয়টি সম্বন্ধীয় অর্থে, 'জলীয়' মানে জলসম্বন্ধীয়। এখানেও ঈপ্সিত অর্থই প্রকাশিত। সমাসবদ্ধ যৌগিক শব্দ : রাজপুত্র, 'রাজার পুত্র' এই ঈপ্সিত অর্থই এখানে বর্তমান।

১৪.৫ ■ যোগরূঢ় শব্দ

'রূঢ়' মানে প্রসিদ্ধ। 'যোগরূঢ়' সেই ধরনের শব্দ যা 'যোগ' অর্থাৎ প্রকৃতি-প্রত্যয়ের ঈপ্সিত অর্থ প্রকাশ করেও বিশেষ একটি অর্থে প্রযুক্ত। যেমন, পঙ্কজ (পঙ্ক-√জন্‌+ড) অর্থাৎ যা পঙ্কে জন্মায়। পঙ্কে-জাত পদ্ম, শালুক, পাঁকালমাছ ইত্যাদি না বুঝিয়ে পঙ্কজ শব্দটি শুধুমাত্র 'পদ্ম'কে বোঝাচ্ছে। তাই এটি যোগরূঢ় শব্দ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কররুহ (নখ), শিরোরুহ (চুল), জলধর (মেঘ), পীতাম্বর (কৃষ্ণ)—এ সব যোগরূঢ় শব্দ।

১৪.৬ ■ রূঢ়

যে শব্দে প্রকৃতিপ্রত্যয়ের কোনও অর্থই প্রকাশিত না হয়ে লোকপ্রচলিত অন্য অর্থ প্রকাশিত হয়, তাকে 'রূঢ়' শব্দ বলে।

হরিণ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'হরণকারী' কিন্তু আদৌ সে অর্থে ব্যবহার না হয়ে 'হরিণ' পশুবিশেষকে বোঝাচ্ছে। তাই হরিণ 'রূঢ়' শব্দ।

রূঢ় শব্দের অন্যান্য উদাহরণ : মাংস, লাবণ্য, শ্বশুর, মণ্ডপ, পলাশ, সন্দেশ (মিষ্টান্ন অর্থে) ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে **প্রবেশক** পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

শব্দগঠন নিয়ে এবারে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করব। শব্দ গড়ে ওঠে প্রত্যয়যোগে। শব্দের তাৎপর্য বুঝতে শব্দব্যুৎপত্তি বিশেষভাবে সাহায্য করে। পরিভাষাদি তৈরি করার ব্যাপারেও প্রত্যয়যোজনার জ্ঞান আমাদের বিশেষভাবে কাজে লাগে। এ বিষয়ে আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদের শেষ দিকে আলোচনা করব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৫

প্রত্যয় : কৃৎ ও তদ্ধিত

[কৃৎ ও তদ্ধিত নামের উৎসসন্ধান—প্রত্যয় কী—সংস্কৃত কৃৎ—উণাদিপ্রত্যয়— বাংলা কৃৎ—সংস্কৃত তদ্ধিত, বাংলা তদ্ধিত—কিছু প্রয়োগভাবনা—বিদেশি তদ্ধিত—কৃদন্ত-তদ্ধিতান্ত শব্দ ও ধ্বনিপরিবর্তন—কৃদন্ত-তদ্ধিতান্ত শব্দ ও অর্থপরিবর্তন]

১৫.১ ■ কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়

এই দু-ধরনের প্রত্যয় শব্দ গড়ার ব্যাপারে আমাদের সহায়ক। পাণিনির অনেক আগে থেকেই প্রত্যয়ের এ দুটি নাম প্রচলিত। এই নামদুটির কোনও ব্যাখ্যা পাণিনি দেননি। আমরা এ ব্যাপারে অনুমানের আশ্রয় নিতে পারি। √কৃ+ক্বিপ্=কৃৎ। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'করে যে' (doer)। যা ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে প্রাতিপদিকে পরিণত করে তা-ই কৃৎ, যেমন গম্+তব্য=গন্তব্য। কিন্তু তাহলে 'কৃৎ' 'ধাতুজ-শব্দগঠক' অর্থ বহন না করে 'শব্দজ-শব্দগঠক'ও তো বোঝাতে পারে। না, কারণ কৃৎ-এর 'কৃ' ধাতুই বলছে 'আমি ধাতু থেকে শব্দ গড়ি'।

'তদ্ধিত' ভাঙলে দাঁড়ায় তদ্+হিত, 'তস্মৈ হিতম্' এর অর্থে যে প্রত্যয় বিহিত তারই সগোত্র প্রত্যয়দের সাধারণভাবে বোঝাল শব্দটি। এক্ষেত্রে শব্দার্থের প্রসার ঘটল। পাণিনীয় 'তস্মৈ হিতম্' অর্থে ছ (ঈয়), যৎ (য), খ (ঈন) ইত্যাদি প্রত্যয় হয়—যজ্ঞীয়, ব্রহ্মণ্য, বিশ্বজনীন ইত্যাদি। এ সবই শব্দ বা প্রাতিপদিকের উত্তর বিধেয়। তাই যা প্রাতিপদিকের উত্তর বিধেয় সেই-সব প্রত্যয়কে সাধারণভাবে তদ্ধিত প্রত্যয় বলা হয়েছে।

তা হলে, যে প্রত্যয় ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ বা ধাতু গঠন করে তা **কৃৎ প্রত্যয়**, আর যা শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে **তদ্ধিত প্রত্যয়** বলে।

তদ্ধিত প্রত্যয়ের কয়েকটি উদাহরণ : গঙ্গা+এয়=গাঙ্গেয়, বর্ষ+ইক=বার্ষিক, বন্ধু+অ=বান্ধব ইত্যাদি।

● 'প্রত্যয়' শব্দটিকে তৈত্তিরীয় সংহিতায় এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে : 'প্রত্যেতি পশ্চাদ্ আগচ্ছতি ইতি প্রত্যয়ঃ।' অর্থাৎ যা পরে যুক্ত হয় তাই প্রত্যয়। অর্থাৎ যে বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ ধাতু বা প্রাতিপদিকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দগঠন করে তাকে প্রত্যয় বলে।

● অনুবন্ধ, ইৎ : প্রত্যয়ের সঙ্গে বাড়তি কিছু বর্ণ থাকে, যা ধাতু বা প্রত্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়, এই বাড়তি অংশ যা লোপ পায় তাকে ইৎ বা অনুবন্ধ বলে। যেমন গম্+ক্ত=গত, কুশল+অণ্=কৌশল। এখানে 'ক্ত' প্রত্যয়ের 'ত' ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। 'ক্' লোপ পেয়েছে। এই 'ক্' বলে দিচ্ছে গম্-এর ম্

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোপ হবে প্রত্যয় যুক্ত হলে। তার মানে এই 'ক্' নিরর্থক নয়। আবার 'অণ্'-এর লুপ্ত 'ণ্' বলে দিচ্ছে আদ্যস্বরের অর্থাৎ 'কু'-এর বৃদ্ধি হবে, অর্থাৎ 'কু' হবে 'কৌ'।

একস্বরবিশিষ্ট অনুবন্ধহীন প্রত্যয়কে 'অপৃক্ত' বলে। 'অপৃক্ত' মানে যা অসংযুক্ত বা একক, যেমন র, ব ইত্যাদি।

১৫.২ ■ প্রত্যয়ের স্বরগত পরিবর্তন

প্রত্যয় যুক্ত হলে ধাতু বা শব্দের মধ্যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্বরগত কিছু পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনগুলির নাম **গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ**। এই তিনটিকে একত্রে **'অপশ্রুতি'** বলে।

গুণ : ই, ঈ > এ (শী > শে+অন=শয়ন), উ, ঊ > ও (পূ > পো+অন=পবন), ঋ > অর্ (কৃ+অন=করণ)।

বৃদ্ধি : অ > আ (অলস+য=আলস্য), ই, ঈ > ঐ (নিশা+অ=নৈশ), উ, ঊ > ও (ভূত+ইক=ভৌতিক), ঋ > আর্ (স্মৃ+অক=স্মারক)।

সম্প্রসারণ : ব > উ (বচ্+ত=উক্ত), য > ই (যজ্+তি=ইষ্টি), র > ঋ (গ্রহ্+ত=গৃহীত)।

কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় অসংখ্য, আমরা প্রয়োজনীয় প্রত্যয়গুলির আলোচনা করছি, বর্ণানুক্রমে।

আমরা মূল সংস্কৃত প্রত্যয়ের অনুবন্ধ বাদ দিয়ে মূল ধ্বনিটি রেখেছি মূল প্রত্যয়টি থাকছে ব্র্যাকেটে।

১৫.৩ ■ সংস্কৃত কৃৎ

অ$_1$ (অচ্) : ভাব-অর্থে √জি+অ=জয়, √ভী+অ=ভয়, বি-√জি+অ=বিজয়, বি-√নী+অ=বিনয়, √স্তু+অ=স্তব। (ধাতুগুলিতে স্বরের গুণ লক্ষণীয়)

অ$_2$ (<অপ্) : √ভূ+অ=ভব, আ-√দৃ+অ=আদর।

অ$_3$ (<ক) : কর্তৃবাচ্য-√প্রী+অ=প্রিয়, নৃ-√পা+অ=নৃপ, সু-√স্থা+অ=সুস্থ, জল-√দা+অ=জলদ।

অ$_4$ (<ট) : দিবা+√কৃ+অ=দিবাকর, এইরকম, নিশাকর, জলচর, পুষ্টিকর ইত্যাদি।

অ$_5$ (<টক্) : কৃত-√হন্+অ=কৃতঘ্ন, শত্রু-√হন্+অ=শত্রুঘ্ন।

অ$_6$ (<ড) : অগ্র-√জন্+অ=অগ্রজ, এইরকম পঙ্কজ, অনুজ, সরোজ, দ্বিজ, ভুজগ ইত্যাদি, প্র-√জন্+অ+আ=প্রজা।

অ$_7$ (<ঘঞ্) : ভাব-অর্থে √বস্+অ=বাস, √ভূ+অ=ভার, √লভ্+অন=লাভ, প্র-√হৃ+অ=প্রহার ইত্যাদি।

অ$_8$ (<কঞ্) : কতগুলি সর্বনাম শব্দের পর দৃশ্ ধাতুর সঙ্গে 'মতো' অর্থে এই প্রত্যয় যুক্ত হয়। তদ্-√দৃশ্+অ=তাদৃশ, কিম্-√দৃশ্+অ=কীদৃশ, যাদৃশ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতাদৃশ ইত্যাদি।

অ$_{৯}$ (<খচ্) : কর্তৃবাচ্যে বিহিত এই প্রত্যয়টির যোগে কর্মপদের পর 'ম্' আসে। প্রিয়-√বদ্+অ=প্রিয় (ম্) বদ=প্রিয়ংবদ, তেমনি ভয়ঙ্কর [ভয়(ম্) কর], ধনঞ্জয় [ধন(ম্) জয়], অরিন্দম [অরি(ম্)+দম], বসু-√ধৃ+অ+আ=বসুন্ধরা < বসুম্+ধরা ইত্যাদি।

অ$_{১০}$ (<খচ্) : পুর-√দৃ +অ=পুরন্দর, সর্ব-√সহ্+অ= সর্বংসহ।

অ$_{১১}$ (<অঙ্) : ভাবার্থক এই প্রত্যয়ের পর স্ত্রীলিঙ্গে আ প্রত্যয় হয়। √পা+সন্+অ+আ=পিপাসা, √জ্ঞা+সন্+অ+আ=জিজ্ঞাসা, √শ্রৎ-ধা+অ+আ=শ্রদ্ধা। এইরকম শব্দ—ভিক্ষা, সেবা, আকাঙ্ক্ষা, পরীক্ষা, দীক্ষা, নিন্দা, লজ্জা, রক্ষা, শঙ্কা, মূর্ছা, ক্রীড়া, ঈর্ষা, পূজা, স্পৃহা, ইচ্ছা, সন্ধ্যা ইত্যাদি।

অ$_{১২}$ (< অণ্) কর্তৃবাচ্য : কুম্ভ-√কৃ+অ=কুম্ভকার। এইরকম গ্রন্থকার, তন্তুবায় ইত্যাদি।

অ$_{১৩}$ (<শ) : 'বিদ্' ধাতুর পর এই প্রত্যয় হলে বিদ্ 'বিন্দ' হয়ে যায় : গো-√বিদ্+অ=গোবিন্দ, এইরকম অরবিন্দ।

অ$_{১৪}$ (<খল্) : ভাববাচ্যে ও কর্মবাচ্যে যা সহজে বা কষ্টে করা যায় এই অর্থে—সু-√গম্+অ=সুগম, দুর্-গম্+অ=দুর্গম, এইরকম সুলভ, দুর্লভ, সুকর, দুষ্কর, দুর্জয়, দুর্দম ইত্যাদি।

'দুর্দম' বোঝাতে বাংলায় 'দুর্দাম' শব্দটি বহুল প্রচলিত। ব্যাকরণসম্মত না হলেও দুর্দাম গতিতে চলছে শব্দটি। চলুক।

AMARBOI.COM

অক$_{১}$ (<ণ্বুল্) : কর্তৃবাচ্যে : √নী+অক=নায়ক, √কৃ+অক=কারক, √রুধ্+অক=রোধক, √বহ্+অক=বাহক।

অক$_{২}$ (<বুঞ্) : √বুঞ্) : কর্তৃবাচ্যে : √নিন্দ্+অক=নিন্দক, হিন্স্+অক=হিংসক।

নিন্দুক ও হিংসুক অশুদ্ধ হলেও বাংলা বহুল প্রচলিত।

অক$_{৩}$ (<ষুন্) : কর্তৃবাচ্যে : শিল্পী বোঝাতে, √নৃৎ+অক=নর্তক, √রন্জ্+অক=রঞ্জক, রজক।

অন$_{১}$ (<ল্যু) : কর্তৃবাচ্যে : √নন্দ্+অন=নন্দন, সাধ্+অন=সাধন, তপ্+অন=তপন, বৃধ্+অন=বর্ধন। শীলার্থে—কোপন, যোধন, দহন ইত্যাদি।

অন$_{২}$ (<ল্যুট্) : ভাববাচ্যে : গমন, শয়ন, দান, স্নান, গান ইত্যাদি। √কৃ +অন=করণ, উদ্-√গৃ +অন=উদ্গিরণ (উদ্গীরণ আ. বা. ২.৮.৯৩ এবং ১৬.৭.৯৪)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করণবাচ্যে : যান (যাওয়া যায় যাহা দ্বারা) এইরকম, নয়ন, বদন ও চরণ।

অধিকরণবাচ্যে : √শী+অন=শয়ন (শয্যা)।

√সংস্কৃতায় (নামধাতু)+অন=সংস্কৃতায়ন, √ক্ষীণায় (নামধাতু) + অন=ক্ষীণায়ন, এইরকম দীর্ঘায়ণ, বিশ্বায়ন, বনায়ন, দুষ্কৃতায়ন ('রাজনীতির দুষ্কৃতায়ন', আ. বা. ২০.৫.৯০) ইত্যাদি। 'আয়্' দ্রষ্টব্য।

অন$_{৩}$ (<ণ্যুট্) : কর্তৃবাচ্যে : √গৈ+অন=গায়ন, মঞ্জুগায়ন (যে সুন্দর গান করে)

অন$_{৪}$ (<যুচ্) : ভাববাচ্য : এই প্রত্যয়ের পর স্ত্রীলিঙ্গে 'আ' যুক্ত হয় : √গণ্+অন+আ=গণনা, এইরকম, সাধনা, অভ্যর্থনা, (অভি-√অর্থ্+অন+আ), উপাসনা (উপ-√আস্+অন+আ), এষণা, বেদনা ইত্যাদি।

অনীয় (<অনীয়র্) : উচিত বা যোগ্য অর্থে— √স্মৃ+অনীয়=স্মরণীয়, বৃ+অনীয়=বরণীয়, এইরকম দর্শনীয়, পূজনীয়, পানীয়, গ্রহণীয়, শোচনীয় < √শুচ্, রমণীয়, পালনীয় < √পালি, মাননীয় ইত্যাদি। (২০)

অস্ (<অসুন্) √মন্+অস্=মনঃ, √তপ্+অস্=তপঃ।

আন (<শানচ্) : শী+আন=শয়ান, অধি-ই+আন=অধীয়ান।

আয়্ (<অকারন্ত শব্দে ক্যঙ্) আচরণ, অনুভব ইত্যাদি অর্থে দ্রষ্টব্য অন$_{২}$ ও ত প্রত্যয়।

আলু (<আলুচ্) : কর্তৃবাচ্যে, শীলার্থে, নি-√দ্রা+আলু=নিদ্রালু, √ভী+আলু=ভয়ালু।

ই$_{১}$ (<ইন্) : কর্তৃবাচ্যে—আত্মম্ভরি=আত্মন্-√ভৃ+ই=আত্মভরি।

'আত্মম্ভরী' অপপ্রয়োগ, কিন্তু ১৪.৫.৯৪ আ. বা. র সম্পাদকীয়তে দেখা গেল 'আত্মম্ভরী দল।'

ই$_{২}$ (<কি)—ভাববাচ্যে—সম্-√ধা+ই=সন্ধি, এইরকম বিধি, ব্যাধি, রুচি ইত্যাদি।

অধিকরণবাচ্যে, জল—নি-√ধা+ই=জলনিধি। এইরকম অম্বুনিধি, পয়োধি (পয়স্-√ধা+ই), বারিধি।

ই$_{৩}$ <ণিচ্ প্রেরণার্থে : √যা+ই=যাপি+ন=যাপন, √স্থা-√ই+অন=স্থাপন, পুনঃ-√বস্+ই=√বাসি+অন=পুনর্বাসন, √শী+ই=√শায়ি+ত=শায়িত, √দ্রু+ই=√দ্রাবি+অন=দ্রাবণ, √হন্+ই=√ঘাতি+অন=ঘাতন, পত্+ই=√পাতি+অন=পাতন, অধি-√ই+ই=√আপি+অন+আ=অধ্যাপনা, √পঠ্+ই=√পাঠি+অন=পাঠন ইত্যাদি।

এই ই <ণিচ্ অন্ত্য প্রত্যয় নয়, মধ্য প্রত্যয়। এই প্রত্যয়যোগে ধাতুর আদ্যস্বরের বৃদ্ধি হয়, যেমন √পঠ্+ই=√পাঠি, কৃ+ই=√কারি, √দ্রু+ই=√দ্রাবি, (√দ্রাবি+অন=দ্রাবণ (lixiviation)।

ইত্র : করণবাচ্যে—√চর্+ইত্র=চরিত্র, √বহ্+ইত্র=বহিত্র (নৌকা), √খন্+ইত্র=খনিত্র (কোদাল) ইত্যাদি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইন্$_1$ (<ণিন্' ও ণিনি) **কর্তৃবাচ্যে**— √স্থা+ইন্=স্থায়িন্ > স্থায়ী, √বদ্+ইন্=বাদিন্ > বাদী, সত্যবাদী, স্তন্যপায়ী, অনুগামী, দেশদ্রোহী, সন্ন্যাসী (সম্-নি+√অস্+ইন্) ইত্যাদি।

ইন্$_2$ (<ঘিনুণ্) : কর্তৃবাচ্যে √দম্+ইন্=দমিন্ > দমী, প্র-√বস্+ইন্=প্রবাসিন্ > প্রবাসী, √যুজ্+ইন্=যোগিন্ > যোগী, অনুরাগী, বিবেকী ইত্যাদি।

ইষ্ণু (<ইষ্ণুচ্) : কর্তৃবাচ্যে, শীলার্থে— √বৃধ্+ইষ্ণু=বর্ধিষ্ণু এইরকম সহিষ্ণু (সহ্+ইষ্ণু), ক্ষয়িষ্ণু (√ক্ষি+ইষ্ণু) ইত্যাদি।

ঈন < শানচ্ : √আস্ + ঈন = আসীন।

উ : কর্তৃবাচ্যে— √ভিক্ষ্+উ=ভিক্ষু, √মুচ্+সন্+উ=মুমুক্ষু, এইরকম, লিপ্সু, ঈপ্সু, জুগুপ্সু (গুপ্+স্ন্+উ) ইত্যাদি।

উ (<ডু) : কর্তৃবাচ্য : বি-√ভূ+উ=বিভু, √প্র-√ভূ+উ=প্রভু ইত্যাদি।

উক (<উকঞ্) কর্তৃবাচ্যে, শীলার্থে—√কম্+উক=কামুক (কম্ > কাম্ [বৃদ্ধি]), √ভূ+উক=ভাবুক (ভূ > ভৌ+উক=ভাবুক, বৃদ্ধি **উ** > ঔ, কর্তৃবাচ্যে, শীলার্থে।

উর্$_1$ (<কুরচ্) : কর্তৃবাচ্যে : √বিদ্+উর=বিদুর (বিদ্বান)।

উর্$_2$ (< ঘুরচ্) : কর্তৃবাচ্যে : √ভন্জ্+উর=ভঙ্গুর, √মিদ্+উর=মেদুর।

উক : কর্তৃবাচ্যে : √জাগৃ+উক=জাগরূক।

ত (<ক্ত) : **কর্মবাচ্যে** —√কৃ+ত=কৃত, √ধৃ+ত=ধৃত, √জন্+ত=জাত, √ব্যধ্+ত=বিদ্ধ, অধি-√বস্+ত=অধ্যুষিত, আ-√হ্বে+ত=আহূত, √বহ্+ত=ঊঢ়, নঞ্-√বহ্+ত+আ= অনূঢ়া, √বচ্+ত=উক্ত, √সৃজ্+ত=সৃষ্ট, √ভ্রন্শ্+ত=ভ্রষ্ট, √ইষ্+ত=ইষ্ট, √নশ্+ত=নষ্ট, √স্বপ্+ত=সুপ্ত, √দন্শ্+ত=দষ্ট, √ভন্জ্+ত=ভগ্ন, √ভিদ্+ত=ভিন্ন, √মসজ্+ত=মগ্ন, √রুজ্+ত=রুগ্ণ। এইরকম লীন, দীন, ডীন, (উড্ডীন) ইত্যাদি শব্দে 'ত' 'ন' হয়ে যায়। তুলনীয় ইং participle: gone, seen, lain, done, grown ইত্যাদি। এইরকম √কৃ +ত=কীর্ণ, উদ্-√গৃ +ত=উদগীর্ণ, √শৃ +ত=শীর্ণ, √তৃ +ত=তীর্ণ।

ধাতুর পর 'ই'—আগম : √স্পন্দ্+ত=স্পন্দিত, এইরকম বলিত, চুম্বিত, মিলিত, বাঞ্ছিত, লুণ্ঠিত, পতিত, শঙ্কিত (√শঙ্ক্+ত), কম্পিত (√কম্প্+ত) ইত্যাদি, √গ্রন্থ্+ত=গ্রথিত। এসব ক্ষেত্রে 'ইত' প্রত্যয় লেখা চলবে না, 'ত' প্রত্যয়ই লিখতে হবে।

আয়্-যুক্ত নামধাতুতে 'ত' যুক্ত হলেও তার আগে 'ই' হবে। দীর্ঘায়িত, সংস্কৃতায়িত ইত্যাদি।

'একত্রিত' শব্দ 'ত' প্রত্যয়যোগে সিদ্ধ। যা একত্র করা হয়েছে এই অর্থে একত্র + ই < ণিচ্ + ত। হিন্দিতে শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ হিসেবেই শব্দটি গৃহীত।

● সংস্কৃতে 'ক্ত' ও 'ক্তবতু' প্রত্যয়কে **নিষ্ঠা** বলা হয়। নিষ্ঠা (নি- √স্থা+অ+আ) শব্দটির অর্থ পূর্ণতা। এই দুটি প্রত্যয় ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পূর্ণ অর্থাৎ সমাপিকা ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করে বলে প্রত্যয় দুটির এই নাম। বাংলায় 'ক্তবতু' নেই, আছে ক্ত (ত)।

'গত', সুপ্ত ইত্যাদি সংস্কৃতে পূর্ণ ক্রিয়ার কাজ করে, বাংলায় তা বিশেষণস্থানীয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অৎ (<শতৃ) : √চল্+অৎ=চলৎ (চলচ্চিত্র), √অস্+অৎ=সৎ।

তব্য : কর্মবাচ্যে, উচিত অর্থে √কৃ+তব্য=কর্তব্য, √দৃশ্+তব্য=দ্রষ্টব্য, √শ্রু+তব্য=শ্রোতব্য, গন্তব্য, বক্তব্য, ভবিতব্য, মন্তব্য ইত্যাদি। অনুষ্ঠাতব্য (অনু-√স্থা+তব্য), অধ্যেতব্য (অধি-√ই+তব্য)।
অনুষ্ঠিতব্য, অধীতব্য ভুল প্রয়োগ।

তা (<তৃচ্, তৃন্) : কর্তৃবাচ্যে : √কৃ+তৃ=কর্তৃ > কর্তা, √ভৃ+তৃ=ভর্তৃ > ভর্তৃ, √নী+তৃ=নেতৃ > নেতা, √হু+তৃ=হোতৃ > হোতা, নি-√যম্+তৃ=নিয়ন্তৃ > নিয়ন্তা ইত্যাদি। পিতা, ভর্তা ইত্যাদি ১মা একবচনের রূপ। প্রাতিপদিক পিতৃ, ভ্রাতৃ, হোতৃ ইত্যাদি। সমাসে পূর্বপদে থাকলে প্রাতিপদিক-রূপটিই বজায় থাকে কর্তৃপক্ষ, ভ্রাতৃবর্গ ইত্যাদি।

তি (<ক্তিন্) : ভাব-অর্থে √গম্+তি=গতি, √স্মৃ+তি=স্মৃতি এইরকম শক্তি, ভক্তি, মুক্তি (মুচ্+তি), দীপ্তি, বৃষ্টি, পুষ্টি, গীতি, স্থিতি, বুদ্ধি ইত্যাদি। √গ্লা+তি=গ্লানি, √হা+তি=হানি, (ত্ > ন্)।

ত্র (<ষ্ট্রন্) : করণবাচ্যে— √নী+ত্র=নেত্র, √শ্রু+ত্র=শ্রোত্র, √শাস্+ত্র=শাস্ত্র, এইরকম স্তোত্র, বস্ত্র, ইত্যাদি।

ত্রিম (<ত্রিমপ্) : করণবাচ্যে—√কৃ+ত্রিম=কৃত্রিম।

ন : ভাব-অর্থে √যৎ+ন=যত্ন, √প্রচ্ছ্+ন=প্রশ্ন, √স্বপ্+ন=স্বপ্ন, √যজ্+ন=যজ্ঞ, √তৃষ্+ন+আ=তৃষ্ণা, √যাচ্+ন+আ=যাচ্ঞা।
এই দুটি শব্দ সম্বন্ধে সূত্রে বলা হয়েছে স্ত্রীত্বং লোকাৎ, অর্থাৎ লোকোক্তি অনুসারেই শব্দদুটিতে স্ত্রীলিঙ্গবাচক 'আ' যুক্ত হয়েছে।

মান (<শানচ্) : ঘটমান অর্থে √বৃৎ+মান=বর্তমান, √যজ্+মান=যজমান, এইরকম বর্ধমান, বিদ্যমান <বিদ্, দীপ্যমান <দীপ্, দেদীপ্যমান √দীপ্ +য [যঙ্] +মান) ইত্যাদি।

য (<ক্যপ্) : ভাববাচ্য : √বিদ্+য+আ=বিদ্যা, √চর্+য+আ=চর্যা, √শী+য+আ=শয্যা, √কৃ+য=কৃত্য, √ভৃ+য=ভৃত্য।

য <খ্য : পণ্ডিত—মন্+য=পণ্ডিতম্মন্য (ম্ এর আগম), এইরকম কৃতার্থম্মন্য, হীনম্মন্য ইত্যাদি। কিন্তু বিদ্যম্মন্য (আ. বা) একেবারেই অচল। প্রথমত শব্দটি বিদ্বৎ, বিদ্যৎ নয়, তাই বিদ্বম্মন্য চলতে পারে।

য (<ণ্যৎ) : কর্মবাচ্যে : √কৃ+য=কার্য (কৃ > কার বৃদ্ধি) এইরকম পাঠ্য, ভার্যা ইত্যাদি।

র : কর্তৃবাচ্যে : √নম্+র=নম্র, হিন্স্+র=হিংস্র, √ক্ষিপ্+র, √স্মি+র=স্মের।

ব : কর্তৃবাচ্যে : √পচ্+ব=পক্ক।

বর, (<ক্বরপ্) : কর্তৃবাচ্যে : নশ্+বর=নশ্বর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্ (<বরচ্) : কর্তৃবাচ্যে √ঈশ্+বর=ঈশ্বর, √ভাস্+বর=ভাস্বর, এই রকম স্থাবর, যাযাবর (√যা+য < যঙ্ + বর)।

১৫.৪ ■ শূন্য প্রত্যয় (=ক্বিপ্)

শাস্ত্র-√বিদ্+০-প্রত্যয়=শাস্ত্রবিদ্
পরি-√সদ্+০-প্রত্যয়=পরিষদ্
উদ্-√ভিদ্+০-প্রত্যয়=উদ্ভিদ
অগ্র-√নী+০-প্রত্যয়=অগ্রণী
সেনা-√নী+০-প্রত্যয়=সেনানী

এইসব উদাহরণে বোঝা যাচ্ছে, ক্বিপ্ প্রত্যয় যুক্ত হলেও ধাতু যেমনকার তেমনি আছে। এই অর্থেই প্রত্যয়টিকে শূন্য প্রত্যয় বলা হয়। কিন্তু, ইন্দ্র-√জি+ক্বিপ্=ইন্দ্রজিৎ, এখানে, ধাতুর পর 'ত্' এল কেন? ওই 'ক্বিপ্' প্রত্যয়েই আছে তার রহস্য, 'প্' লোপ পেলে হ্রস্বস্বরযুক্ত ধাতুর পর ত্ আসে। এইরকম পর-√ভৃ+ক্বিপ্=পরভৃৎ। প্রত্যয়টি সবই (ক্ ব্ ই প্) লোপ পায় বলেই একে শূন্যপ্রত্যয় বলা হয়ে থাকে। অবশ্য শূন্য প্রত্যয় শব্দটির বদলে লুপ্ত প্রত্যয় বা ইৎ-প্রত্যয়ও বলা চলে। এই রকম আর একটি প্রত্যয় 'ণ্বি', এটিও শূন্য প্রত্যয়, এরও (ণ্ ব্ ই) কিছুই থাকে না। ই=ইৎ অর্থাৎ ণ্ ব্—দুই-ই ইৎ।

ণ্ ইৎ যাওয়া ধাতু আদ্য স্বর দীর্ঘ হবে। দুঃখ-√ভজ্+ণ্বি=দুঃখভাজ্ > দুঃখভাক্ (১মা একবচন)।

স্যৎ (<স্যতৃ) : ভবিষ্যৎকালে √ভূ+স্যৎ=ভবিষ্যৎ, **স্যমান** : √বচ্+স্যমান=বক্ষ্যমাণ।

ভবিষ্যৎকালে পরস্মৈপদী ধাতুর উত্তর 'স্যতৃ' এবং আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর 'স্যমান' প্রত্যয় হয়। কিন্তু আ.বা. ১৫.৮.৯৪ এ দেখা গেল 'তার উত্তরসূরি 'বক্ষ্যমান' সংকলন'।' বলা বাহুল্য 'যা বলা হচ্ছে' অর্থে 'বক্ষ্যমান' চলবে না। 'বক্ষ্যমান' বানানটিও ভুল। 'বক্ষ্যমাণ' হবে। চলন্তিকায় অবশ্য ভুল বানানটিই গৃহীত হয়েছে।

● এইরকম আরও অনেক কৃৎ প্রত্যয় আছে, যে-সব প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ একান্তভাবেই সংস্কৃত, বাংলায় তার ব্যবহার নাই। যেমন, তুমুন্, (গন্তুম্, কর্তুম্) ণমুল্ (স্মারং স্মারম্), ক্ত্বাচ্ (কৃত্বা, গত্বা), ল্যপ্ (আগম্য, প্রণম্য)। বাংলায় করিয়া খাইয়া ইত্যাদি ইয়া-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া এই 'ল্যপ্' প্রত্যয় থেকে এসেছে। আরও বহু কৃৎ প্রত্যয়ই সংস্কৃতে আছে, কিন্তু সেইসব প্রত্যয় থেকে গড়ে ওঠা শব্দ বাংলায় চলে না বলে সেগুলোর আলোচনা করা হল না। অদ্মর, ঘস্মর, পচেলিম দিয়ে আমরা কী করব?

১৫.৫ ■ উণাদি প্রত্যয়

এ ছাড়া পাণিনিবিহিত কৃৎ প্রত্যয়ে সিদ্ধ হয় না এমন সব শব্দসাধনে উণাদি (উণ্ আদি) প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন: উ (√তৃ+উ=তরু), উণ্

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(√বা+উণ্=বায়ু), ক (√শুষ্+ক=শুষ্ক), কু (√গৃ+কু=গুরু), নি (√বহ্+নি=বহ্নি), নু (√ভা+নু)=ভানু, প (√পা+প=পাপ), মন্ (√ধৃ+মন্=ধর্ম), মি (√ভূ+মি=ভূমি), রু (√মি+রু=মেরু), স (√হন্+স=হংস) ইত্যাদি।

এই উণাদি প্রত্যয়গুলোকে তেমন শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়নি : 'উণাদয়োঽব্যুৎপন্নানি প্রাতিপদিকানি' অর্থাৎ উণাদি প্রত্যয়যুক্ত প্রাতিপদিক অসিদ্ধ। আবার বিপক্ষেরা বলেন, 'উণাদয়ো ব্যুৎপন্নানি' অর্থাৎ এদের সঠিকভাবে ব্যুৎপন্ন শব্দ বলেই মনে করতে হবে।

উণাদি প্রত্যয়ের মধ্যে এমন সব প্রত্যয় এসেছে যা যুক্ত করে অসংস্কৃত শব্দকেও সংস্কৃত করে নেবার প্রবণতা দেখা যায়। যেমন, 'তাম্বূল' শব্দটি যা মূলত দ্রাবিড়ীয়, তাকেও √তম্ব্+উলচ্=তাম্বূল করে নেওয়া হয়েছে। (২১)

(২১) গল্পে আছে এক পণ্ডিতমশাই এক মৌলবিসাহেবকে উৎকণ্ঠিত হতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'মৌলবি সাহেব, আমি আপনার কোনও কাজে আসতে পারি কি?' মৌলবি সাহেব বললেন, 'তিনটে শব্দের ব্যুৎপত্তি আমার মাথায় আসছে না—মিঞা, মালিক আর মোল্লা।' পণ্ডিতমশাই তাঁকে বললেন, 'কোনও চিন্তা করবেন না।' এই বলে তাঁকে উণাদি প্রত্যয়ের অভিধানটি দিলেন। কদিন বাদে মৌলবি সাহেব উল্লসিত হয়ে পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে এসে বললেন :

ঔণাদি সে সাধ লিয়া হৈ মিয়া মালিক মোল্লা।
মা-ধাতুসে প্রত্যয় কিয়া—ডিয়া ডালিক ডোল্লা ॥

—অর্থাৎ উণাদি প্রত্যয় থেকে তিনি সমাধান পেয়েছেন,— 'মা' ধাতুর সঙ্গে যথাক্রমে ডিয়া, ডালিক আর ডোল্লা প্রত্যয় যোগে শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করতে পেরেছেন!

AMARBOI.COM

১৫.৬ ■ বিতর্কিত শব্দ

√মুহ্যমান ইত্যাদি

আ.বা.-তে 'মোহ্যমান' লেখা হয়েছে। 'মুহ্' ধাতু পরস্মৈপদ। কিন্তু কখনও কখনও শানচ্‌ও হয় ('rarely Atmanepad'— Monier Williams) উপনিষদে মুহ্যমান শব্দের প্রয়োগও আছে। শোচতি মুহ্যমানঃ—মুণ্ডক, ৩.১.২। কোনওভাবেই 'মোহ্যমান' গঠন সম্ভব নয়। বাংলায় 'মুহ্যমান' যেমন চলছে চলবে।

√মান<শানচ্-যুক্ত আরও কয়েকটি শব্দ প্রসঙ্গে আত্মনেপদী ধাতুর সঙ্গেই মান < শানচ্ হয়, পরস্মৈপদী ধাতুর সঙ্গে নয়। কিন্তু বাংলায় 'ভ্রাম্যমাণ', 'চলমান'. চলবেই! অস্তায়মান'-এর সমর্থন নেই সংস্কৃত অভিধানে, তার ঠাঁই না হবার কিছু নেই। তবে 'অস্তমান' নৈব নৈব চ।

যা ঘুরছে ঘূর্ণমান, যাকে ঘোরানো হচ্ছে ঘূর্ণ্যমান, যা অপসৃত হচ্ছে এই অর্থে অপস্রিয়মাণ অশুদ্ধ। আসলে ম্রিয়মাণের অনুকরণে অপস্রিয়মাণ তৈরি। কিন্তু 'মৃ' আত্মনেপদ, 'সৃ' পরস্মৈপদ।

'হ্রাসমান'ও (ক্রমহ্রাসমান) একই কারণে অশুদ্ধ, কারণ 'হ্রস্' পরস্মৈপদী,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্রাসমান' একেবারেই অচল, তবে চলমান যেমন চলছে তেমনি হ্রসমান চলতে পারে।

১৫.৭ ■ বাংলা কৃৎ

বাংলা কৃৎ বলতে আমরা সেইসব কৃৎ প্রত্যয় বুঝি যেগুলো প্রাকৃত-জ। প্রাকৃতজ শব্দের সঙ্গেই এগুলোর ব্যবহার।

অ১ : এই 'অ' ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের সৃষ্টি করে, এই 'অ'-এর উচ্চারণ লুপ্ত। √বাড়্+অ=বাড়। তোমার বড় বাড় বেড়েছে। √ছাড়্+অ=ছাড়। ছাড়-পত্র। এই রকম, ধরপাকড়, কাটছাঁট, মারপিট ইত্যাদি।

অ২ > ও, উ : ঈষৎ বা প্রায় অর্থে এই অ-এর প্রয়োগ। এই 'অ'-প্রত্যয়ের যোগে শব্দদ্বিরুক্তি ঘটে : √কাঁদ্+অ=কাঁদ > কাঁদো, কাঁদো কাঁদো মুখ। পড়ো পড়ো চাল, মরো মরো রোগী। এই 'ও' আবার উ-তেও রূপ নেয় : নিভুনিভু প্রদীপ, ডুবুডুবু সূর্য, একক প্রয়োগও দেখা যায়, যেমন, হবু জামাই (√হ+উ=হবু, ব-শ্রুতি)।

অন > ওন : এই প্রত্যয়টিও ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য সৃষ্টি করে। √নাচ্+অন=নাচন, এইরকম, দেখন, থাকন, হওন, কাঁদন, রাঁধনবাড়ন। করণবাচ্যে : √ঢাক্+অন=ঢাকন (ঢাকনা), √ঝাড়্+অন=ঝাড়ন।

AMARBOI.COM

অনা ('অন'র প্রসার : অন+আ) : √বাজ+অনা=বাজনা > উচ্চারণে বাজ্‌না, এইরকম রাঁধ্+অনা=রাঁধনা > রাঁধ্‌না > রান্না (সমীকরণ), বাটনা, ঢাকনা ইত্যাদি।

অনি, অনি > উনি : ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য অর্থে : √বাঁধ্+অনি > উনি=বাঁধুনি, বাঁধুনিটা ভালোই। √জ্বল্+অনি > উনি=জ্বলুনি, কী জ্বলুনি! কর্তৃবাচ্যে : √নাচ্+উনি=নাচুনি, কী নাচুনি মেয়ে! কর্মবাচ্যে : √ছা+উনি=ছাউনি, করণবাচ্যে : √নিড়্+উনি=নিড়ুনি।

আসলে অনি=অন+ই, নাচনি নাচুনি হয়েছে স্বরসঙ্গতিতে।

অত (<অৎ <শতৃ), অতা, অতি >তা, তি=প্রসারে। ঘটমান অর্থে : √ফির্+অত=ফিরত, ফেরত, বিলেতফেরত। অথবা বিলেতফেরতা ছেলে। উঠতি বয়েস, চলতি বছর। বহতা নদী। জানতা (সব-জানতা), পারত (পারতপক্ষে), করত (আগমনকরত), করতঃ 'করত' শব্দে 'ঃ' যোগ সংস্কৃত 'তস্' প্রত্যয়ের প্রভাবে আমার জানত লোক, আমার জানিত লোক। এক্ষেত্রে জানিত শব্দে শতৃপ্রত্যয়জাত 'ত' নয়, সংস্কৃত 'ক্ত'-প্রত্যয়জাত 'ত'।

'শতৃ'জাত 'অন্ত' প্রত্যয়ের 'অত'তে পরিবর্তন হিন্দির বাঢ়ত, চাহত, দেখত (দেখত নয়নন মিট্টী মিলাঈ) ইত্যাদি শব্দের প্রভাব থাকা সম্ভব। বাড়্+তি=বাড়তি, কমতি, উঠতি, ঝরতি, পড়তি ইত্যাদি।

অন্ত > অন্তি, উন্তি : ঘটমান অর্থে। √ভাস্+অন্ত=ভাসন্ত, √বাড়্+অন্ত=বাড়ন্ত (বাড়ন্ত বয়েস), √জী+অন্ত=জীয়ন্ত > জ্যান্ত, √নাচ্+উন্তি=নাচুন্তি, √উঠ্+অন্তি=উঠন্তি (উঠন্তি মূল পত্তনে চেনা যায়)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আ১। ক্রিয়াবাচক কিংবা ভাববাচক বিশেষ্য। √কর্+আ=করা, √খা+আ=খাওয়া (ব-শ্রুতি) এইরকম বলা, দেখা, শোনা, ওঠা, বসা ইত্যাদি।

আ২। ক্রিয়াত্মক বিশেষণবাচক (Past Participle): হওয়া চাকরি, রাঁধা ভাত, বাড়া ভাত (বাড়া ভাতে ছাই), জ্বানা কথা, শোনা গল্প, ধোয়া কাপড়।

আ৩। কর্তৃবাচ্যে উপপদের সঙ্গে ব্যবহৃত : √কাট্+আ=কাটা (গলাকাটা দাম) এমনি কাপড়কাচা সাবান, হাড়ভাঙা খাটুনি, আখঝাড়া কল ইত্যাদি।

আই। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে : √বাছ্+আই=বাছাই (ঝাড়াইবাছাই), যাচাই, বাঁধাই, লড়াই, ঝালাই, ঢালাই ইত্যাদি।

আইত। কর্তৃবাচ্যে, √ডাক্+আইত=ডাকাইত (ডাকিয়া বা হাঁকিয়া আসে যে), √বাজ্+আইত=বাইত (বায়েন অর্থে)।

আও। ভাবার্থে : √চড়্+আও=চড়াও, √ঘির্+আও=ঘেরাও। ফলাও <হিন্দি ফৈলাও ইত্যাদি।

আকু। √লড়্+আকু=লড়াকু, √উড়্+আকু=উড়াকু > উড়ুকু > উড়ুক্কু।

আন (আন্)। নিজন্ত ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষ্য গঠন করে। √জানা+আন=জানান (জানান্ দেওয়া), √মানা+আন=মানান (মানানসই), √চাল্+আন=চালান।

আনো। 'আন' এই প্রত্যয়টি ণিজন্ত ক্রিয়া বোঝাতে বা ণিজন্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বোঝাতে 'আনো' হয় : (ওকে জানানো দরকার কী), √জানা+আনো=জানানো, এইরকম করানো, শোয়ানো, পড়ানো, ওঠানো ইত্যাদি। হিন্দিতে 'না'—বুলানা, পঢ়ানা ইত্যাদি।

বিশেষণ হিসেবে প্রয়োগ : জানানো খবর, পড়ানো গল্প, ওঠানো জিনিস ইত্যাদি।

AMARBOI.COM

ইতে। অভিপ্রায় অর্থে √দেখ্+ইতে=দেখিতে > দেখতে, এইরকম, বলতে, শুনতে ইত্যাদি। ঘটমান অর্থে দ্বিত্ব : সে গাইতে গাইতে আসছে।

ইবা। ক্রিয়া বা ভাববাচক বিশেষ্য অর্থে, খাইবামাত্র=খাওয়ামাত্র, পরিবার জন্য, কবিতায় করিবারে, দেখিবারে।

ইয়া > এ। অনন্তর অর্থে— √কর্+ইয়া > এ =করিয়া > করে, খাইয়া > খেয়ে, দেখিয়া > দেখে।

ইয়ে। কর্তৃবাচ্যে পটু অর্থে—√খা+ইয়ে=খাইয়ে, √গা+ইয়ে=গাইয়ে, (গাইয়ে বাজিয়ে √নাচ্+ইয়ে=নাচিয়ে, √লিখ্+ইয়ে=লিখিয়ে।। (মস্ত লিখিয়ে)।

ইলে। যদির অর্থ বা কালের পৌর্বাপর্য বোঝাতে : এমন করিলে > করলে কে তোমাকে সাহায্য করিবে ? সে আসিলে > এলে আমি যাইব।

উয়া > ও। কর্তৃবাচ্যে বিশেষণ-অর্থে প্রযুক্ত। √পড়্+উয়া=পড়ুয়া > পোড়ো (পুঁথিপোড়া), √উড়্+উয়া > ও=উড়ো (উড়ো খই)।

উক, উকা। কর্তৃবাচ্যে করিতে অভ্যস্ত অর্থে : √মিশ্+উক। √খা+উকা=খাউকা > খাউকো > খেকো।

ওয়া। বাঁচোয়া, চড়োয়া < হিন্দি চঢ়াওয়া।

ক। √মুড়্+অক=মোড়ক, √চড়্+অক=চড়ক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ট ; স্বার্থে : √ঘষ্‌+ট+আ=ঘষ্‌টা।

ড় । স্বার্থে : √ঘষ্‌+ড়+আ=ঘষড়া, √খিচ্‌+ড়+আ=খিঁচড়া।
√হাঁক+ড়+আ=হাঁকড়া (নো)।

১৫.৮ ■ সংস্কৃত তদ্ধিত

যে-তদ্ধিত প্রত্যয় সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তা সংস্কৃত তদ্ধিত। বিভিন্ন অর্থে যুক্ত এইসব প্রত্যয় বর্ণানুক্রমে দেওয়া হল : মূল প্রত্যয়গুলি পাণিনীয়।

অ < অণ্‌
ক) পুত্র বা বংশধর অর্থে : যদু+অ=যাদব, রঘু+অ=রাঘব, পুত্র+অ=পৌত্র, দুহিতৃ+অ=দৌহিত্র, মনু+অ=মানব, পৃথা+অ=পার্থ ইত্যাদি।
খ) ভক্ত বা উপাসক অর্থে : শিব+অ=শৈব, শক্তি+অ=শাক্ত, বুদ্ধ+অ=বৌদ্ধ, এইরকম ব্রাহ্ম, জৈন, বৈষ্ণব ইত্যাদি।
গ) নিষ্ণাত বা কুশল অর্থে : ব্যাকরণ+অ=বৈয়াকরণ, স্মৃতি+অ=স্মার্ত ইত্যাদি।
ঘ) প্রণীত বা সম্বন্ধীয় অর্থে : পতঞ্জলি+অ=পাতঞ্জল, ইন্দ্র+অ=ঐন্দ্র (ব্যাকরণ), সরস্বতী+অ=সারস্বত (ব্যাকরণ)।
ঙ) বিকার অর্থে : তিল+অ=তৈল, হেম+অ=হৈম, পয়স্‌ (দুগ্ধ)+অ=পায়স।
চ) সম্বন্ধ অর্থে : নিশা+অ=নৈশ, সন্ধ্যা+অ=সান্ধ্য, দেব+অ=দৈব, শরীর+অ=শারীর, এইরকম প্রাকৃত, শারদ, মৌল, চাক্ষুষ ইত্যাদি।
ছ) ভাবার্থে : মুনি+অ=মৌন, লঘু+অ=লাঘব, পুরুষ+অ=পৌরুষ ইত্যাদি।
জ) অবস্থা অর্থে : শিশু+অ=শৈশব, এইরকম কৌমার, যৌবন, স্থবির ইত্যাদি।
ঝ) স্বার্থে : বন্ধু+অ=বান্ধব, চোর+অ=চৌর, কুতূহল+অ=কৌতূহল ইত্যাদি।
ঞ) দেশবাসী অর্থে : মগধ+অ=মাগধ, কুরু+অ=কৌরব, বিদেহ+অ+ঈ=বৈদেহী, পঞ্চাল+অ+ঈ=পাঞ্চালী, দ্রুপদ+অ+ঈ=দ্রৌপদী ইত্যাদি।

অ < অচ্‌
আছে যার এই অর্থে : পাপ+অ=পাপ (পাপী অর্থে), পুণ্য+অ=পুণ্য (পুণ্যযুক্ত অর্থে)।

আয়ন (<ফক্‌)।
ক) বংশধর অর্থে : বাৎস্য+আয়ন=বাৎস্যায়ন, বদর+আয়ন=বাদরায়ণ, ('রামায়ণ' এই 'আয়ন' প্রত্যয়যোগে সিদ্ধ নয়। রাম অয়ন যার এই অর্থে রামায়ণ)।
খ) এই স্থানে জাত অর্থে : দ্বীপ+আয়ন=দ্বৈপায়ন।
এই 'আয়ন'-এর সঙ্গে কৃদন্ত √আয়্‌+অন=আয়নের পার্থক্য লক্ষণীয়। সম্প্রতি প্রচলিত দুষ্কৃতায়ন, বনায়ন, দুর্বৃত্তায়ন, বিশ্বায়ন প্রভৃতি শব্দ 'আয়ন' যোগে গঠিত নয়। এ বিষয়ে অন্‌২ কৃৎপ্রত্যয় দ্রষ্টব্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ই (<ইঞ্) তার পুত্র এই অর্থে : দশরথ+ই=দাশরথি (দশরথের পুত্র), সুমিত্রা+ই=সৌমিত্রি (সুমিত্রার ছেলে)। এইরকম রাবণি, আর্জুনি, কার্ষ্ণি (কৃষ্ণ+ই)।

ইক (<ঠক্, ঠঞ্)—তৎসম্বন্ধীয় অর্থে : বর্ষ+ইক=বার্ষিক, ইচ্ছা+ইক=ঐচ্ছিক (তুলনীয় ইং ic < L, ik < ikos in atomic, Arabic etc.) এইরকম কায়িক, মানসিক, বাচিক, পাশবিক, পারলৌকিক, আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক (অধ্যাত্মন্+ইক) ইত্যাদি। বাংলায় গণতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক, সমসাময়িক পদ বহুল প্রচলিত।

বৃত্তি অর্থে দ্বার=দ্‌ব্ আর, 'ব্' স্থানে উ, তারপর বৃদ্ধি উ>ঔ অর্থাৎ দৌ। দৌবার+ইক=দৌবারিক। নৌ+ইক=নাবিক, জাল+ইক=জালিক, ব্যবহার+ইক=ব্যাবহারিক ব্য > ব্যা (বৃদ্ধি), সাংবাদিক ইত্যাদি।

রচয়িতা অর্থে—সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক ইত্যাদি।

ইত (<ইতচ্) জাত বা যুক্ত অর্থে বিশেষণ : পুষ্প+ইত=পুষ্পিত, এইরকম পল্লবিত, দুঃখিত, সীমিত, মুকুলিত, অঙ্কুরিত, তরঙ্গিত, কবলিত, স্তবকিত, একত্রিত (বাংলা প্রয়োগসিদ্ধ 'একত্রিত 'প্রসঙ্গে সংস্কৃত 'ত' প্রত্যয় দেখুন) ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ 'শিশিরিত' শব্দ গঠন করেছেন : শিশিরিত পুষ্পসম।

ইন্ (<ইনি) আছে যার এই অর্থে—ধন+ইন্=ধনিন্ > ধনী (১মা একবচন), এইরকম জ্ঞানী, গুণী, সুখী, দুঃখী কেশরী, কর্মী ইত্যাদি। দোকানকর্মি (আ. বা ১৯.৪.৯৪) চলবে না।

ইন্ ভাগান্ত শব্দের ১মার একবচনান্ত শব্দটি বাংলায় ব্যবহৃত। কিন্তু প্রত্যয়টিকে সরাসরি 'ঈ' প্রত্যয় বলা অসমীচীন।

ইম < ডিমচ্ : 'এইরূপে বর্তমান' এই অর্থে—অগ্র+ইম=অগ্রিম, অন্ত+ইম=অন্তিম, পশ্চাৎ > পশ্চ+ইম=পশ্চিম।

ইল (<ইলচ্) : যুক্ত অর্থে—পিচ্ছা+ইল=পিচ্ছিল, ফেন+ইল=ফেনিল, পঙ্ক+ইল=পঙ্কিল।

ইষ্ঠ (<ইষ্ঠন্) : দুয়ের অধিকের মধ্যে তুলনায় শ্রেষ্ঠ বোঝাতে : গুরু+ইষ্ঠ=গরিষ্ঠ, লঘু+ইষ্ঠ=লঘিষ্ঠ, বহু (ভূ)+ইষ্ঠ=ভূয়িষ্ঠ (তুলনীয় best)

ইমন্ (<ইমনিচ্) : ভাবার্থে—নীল+ইমন্=নীলিমন্ > নীলিমা (১মা ১বচন), গুরু+ইমন্=গরিমন্ > গরিমা (১মা ১বচন), বহু (ভূ < বৃহু < বহু) +মন্=ভূমন্ > ভূমা (১মা ১বচন), শোণ+ইমন্=শোণিমন্ > শোণিমা (১মা ১বচন)। এইরকম, লঘিমা, অণিমা, দ্রাঘিমা (দীর্ঘ > দ্রাঘ্ + ইমন্), জড়িমা, দ্রঢ়িমা (দৃঢ় > দ্রঢ়+ইমন্), মহিমা (মহৎ+ইমন্), তনিমা, ঘনিমা ইত্যাদি। লালিমা মিশ্রশব্দ—লাল (ফা.)+ইমন্। ইমন্ প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দের ১মার একবচনের রূপটি বাংলায় ব্যবহৃত।

এই ইমন্ প্রত্যয়কে এখন যে সরাসরি 'ইমা' বলা হচ্ছে, তা সমীচীন নয়, কারণ, বাংলা প্রত্যয়ে আমরা সংস্কৃতের অনুবন্ধ বাদ দিয়ে লিখি, যেমন ক্ত=ত অনট্=অন ইত্=ই, তেমনি ইমনিচ্=ইমন্।

ঈ (<ঙীপ্, ঙীষ্) দেবী, ব্রাহ্মণী, পুত্রী ইত্যাদি। নারী শব্দের আদ্যস্বরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃদ্ধি (ন > না)। স্ত্রী প্রত্যয় দ্রষ্টব্য।

ঈন$_1$ (<খ্) : জাত অর্থে : কুল+ঈন=কুলীন, হিতার্থে : সর্বজনীন, বিশ্বজনীন, ব্যাপ্তি অর্থে : সর্বাঙ্গ+ঈন=সর্বাঙ্গীণ, স্বার্থে—নব+ঈন=নবীন।

ঈন$_2$ (<খঞ্) : যোগ্য অর্থে : সর্বজন+ঈন=সার্বজনীন, বিশ্বজন+ঈন=বৈশ্বজনীন। আদ্যস্বরে 'খঞ্' জাত 'ঈন' প্রত্যয়যুক্ত শব্দের বৃদ্ধি হয় (অ > আ) 'গ্রামীণ' খঞ্-জাত ঈন প্রত্যয়যোগে সিদ্ধ। মূল শব্দে আদ্যস্বর 'আ', এই জন্যে বৃদ্ধির প্রশ্ন নেই।

১৫.৯ ■ বিতর্কিত শব্দ

অভ্যন্তরীণ না আভ্যন্তরীণ

সংস্কৃতে এই দুটি শব্দের কোনওটিই ব্যাকরণসিদ্ধ নয়। সংস্কৃতে 'অভ্যন্তর' থেকে যে বিশেষণ সিদ্ধ তা অণ্ যোগে অর্থাৎ 'আভ্যন্তর' (অভ্যন্তর+অ)।

আমরা বাংলায় যেমন খ-জাত 'ঈন' যোগ অভ্যন্তরীণ লিখতে পারি, তেমনি খঞ্ জাত ঈন যোগে আভ্যন্তরীণও লিখতে পারি। এ পর্যন্ত সাহিত্যে 'আভ্যন্তরীণ'ই চলিত ছিল, এখন 'অভ্যন্তরীণ'ও চলছে। অভিধানে দুটিই স্বীকৃত।

বঙ্গীয় শব্দকোষ, বাঙ্গালা ভাষার অভিধান ও বাংলাদেশের ব্যবহারিক অভিধানে শুধু 'আভ্যন্তরীণ'-ই গৃহীত।

আভ্যন্তরীণ গৃহীত হয়েছে চলন্তিকাতে

AMARBOI.COM

ঈয় (< ছ) : সম্বন্ধীয় অর্থে : জল+ঈয় = জলীয়, মদ্+ঈয় = মদীয়, ত্বদ্+ঈয় = তদীয়, স্ব+ক+ঈয় = স্বকীয়, পর+ক+ঈয় = পরকীয়, রাজন্+ক+ঈয় = রাজকীয়। এইরকম শাস্ত্রীয়, যজ্ঞীয় ইত্যাদি।

পূরণ অর্থে : চতুর্ + ঈয় = তুরীয় (চ লোপ)

ঈয় (< ছন্) : তিত্তিরি+ঈয় = তৈত্তিরীয়, নরক+ঈয় = নারকীয়

'ছন্' জাত ঈয় প্রত্যয় যোগে আদ্য স্বরের বৃদ্ধি হবে।

ঈয়স্ (< ঈয়সুন্) দুজনের মধ্যে তুলনায় একজনের উৎকর্ষ বা আতিশয্য বোঝাতে :

গুরু+ঈয়স্ = গরীয়স্ > গরীয়ান্ (১মা ১ব)

বলিন্+ ঈয়স্ = বলীয়ান্ > বলীয়ান্ (১মা ১ব)

শ্রেয়স্+ঈয়স্ = শ্রেয়স্ > শ্রেয়ান্ (১মা ১ব)

'ঈয়স্' প্রত্যয়ান্ত শব্দের ১মার একবচনান্ত পদটি শুধু বাংলায় ব্যবহৃত হয় (হসন্ত বাদ দিয়ে)।

শ্রেয়স্ > শ্রেয় পদটি বাংলায় কল্যাণ বা মঙ্গলার্থ বিশেষ্য হিসেবে প্রযুক্ত হয়।

এয় (< ঢক্) : অপত্য অর্থে

গঙ্গা+এয় = গাঙ্গেয়, রাধা+এয় = রাধেয়, এইরকম কৌন্তেয়, বৈনতেয়, (< বিনতা), সারমেয়, ভাগিনেয় < ভগিনী, মার্কণ্ডেয় (মৃকণ্ড+এয়)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এয় (< ঢঞ্) : পরায়ণ অর্থে
অতিথি+এয় = আতিথেয় ।

ক (< কন্) : স্বার্থে বা হ্রস্ব অর্থে বা নিন্দার্থে
শশ+ক, বাল+ক = বালক, শূদ্র+ক = শূদ্রক ইত্যাদি ।
কল্প (< কল্পপ্) : তুল্যার্থে
আশ্চর্যকল্প, মাতৃকল্প, তরুকল্প ইত্যাদি ।

তন (ট্যু, ট্যুল্) : সেই সময়কার অর্থে
পুরাতন, সনাতন, অধুনাতন, চিরন্তন (চিরম্+তন), সায়ন্তন, তদানীন্তন ইত্যাদি ।

তম১ (< তমট্) : ক্রমবাচক
বিংশতিতম, পঞ্চাশত্তম ইত্যাদি ।
তম২ (তমপ্) : প্রকর্ষার্থে
দীর্ঘতম, প্রিয়তম, ক্ষুদ্রতম ইত্যাদি ।

তর (তরপ্) : দুইয়ের মধ্যে একটির উৎকর্ষ বোঝায় ।
মহৎ+তর = মহত্তর, প্রিয়+তর = প্রিয়তর, বৃহৎ+তর = বৃহত্তর ।
বাংলায় তুলনামূলক ভাবটি অনেক সময় বর্জিত হয় । যেমন, গুরুতর, 'অপেক্ষাকৃত গুরু' না বুঝিয়ে, প্রকর্ষ বা আতিশয্য বোঝায়—গুরুতর পীড়া ।

তস্ (< তসিল্) : উভয়+তঃ = উভয়তঃ, অংশ+তঃ = অংশত, অন্ত+তঃ = অন্ততঃ । আধুনিক বাংলা বানানে এখন বিসর্গ বাদ দিয়েই লেখা হয় ।

তরাং : তর = তম অর্থেই তরাং তমাং প্রত্যয়ের বিধান আছে । 'তমাং' প্রত্যয়ের কোনও শব্দ বাংলায় নেই, আছে 'তরাং' যুক্ত 'সুতরাং' অর্থাৎ অত্যন্ত ভাল । কিন্তু শব্দটিতে অতিশায়নের কোনও অর্থ নেই । এটি 'অতএব' অর্থে প্রচলিত ।
তা (< তল্) : ভাবার্থ
সাধু+তা = সাধুতা, এইরকম সহায়তা, সত্তা, চঞ্চলতা, বিলাসিতা, (বিলাসিন্+তা), সহযোগিতা (সহযোগিন্+তা) 'ইন্' ভাগান্ত শব্দের সঙ্গে 'তা' যুক্ত হলে 'ন্' লোপ পায় । 'সততা' (<সত্তা) শব্দটি অশুদ্ধ হলেও বাংলায় গৃহীত ।

ত্র (< ত্রল্) : সর্বত্র, (সব জায়গায়), একত্র, যত্র (যদ্+ত্র), তত্র (তদ্+ত্র), কুত্র (কিম্+ত্র) । বাংলায় 'কুত্র' শব্দের একক প্রয়োগ নাই । 'কুত্রাপি' সাধুভাষায় চলিত ।

ত্ব : ভাবার্থে
সৎ+ত্ব = সত্ত্ব, তদ্+ত্ব = তত্ত্ব । এইরকম গুরুত্ব, ভ্রাতৃত্ব, মাতৃত্ব, মহত্ত্ব ইত্যাদি ।

থ (< থক্) : ক্রম বা পূরণবাচক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষষ্‌+থ = ষষ্ঠ, চতুর্‌+থ = চতুর্থ, তুলনীয় ইং 'th': sixth, fourth
থা : প্রকারবাচক সর্বথা, অন্যথা ইত্যাদি

দা : কালাধিকরণ বোঝাতে
সর্বদা, একদা, যদা, তদা ইত্যাদি।

ধা : প্রকারবাচক
দ্বিধা, ত্রিধা ইত্যাদি।

ম (< মট্‌) : সংখ্যার ক্রম বোঝাতে
পঞ্চম, দশম।
মৎ (< মতুপ্‌) : শ্রী+মৎ = শ্রীমৎ > শ্রীমান্‌ (১মা ১ব), বুদ্ধি+মৎ = বুদ্ধিমৎ > বুদ্ধিমান্‌। রুচি+মৎ = রুচিমৎ > রুচিমান্‌।
'রুচিবান' শব্দটি অশুদ্ধ হলেও বাংলায় চলে।

অ-কারান্ত ও আ-কারান্ত শব্দের পর মৎ 'বৎ' হয়ে যায়। ধনবান্‌, জ্ঞানবান্‌, প্রজ্ঞাবান্‌ ইত্যাদি। উপধায় 'ম্‌' আছে এমন শব্দে মৎ হয়ে যায় বৎ। লক্ষ্মী+মৎ = লক্ষ্মীবৎ > লক্ষ্মীবান্‌।

এই সব শব্দে বাংলায় হস্‌ চিহ্ন আর এখন ব্যবহার হয় না। শ্রীমান, বুদ্ধিমান ইত্যাদি।

ময় < ময়ট্‌ : বিকার বা ব্যাপ্তি অর্থে
মৃদ্‌+ময় = মৃন্ময়, বাক্‌+ময় = বাঙ্ময়, জলময়, তন্ময় ইত্যাদি।

য (যৎ) : সম্পর্কযুক্ত অর্থে
গ্রাম্য, দিব্য, ন্যায্য ইত্যাদি।
ল : আছে যার এই অর্থে—বৎসল, মাংসল, শ্রীল ইত্যাদি।

বৎ (< বতি) : তুল্যার্থে—স্বপ্নবৎ, মনুষ্যবৎ, পিতৃবৎ।

বিন্‌ : অস্ত্যর্থে—মেধা+বিন্‌ = মেধাবিন্‌ < মেধাবিন্‌ > মেধাবী (১মা ১ব), মায়া+বিন্‌ = মায়াবিন্‌ > মায়াবী, যশস্‌+বিন্‌ = যশস্বিন্‌ > যশস্বী

শ : অস্ত্যর্থে—রোমন্‌+শ = রোমশ। এইরকম লোমশ, কর্কশ ইত্যাদি।
শঃ < শস্‌ : ক্রিয়াবিশেষণে—
বহুশঃ, প্রায়শঃ, ক্রমশঃ ইত্যাদি
আধুনিক বানানে 'ঃ' বিসর্গ বাদ দিয়েই লেখা হয়।
শালিন্‌ : অস্ত্যর্থে—
সৌভাগ্য+শালিন্‌ > সৌভাগ্যশালিন্‌ > সৌভাগ্যশালী (১মা একবচন)। এইরকম, বিত্তশালী, সমৃদ্ধিশালী ইত্যাদি। শালিন্‌ মূলত ইন্‌-ভাগান্ত বিশেষণ শব্দ, কিন্তু প্রত্যয় হিসেবে গৃহীত। √শাল্‌ ধাতুর অর্থ শোভা পাওয়া। শালিন্‌ = শোভমান। বিত্তশালী মানে মূলত বিত্ত দ্বারা শোভমান, পরে অস্ত্যর্থের সঙ্গে অতিশয্যের বা প্রাচুর্যের অর্থ মিশেছে, বিত্তশালী = প্রচুর অর্থ যার।

সাৎ < সাতিচ্‌ : অঙ্গীকৃত অর্থে—আত্মন্‌+সাৎ = আত্মসাৎ, ভস্মন্‌+সাৎ = ভস্মসাৎ, এইরকম ধূলিসাৎ, অগ্নিসাৎ ইত্যাদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলায় প্রচলিত শব্দের গঠনে যে-সব সংস্কৃত তদ্ধিত প্রয়োজন এখানে সেগুলিই শুধু উল্লিখিত হল। চুঞ্চু, চর ইত্যাদি প্রত্যয়জাত জ্ঞানচুঞ্চু বাংলায় কোনও অর্থ বহন করবে কি? প্রাক্তন অধ্যাপক বোঝাতে অধ্যাপকচর চলবে কি? আজকের দিনে কথাটির অর্থ দাঁড়িয়ে যাবে যিনি অধ্যাপক তিনিই চর। ঈশ্বর না করুন।

১৫.১০ ■ শূন্য প্রত্যয়

কৃৎ প্রত্যয়ের ক্বিপ্, ঘি যেমন শূন্য প্রত্যয় তদ্ধিত 'চ্বি ও তেমনি একটি শূন্য প্রত্যয়। চ্ ব্ ই = চি, 'ই' ইৎ-বাচক। চ্ ব্ ইৎ হচ্ছে, একত্র অকারান্ত এবং ই-কারান্ত শব্দকে ঈ-কারান্ত করে তুলেছে। যেমন: স্তূপ+চ্বি√কৃ+ত = স্তূপীকৃত, প্রস্তর+চ্বি+√ভূ+ত = প্রস্তরীভূত, সম+চ্বি+√কৃ+অন = সমীকরণ। এসব ক্ষেত্রে 'অ' কারান্ত শব্দ ঈ-কারান্ত হচ্ছে। রাশি+চ্বি+কৃ+ত = রাশীকৃত, এখানে ই-এর দীর্ঘায়ণ ঘটেছে, তেমনি দীর্ঘায়ণ ঘটেছে লঘূকরণে: লঘু+চি+√কৃ+অন্।

আনন্দবাজার পত্রিকায় আধুনিকীকরণ আর 'আধুনিককরণ' নিয়ে দোমনা ভাব লক্ষ করছি। কোনওদিন আধুনিকীকরণ লেখা হচ্ছে, কোনওদিন আধুনিককরণ—ও কথা আগেও বলেছি। 'আধুনিককরণ' (আ. বা. ২৩.৮.৯৩) দেখে মনে হয় হয়তো আধুনিকীকরণকে বড় বেশি সংস্কৃত বলে 'ঈ' বর্জন করার ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু তা না করাই ভাল, কারণ অভূততদ্ভাবের 'ঈ' প্রত্যয় জাত শব্দ বাংলা বাগ্‌বিধির অন্তর্গত হয়ে পড়েছে। এমন কি বিদেশি শব্দের সঙ্গেও আমরা এই চ্বি-জাত ঈ ব্যবহার করছি। যেমন—বেসরকারীকরণ। শুধু 'আধুনিকীকরণ'কে সহজ করে নিয়ে কি আমরা পার পাব? পরিভাষাতেও এই চ্বি প্রত্যয়জাত শব্দের ছড়াছড়ি। যেমন একাত্মীকরণ (identification), আত্তীকরণ (assimilation), প্রমাণীকৃত (authenticated), দৃঢ়ীকরণ (confirmation), অশ্মীভূত বা শিলীভূত (fossilized), ইত্যাদি। তাই আধুনিকীকরণ, নবীকরণ চলতেই পারে। আধুনিক বা নবীন হতে গিয়ে আধুনিককরণ বা নবকরণের প্রয়োজন নেই। তেমনি 'বেসরকারিকরণ' (আ.বা. ১৩.৮.৯৪) না লিখে বেসরকারীকরণ লেখাই সঙ্গত।

১৫.১১ ■ বিতর্কিত শব্দ

আর্থনীতিক না আর্থনৈতিক না অর্থনৈতিক

দ্বিপদ তৎসম শব্দে তদ্ধিত প্রত্যয় যোগ হলে পূর্বপদের প্রথম স্বরেও বৃদ্ধি হতে পারে, দ্বিতীয় পদের প্রথম স্বরেও হতে পারে, উভয়ক্ষেত্রেও হতে পারে:

১. শুধু পূর্বপদের প্রথম স্বরে বৃদ্ধি: আনুপূর্বক, সার্বজনীন, পৌনঃপুনিক, যৌগপদ্য ইত্যাদি।
২. শুধু দ্বিতীয় পদের প্রথম স্বরে বৃদ্ধি: পিতৃদৈবত, পিতৃপৈতামহ, গুরুলাঘব, শিবভাগবত ইত্যাদি।
৩. উভয় পদের প্রথম স্বরে বৃদ্ধি:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, ঔর্ধ্বদৈহিক ইত্যাদি।

সব সূত্রই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সর্বত্র নিয়ামক সূত্রও নাই। নব্য তৎসম শব্দগুলোর ক্ষেত্রে তাই প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ।

স্বচ্ছন্দে অর্থনৈতিক লেখা চলে, আর্থনীতিকও লেখা চলে, আর আর্থনৈতিক লিখলেও তা ব্যাকরণবিরোধী হবার সম্ভাবনা নাই। এতদিন 'অর্থনৈতিক' চলেছে তাকে—যেন ব্যাকরণ মানছি এই বোধ নিয়ে—আর্থনীতিক করে তোলাও অনাবশ্যক। 'দ্বিপাক্ষিক'কেও দ্বৈপাক্ষিক করা নিষ্প্রয়োজন। তবে পরমাণবিক নয়, কারণ 'পরমাণু'তে বৃদ্ধি কোথাও হয় নাই। 'মা' এসেছে সন্ধিতে : পরম + অণু = পরমাণু। তার সঙ্গে 'ইক' প্রত্যয় করলে পারমাণবিক হবেই।

'সমসাময়িক' চলছে চলবে। একে 'সামসময়িক' করে তোলা নিষ্প্রয়োজন।

'আত্মজৈবনিক' কথাটা অনেকে ব্যবহার করছেন। এতে অশুদ্ধি না থাকলেও বাগ্‌বিধি অনুযায়ী 'ইক' প্রত্যয় ব্যবহার না করে 'আত্মজীবনীমূলক' লেখাই বোধহয় ভাল।

১৫.১২ ■ বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়

আ—ক) স্বার্থে চোর+আ=চোরা, জন+আ=জনা, থাল+আ=থালা, চাঁদ+আ=চাঁদা/(চাঁদামালা)।

খ) সদৃশ অর্থে—হাত+আ=হাতা, বাঘ+আ=বাঘা, কদম+আ=কদমা, ঠেঙ+আ=ঠেঙা ইত্যাদি

গ) অস্ত্যর্থে—নুন+আ=নোনা, তেল+আ=তেলা, জল+আ=জলা

ঘ) আদরে বা তুচ্ছার্থে—কেষ্ট+আ=কেষ্টা, এইরকম গণ্‌শা, রামা ইত্যাদি

ঙ) সেখানে প্রস্তুত বা সেখান থেকে আসা : চিন+আ=চিনা ভৈঁস+আ=ভৈঁসা, পশ্চিম+আ=পশ্চিমা

চ) সমাসান্ত দোটানা, দোনলা, তেভাগা, চৌগোপ্পা (প্-এর দ্বিত্ব)

আই—ক) ভাবার্থে—বড়+আই=বড়াই, পুষ্ট+আই=পোষ্টাই, সাফ+আই=সাফাই, খাড়া+আই=খাড়াই। ধরতা+আই=ধরতাই, খোলতা+আই=খোলতাই।

খ) সম্বন্ধ অর্থে—চোর+আই=চোরাই (মাল), মোগল+আই=মোগলাই (খানা)

গ) আদরে—কান+আই=কানাই, এইরকম জগাই, মাধাই, লখাই ইত্যাদি

আনি : জল বা জলীয়ভাব অর্থে—

আম+আনি=আমানি, চোখ+আনি=চোখানি

এইরকম নাকানি, চোবানি ইত্যাদি

(মূল রূপ পানীয়>পানী>আনী>আনি)

আম বা আমো>মো-আমি-মি : ভাব বা কর্ম অর্থে—

পাকা+আম বা আমো=পাকাম, পাকামো, পাকামি, ন্যাকামি, সভ্যমি (রবীন্দ্রনাথ) ইত্যাদি।

এইরকম নেকামো, বখামো, ডেঁপোমো, জেঠামো, পেজোমো ধাষ্ট্যামো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইত্যাদি

বাঁদর+আমি=বাঁদরামি, এইরকম পাকামি, ডেঁপোমি, ফাজলামি, নষ্টামি, মুখামি, ধূর্তোমি, আলসেমি, ছেলেমি ব্যাদড়ামি, হ্যাংলামি, ক্যাংলামি ইত্যাদি।

গোঁয়ারতুমি শব্দে দুটো প্রত্যয়: গোঁয়ার+তা (সংস্কৃত প্রত্যয়)+মি=গোঁয়ারতামি>গোঁয়ারতুমি (স্বরসঙ্গতি)

আমি$_2$: তৈরি করে যে—ঘর+আমি=ঘরামি।

আর$_1$ (সং-কার> আর) ব্যবসায়ী অর্থে— চাম+আর= চামার, কুম্ভ+আর=কুম্ভার> কুমার

আর$_2$ (সং-আগার) ভাণ্ড+আর=ভাণ্ডার

আরি : ক) বৃত্তি অর্থে—শাঁখা+আরি=শাঁখারি, এই রকম ভিখারি > ভিখিরি (স্বরসঙ্গতি) ধুনারি > ধুনুরি (স্বরসঙ্গতি)।

খ) সদৃশ অর্থে—ঝি+আরি=ঝিয়ারি, মাঝ+আরি=মাঝারি।

আরু : কর্তৃবাচ্যে—দিশা+আরু=দিশারু, দুধ+আরু=দুধারু, ডুব+আরু=ডুবারু, খোঁজ+আরু=খোঁজারু বাক্+আরু=বাগারু (বাচাল)

আল, আলো—ক) সম্বন্ধ বা বৃত্তি অর্থে—কুঠিয়াল

ক) আছে যার বা সংযোগ অর্থ—ধার+আল, আলো=ধারাল, ধারালো এইরকম জমকালো, ঝাঁঝালো, আঠালো, জোরালো, দুধাল, পাঁকাল ইত্যাদি।

খ) পরিধেয় অর্থে—মাথাল

গ) অধিবাসী অর্থে—বঙ্গ+আল=বঙ্গাল > বাঙাল

আলা < ওয়ালা : বৃত্তি অর্থে—গো+আলা=গোয়ালা > গয়লা

বাড়ি+আলা=বাড়িআলা > বাড়িঅলা

স্ত্রীলিঙ্গ আলি, আলা, ওলি, উলি : বাড়িআলা-বাড়িআলি, বাড়িওলি, বাড়িউলি, ঘাটোয়ালি ইত্যাদি

আলি : ভাব, সাদৃশ্য, অধিবাসী, কর্ম ইত্যাদি অর্থে।

মিতা+আলি=মিতালি।

ঠাকুর+আলি=ঠাকুরালি, নিদালি, নাগরালি, চতুরালি, সুতালি>সুতলি, ঘটকালি, মাইয়া+আলি=মাইয়ালি>মেয়েলি (অভিশ্রুতি), গয়ালি (পাণ্ডা) ইত্যাদি।

ই ● আছে যার অর্থে : দাগ+ই=দাগি

এইরকম তেজি, দামি, ভারি

বৃত্তি বা দক্ষতা অর্থে—ঢাকি, সেতারি, ঢুলি, করাতি, হিসাবি, শিকারি, পণ্ডিতি, মাস্টারি, ডাক্তারি, মোড়লি ইত্যাদি।

● যা দিয়ে তৈরি বা যার রঙে তৈরি অর্থে—

রেশমি, পশমি, সুতি, বাদামি, আসমানি, জাফরানি ইত্যাদি

● সেখানে তৈরি অথবা সেখানকার অর্থে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কটকি, শান্তিপুরি, কাশ্মীরি, বৃন্দাবনি, বেনারসি, বিলাতি।
ক্ষুদ্রার্থে : ছোরা+ই=ছুরি, এইরকম কাঠি, পুঁটলি।

ইয়া > এ : সম্বন্ধ অর্থে বা সেখান থেকে আগত,
মাটি+ইয়া>এ=মেটে। এইরকম বেলে, শহরে পাড়াগেঁয়ে, উত্তুরে, পটু বা পণ্ডিত অর্থে—ব্যাকরণিয়া (ব্যাকরণিয়া রবীন্দ্রনাথ—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়) ইত্যাদি
বৃত্তি অর্থে জাল+ইয়া>এ=জেলে

উ : আদরে বা তাচ্ছিল্যে—দুখু, কালু, ছোটু, খুকু, পাঁচু, পঞ্চু, হরু (< হর [নাথ]), কানু < কান, রাধু (< রাধা [নাথ]), বাবলু, হীরু (<হীরা) ইত্যাদি
আছে যার অর্থে : ঢাল+উ=ঢালু

উয়া > ও : সম্বন্ধ বা সংযোগ বোঝাতে—
জল + উয়া > ও=জ'লো, জোলো, বন+উয়া > ও=বুনো
এইরকম মেঠো, জ্বোরো (রোগী), ঝোড়ো (কাক)।
ছোট বা আদরের বোঝাতে—জুতুয়া, বুধুয়া ইত্যাদি।
সমাসান্ত—ঘরমুখো, হুঁকোমুখো, বিড়ালচোখো ইত্যাদি।

ওয়া : সম্বন্ধ অর্থে—ঘরোয়া; আগোয়া

ক : প্রসারে বা ছোট বোঝাতে—ঢোলক, ধনুক, দমক ফলক ইত্যাদি
কিয়া>কে ; পণকিয়া> পণকে, পুনকে, শতকিয়া > শত্কে, ছিচকিয়া>ছিচকে।
কি : ভাইয়ের স্ত্রী অর্থে : বড়কি, ছোটকি > ছুটকি ইত্যাদি
করা : 'প্রতি-অর্থে—শতকরা; মণকরা; সেরকরা।
কার, কের : সম্বন্ধ বিভক্তি বোঝাতে—আজিকার, আজকের, সেদিনকার, কবেকার।

চ : স্বার্থে, ক্ষুদ্রার্থে বা সাদৃশ্যে—কানাচ, কোনাচ।

জা < জায়া—ওই বংশের এই অর্থে
ঘোষজা, বোসজা ইত্যাদি
ট : মাথা+ট=মাথট (=মাথাল)
লিঙ্গ+ট=লিঙ্গট>লেঙ্গট>লেঙট।
টা : সাদৃশ্য বা সম্বন্ধ বোঝাতে—চ্যাপটা<চাপটা, ঝাপটা, নেং<নগ্ন+টা=নেংটা।
টি : মুখ+টি=মুখটি (=ঢাকনি)

টিয়া > টে : স্বার্থে বা ঈষৎ অর্থে—ঘোলা+টিয়া > টে=ঘোলাটে
সাদৃশ্যে তামাটে, আঁষটে, বকাটে ইত্যাদি।
পটু অর্থে—ঝগড়া+টে=ঝগড়াটে।

ড়া, ড়ি : স্বার্থে বা সাদৃশ্যে—
রাজা+ড়া=রাজড়া, এইরকম গাছড়া, কাঠড়া, পাতড়া, চামড়া, খাগড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইত্যাদি।

শ্বশ্রূ > শাশ+ড়ি=শাশড়ি > শাশুড়ি।
কাটরা, টুকরা, পেঁটরা, ভায়রা < ভাইরা ইত্যাদি শব্দে। 'ড়া' 'রা'-তে রূপ নিয়েছে।
তেমনি বাঁশড়ি হয়েছে বাঁশরি>বাঁশুরি।
তুতো সম্বন্ধ অর্থে—জ্যাঠতুতো, জ্যেঠাতো, মাসতুতো।

ন : প্রসারে, নি, নি, অনা আনা, ইনি উনি, উন :
স্ত্রীবাচক—সতিন, বেয়ান, চাকরানি, ঠাকরুন, ঠান, নাতিন্‌, ডাক্তারনি, সেকরানি, সাপিনি, বাঘিনি ইত্যাদি।
এই প্রসঙ্গে উনবিংশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য
না : স্বার্থে—পাখনা, বাস্‌না।

পনা : ভাববাচক—গিন্নিপনা, বেহায়াপনা, ঢিটপনা, দুরন্তপনা, নেকাপনা, কুলোপনা ইত্যাদি।
এই 'পনা' হিন্দি 'পন'-এর (বচপন, বড়প্পন) রূপান্তর।

পানা : সাদৃশ্যে : চাঁদপানা, বোকাপানা, কুলোপানা (কুলোপানা চক্কর) ইত্যাদি।
মন্ত, বন্ত<মৎ, বৎ : আছে যার এই অর্থে—শ্রীমন্ত, বুদ্ধিমন্ত, ভাগ্যবন্ত, গুণবন্ত, পয়মন্ত। ফার্সি 'মন্দ্‌' প্রত্যয়ের প্রভাব থাকা স্বাভাবিক।

পারা<প্রায় : সাদৃশ্যে—পাগলপারা, সোনাপারা (মুখ) ইত্যাদি।
লা ॥সাদৃশ্যে—পাতলা
রা : নির্মিত বা সম্বন্ধ অর্থে—কাঠরা (কাঠের তৈরি), ভাগরা (ভাগ সম্বন্ধীয়, ভাগরা ধাম।
রে > রিয়া: বৃত্তি অর্থে—হাটুরে, কাঠুরে।
লা : স্বার্থে, পূরণার্থে বা সদৃশ বা যুক্ত অর্থে—একলা, দোকলা, আধলা, নওল, কাতলা।
হারা ॥ পল্ল অর্থে একহারা, দোহারা, ইত্যাদি।

১৫.১৩ ■ বিদেশি তদ্ধিত

বাংলার শব্দসম্ভার বিষয়ে আলোচনাপ্রসঙ্গে বিদেশি শব্দের প্রসঙ্গে এসেছি আমরা। বিশেষ করে ফারসি, তুরকি, আরবি শব্দের তদ্ধিত প্রত্যয়গুলো বাংলার নিজস্ব শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সংকর শব্দের সৃষ্টি করেছে।

আনা, আনি : আচরণ অর্থে—বাবু+আনা, আনি=বাবুয়ানা, বাবুয়ানি। এইরকম, গরিবানা, সাহেবিয়ানা, মুন্সিয়ানা, 'মাদিয়ানা' (নজরুল), 'একেলিয়ানা' (বুদ্ধদেব বসু) ইত্যাদি।
কি<গী, ইয়ার+কি=ইয়ারকি।

খানা : স্থান বা দোকান অর্থে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুদিখানা, ডাক্তারখানা, ছাপাখানা, শুঁড়িখানা ইত্যাদি

খোর : খায় যে অর্থে—গুলিখোর, গাঁজাখোর, ঘুষখোর, হারামখোর (নিষিদ্ধ জিনিস খায় যে) ইত্যাদি।

গর : 'করে যে বা গড়ে যে' অর্থে—কারিগর, বাজিগর, সওদাগর। এইরকম জাদুগর, কারিগর, ইত্যাদি।

গিরি : ব্যবসা অর্থে—বাবুগিরি, কেরানিগিরি, পাণ্ডাগিরি ইত্যাদি। মূল প্রত্যয় ফার্সি 'গরী', স্বরসঙ্গতিতে 'গিরি'।

চা-চি : ক্ষুদ্র অর্থে ডেগ+চি=ডগচি, বাগিচা, নলিচা, ব্যাঙাচি ইত্যাদি। মূল প্রত্যয় ফার্সি 'চহ্'

চী>চি : ব্যবসায়ী বা বাহক অর্থে—খাজাঞ্চি, মশালচি, ধুনুচি, বাবুর্চি। মূল প্রত্যয় তুর্কি 'চী'>চি।
খজানা+চি=খাজান্‌চি=খাজাঞ্চি (দ্বিমাত্রিকতা)।

তর, তরো < তর : প্রকার অর্থে—যেমনতর, কেমনতরো (তোমার খেলা কেমনতরো ?) ইত্যাদি। মূল প্রত্যয়টি ফার্সি 'তরহ্'

দান, দানি : আধার অর্থে—কলমদান-কলমদানি, পিকদান-পিকদানি, নিমকদান-নিমকদানি ইত্যাদি।

দার : ধারক বা কর্তা অর্থে—ফাঁড়িদার, চৌকিদার, ছড়িদার, অংশীদার, জমিদার, চকলাদার, হাকিমদার যুক্ত অর্থে—বুটিদার, চটকদার ইত্যাদি।

নবিশ : লেখক অর্থে—নকলনবিশ, হিসাবনবিশ, খাসনবিশ

বন্দ, প্রসারে বন্দি—বদ্ধ বা গৃহীত অর্থে—ইজারাবন্দ, বাক্সবন্দি, বাঘবন্দি, নজরবন্দি। বাংলা বন্ধ শব্দের সাদৃশ্য থাকায় গলাবন্ধ কোমরবন্ধ হয়েছে গলাবন্দ, কোমরবন্দ।
'বন্দী' না লিখে 'বন্দি' লেখাই ভাল।

বাজ, বাজি : পটু বা অভ্যস্ত অর্থে—মামলাবাজ, ধোঁকাবাজ, ধড়িবাজ। বিশেষ্যে 'তার কাজ' অর্থে—গলাবাজি, ধোঁকাবাজি, ফেরেববাজি, ফাঁকিবাজি ইত্যাদি।

সহি, সই : যোগ্য বা উপযুক্ত অর্থে—মাপসই, মানানসই, বুকসই, দশাসই, চলনসই, লাগসই ইত্যাদি। মূল প্রত্যয় আরবি 'সহীহ্'।

স্তান : বাসভূমি, দেশ বা আধার অর্থে—বাংলা স্থান শব্দের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গিয়েছে : হিন্দুস্তান > হিন্দুস্থান, পাকিস্তান > পাকিস্থান।

১৫.১৪ ■ কৃদন্ত-তদ্ধিতান্ত শব্দে ধ্বনিপরিবর্তন

যদিও এ সম্বন্ধে প্রসঙ্গত কিছুটা দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, এখানে একসঙ্গে মূল পরিবর্তনের ধারাগুলি উপস্থাপিত হল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃদন্ত শব্দ (সংস্কৃত)

গুণ : নেতা<নী, এষণা (<ই), **বৃদ্ধি** : পাঠ (<পঠ্), শান্ত (<শম্), **সম্প্রসারণ** : উক্ত<বচ্, সুপ্ত<স্বপ্ ।
স্বরাগম : পঠিত (<পঠ্), **ব্যঞ্জনলোপ** : গত<গম্ ।
ব্যঞ্জনাগম : ভৃত্য<(ভৃ), ইন্দ্রজিৎ (ইন্দ্র-জি)
ব্যঞ্জনান্তর : ত>ন (স্না+ত=স্নান), ত>ক (শুষ্+ত=শুষ্ক), ত>ব (পচ্+ত=পক্ব. ত>ম (ক্ষৈ+ত=ক্ষাম) ।
চ্>ক্ (বি-বিচ্+অ=বিবেক), জ্>ক্ (ভুজ্+ত=ভুক্ত, জ্>গ্ (রুজ্+ত=রুগ্ণ)
জ্>ষ=(সৃজ্+তি=সৃষ্টি)
স্বরপরিবর্তন : আ>ই (স্থা+তি=স্থিতি), < ঋ (দীর্ঘ ঋ) > ইর্, ঈর্ (কিরণ, কীর্ণ)
এছাড়া সন্ধিগত পরিবর্তন তো আছেই,
যেমন, কিংকর (<কিম্), আত্মম্ভরি (<আত্মন্), সৃষ্টি<সৃষ্+তি) ।

কৃদন্ত শব্দ (বাংলা)

স্বরসঙ্গতি : ডুবডুব>ডুবুডুবু, কাঁদনি>কাঁদুনি, পড়ুয়া>পোড়ো, খাইকা>খেকো ।
সমীকরণ : কাঁদ্না>কান্না, ধর্না>ধন্না ।
ব-শ্রুতি : খা+আ=খাওয়া, হ+উ=হবু
গুণ : মুড়্+ক=মোড়ক ।

তদ্ধিতান্ত শব্দ (সংস্কৃত)

তদ্ধিতে ধ্বনিপরিবর্তন প্রধানত বৃদ্ধিজনিত : বার্ষিক, ভৌম, নৈশ, কৌন্তেয়, কার্পণ্য ।
এ ছাড়া, স্বরলোপ : লঘু+ইমন্=লঘিমা (লঘু>লঘ্)
স্বরাগম : (ব্যতিহারে) কেশ কেশ>কেশাকেশি (কেশ+আ কেশ+ই)
সন্ধিজাত ধ্বনিপরিবর্তন তো আছেই : চতুঃ+তয়=চতুষ্টয়, ষষ্+থ=ষষ্ঠ ।

তদ্ধিতান্ত শব্দ (বাংলা)

অভিশ্রুতি : মাটিয়া>মেটে, মাঠুয়া>মেঠো ইত্যাদি ।
দ্বিতীয়-স্বরলোপ (দ্বিমাত্রিকতা) : রাজা+ড়া=রাজড়া (রাজারাজড়া), কাবুলিয়া>কাব্লে, রেশম+ই>রেশমি, গাড়িওয়ান>গাড়ওয়ান>গাড়োয়ান, শতকিয়া (শত্কে)
স্বরসঙ্গতি : মুখ+টি=মুখটি>মুখুটি
জুতা+উয়া=জুতুয়া

১৫.১৫ ■ কৃদন্ত-তদ্ধিতান্ত শব্দ এবং অর্থান্তর

তদ্ধিতের ক্ষেত্রে :

'কুলীন'—মূল অর্থ এখানে কুলে জাত, ব্যঞ্জনায় যিনি উচ্চকুলে জাত ।
অস্ত্যর্থক শ, ল : রোমশ, মাংসল ইত্যাদি শব্দে অত্যধিক পরিমাণে আছে এই অর্থে প্রযুক্ত ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'র' শুধু স্বার্থপ্রত্যয় নয়। নখর—খুব বড় নখ বোঝাতেই প্রযুক্ত।

সম্বন্ধার্থে আহ্নিক বা পারিতোষিক শুধু অহন্ বা দিনসম্বন্ধীয় বা পরিতোষ-সম্বন্ধীয় না বুঝিয়ে যথাক্রমে 'জপ' বা 'পুরস্কার' বোঝাচ্ছে। শ্রেষ্ঠ—ইষ্ঠন্ প্রত্যয় এখানে তার superlative-এর অর্থ ত্যাগ করে শুধু প্রশস্য বা উত্তম অর্থে প্রযুক্ত।

কৃৎ-প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে :

'ম্রিয়মাণ' যে মরছে এই অর্থে না বুঝিয়ে ম্লান অর্থ বোঝাচ্ছে।

মুমূর্ষুও তেমনি মরতে ইচ্ছুক না বুঝিয়ে 'মর মর' বোঝাচ্ছে।

'উপাদেয়' তার 'গ্রহণীয়' অর্থে ছাড়িয়ে—উৎকৃষ্ট অর্থে উন্নীত হয়েছে। 'সৎ' 'বর্তমান' অর্থ থেকেও 'সাধু' (সচ্চরিত্র) অর্থে চলছে।

'বিরাট' 'বিরাজিত' অর্থ ত্যাগ করে—'প্রকাণ্ড' অর্থে নীত হয়েছে।

'চর্ব্যচূষ্য' <বাং চর্ব্যচোষ্য

'উপাদেয়' খাদ্যসামগ্রী অর্থে ব্যবহৃত : শ্বশুরবাড়ির চর্ব্যচোষ্য ছেড়ে সে সহজে নড়ছে না।

এ-সব শব্দ যৌগিক, যোগরূঢ় ও রূঢ় শব্দ হিসেবেও চিহ্নিত হতে পারে। উপসর্গযোগে ধাত্বর্থ-পরিবর্তনের কথা উপসর্গের আলোচনায় বলা হয়েছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬
উপসর্গ

[উপসর্গের স্বরূপ—উপসর্গযোগে ধাতুর অর্থের পরিবর্তন—বিচ্ছিন্ন উপসর্গ—উপসর্গের বিভাগ— উপসর্গের স্বতন্ত্র অর্থ আছে কি না— সংস্কৃত উপসর্গ ও শব্দগঠন— পরিভাষা ও উপসর্গ— পরিভাষাগঠনে উপসর্গ— বাংলা উপসর্গ—বিদেশি উপসর্গ]

১৬.১ ■ উপসর্গের স্বরূপ

● 'নত' বললে নতির ভাবটা যতটুকু প্রকাশ পায়, 'প্রণত' বললে নতির ভাবটা তার চেয়ে আরও বেশি তা বোঝা যায়। এই 'প্র' হল উপসর্গ, ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তা ধাতুর অর্থকে বিশেষিত করল। তাই উপসর্গের এই লক্ষণ দেখে প্রাচীন বৈয়াকরণেরা একে 'ক্রিয়াবিশেষক' বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ উপসর্গকে মাছের ছোট্ট পাখনার সঙ্গে তুলনা করেছেন, যে পাখনার চালনে মাছ ডাইনে বাঁয়ে বা সামনে পিছনে বিশেষ গতি লাভ করে। পাণিনি যে 'গতি' সংজ্ঞাটি ব্যবহার করেছেন (১৬.৮ দেখুন) তার সঙ্গে অর্থের এই গতিবদলের সম্পর্ক থাকা বিচিত্র নয়।

● উপসর্গ বেশ প্রাচীন। বৈদিক সাহিত্যে তা ধাতুবিযুক্ত হয়েও ব্যবহৃত হয়েছে, অন্য শব্দের ব্যবধানে। যেমন, আ নো ভদ্রাঃ ক্রতবো যন্তু সর্বতঃ। এখানে 'আযন্তু' একত্রে নেই। তেমনি—পরবর্তী সংস্কৃতেও এ-ধরনের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, মনুসংহিতায় 'অভি ভো রম্যতাম্' অর্থাৎ ভো অভিরম্যতাম্।

● **সংস্কৃত উপসর্গ** প্রধানত কুড়িটি।

প্র, পরা, অপ, সম্, অনু, অব, নির্, দুর্, অভি, বি, অধি, সু, উদ্, অতি, নি, প্রতি, পরি, অপি, উপ, আ

মনে রাখবার জন্যে এগুলোকে ছন্দে গেঁথে দেওয়া হয়েছে :

প্রপরাপসমন্ববনির্দুরভি-
ব্যধিসূদতিনিপ্রতিপর্যপয়ঃ।
উপ আঙ্ ইতি বিংশতিরেষ সখে
উপসর্গবিধিঃ কথিতঃ কবিনা ॥

● এই উপসর্গগুলি ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধাতুর অর্থের পরিবর্তন ঘটায়।

যেমন, প্রহার, আহার, সংহার, বিহার, পরিহার। এখানে 'হৃ' ধাতুর মূল অর্থ বদলে দিয়েছে প্র, আ, সম্, বি ও পরি।

ধাতুর আগে উপসর্গের সঙ্গে প্রত্যয় যোগ বোঝাতে আমরা উপসর্গের পরে 'পূর্বক' শব্দটির ব্যবহার করি। যেমন, 'প্রহার' শব্দটির বেলায় আমরা বলব প্র-পূর্বক 'হৃ' ধাতু ঘঞ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে পড়বে সুকুমার রায়ের ছড়া :

"পরিপূর্বক 'বিষ' ধাতু তাহে অনট্ বসে,
তবে ঘটায় পরিবেষণ, লেখা অমরকোষে।"

একটি শ্লোকে টীকাকার দুর্গাদাস উপসর্গকে তিনভাগে ভাগ করেছেন :

ধাত্বর্থং বাধতে কশ্চিৎ কশ্চিত্তমনুবর্ততে।
তমেব বিশিনষ্ট্যন্য উপসর্গগতিস্ত্রিধা ॥

অর্থাৎ, কোথাও তা ধাত্বর্থের নিবারক বা পরিবর্তনসাধক, কোথাও অনুবর্তক, কোথাও বা বিশেষক।

উদাহরণ যথাক্রমে, আগমন, অভিগমন, অনুগমন।

● আমরা দেখছি উপসর্গযোগে ধাতুর অর্থের পরিবর্তন ঘটছে, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে উপসর্গগুলোর কি নিজস্ব অর্থ আছে? এই প্রশ্ন তুলেছেন প্রাচীন বৈয়াকরণেরা। শাকটায়ন বলেন ধাতু-বিচ্ছিন্ন হলে উপসর্গের নিজের কোনও অর্থ থাকে না। কিন্তু গার্গ্যপ্রমুখ বৈয়াকরণেরা বলেন, পৃথকভাবেও উপসর্গের অর্থ আছে। পাণিনি এ বিষয়ে স্পষ্টত কোনও মত দেননি, তবে তাঁর বিভিন্ন সূত্রবিশ্লেষণ করে মনে হয় তিনি যেন বলতে চেয়েছেন, আসলে ধাতুর মধ্যেই বিভিন্ন অর্থের ব্যঞ্জনা আছে, উপসর্গ সেইসব ভাবপ্রকাশে উপলক্ষ মাত্র। ভর্তৃহরি, কৈয়ট, নাগেশ প্রমুখ বৈয়াকরণেরা জোর দিয়েই বলেন উপসর্গের কোনও অর্থ নেই, উপসর্গ হল 'দ্যোতক', 'বাচক' নয়।

অর্থাৎ, তা অর্থের দ্যোতনা করতে পারে, কিন্তু নিজস্ব অর্থ নেই তার। এই নিয়ে কূটতর্কের মধ্যে না গিয়ে আমরা বলতে চাই 'দ্যোতকতা' আর 'বাচকতা' অনেকটা একই : 'প্র'-এর মধ্যে একটা প্রথম বা প্রকর্ষের অর্থ লক্ষ করি, প্রভাত, প্রণাম ইত্যাদি অর্থে ওই অর্থ ধরা পড়ে।

এবারে উপসর্গের মোটামুটি অর্থ ও তা দিয়ে শব্দগঠনের উদাহরণ দিই আমরা।

১৬.২ ■ সংস্কৃত উপসর্গ :

প্র—সম্মুখ, প্রথম, প্রকৃষ্ট অর্থে : প্রগতি, প্রমাণ প্রভূত, প্রকীর্ণ, প্রকোপ, প্রক্রম, প্রক্রিয়া, প্রখর, প্রগাঢ়, প্রজনন, প্রণাম ইত্যাদি।

পরা—দূরে, বাইরে পিছনে বা বিপরীতার্থে
পরাগত, পরাজয়, পরাবৃত্ত, পরাকৃত (=অবজ্ঞাত)।

অপ—দূরে, নিকৃষ্ট বা বিকৃত বা কু অর্থে :
অপহৃত, অপমান, অপরাধ, অপভাষণ, অপশ্রুত, অপচিন্তা।

সম্—সম্যক্, সহ, সম, অর্থে :
সঞ্চয়, সন্নিধি, সম্মুখ, সম্মেলন, সমিতি, সংগত, সন্ধি ইত্যাদি।

অনু—পরে বা কোনও কিছুর দিকে অর্থে :
অনুমান, অনুকরণ, অনুগত, অনুচর, অনুজ, অনুভব ইত্যাদি।

অব—নিম্নে, বা নিম্নদিকে বা প্রকৃষ্ট অর্থে : অবগাহন, অবমান, অবরোধ, অবনয়ন, অবচয়, অবলীন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্—বহির্গত বা নাই অর্থে :

নির্গমন, নির্বাহ, নির্ণয়, নিষ্পত্তি, নিঃসন্দেহ, নিরুত্তর ইত্যাদি।

দুর্—মন্দ বা কঠিন অর্থে :

দুরদৃষ্ট, দুর্নীতি, দুর্দম, দুঃসহ, দুষ্প্রাপ্য ইত্যাদি।

অভি—প্রতি, উপরে, দিকে অর্থে :

অভিগমন, অভিকর্ষ, অভিবাদন, অভিনয় ইত্যাদি।

বি—বিশেষ, বিশিষ্ট, বিগত, বহির্গত অর্থে :

বিকিরণ, বিক্রম, বিক্ষোভ, বিহার, বিরক্ত, বিবেক, বিদীর্ণ ইত্যাদি।

অধি—উপরে বা মধ্যে অর্থে :

অধিষ্ঠিত, অধ্যুষিত (অধি+উষিত), অধিবেশন, অধিপতি, অধিবাসী, অধিকরণ।

সু—উৎকৃষ্ট, সহজসাধ্য অর্থে :

সুকৃতি, সুগঠিত, সুগীত, সুকর, সুলভ, সুপাচ্য ইত্যাদি।

উদ্—উপরে, উপরের দিকে, বাহিরে অর্থে :

উদ্ভিন্ন, উদিত, উৎক্রমণ, উদ্বৃত্ত ইত্যাদি।

অতি—অতিক্রমণ ও অতিরিক্ত অর্থে :

অতিক্রম, অতিরঞ্জন, অতীত, অত্যাচার, অতিবর্ষণ ইত্যাদি।

নি—নিম্নে, ভিতরে, পূর্ণরূপে অর্থে :

নিপতিত, নিবাস, নিরত, নিমেষ, নিধান, নিমগ্ন, নিক্বণ, নিগূঢ় ইত্যাদি।

প্রতি—বিরুদ্ধে, বিপরীতে অর্থে :

প্রতিপক্ষ, প্রতিষেধক, প্রতিঘাত, প্রতিবন্ধ ইত্যাদি।

পরি—চতুর্দিকে বা ব্যাপকভাবে অর্থে :

পরিক্রমা, পরিভ্রমণ, পরিদর্শন, পরিবেষণ।

অপি—ভিতরে বা সন্নিকটে অর্থে :

অপিনিহিতি।

অপি উপসর্গে 'অ' লুপ্ত হয় বিকল্পে, প্রয়োগে শুধু পি : পিনদ্ধ (ঘনপিনদ্ধ=আঁট করে বাঁধা), পিধান (=তূণীর)।

উপ—দিকে, প্রতি, সন্নিকটে :

উপবেশন, উপস্থিত, উপকার, উপহার, উপনিবেশ, উপচয়।

আ—প্রতি, ঈষৎ, বা সম্যক্ বা বিপরীত অর্থে :

আগমন, আকীর্ণ, আক্ষেপ, আগামী, আদান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দ গঠনে একাধিক উপসর্গ

যেমন : পর্যবেক্ষণ (পরি-অব-√ঈক্ষ্+অন)
প্রণিপাত (প্র-নি-√পৎ+অ)
বিন্যস্ত (বি-নি-√অস্+ত)
বিপরীত (বি-পরি-√ই+ত)
সন্ন্যাসী (সম্-নি-√অস্+ইন্)
ব্যতিব্যস্ত (বি-অতি-বি-√অস্+ত)
সমভিব্যাহার (সম্-অভি-বি-আ+√হৃ+অ) (২২)

- প্র, পরা প্রভৃতি উপসর্গের মতো আরও কিছু অব্যয় আছে। এগুলিও ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয় ! এগুলিকে 'গতি' বলে
  আবিঃ (দৃষ্টিগোচর অর্থে)—আবিষ্কার, আবির্ভাব।
  তিরঃ (অদৃশ্য হওয়া অর্থে)—তিরস্কার, তিরোভাব, তিরোধান।
  পুরঃ (সামনে অর্থে)—পুরস্কার, পুরোধা, পুরোবর্তী।
  বহিঃ (বাইরে অর্থে)—বহিষ্কার, বহির্ভূত।
  অলম্ (সম্যক্ বা পর্যাপ্ত অর্থে) : অলংকার।
  সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষ, সমক্ষ) : সাক্ষাৎকার, সাক্ষাদ্দর্শন।
- ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত না হলে প্র-পরা ইত্যাদিকে উপসর্গ না বলে অব্যয় বলতে হবে। যেমন,
  সমুদ্র পর্যন্ত=আসমুদ্র
  শৈশব হইতে=আশৈশব
  কূলের সমীপে=উপকূল
  মূর্তির সদৃশ=প্রতিমূর্তি

AMARBOI.COM

পরিভাষা রচনায় উপসর্গ

পরিভাষা রচনায় এই উপসর্গের ব্যবহার খুব কাজে লাগে। যেমন,
পরিবাহী (conductor),
অপেরণ (aberration)
অধিগ্রহণ (requisition)
অপায়ন (smuggling)
আবণ্টন (allotment)
অপচিতি (catabolism)

এইসব উদাহরণ উপসর্গগুলি ধাতুর সঙ্গে যোগ আছে (পরি-√বহ্, অপ-√ঈর্, অধি-√গ্রহ্, অপ-√ই, আ-√বণ্ট্, অপ-√চি)।

- ধাতুনিরপেক্ষভাবেও উপসর্গকে কাজে লাগানো হয়, পরিভাষা গঠনে, যেমন,
  অপকেন্দ্র (centrifugal)
  অভিকেন্দ্র (centripetal)
  উত্তল (concave)
  অধিবিদ্যা (metaphysics)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরাক্ষ (major axis)
উপাক্ষ (minor axis) ইত্যাদি।

- 'নির্বীজন' (sterilization)
'নির্বীজকে' শূন্যপ্রত্যয়যোগে নামধাতু করে নেওয়া হয়েছে : নির্বীজ+শূন্যপ্রত্যয়=√নির্বীজ+অন=নির্বীজন।
- অন্তঃ বা সহ প্রভৃতি উপসর্গস্থানীয় অব্যয়কেও কাজে লাগানো হয়েছে। যেমন, অন্তর্জনিক্ষু (endogenous), সহভাবী (concommitance) ইত্যাদি।
- পরিভাষাস্থানীয় কিছু প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ (উপসর্গযোগে গঠিত) :
অন্বাহিত—গচ্ছিত জিনিস মালিককে ফেরত দেবার জন্যে অন্য কারও হাতে সমর্পণ
অবঘুষ্ট—ঘোষণা দ্বারা প্রচার
অবচ্ছায়া—জলে প্রতিবিম্বিত বৃক্ষাদির ছায়া
আস্কন্দ—অশ্বের গতিবিশেষ
নির্ঘাত—প্রবল বায়ু বা অন্য জিনিসের সংঘর্ষজনিত শব্দ
নির্হরণ—শবদেহকে ঘর থেকে বাইরে আনা
নিরঞ্জনা, নীরাজনা (নিঃ+রাজনা)—দুর্গাদি প্রতিমার বিসর্জন
পরিক্রিয়া—পরিখা দ্বারা বেষ্টন
পরিবেদন—জ্যেষ্ঠ বর্তমানে কনিষ্ঠের বিবাহ
প্রত্যালীঢ়—বাঁ-পা প্রসারিত করে ডান পা সংকুচিত করে অবস্থান (মৃগয়ায়)
সম্প্রেক্ষণ—জলসেচনে খাদ সংস্কার
সংসর্প—সাপের মতো আঁকাবাঁকা পথ।

১৬.৩ ■ কয়েকটি গ্রিক ও লাতিন উপসর্গ

মূল অর্থ জানলে শব্দানুবাদে বা পরিভাষা গঠনে বাংলা উপসর্গ বা সমতুল্য অন্য শব্দ ব্যবহার সহজ হবে।

গ্রিক

an-=not, without : নঞর্থক
  ন>অ, অন্ ও নির্
  anonymous=অ-নামা (অজ্ঞাতনামা)
  anemia=নিঃ+রক্ততা=নীরক্ততা (রক্তশূন্যতা)।

dia=through, across, পরি, উপ, সম্
  diagnosis=পরিজ্ঞান
  dialect=উপভাষা
  dialogue=সংলাপ

hemi=half=অর্ধ
  hemisphere অর্ধগোলক (=গোলার্ধ)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

homo=same=সম

homonym=সমনাম

meta : between, after, with

changing : অপি, অনু, প্রতি, অন্তর, পরা

metathesis=অপিনিহিতি

metamorphosis=পরারূপ

neo=new

neoliterate=নবসাক্ষর

para=beside, near, beyond

উপ, অতি

paradoxical=beyond belief

অতিপ্রত্যয় (প্রত্যয়াতীত)

লাতিন

ab=from, away from : অপ abuse=অপপ্রয়োগ

bi=দ্বি, bicycle=দ্বিচক্র (যান) binacular=bi(n)acular=two-eyes দ্বিনেত্র (আক্ষরিক অর্থে)

contra=against বি, প্রতি contradict=say against (বি-√বচ্, √ভাষ্) controversy=বিতর্ক ex=out, out of, নি, বহিঃ exit=নির্গমন, বহির্গমন inter=অন্তঃ, আন্তঃ international=আন্তর্জাতিক intra=অন্তঃ, আন্তঃ intervenous=আন্তর্ধমনী

AMARBOI.COM

pro=for, before, forward, প্র, উপ, প্রতি progress=প্রগতি

super=over, above, beyond, অতি, উপরি superman=অতিমানব

- রবীন্দ্রনাথ 'শব্দতত্ত্বে'র উপসর্গ-সমালোচনা নিবন্ধে বাংলা ও গ্রিক-লাতিন উপসর্গের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এই আলোচনায় উইল্‌কিন্‌স্ অনুসরণে বলেছেন—'অ কোথাও e, i এবং কোথাও o, u আকার ধারণ করিয়াছে। ইহা হইতে একথা অনুমান করা যাইতে পারে যে মূল আর্য ভাষায় যাহা অন্ ছিল, ইউরোপীয় আর্য ভাষায় তাহা ইন্ ও এন্ হইয়াছে। লাটিন ইন্ উপসর্গের উত্তর তর প্রত্যয় করিয়া inter, intra, intro প্রভৃতি শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। সংস্কৃত 'অন্তর' শব্দের সহিত তার সারূপ্য সহজেই হৃদয়ংগম হয়।'

মূলত প্রবন্ধটি রবীন্দ্র-অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মরণীয় প্রবন্ধ 'উপসর্গবিচার' প্রসঙ্গেই। রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এই প্রবন্ধের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ এর উপযুক্ত জবাব দিন। দ্বিজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন 'রবি, সমালোচনা কতদূর এগোলো। ...হাল ছেড়ে দেওনি তো ? I am afraid তুমি বলবে—কাজে ব্যস্ত আছি অতএব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখনো লিখতে পাচ্ছি নে। But that wont do। —তোমাদের বড়দাদা।
চিঠিখানি মাঘ-চৈত্র সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৫৮ সালে।

১৬.৪ ■ বাংলা উপসর্গ

বাংলা উপসর্গ সংস্কৃতের মতো সর্বত্র ধাতুর সঙ্গে যুক্ত নয়।

অ১ (না বা মন্দ অর্থে) : অকাজ, অবেলা, অযাত্রা অজানা, অবাঙালি

অ২ (স্বার্থে বা প্রকর্ষ অর্থে) : অঘোর, অকুমারী

অনা (মন্দ বা কম অর্থে) : অনাচ্ছিষ্টি, অনামুখো, অনাবৃষ্টি
আ (না বা মন্দ অর্থে) আভাঙা, আঘাটা, আকাঁড়া, আছাঁটা, আকাল, আলুনি

কু (মন্দ অর্থে) : কুকাজ, কুকথা, কুপথ, কুছবি

নি (না বা নাই অর্থে) : নিলাজ, নিঝুম, নিভাঁজ, নিখরচা,
পাতি (ছোট বা নিকৃষ্ট অর্থে) : পাতিলেবু, পাতিহাঁস, পাতিকাক, পাতিচোর, পাতিঝিনুক, পাতিডাল, পাতিমৌড় (কনের মাথায় ছোট মুকুট) ইত্যাদি। বিপরীত শব্দ যথাক্রমে—কাগজিলেবু, রাজহাঁস, দাঁড়কাক, সিঁধেল চোর, গোঁড়াঝিনুক, ফিকড়ি ডাল, সীঁতিমৌড় ইত্যাদি।

স (স্বার্থে বা অতিশয়ার্থে) সঠিক, সপ্রমাণ, সজোরে

হা (বিগত অর্থে) হাঘরে, হাভাতে, হাপিত্যেস

AMARBOI.COM

স-উপসর্গ প্রসঙ্গে

'স' উপসর্গটির প্রয়োগ সংস্কৃতেও আছে। চিন্তয়ধ্বং সকাতরাঃ (বনপর্ব, মহাভারত), জাতত্বরাণামপি সোৎসুকানাম্ (বুদ্ধচরিত, ৩/১৬, অশ্বঘোষ। নঞর্থক 'অ'এর প্রতিদ্বন্দ্বী উপসর্গটি থেকেই হয়তো এর উদ্ভব : অক্ষম-সক্ষম, অপ্রতিভ-সপ্রতিভ, অকাতর-সকাতর ইত্যাদি। এই 'স'এর অর্থ তাই ন-এর বিপরীত অর্থাৎ সদর্থক, তা থেকে 'অতিশয়'।

আগ, আট, আড়, আধ উপর, উপরি, ছিঁচ, পাছ-পিছ, পাশ, মগ, মাঝ, মিত-নিত, রাম—এগুলোকেও বাংলা উপসর্গের মধ্যে ধরা চলে :

আগ<অগ্র : আগজল, আগবাড়ান

আট<অষ্ট (সংখ্যার অর্থ কোথাও আছে, কোথাও নেই) : আটচালা, আটকৌড়ে, আটকপালে, আটপিঠ

আড় (তির্যক,বাঁকা) : আড়চোখ, আড়খেমটা, আড়কাঠি

উপর : উপরটপকা, উপরচটকা, উপরচাল, উপরচালাকি

উপরি : উপরি আয়, উপরি খরচ

ছিঁচ (অল্প বা অল্পে) : ছিঁচকাঁদুনে

পাচ-পিছ<পশ্চাৎ : পাছমোড়া, পিছ-মোড়া, পিছটান

পাশ<পার্শ্ব : পাশবালিশ, পাশদুয়ার

ক্ষুদ্র অর্থে : পাশখালি, পাশখেদান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মগ ('আগ' অর্থে) : মগডাল
মাঝ-মাজ (সর্ব) : মাঝগাঙ, মাঝমাঠ, মাঝদোর
মিত-নিত<মিত্র, নিত্য : মিতবর, নিতবর
রাম (বড় বা বড়-রকমের) : রামছাগল, রামশিঙা, রামধোলাই

১৬.৫ ■ বিদেশি উপসর্গ

গর (না অর্থে) : গরমিল, গরহাজির, গরআবাদি

দর (ছোট, নিম্নস্থ বা অধীন অর্থে) : দরপত্তনি, দরদালান, দরইজারাদার

না (নয় অর্থে) : নাহক, নাবালক, নামঞ্জুর, নারাজ ইত্যাদি।

লা (নয় অর্থে) : লাওয়ারিশ, লাশরিক, লাপাত্তা, লা-ইলাজ (দুশ্চিকিৎস্য), লাখেরাজ (নিষ্কর)।

নিম (অর্ধেক অর্থে) : নিমখুন, নিমরাজি, নিমগোছ (=মাঝারি ধরনের)

ফি (প্রত্যেক অর্থে) : ফিবছর, ফিসন, ফিহপ্তা

বদ (খারাপ অর্থে) : বদলোক, বদরাগী, বদগন্ধ ইত্যাদি।

বে (না অর্থে বা নিন্দা) : বেচাল, বেসামাল, বেহায়া, বেগতিক, বেনামি ইত্যাদি।

হর (প্রত্যেক অর্থে) : হররোজ, হরদিন, হরবোলা, হরঘড়ি, হরেক
এগুলো সবই ফারসি উপসর্গ

ইংরেজি কিছু উপসর্গও বাংলায় চলে :

সব্, সব (=sub)—অধীনে অর্থে : সব্‌ডেপুটি, সব্‌জজ।

হেড (=head)—প্রধান অর্থে : হেডমাস্টার, হেডপণ্ডিত, হেডমৌলবি, হেডমিস্ত্রি ইত্যাদি

ডবল (=double)—ডবল মাশুল, ডবল পরোটা ইত্যাদি।

ফুল (=full)—পুরা অর্থে : ফুলবাবু, ফুলটিকিট, ফুলহাতা

হাফ (=half) অর্ধ অর্থে :

হাফটিকিট, হাফমোজা, হাফআখরাই হাফশার্ট, হাফনেতা। বিশেষ করে জমিজমা সংক্রান্ত পরিভাষা রচনাতে, বে, দর ইত্যাদি বিদেশি উপসর্গের প্রয়োজন হয়, যেমন, বেনামা, দরপত্তনি, দরইজারাদার, দরপেশ (বিচারাধীন) ইত্যাদি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৭

পুরুষ

['পুরুষ' কী—শ্রেণীবিভাগ—পুরুষগুলির নামকরণের ব্যাখ্যা— উত্তমপুরুষের জায়গায় প্রথমপুরুষের ব্যবহার—মধ্যমপুরুষের জায়গায় প্রথম পুরুষের ব্যবহার]

১৭.১ ■ 'পুরুষ' কী

'পুরুষ' কথাটি সুপ্রাচীন। ইংরেজি 'person' এসেছে লাতিন persona (human being) থেকে, আরবি ব্যাকরণে 'শখ্স্' একই অর্থে প্রযুক্ত। (২৩)

যাচ্ছে যাচ্ছ যাচ্ছি

ক্রিয়ার এই রূপভেদের কারণে কর্তৃপদের ভেদ। সে, তারা বা রাম বা রামেরা বা অন্য কেউ বা কারা 'যাচ্ছে' ক্রিয়ার সঙ্গে অন্বিত হতে পারে, 'যাচ্ছ' ক্রিয়াপদটির সঙ্গে অন্বিত হতে পারে তুমি বা তোমরা, আর 'যাচ্ছি' ক্রিয়ার কর্তা হতে পারে আমি বা আমরা। যাকে অবলম্বন করে ক্রিয়ার রূপভেদ ঘটে, তা-ই পুরুষ।

AMARBOI.COM

১৭.২ ■ পুরুষের শ্রেণীবিভাগ

● পুরুষ বা ইংরেজি person কথাটি সাধারণভাবে ব্যক্তি বোঝায়। বক্তা যখন নিজের সম্বন্ধে 'আমি' 'আমাকে' ইত্যাদি পদ ব্যবহার করে তখন তাকে **উত্তমপুরুষ** বলে।

● বক্তা যাকে বা যাদের সম্বোধন করে তুমি বা তোমরা, তোমাকে বা তোমাদের বলে সে বা তারা মধ্যমপুরুষ।

'তুমি' সাধারণ সম্ভাষণ, তুই অতিপরিচয়ে, বা আপনজনের মধ্যে ব্যবহৃত সম্ভাষণ আর 'আপনি' সম্বোধনটি সম্ভ্রমসূচক।

সর্বনামের আলোচনা পর্বে আমরা আপনি-তুই-তুমির ব্যবহারের পার্থক্য আলোচনা করেছি।

● আমি তুমি ছাড়া সে বা যে কোনও নামপদ **প্রথমপুরুষ**।

১৭.৩ ■ পুরুষগুলির নাম ওরকম হল কেন ?

অনুমানের আশ্রয় নেওয়া চলতে পারে। ইংরেজিতে আমি-তুমি-সে এই নামে first-second-third এই ক্রমই স্বাভাবিক, যদি গণনাটি 'আমি' দিয়ে শুরু হয়।

কিন্তু বাংলায় গণনাটি উল্টো, সংস্কৃতের ধারা বেয়ে। নিজের কথাটা শেষে, আরম্ভ আমি-তুমি ছাড়া 'অন্য'-কে দিয়ে। তা-ই সে-ই প্রথমপুরুষ, তুমি মধ্যমপুরুষ, আর 'আমি' সবশেষের পুরুষ অর্থাৎ উত্তমপুরুষ। এই উত্তম শ্রেষ্ঠবাচক নয়, উত্তর (উদ্+তর) মানে যেমন পরবর্তী, উত্তম মানে তেমনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবার পরবর্তী (উদ্+তম)।

হিন্দিতে প্রথমপুরুষের জায়গায় 'অন্যপুরুষ' পরিভাষাটি চলে। অর্থাৎ আমি-তুমি ছাড়া আর যা কিছু তা-ই অন্য।

আরবি-ফার্সি ব্যাকরণের পুরুষবাচক পরিভাষা সত্যিই উল্লেখযোগ্য :

মুতকল্লম, হাজি.র, গ.য়েব্ : 'মুতকল্লম' মানে বক্তা স্বয়ং, 'হাজির' মানে যে সম্মুখে উপস্থিত, 'গায়েব' মানে যে সামনে নেই বা যাকে দেখা যাচ্ছে না। ইংরেজি first, second ও third person-র সঙ্গে এর তাৎপর্যগত মিল আছে।

১৭.৪ ■ উত্তমপুরুষের জায়গায় প্রথমপুরুষের ব্যবহার

'আমি' না বলে, অনেকে দাস, অধম, বান্দা ইত্যাদি প্রথমপুরুষের ব্যবহার করেন :

এই দাসের বা অধমের বিনীত নিবেদন এই যে...ইত্যাদি।

বান্দা বেঁচে থাকতে হুজুরের গায়ে আঁচড়টি লাগতে দেব না।

১৭.৫ ■ মধ্যমপুরুষের জায়গায় প্রথমপুরুষের ব্যবহার :

বাবু বা হুজুর যদি বলেন কী না করতে পারি ?

১৭.৬ ■ উত্তমপুরুষের সঙ্গে মধ্যম বা প্রথম পুরুষ যুক্ত হলে উত্তমপুরুষ প্রাধান্য পাবে এবং ক্রিয়া উত্তমপুরুষের হবে:

আমি আর তুমি যাব।

সুধা আমি আর তুমি যাব।

মধ্যপুরুষের সঙ্গে প্রথমপুরুষ যুক্ত হলে মধ্যমপুরুষ প্রাধান্য পাবে এবং ক্রিয়া মধ্যমপুরুষের হবে:

সে ও তুমি যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮

বচন

[বচন কী—একবচন ও বহুবচন—একবচন প্রকাশের উপায়—বহুবচন প্রকাশের উপায়—চিহ্ন ছাড়াও বচনের স্বরূপ প্রয়োগে—একবচনের জায়গায় বহুবচন]

১৮.১ ■ বচন কী

'বচন' মানে 'যা সংখ্যা বলে দেয়—', শব্দের যে রূপের দ্বারা তার সংখ্যা বোধ হয় তাকে **বচন** বলে।

১৮.২ ■ একবচন ও বহুবচন

যাতে কেবল একটি সংখ্যার বোধ হয় তা **একবচন** (singular), এবং যাতে একাধিক সংখ্যার বোধ হয় তা **বহুবচন** (plural)।

ফুলটি সুন্দর। 'ফুলটির 'টি' এখানে নির্দিষ্ট একটি ফুলকে বোঝাচ্ছে।

'ফুলগুলি' বললে ফুলের সংখ্যা যে একাধিক তা বেশ বোঝা যায়। 'গুলি' এখানে বহুত্ববাচী। 'টি' বা 'গুলি' বাদ দিয়েও ফুলের এক বা একাধিক সংখ্যা বোঝানো যেতে পারে। 'তার কোটে গোলাপ ফুল গোঁজা' বললে বাক্য থেকে গোলাপ ফুল যে একটি তা বোঝা যাবে। কারণ 'কোটে' লোকে অনেক গোলাপ গোঁজে না, কিন্তু যখন বলি 'গোলাপ ফুলে বাগান আলো' তখন 'গোলাপ'-এর বহুত্বই স্বাভাবিক।

১৮.৩ ■ একবচন প্রকাশের উপায় :

● একবচন প্রকাশের জন্যে পৃথক কোনও বিভক্তি নেই, শব্দের মূল রূপটিতেই একত্ব প্রকাশ পেতে পারে। যেমন দাদাকে এ সংবাদ দিও। এখানে দাদার একত্ব প্রকাশিত। 'এক' যোগ করে একবচন প্রকাশ করা যেতে পারে—এক ছিল রাজা আর তার ছিল এক রানি।

● টা, টি, খানা, খানি, গাছা, গাছি, ইত্যাদি নির্দেশক প্রত্যয়যোগে একত্ব প্রকাশিত হয়—বাড়িটা খাঁ-খাঁ করছে, মেয়েটি ভারী লাজুক, জামাখানা তো বেশ জেল্লা দিচ্ছে! ঘরখানি দেখবার মতো, দড়িগাছা খুঁজে পাচ্ছি না, মালাগাছি নানা ফুলে গাঁথা।

এখানে বাড়ি, মেয়ে, জামা, ঘর, দড়ি আর মালার সংখ্যা যে এক তা বোঝা যাচ্ছে।

১৮.৪ ■ বহুবচন প্রকাশের উপায়

● রা, এরা, গুলি, গুলো, দিগকে (দেরকে দেকে, দের), দিগের (দের) প্রভৃতি বহুত্ববাচক বিভক্তি বিশেষ্য বা সর্বনামে যুক্ত হয়ে বহুবচন প্রকাশ করে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওরা কোথায় গেল ? বালকেরা খেলায় মেতেছে ? ছেলেদের ডাকো ; তোমাদের দেখে খুশি হলাম। গাছগুলো কে লাগাল ? বইগুলি ভারী সুন্দর।

● অনেক, সব ইত্যাদি বহুত্ববাচক শব্দযোগে :

অনেক কাজ পড়ে আছে। সব বই কিনেছ ? গুলো-গুলির পরে 'সব' প্রায়ই যুক্ত হয়, ছেলেরা সব, ওরা সব, ওগুলি সব ইত্যাদি। তেমনি, ছেলেরা অনেকেই চলে গেল।

● সমষ্টিবাচক শব্দের যোগে :

আবলী, -আবলি	: অপ্রাণিবাচক শব্দে	রচনাবলী-লি, রত্নাবলী-লি, পদাবলী-লি, পশ্বাবলী-লি
উচ্চয়	: প্রাণিবাচক শব্দে অপ্রাণিবাচক	পুষ্পোচ্চয়, শিলোচ্চয়
কুল	: প্রাণিবাচক শব্দে :	অলিকুল, জীবকুল
গণ	: প্রাণিবাচক শব্দে :	বন্ধুগণ, মনুষ্যগণ
গুচ্ছ	: অপ্রাণিবাচক শব্দে :	পুষ্পগুচ্ছ, কেশগুচ্ছ
গ্রাম	: অপ্রাণিবাচক শব্দে :	গুণগ্রাম
চয়	: উভয় ক্ষেত্রে :	পুষ্পচয়, বুধচয়
জাল	: অপ্রাণিবাচক শব্দে :	শরজাল, বিপজ্জাল
দল	: উভয় ক্ষেত্রে	শ্রমিকদল, ফুলদল, তারাদল
দাম	: অপ্রাণিবাচক শব্দে :	শৈবালদাম
নিকর	: ,,	কমলনিকর
নিচয়	: উভয়ক্ষেত্রে	পুষ্পনিচয়, বুধনিচয়
পাল	: প্রাণিবাচক শব্দে	মৃগপাল
পুঞ্জ	: উভয় পক্ষে	প্রাস্তরপুঞ্জ, মেঘপুঞ্জ
বৃন্দ	: ,,	বীরবৃন্দ, প্রজবৃন্দ
ব্রজ	: অপ্রাণিবাচক	ভূধরব্রজ
ব্রাত	: প্রাণিবাচক	মধুকরব্রাত
মণ্ডল	: উভয় ক্ষেত্রে	বুধমণ্ডল, সারস্বতমণ্ডল
মণ্ডলী	: উভয় ক্ষেত্রে	নক্ষত্রমণ্ডলী, বিদ্বন্মণ্ডলী
মহল	: প্রাণিবাচক শব্দে	মহিলামহল, গুণীমহল
মালা	: অপ্রাণিবাচক	মেঘমালা, পর্বতমালা
যূথ	: প্রাণিবাচক শব্দে	গজযূথ, মৃগযূথ
রাজি	: অপ্রাণিবাচক শব্দে	পুষ্পরাজি, বৃক্ষরাজি
রাশি	: ,,	পুষ্পরাশি, পত্ররাশি
শ্রেণী	: উভয় ক্ষেত্রে	পাদপশ্রেণী, দ্বিজশ্রেণী
সঙ্ঘ	: প্রাণিবাচক	ব্রতিসঙ্ঘ, বিদ্বৎসঙ্ঘ
সমূহ	: উভয় ক্ষেত্রে	বিহগসমূহ, জনসমূহ, জাতিসমূহ

● অনেক ক্ষেত্রেই প্রাণী-অপ্রাণী ভেদে ব্যতিক্রম দেখা যায়, বিশেষ করে কবিতার ক্ষেত্রে। (২৪)

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশেষ করে মধুসূদনের প্রয়োগে :
কে না জানে ফুলকুল বিরসবদনা,
চলিছে সঙ্গে বামাব্রজ কাঁদি ইত্যাদি।
চুম্বিতাম, মঞ্জুরিত যবে
দম্পতী মঞ্জরীবৃন্দে।

সমষ্টিবাচক শব্দের বিচ্ছিন্ন প্রয়োগ, সম্বন্ধবাচক পদের সঙ্গে :
রাখাল গোরুর পাল লয়ে যায় মাঠে। —মদনমোহন
...ছিঁড়িয়া পড়িল খসি অশ্রু মুকুতার রসি। —রবীন্দ্রনাথ
আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ। —রবীন্দ্রনাথ

- বিদেশি বহুবচনবাচক প্রত্যয়যোগেও বহুত্ব বোঝানো হয় :

হা : খৎ+হা=খৎহা>খাতা (খণ্ড-ত লোপ ও ক্ষতিপূরণে পূর্বস্বরের দীর্ঘায়ণ)
আমলা+হা=আমলাহা (আমলারা)

আমলাহায়েরা সেখানে উপস্থিত ছিল—এই ধরনের প্রয়োগ থেকে জমিদারি সংক্রান্ত কাগজপত্রে 'হা' থেকে 'হায়' বহুত্ববাচক প্রত্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হত: কুঠি হায় প্রজাহায় প্রভৃতি।

আৎ : কাগজ+আৎ=কাগজাত (কাগজপত্র)
আন : সহেব+আন=সাহেবান
বুজুর্গ+আন=বুজর্গান
দিগর : মদননন্দীদিগর
(মদননন্দী ও তাহার সহযোগীরা)

- শব্দদ্বৈতে ও বহুত্ব বোঝাতে পারে
গাড়ি গাড়ি ইঁট
একত্রিংশ পরিচ্ছেদ (শব্দদ্বৈত দ্রষ্টব্য)
- সম্বন্ধপদপ্রয়োগে বহুবচন :
গুচ্ছের কলা আনলি কেন ?

১৮.৫ ■ প্রয়োগ দেখে বচনবোধ

প্রয়োগ বা প্রসঙ্গ দেখেও একবচন বা বহুবচন বোঝা যায় :
এই ধরনের বচনকে 'সাধারণ বচন' বলা চলে।

'রামানন্দ বাহির হলেন পথে একাকী,
মাথার উপর জাগে ধ্রুবতারা
পার হয়ে গেলেন নগর পার হয়ে গেলেন গ্রাম।
নদীতীরে শ্মশান, চণ্ডাল শবদাহে ব্যাপৃত।'

এখানে নগর, গ্রাম একবচন বা বহুবচন দুই-ই হতে পারে, শ্মশান একবচনই, আর চণ্ডাল যে একজনই পরে প্রসঙ্গ দেখে তা বোঝা যাবে।
'প্রভু, আমি চণ্ডাল, নাভা আমার নাম।'

১৮.৬ ■ বিনয়ে বহুবচন

বিনয়ে বহুবচনের প্রয়োগ দেখা যায়, বাংলায় : বাচনে বা লেখায় বক্তৃতায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বক্তা বা লেখকেরা অনেক সময় 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি ব্যবহার না-করে 'আমরা' বা 'আমাদের' ব্যবহার করেন : আমরা এই ঐক্যবুদ্ধিরই জয়গান গাই, আমাদের মনে হয় এ নীতি ভ্রান্ত ইত্যাদি।
জায়গায় প্রথমপুরুষের ব্যবহার :

১৮.৭ ■ সংজ্ঞাবাচক শব্দের বহুবচন

সাধারণত মোহিত , মোহন প্রভৃতি সংজ্ঞাবাচক শব্দ একবচন বোঝালেও মোহিতদের বাড়ি, মোহনদের কলেজ এমন সব পদগুচ্ছ তো আমরা ব্যবহার করেই থাকি। 'মোহনদের বাড়ি' পদগুচ্ছের 'মোহনদের' বলতে বোঝায় মোহন ও ওই বাড়ির অন্যান্য লোক, তেমনি 'মোহিতদের কলেজ' পদগুচ্ছে 'মোহিতদের' মানে মোহিত ও তার অন্যান্য সহপাঠীদের। তেমনি মোহিতেরা চার ভাই বলতে চারজন। Corum মোহিত ও তার অন্য ভাইয়ে মিলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯

লিঙ্গ

[লিঙ্গ ও লিঙ্গবিভাগ— লিঙ্গ পরিবর্তন—বিশেষণের লিঙ্গ— মেয়েদের নামে ক্লীব লিঙ্গ বা নিত্যপুংলিঙ্গ শব্দে 'আ' যোগ]

১৯.১ ■ লিঙ্গ ও লিঙ্গবিভাগ

● মানুষ যে শব্দের উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে চেয়েছে তার প্রমাণ ভাষার এই 'লিঙ্গ'-কল্পনা। পুরুষবাচক শব্দ পুংলিঙ্গ বলে চিহ্নিত হল আর স্ত্রীবাচক শব্দ চিহ্নিত হল স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে। 'চিহ্নিত' শব্দটি ব্যবহার করলাম, কারণ 'লিঙ্গ' আর 'চিহ্ন' সমার্থক। কিন্তু যেসব জিনিস অচেতন, তারা সব যদি ক্লীবলিঙ্গ বলে চিহ্নিত হত, তা হলে কথা ছিল না। কিন্তু এই অচেতন জিনিসগুলোর কিছু চিহ্নিত হল পুংলিঙ্গ হিসেবে, কিছু চিহ্নিত হল স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে।

লতা, বৃক্ষ, জল—

এসবই অচেতন কিন্তু সংস্কৃতে লতা স্ত্রীলিঙ্গ, বৃক্ষ পুংলিঙ্গ, জল ক্লীবলিঙ্গ। সংস্কৃত থেকে প্রাকৃতের মাধ্যমে হিন্দি, পাঞ্জাবি, মরাঠি ইত্যাদি যেসব ভাষা এল তাতে অচেতন পদার্থের এই কাল্পনিক লিঙ্গ রয়ে গেল। হিন্দিতে রোটী স্ত্রীলিঙ্গ, দহী পুংলিঙ্গ। এই কাল্পনিক লিঙ্গ উর্দুতেও রয়ে গেল, তাকে বলা হল 'জিন্‌স্ কেয়াসী' (জিন্‌স্=লিঙ্গ, কেয়াসী=কাল্পনিক)।

● বাংলা, অসমিয়া ও ওড়িয়াতে লিঙ্গ নির্ণয়ে এই কাল্পনিকতা নেই। বাংলায় যে-শব্দ পুরুষবাচক তা পুংলিঙ্গ, যা স্ত্রীবাচক তা স্ত্রীলিঙ্গ, যা প্রাণহীন তা ক্লীবলিঙ্গ।

'বাবা' পুংলিঙ্গ, 'মা' স্ত্রীলিঙ্গ এবং 'ঘর' ক্লীবলিঙ্গ।

১৯.২ ■ লিঙ্গ পরিবর্তন

● তৎসম শব্দ ও তদ্ভব, অর্ধতৎসম শব্দের সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করে পুংলিঙ্গ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়। এইসব প্রত্যয়কে স্ত্রী-প্রত্যয় বলে।

লিঙ্গ পরিবর্তন

আ-যোগে

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অজ	অজা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অশ্ব	অশ্বা
কোকিল	কোকিলা
বৎস	বৎসা

'ইষ্ঠ' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে

জ্যেষ্ঠ	জ্যেষ্ঠা
পাপিষ্ঠ	পাপিষ্ঠা

'অক'র জায়গায় ইকা

পরিচারক	পরিচারিকা
পাচক	পাচিকা
সাধক	সাধিকা
লেখক	লেখিকা
বালক	বালিকা
নাটক	নাটিকা (ক্ষুদ্রার্থে)
পুস্তক	পুস্তিকা (ক্ষুদ্রার্থে)

ঈ-প্রত্যয়যোগে

কিশোর	কিশোরী
কপোত	কপোতী
ব্যাঘ্র	ব্যাঘ্রী
কুমার	কুমারী
নর	নারী (ন>না, বৃদ্ধি)
পুত্র	পুত্রী
দৌহিত্র	দৌহিত্রী
ভাগিনেয়	ভাগিনেয়ী
দেব	দেবী
ময়ূর	ময়ূরী
মনুষ্য	মনুষী
মৎস্য	মৎসী

(য-ফলা লোপ)

অন্‌ভাগান্ত শব্দে

রাজন্	রাজ্ঞী
যুবন্	যূনী
শ্বন্	শুনী

ইন্‌ভাগান্ত শব্দে

মানী<মানিন্	মানিনী
যোগী<যোগিন্	যোগিনী
বিজয়ী<বিজয়িন্	বিজয়িনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দে

তেজস্বী<তেজস্বিন্	তেজস্বিনী
যশস্বী<যশস্বিন্	যশস্বিনী
ওজস্বী<ওজস্বিন্	ওজস্বিনী
স্রোতস্বী<স্রোতস্বিন্	স্রোতস্বিনী

মৎ-বৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দে

শ্রীমান<শ্রীমৎ	শ্রীমতী
ধীমান<ধীমৎ	ধীমতী
ভাগ্যবান<ভাগ্যবৎ	ভাগ্যবতী
ভগবান<ভগবৎ	ভগবতী

অৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দে

সৎ	সতী
মহৎ	মহতী

তৃ প্রত্যয়ান্ত শব্দে

দাতা<দাতৃ	দাত্রী (দাতৃ+ঈ)
নেতা<নেতৃ	নেত্রী (নেতৃ+ঈ)
কর্তা<কর্তৃ	কর্ত্রী (কর্তৃ+ঈ)

ঈয়স্ প্রত্যয়ান্ত শব্দে

গরীয়ান<গরীয়স্	গরীয়সী
প্রেয়ান<প্রেয়স্	প্রেয়সী
মহীয়ান<মহীয়স্	মহীয়সী

আনী প্রত্যয়যোগে

ভব	ভবানী
ব্রহ্ম	ব্রহ্মাণী
ইন্দ্র	ইন্দ্রাণী
মাতুল	মাতুলানী

আ ও ঈ দুই-ই হতে পারে এমন কয়েকটি শব্দ :

সুকেশা, সুকেশী
সুকণ্ঠা, সুকণ্ঠী
বিশালা, বিশালী

- ভিন্ন প্রত্যয়যোগে গঠিত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের অর্থগত পার্থক্য

আচার্যা (অধ্যাপিকা) আচাযনী (আচার্যপত্নী)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যবনী (যবনজাতীয় স্ত্রী) যবনানী (যবনদের লিপি)
শূদ্রা (শূদ্রজাতীয় স্ত্রী) শূদ্রাণী, শূদ্রী (শূদ্রপত্নী)
সূর্যা (সূর্যের দেবীপত্নী) সূরী (সূর্যের মানবী পত্নী, কুন্তী)

- চলিত বাংলা শব্দের স্ত্রী-প্রত্যয় : ই, অনি, ইনি, উনি
(ঈ, অনী, আনী, ইনী, উনী বর্জিত)

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
মামা	মামি
খুড়ী	খুড়ি
চাচা	চাচি
নানা	নানি
শ্বশুর	শাশুড়ি
মোরগ	মুরগি
গয়লা	গয়লানি
নাতি	নাতনি, নাতিন
চাকর	চাকরানি
কাঙাল	কাঙালি

এইরকম : পাগল—পাগলিনি, বাঘ—বাঘিনি, বুড়া—বুড়ি, বেয়াই—বেয়ান, কামার—কামারনি, মেথর—মেথরানি, রজক—রজকিনি, ভিখারি—ভিখারিনি।

AMARBOI.COM

স্ত্রীবাচক ভিন্নশব্দযোগে

তৎসম শব্দে : স্বামী—স্ত্রী, পিতা—মাতা, বর—বধূ, জনক—জননী, ভ্রাতা—ভগিনী, পুরুষ—মহিলা ইত্যাদি।
বাংলা শব্দে : বাবা—মা, ভাই—বোন, দেওর—ননদ, জামাই—মেয়ে, তালুই—মাউই, বলদ—গাই, শুক—শারি, ভূত—পেত্নি।

বিদেশি শব্দে : সাহেব—বিবি বা মেম, জনাব—খাতুন বা খানুম, নবাব—বেগম, বাদশা—বেগম, খানসামা—আয়া, লাট—লেডি, মিস্টার—মিসেস, বান্দা—বাঁদি, মিয়া—বিবি ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গশব্দযোগে

তৎসম শব্দে : কবি—মহিলাকবি (এখন শুধু 'কবি'ই বলে), প্রভু—প্রভুপত্নী, রাজপুত্র—রাজকন্যা, মুনি—মুনিপত্নী।

বাংলা শব্দে

হাতি—মাদি হাতি, ঘোষ—ঘোষপত্নী, বামুন—বামুনমেয়ে, বামুনমা, ঘোষ—ঘোষগিন্নি ইত্যাদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯.৩ ■ উভয়লিঙ্গ

বন্ধু, সন্তান, মানুষ, গোরু ইত্যাদি

বিশেষ করে বোঝানোর জন্যে পুরুষবন্ধু—মেয়েবন্ধু, পুত্রসন্তান—কন্যাসন্তান, পুরুষমানুষ—মেয়েমানুষ, বলদ গোরু—গাই গরু।

১৯.৪ ■ বিশেষণের লিঙ্গ

তৎসম বিশেষণ আ, ঈ প্রত্যয়যোগে গঠিত হয় যেমন : সবল—সবলা, সরল—সরলা ইত্যাদি।

বাংলায় সংস্কৃতের অনুকরণে অনেক সময়ে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ ব্যবহার করা হয় :

মহীয়সী মহিলা, সবলা নারী, সরলা বালিকা, বিদুষী মহিলা, ওজস্বিনী ভাষা, বুদ্ধিমতী বালিকা, বিপুলা পৃথিবী, জ্যেষ্ঠা কন্যা ইত্যাদি।

সম্বোধনপদেও সংস্কৃত অনুকরণ দেখা যায় :

জননি ! সুচরিতে, মানিনি, প্রিয়ে ইত্যাদি।

চলিত বাংলায় বিশেষণ অপরিবর্তিত থাকে। যেমন : ভাল ছেলে, ভাল মেয়ে।

কিন্তু অভাগি মা, পাগলি মেয়ে, রূপসি মেয়ে, ঝগড়ুটি মেয়ে ইত্যাদি।

১৯.৫ ■ মেয়েদের নামকরণ প্রসঙ্গে

ক্লীবলিঙ্গ বা পুংলিঙ্গ বিশেষ্য শব্দে আ-প্রত্যয়-যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করে নেওয়া হয়, যেমন রত্ন+আ=রত্না, কুন্তল+আ=কুন্তলা, এইরকম স্বপ্না, পর্ণা, বর্ণা ইত্যাদি।

'ইমন্' প্রত্যয়ান্তে শব্দ পুংলিঙ্গ, কিন্তু শব্দগুলি আকারন্ত হওয়ায় তাকে স্ত্রীলিঙ্গভ্রমে মেয়েদের নাম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে ; যেমন,

অণিমা, তনিমা, অরুণিমা ইত্যাদি

এইসব প্রয়োগ বা ব্যবহার মেনে নেওয়াই সমীচীন।

১৯.৬ ■ পদবীর লিঙ্গান্তর

সাধারণত পদবীর লিঙ্গাতর করা হয় না, নন্দী নন্দিনী হয় না, মিত্র মিত্রা হয় না, কিন্তু গুপ্ত গুপ্তা হয়। এই একটিমাত্র পদবীর স্ত্রীলিঙ্গটি বর্জন করা যায় না ?

১৯.৭ ■ শ্রী শ্রীমতী সর্বশ্রী

সাধারণত পুরুষেরা নামের আগে শ্রী লেখেন, মহিলারা শ্রীমতী। শ্রী উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও এখনও মেয়েরা শ্রী লিখতে কুণ্ঠিত। পণ্ডিত নকুলেশ্বর উভয় ক্ষেত্রে শ্রীবাদী হয়েও বলেছিলেন—শান্তি, চারু, বিজলী, বিরাজ প্রভৃতি পুরুষও হইতে পারেন। সেই জন্য শ্রী ও শ্রীমতী ব্যবহার সঙ্গত'।— বাঙলা ব্যাকরণ, পৃঃ ৪১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বশ্রী শব্দটিতে যখন পুরুষ-মহিলা সবাই অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন, তখন মহিলারা; শুধু শ্রী লিখতেও পারেন।

হিন্দিতে 'মহাভারত' সিরিয়ালের পর শ্রী শব্দের পরনিপাত দেখা যাচ্ছে স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ শব্দ নির্বিশেষে পিতাশ্রী, মাতাশ্রী ইত্যাদি।

নামের আগে শ্রী-শ্রীমতী ইত্যাদি যোজনা কি চলতেই থাকবে, না থাকলে কি সবাই হতশ্রী হয়ে পড়বেন ? ওদেশে Miss., Mr. & Mrs.অবশ্য চলছে। মুসলিম সমাজে জনাব। ও মুসম্মত চালু আমরা এখনও দেখেছি অবিবাহিত মেয়েদের জন্যে—'কুমারী'। এটি ইং miss শব্দের প্রভাবেই হয়তো চলিত। স্কুলের বিবাহিত বা অবিবাহিত সব দিদিমণিই 'মিস্'। 'আন্টি'ও চলে, তবে miss যেমন বয়সটাকে নামিয়ে আনে, 'আন্টি' দেয় বাড়িয়ে !

১৯.৮ ■ যেখানে লিঙ্গবোধটিকে গৌণ করেও দেখা যেতে পারে সেক্ষেত্রে কিছু শব্দকে উভলিঙ্গ করে নেওয়া হচ্ছে। যেমন কবি, সম্পাদক। এখন letter-এ বেশকিছু সম্পাদিকা 'সম্পাদক' লিখছেন।

সভাপতির স্ত্রীলিঙ্গ আমরা সভানেত্রী করে নিয়েছি। তবে সভাপতিত্ব করবেন বা পৌরোহিত্য করবেন গৌরী দেবী এমন প্রয়োগ তো এসেই গিয়েছে।

chairman কথাটিই শুধু ছিল, ওপদে স্ত্রীলোক বসবে হয়তো তখন সমাজ ভাবেনি। তাই chairwoman কথাটি চলল না। শেষ পর্যন্ত উভলিঙ্গ chairperson শব্দটার সৃষ্টি হল।

সুলতান হওয়াও পুরুষেরই একচেটিয়া ছিল। রাজিয়া বা রিজিয়া মুশকিল করলেন। তাঁকে কী বলা হবে ? সুলতানা' শব্দটা মহিলা-সুলতান অর্থে শেষমেষ চালু করতে হলই।

AMARBOI.COM

১৯.৯ ■ **এমন কিছু শব্দ আছে যা বাগবিধির অন্তর্গত, তা**

পুংলিঙ্গবাচক হলেও স্ত্রীলোকদের বোঝাতে পারে আবার এমন শব্দও আছে যা স্ত্রী-বাচক হয়েও পুরুষদের বোঝাতে পারে। যেমন ছেলেবেলা যেমন ছেলেদেরও হতে পারে মেয়েদেরও হতে পারে। মেয়েবেলা বলে কোনও কথা হতে পারে না। সম্প্রতি একজন লেখিকা তাঁর লেখা একটি বইয়ের নাম দিয়েছেন 'আমার মেয়েবেলা'। কোনও দরকার ছিল না 'মেয়েবেলা' বলার। পুণ্যলতা চক্রবর্তী তাঁর ছোটবেলার কথা নিয়ে যে বইটি লিখেছিলেন তার নাম দিয়েছিলেন 'ছেলেবেলার দিনগুলি'। মেয়েবেলা বললে বাগ্‌বিধি লঙ্ঘন করা হয়। মা বিবাহিত মেয়েকে বলছেন, কী ছেলেমানুষি করছিস, মা, ও তোর নিজের ঘর, ওখানেই যা, মানিয়ে নে সব কিছু। এখানে 'মেয়েমানুষি' বসবে কি ? একজন তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে বলছেন, থাক, ভাই, তোর সতিপনার কথা আর বলিস না। তোর বাড়ি গাড়ি কী করে হয়েছে আমি তো জানি। এখানে সতিপনা মানে সততা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০

পদ

[পদের স্বরূপ—পদবিভাগ]

২০.১ ■ পদের স্বরূপ

বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন শব্দের প্রত্যেকটি একেকটি পদ (parts of speech)। সংস্কৃত মতে শব্দবিভক্তি (সুপ্) আর ধাতুবিভক্তি (তিঙ্) যুক্ত শব্দকে পদ বলে ('সুপ্তিঙন্তং পদম্')।

'আকাশ' আর 'তারা' দুটোই শব্দ,

কিন্তু যখনই বললাম আকাশে তারা ফুটেছে, তখন 'আকাশ' আর 'তারা' দুটোই পদ, 'ফুটেছে'-ও পদ। তিনটি শব্দই পদ—একটাতে স্পষ্টত এ বিভক্তি আছে 'তারা'-তেও বিভক্তি আছে, তবে তা আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি না। বিভক্তি এখানে অদৃশ্য, এই অদৃশ্য বিভক্তিকে আমরা শূন্য-বিভক্তি বলি। ফুটেছে ক্রিয়ার মূলে আছে 'ফুট্' ধাতু। 'এছে' ধাতুবিভক্তি।

পদ বোঝাতে আমরা একটা বাংলা বাগ্বিধির সাহায্য নিই। 'পদে থাকা' মানে চলনসই থাকা। শব্দ আর পদের পার্থক্যের কথা বলতে গিয়ে এই বিশিষ্টার্থক কথাটিই মনে পড়ে। বস্তুত শব্দ যতক্ষণ বিভক্তিহীন, ততক্ষণ সে অর্থের ভার বয়েও কেমন নিশ্চল। অর্থাৎ তার কোনও 'চলন' নেই। যেই বিভক্তি যুক্ত হল অমনি তা পদে উঠল অর্থাৎ চলনসই হল। 'পদ' কথাটি চলার ইঙ্গিত দেয়। বিভক্তিযুক্ত শব্দই পদ, বাক্যে যার গতি।

- অনেক সময় একটি শব্দই পদ হয়ে সম্পূর্ণ বাক্যের অর্থ বোঝাতে পারে। রেস্তরাঁয় গিয়ে 'চা'—শুধু একথাটি বললেই চা এসে যাবে। এখানে শূন্য-বিভক্তি চা শব্দটি বোঝাবে—চা চাই বা চা দাও।

এক ধরনের জাপানি কবিতায় একেকটি শব্দ পঙ্ক্তির স্থান নেয়।

জল্
ঢেউ
মন
জীবন

আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, এখানে বিভক্তির ছোঁয়া নেই যেন, কিন্তু একটু কল্পনার ছোঁয়াতে বোঝা যাবে, এগুলো সবই উহ্য-বিভক্তি পদ। চারটি পদ মিলে একটি সুন্দর ভাব প্রকাশ করতে পারে।

যেমন, জলের সঙ্গে ঢেউয়ের যে সম্পর্ক, মনের সঙ্গে জীবনেরও তাই, কারণ মননই তো জীবন। অথবা জলে ঢেউ দিয়েছে, মনের সঙ্গেও নানান ঢেউ, এ জীবনটা ভাল কি মন্দ, বা যাহোক একটা কিছু, এই ভাবতে ভাবতে চলেছি।

প্রশ্নবাচক অব্যয়গুলো যেন নিজেরাই একেকটা বাক্য।

শুধু 'কেন'-ই বোঝাতে পারে : কেন ডাকছ ? কেন যাব ? কেন এসেছ ? কেন এ কথা বলছ ? ইত্যাদি, তেমনি 'কোথায়' বোঝাতে পারে কোথায় থাক ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথায় যাব ? কোথায় সে আছে ? ইত্যাদি।

অদৃশ্য বিভক্তিযুক্ত হয়ে বিশেষ্যেরাই কি কম অর্থ বহন করে ?

পদ কি খণ্ডিত ? ভগ্ন ? বাক্যের মধ্যে গৌণ ? বাক্যই কি সব ? খুব প্রাচীনকালেই আমাদের দেশে এসব প্রশ্ন উঠেছে ? আমরা অন্যত্র তার আলোচনা করব।

পদ **যুক্ত** বা **মুক্ত** হতে পারে। যখন বলছি জল পড়ে পাতা নড়ে, তখন জল ও পাতা মুক্ত পদ, কিন্তু যখন বলছি ঝড়জল হচ্ছে, বটপাতা নড়ছে, তখন ওই জল আর পাতা যুক্ত পদ। এই যুক্ত পদ আসলে সমস্ত বা সমাসবদ্ধ পদের অঙ্গ।

২০.২ ■ পদবিভাগ

বাক্যের বিভিন্ন পদ বিশ্লেষণ করে আমরা যে-পাঁচটি শ্রেণী দেখতে পাই তারা হল—নাম বা বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া।

এবারে আমরা এই বিভিন্নরকমের পাঁচটি পদ এবং তাদের নানা ধরন নিয়ে আলোচনা করব।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২১

বিশেষ্য

[বিশেষ্য কী—বিশেষ্যের শ্রেণীবিভাগ— এক শ্রেণীর বিশেষ্যের অন্য শ্রেণীতে ব্যবহার]

২১.১ ■ বিশেষ্য কী

কোনও কিছুর নামকে বিশেষ্য বলে। একে নাম বা নামপদও বলা হয়। ইংরেজি ভাষায় বা আরবি-ফারসি 'ইসম্' শব্দটির অর্থ নাম। যাকে গুণাদির পার্থক্য দেখে বিশেষ করে অর্থাৎ পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায় তাকে বিশেষ্য বলে।

২১.২ ■ বিশেষ্যের শ্রেণীবিভাগ

বিশেষ্যকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে :

ব্যক্তি বা সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য : কালিদাস, কলকাতা, গীতা ইত্যাদি।

জাতিবাচক বিশেষ্য : মানুষ, পশু, পাখি ইত্যাদি।

পদার্থ বা বস্তুবাচক বিশেষ্য : লোহা, জল, চিনি ইত্যাদি।

গুণবাচক ও অবস্থাবাচক বিশেষ্য : সুখ, দুঃখ, জীবন, যৌবন, বার্ধক্য ইত্যাদি।

সমষ্টিবাচক বিশেষ্য : দল, পাল, সমিতি ইত্যাদি।

ক্রিয়াবাচক বা অবস্থাবাচক বিশেষ্য : গমন, দর্শন, ভোজন ইত্যাদি।

কিন্তু সূর্য ও চন্দ্র কোন শ্রেণীতে পড়বে ? যদি জ্যোতিষ্কের কোনও নাম হিসেবে ধরা যায়, তবে এরা সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্যের মধ্যে পড়বে। কিন্তু ইংরেজিতে বড় হাতের হরফ দিয়ে sun বা moon লেখা হয় না। সূর্য ও চন্দ্র জাতিবাচকও হতে পারে না, কারণ এরা একমেব অদ্বিতীয়ম্ (অন্তত আমাদের পরিচিত আকাশে)। তাই এ দুটিকে **একক বিশেষ্য** (singular noun) বলা চলে।

প্রয়োগে এক শ্রেণীর বিশেষ্য অন্য শ্রেণীতে রূপান্তরিত হতে পারে।

২১.৩ ■ এক শ্রেণীর বিশেষ্যের অন্য শ্রেণীতে ব্যবহার

যেমন : যখন বলছি 'কালিদাস তো আর দুটো হয় না' তখন সংজ্ঞাবাচক কালিদাস পদটি কালিদাসের মতো কবি অর্থ বুঝিয়ে জাতিবাচক বিশেষ্য হয়ে ওঠে।

যখন বলছি 'তার ভিতরের মানুষ জেগে উঠল', তখন জাতিবাচক বিশেষ্যটি 'মনুষ্যত্ব' অর্থ বুঝিয়ে গুণবাচক হয়ে উঠল।

বৈজ্ঞানিক যখন পরীক্ষা করে বললেন 'জলগুলোর একটাও ভাল না', তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই পদার্থবাচক জল জাতিবাচক হয়ে উঠল।

২১.৪ ■ শ্রেণীগত পার্থক্য লোপ

আলংকারিক প্রয়োগ ছাড়াও সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্যের (proper noun) সঙ্গে জাতি-বা শ্রেণীবাচক বিশেষ্যের (common noun) পার্থক্য কখনও কখনও লুপ্ত হয়ে যায়। সাহিত্যের যে চরিত্র আমাদের সুপরিচিত কিংবা সমাজজীবনে যে মানুষের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা, হয়েছে তাদের সংজ্ঞা (designation) আমাদের কাছে বিশিষ্টগুণ সম্পন্ন (connotative)। 'কিশোর' proper name হতে পারে কিন্তু কিশোর কিশোরেরও প্রতীক রক্তকরবীতে। সে হিসেবে সে common noun-এর সগোত্র।

—তোর নাম কী রে ?

—শ্রীকান্ত।

—আবার শ্রীকান্ত ! শুধু কান্ত, নে তামাক সাজ।

নতুনদার এই তাচ্ছিল্যে শ্রীকান্ত যেন connotative হয়ে ওঠে। নতুনদাকে common noun বলব না proper noun বলব তা-ও চিন্তার বিষয়। কমললতার দেওয়া শ্রীকান্তের 'নতুন গোঁসাই' নামটিও এমনি-ই।

২১.৫ ■ ধ্বন্যাত্মক বিশেষ্যপদ

AMARBOI.COM

প্রত্যয়যোগে :

গড়গড়্+আ=গড়গড়া (বড় হুঁকো)
গড়গড়্+ই=গড়গড়ি (ছোট হুঁকো)
এইরকম সুড়সুড়ি, টিকটিকি, কচকচি, ডুগডুগি, গুব্‌গুবি হুটোপুটি, ছুটোছুটি ইত্যাদি [তুলনীয় হিন্দি গড়বড়ী, খলবলী ইত্যাদি]

'আনি' যোগে :

ঘ্যান্‌ঘ্যান+আনি=ঘ্যান্‌ঘ্যানানি, এমনি কন্‌কনানি, ছটফটানি, ধড়ফড়ানি, ফিসফিসানি, ভনভনানি, চড়বড়ানি, থরথরানি, বিড়বিড়ানি ইত্যাদি।

তুলনীয় হিন্দি :

ভিনভিনাহট, ঝনঝনাহট, কড়কড়াহট, গির্‌গিরাহট ইত্যাদি।

বিনা প্রত্যয়যোগে :

টমটম (এক ঘোড়ার গাড়ি), চমচম্‌ (মিষ্টান্ন বিশেষ), আইঢাই, আঁকুপাঁকু, হাঁসফাঁস, আঁটিসাটি, আঁটুবাটু (অক্ষমতা সত্ত্বেও প্রচেষ্টা)

ধ্বন্যাত্মক শব্দ ধ্বনি অনুকরণে কীভাবে গড়ে ওঠে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—'শব্দকথা : ধ্বনিবিচার' প্রবন্ধে তা দেখিয়েছেন। এই আলোচনা মূলত অনুধাবন হলেও ধ্বন্যাত্মক শব্দ-গবেষণার ক্ষেত্রে এটি একটি স্মরণীয় রচনা। সামান্য একটু উদাহরণ দিই—

'হালকা ভঙ্গপ্রবণ কঠিন দ্রব্য ফাটিবার সময়ে বায়ু সেই ফাট দিয়া বাহির হইলে পট্

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দ হয় ; উহার রূপান্তর পটাস্ ও পটাং। যাহা পট্ করিয়া ফাটে তাহা পটকা, পটকা ছোড়া হইতে পটকানো। সংস্কৃতে পেটক ও পিটক শব্দ না থাকিলে, বলিতাম পেট, পেটরা প্রভৃতি শব্দও শূন্যগর্ভতার জ্ঞাপক। অন্তত পোটলা, পুঁটলির ভিতরটা ফাঁপা বটে। পুঁটি মাছ ও পুঁটি খুঁকি কী জন্য ঐ নাম পাইয়াছে? পর্পটী (সংস্কৃত) ও পাঁপড় (বাঙ্গালা) হালকা দ্রব্য। ফাটিবার শব্দ পট্পট্, পিট্পিট্, পুট্পুট্ ইত্যাদি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২২

সর্বনাম

[সর্বনাম কী—শব্দটির নামকরণ—সর্বনামের শ্রেণীবিভাগ—সর্বনাম হিসেবে ব্যবহৃত বিশেষ্য, অমুক-প্রভৃতি-ইয়ে—ছদ্মবেশী সর্বনাম]

২২.১ ■ সর্বনাম কী

সাধারণত যা নামের অর্থাৎ আগে উল্লেখ করা হয়েছে এমন নাম বা বিশেষ্যের পরিবর্তে বসে তাই সর্বনাম। এ সংজ্ঞাটি ইংরেজির অনুকরণে pro (for) noun=pronoun. সুনীতিকুমার এই সংজ্ঞাটিকে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু এই সংজ্ঞাটি অব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট। কারণ 'আমি' 'আমরা' 'তুমি' 'তোমরা' তো কোনও বিশেষ্যের পরিবর্তে বসে না।

২২.২ ■ কেন এই নামকরণ

সুনীতিকুমার এই সর্বনামের নামকরণ ব্যাখ্যায় গিয়ে বলেছেন 'সর্ব অর্থাৎ সর্বপ্রকার নামের স্থলে হয় বলিয়া 'সর্বনাম' এই নামকরণ হইয়াছে'। কিন্তু পাণিনি সর্বনামের কোনও সংজ্ঞা দেননি শুধু বলেছেন সর্বপ্রভৃতি নাম হল সর্বনাম (সর্বাদীনি সর্বনামানি, পাণিনি ১.১.২৭)।

সেই শব্দগুলি হল :

১. সর্ব, বিশ্ব, উভয় ইত্যাদি।
২. অন্য, অন্যতম, ইতর ইত্যাদি।
৩. পূর্ব, পর, অপর, অধর, উভয় ইত্যাদি।
৪. যদ্, তদ্; এতদ্ ; কিম্ ইত্যাদি।
৫. ইদম্, অদম্ যুষ্মদ ও অস্মদ্ ইত্যাদি।

● পাণিনির তালিকায় অস্মদ্ ও যুষ্মদ্ অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে 'আমি' 'তুমি' সর্বনামের মধ্যে পড়ছে। কিন্তু শুধু বিশেষ্যের পরিবর্তে বললে অব্যাপ্তিদোষ ঘটে, এই দোষ আরও একটি কারণে ঘটে, কারণ সর্বনাম শুধু বিশেষ্য বিশেষের পরিবর্তে বসে না, বাক্যাংশ বা পূর্ণবাক্যের পরিবর্তেও বসে। যেমন বাক্যাংশের পরিবর্তে : যাকে তুমি চাও না সেই রাম এসেছে। এখানে 'যাকে' বাক্যাংশের পরিবর্তে বসেছে।

তুমি ছেলেটিকে ভুল বুঝেছিলে। তা স্বীকার করো। এখানে 'তা' সম্পূর্ণ বাক্যটির পরিবর্তে বসেছে।

● তাই আমাদের মতে সর্বনামের সংজ্ঞা হওয়া উচিত—যা উত্তম ও মধ্যমপুরুষবাচক, যা প্রথমপুরুষ বিশেষ্যের পরিবর্তে বসে এবং যা বাক্যাংশ বা বাক্যের পরিবর্তে বসে তাকে 'সর্বনাম' বলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে আরবি ফারসিতে সর্বনামকে ইসম্-ই-জ.মীর বলে। এই শব্দটির তৎপর্যগত অর্থ 'প্রতীকী নাম-শব্দ'। আক্ষরিক অর্থটি এইরকম : বললাম 'রাম যায়'। 'রাম' কথাটি আমাদের মনের মধ্যে রইল। কিন্তু তাকে বোঝাতে তার সম্বন্ধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সে' ব্যবহার করলাম। এই 'সে' সর্বনাম বা এইস্‌ম্‌-ই-জ.মীর।

২২.৩ ■ সর্বনামের প্রকারভেদ

পুরুষবাচক (personal) : আমি তুমি, সে, আপনি, তিনি, তুই।
সাকল্যবাচক (inclusive) : সব, সকল, উভয়, সর্ব বা পারস্পরিক।
সাপেক্ষ (relative) : যে, যিনি, যাহা (co-relation).
প্রশ্নসূচক (interrogative) : কে, কি, কী।
অনিশ্চয়সূচক (indefinite) : কেউ, কিছু।
অন্যাদি (denoting other বা others) : অন্য, পর, অপর।
আত্মবাচক (reflexive) : আপনি, নিজ, নিজে, নিজে নিজে, খোদ। (খোদ) মালিক এসেছেন।
ব্যতিহারিক (mutual) : আপনা-আপনি, আপোসে। (আপনা-আপনি মিটে গেল সব।
আপোসে মিটিয়ে ফেলো ব্যাপারটা! (হিন্দি 'আপ-সে' শব্দটি বাংলায় 'আপোসে' হয়েছে)।
কিন্তু যখন বলছি 'আপোস' করো, তখন আপস 'বিশেষ্য', সর্বনাম নয়।
সামীপ্যবোধক নির্দেশক (near demonstrative) : এ, ইহা, ইনি।
পরোক্ষবোধক নির্দেশক (far demonstrative) : ও, উহা, উনি।
প্রশ্নাত্মক সর্বনাম (interrogative) : কে, কি, কী, কারা, কাদের ইত্যাদি।
অনিশ্চয়বাচক যৌগিক সর্বনাম (compound indefinite pronoun) :
কেই-বা : এই বৃষ্টিতে কেই-বা আসবে ?
আর-কেউ : আর কেউ যাবে ?
আর-কিছু : আর কিছু চাই আপনার ?
অন্য-কিছু : আমার যা আছে তা-ই দিলাম, অন্য কিছু চেয়ো না।
অন্য-কেউ : একথা তুমি ছাড়া অন্য কেউ জানে না।
কেউ-না-কেউ : দু-একটা উইকেট পড়লে কী হবে, কেউ-না-কেউ নিশ্চয় দাঁড়িয়ে যাবে।
যে-কেউ : যে-কেউ এই কাজ করতে পারে ?
এইরকম, যে-কোনও, যা-কিছু, যে-সে, যা-তা ইত্যাদি।

২২.৪ ■ সর্বনাম হিসেবে ব্যবহৃত বিশেষ্যপদ

হুজুর, হুজুরবাহাদুর, কর্তা ইত্যাদি।
হুজুরের যদি মর্জি হয় তবে ইত্যাদি।

এখানে জমিদার বা নিয়োক্তার সামনে দাঁড়িয়ে কেউ বলতে চায়, আপনার যদি মর্জি হয় ইত্যাদি।

তেমনি, আজ্ঞে কর্তা কী বলেন।

কর্তা এখানে আপনিবাচক।

জন : হরিবাবুর দুই ছেলেই কৃতী, বড়জন ডাক্তার, ছোটজন ইঞ্জিনিয়ার। এখন 'জন' 'ছেলে'র স্থান নিয়েছে। বড়জন=বড় ছেলে। ছোটজন=ছোট ছেলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২২.৫ ■ সর্বনাম হিসেবে ব্যবহৃত নির্দেশক প্রত্যয় টা-টি

আগের উদাহরণে বড়জন-ছোটজনের জায়গায় বড়টি বা ছোটটি অথবা বড়টা বা ছোটটা চলতে পারে।

২২.৬ ■ অমুক-ইত্যাদি-প্রভৃতি-ইয়ে

অমুকে কী বলল তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন ? কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী **প্রভৃতি** গুণিজন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সোনারুপা প্রভৃতি ধাতুর কদর কি কোনওদিন কমবে ? এখানে কাগজ কলম পেন্‌সিল **ইত্যাদি** লেখার সরঞ্জাম পাওয়া যায়। জগদীশচন্দ্র বসু সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা **প্রমুখ** বৈজ্ঞানিকেরা ভারতের উজ্জ্বল রত্ন।

এইসব বাক্যে 'অমুক' 'প্রভৃতি' 'ইত্যাদি' ও 'প্রমুখ'কে সর্বনাম বলা চলে। কারণ এইসব শব্দ ব্যক্তি বা বস্তুর পরিবর্ত (substitute)।

অমুক—অনিশ্চিত অনির্দিষ্ট কেউ।

প্রভৃতি—এইরকম ও আরও অনেক ব্যক্তি বা অনেক জিনিস।

ইত্যাদি—এইরকম আরও কিছু।

প্রমুখ—প্রভৃতি অর্থে।

'অমুক'-এর প্রসঙ্গে হিন্দি 'ফলানা' <আ. ফলান্ শব্দটির উল্লেখ করা যেতে পারে।

ফলানে নে কুছ কহা ঔর তুম সোচ মেঁ পড় গয়ে হো ?

এই অব্যয়টিও সর্বনাম স্থানীয়। 'অমুকে'র সহচর 'তমুক'।

'ইয়ে' বাংলার একটি মুদ্রাদোষ হলেও এটি একটি বিশিষ্ট অব্যয়। এটিও সর্বনামস্থানীয়, কারণ যে কোনও ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয়ের পরিবর্তনে 'ইয়ে'র ব্যবহার হয়। বাঙালির মুখে এটি সর্ববাচী। বাজারে যাচ্ছ—একটা ইয়ে এনো—একটা থলে, ওখানে রামু ছিল বা ইয়ে—মহিম। কিন্তু যাই বলো এ ঘটনার একটা ইয়ে তো থাকবে,—কারণ কিছু।

যে-শব্দ মনে বা মুখে আসছে না অথবা ব্যবহার করা সমীচীন মনে হচ্ছে না 'ইয়ে' তারই পরিবর্ত। 'ইয়ে' কোনও বিশেষণকেও বোঝাতে পারে, যেমন ছেলেটা বেশ ইয়ে হয়েছে। (বক্তা হয়তো বলতে চান ছেলেটা বেশ চালাকচতুর হয়েছে)।

২২.৭ ■ ছদ্মবেশী সর্বনাম

আশটা বা আসটা

আসটা সহচর শব্দ হিসেবে চলে, ইত্যাদি বা 'সেই জাতীয় কিছু' বোঝাতে। যেমন ঘিটা-আশটা, পিঠেটা-আসটা। এই 'আশটা'কে সর্বনাম বলা চলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৩

বিশেষণ

[বিশেষণ কী— বিশেষণের বিভাগ— বিশেষ্যের বিশেষণ— সর্বনামের বিশেষণ— বিশেষণের বিশেষণ— ক্রিয়ার বিশেষণ— বিশেষণের তারতম্য— ছদ্মবেশী তারতম্য— বিশেষ্যরূপে বিশেষণ— বিশেষণ প্রয়োগে সতর্কতা]

২৩.১ ■ বিশেষণ কী

যা কোনও কিছুকে বিশিষ্ট করে তাকে **বিশেষণ বলে**। বিশেষণ শুধু যে বিশেষ্যকেই বিশেষিত করে, তা নয়, অন্যান্য পদকেও বিশেষিত করে। ইংরেজির adjective ও adverb দুই-ই বাংলায় বিশেষণপদের অন্তর্ভুক্ত। আরবি ও ফারসিতে বিশেষণকে বলে ইস্‌ম্-ই-সিফৎ অর্থাৎ গুণবাচক পদ।

২৩·২ ■ বিশেষণের বিভাগ

বিশেষণের ক্ষেত্র সত্যিই সুদূর প্রসারিত। প্রথমে বিশেষ্যের বিশেষণের কথাই বলা যাক।

- **বিশেষ্যের বিশেষণ**

ভাঙা কুঁড়ে ঘর, পোষা ময়ূর, সফেন সমুদ্র, রুক্ষ দিন, অন্ধকার রাত ইত্যাদি। এখানে ভাঙা, পোষা, সফেন, রুক্ষ, অন্ধকার এগুলি বিশেষণ পদ। যে বিশেষ্যপদগুলির গুণ প্রকাশ করছে ঠিক তাদের আগে এদের অবস্থান।

- **বিধেয় বিশেষণ**

কিন্তু যদি বলি কুঁড়েঘরটি ভাঙা, ময়ূরটি পোষা, সমুদ্র এখন সফেন, দিনটি রুক্ষ, রাতটি অন্ধকার, তখন এগুলোকে আমরা বলব বিধেয় বিশেষণ (predicative adjective)। এগুলো বিধেয় বিশেষণ, কারণ এগুলি সবই বিধেয়াংশে আছে।

- **পরিমাণ বাচক বিশেষণ**

অনেক লোক, একবিঘা জমি, অল্প আলো, একটু জল ইত্যাদি

- **সংখ্যাবাচক বিশেষণ :**

দু'দিন, তিন কন্যা, চার টাকা ইত্যাদি

- **পূরণবাচক বিশেষণ :**

চৌঠা শ্রাবণ, প্রথম দিন, ষষ্ঠ শ্রেণী, বিংশ শতক

(পয়লা, দোসরা, তেসরা, চৌঠা, পাঁচুই, ছওই, সাতই বা সাতুই— এই সব চলিত পূরণবাচক বিশেষণগুলি শুধু তারিখ বোঝাতে ব্যবহৃত)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংখ্যা	পূরণবাচক বিশেষণ
এক	প্রথম
দুই < দ্বি	দ্বিতীয়
তিন < ত্রি	তৃতীয়
চার < চতুর্	চতুর্থ
পাঁচ < পঞ্চ	পঞ্চম
ছয় < ষট্	ষষ্ঠ
সাত < সপ্ত	সপ্তম
আট < অষ্ট	অষ্টম
নয় < নবম	নবম
দশ	দশম
এগারো < একাদশ	একাদশ
বারো < দ্বাদশ	দ্বাদশ
তেরো < ত্রয়োদশ	ত্রয়োদশ
চোদ্দ < চতুর্দশ	চতুর্দশ
পনেরো< পঞ্চদশ	পঞ্চদশ
ষোলো < ষোড়শ	ষোড়শ
সতেরো < সপ্তদশ	সপ্তদশ
আঠারো < অষ্টাদশ	অষ্টাদশ
উনিশ < ঊনবিংশতি	ঊনবিংশ
বিশ < বিংশ	বিংশ
তিরিশ < ত্রিংশ	ত্রিংশ, ত্রিংশতম
চল্লিশ < চত্বারিংশৎ	চত্বারিংশ, চত্বারিংশত্তম
পঞ্চাশ < পঞ্চাশৎ	পঞ্চাশত্তম
ষাট < ষষ্টি	ষষ্টিতম
সত্তর < সপ্ততি	সপ্ততিতম
আশি < অশীতি	অশীতিতম
নব্বই < নবতি	নবতিতম
শ' < শত	শততম

AMARBOI.COM

বাংলায় চত্বারিংশত্তম, পঞ্চাশত্তম ইত্যাদি না লিখে এখন ৪০তম, ৫০তম ইত্যাদি লেখা হয়। এই ধরনের প্রয়োগ মেনে নেওয়াই সঙ্গত।

- **গুণিত সংখ্যাবাচক বিশেষণ :**

দ্বিগুণ বল, পাঁচগুণ দাম

- **ভগ্নাংশ সংখ্যাবাচক বিশেষণ :**

একতৃতীয়াংশ লোক

- **ধ্বন্যাত্মক বিশেষণ :**

কনকনে ঠাণ্ডা, গনগনে আঁচ, কুচকুচে কালো, টকটকে লাল, ঘুটঘুটে অন্ধকার ইত্যাদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ-ছাড়া গঠনগত দিক থেকে বিশেষণকে প্রধানত দু-ভাগে ভাগ করা যায় : মৌলিক ও সাধিত।

- **মৌলিক বিশেষণ :**

যে বিশেষণ পদ আর ভাঙা যায় না তাই মৌলিক বিশেষণ :
ছোট, বড়, উঁচু, নিচু, সাদা, কালো ইত্যাদি।

- **সাধিত বিশেষণ :**

কৃদন্ত : সুপ্ত, শয়ান, সহিষ্ণু, চলন্ত, উঠতি ইত্যাদি।

তদ্ধিতান্ত : গুণী ব্যক্তি, বুদ্ধিমান ছেলে, বেগবতী নদী, চলন্ত গাড়ি, ফুটন্ত জল ইত্যাদি

সমাস-নিষ্পন্ন : শরণাগত, সংকল্পবদ্ধ, পাশকরা (ছেলে), বুকফাটা (কান্না), দিলদরিয়া (লোক)।

এসব দুই পদের সমাস, এর চেয়ে বেশি পদের সমাসও বাংলায় চলে, যেমন :
নদীজপমালাধৃত প্রান্তর
অবাঙ্‌মনসগোচর ব্রহ্ম
যৎপরোনাস্তি ক্লেশ, আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি, সর্বজনগ্রাহ্য মত ইত্যাদি।

ধ্বন্যাত্মক বিশেষণও সাধিত বিশেষণের অন্তর্গত।

AMARBOI.COM

- বিযুক্ত বহুপদময় বা বাক্যময় বিশেষণ :

বেড়া ভেঙে পড়া বাগানটায় **কালকে হারিয়ে যাওয়া** লাঠিটা পাওয়া গিয়েছে।

অনেক দেখে শিখেছে এমন ছেলেই চাই। **তীর্থের কাকের মতো বসে থাকা** প্রার্থীর দল, **ঝড়ে আম কুড়িয়ে বেড়ানো** বয়সের কাছাকাছি ইত্যাদি। (শামসুর রহমান)

তেমনি ইংরেজিতে : a dog in the manger policy, let me have a try attitude ইত্যাদি।

- **সর্বনামের বিশেষণ**

এই **ছোটলোক** আমাদের আর কে পোছে ! **কোন্** সে কঠিন ইত্যাদি

- **সর্বনাম-বিশেষণ :**

সে দিন, **কী** কথা ইত্যাদি

- **সর্বনামজাত বিশেষণ :**

মদীয় বাসভবন, **তদীয়** ভ্রাতুষ্পুত্র, **ভবদীয়** সুহৃদ, **স্বকীয়** বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি

- **বিশেষণের বিশেষণ (২৫)**

খুব ভাল ছেলে, **দারুণ** চালাক লোক, **সম্পূর্ণ** পরাস্ত দল
আকাট মুখ্যু ওরা ইত্যাদি
ঝড়ে ঝরে পড়া শুকনো পাতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

● **ক্রিয়াবিশেষণ**

ক্রিয়াবিশেষণ প্রকাশের বিভিন্ন রীতি :

১. **বিভক্তিহীন পদযোগে :**
ভাল খেলে, **দ্রুত** দৌড়োয়, **নিশ্চয়** যাব, **অবশ্য** এসো, **ক্রমাগত** চলছে।
স্থির জেনেছি পেয়েছি তোমাকে। (রবীন্দ্রনাথ)
● সংস্কৃত সহসা, হঠাৎ ইত্যাদি শব্দ বিভক্তিহীন মনে হলেও এরা বিভক্তিযুক্ত। সহস্+তৃতীয় বিভক্তি=সহসা, হঠ+৫মী বিভক্তি= হঠাৎ। এইরকম দৈবাৎ অকস্মাৎ ইত্যাদি।
ব্যাপ্তি বোঝাতে : **দু মিনিট** অপেক্ষা কর, **এক ঘণ্টা** বসে আছি।

২. 'এ' বিভক্তি যোগে :
ধীরে, বেগে, সুখে, ভিতরে, বাইরে ইত্যাদি।

৩. করিয়া < করে, ধরিয়া < ধরে, হইয়া < হয়ে ইত্যাদি অসমাপিকা ক্রিয়া যোগে : ভাল করে, হনহন করে, দুদিন ধরে, গ্যাঁট হয়ে ইত্যাদি।

৪. ভাবে, রূপে, সহকারে, পূর্বক, পুরঃসর, ক্রমে ইত্যাদি শব্দযোগে :
ভালভাবে, উত্তমরূপে, যত্নসহকারে, প্রণামপূর্বক, সম্মানপুরঃসর, ভুলক্রমে ইত্যাদি।

৫. বিভিন্ন রকমের শব্দদ্বৈতে :
থেকে থেকে, দেখে দেখে, দেখে শুনে, দেখতে দেখতে, যত্রতত্র, টপাটপ, ঝপাঝপ, দমাদম।
ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিতে মাঝখানে 'আ' এসেছে।
তুলনীয় হিন্দি প্রয়োগ : ধড়াধড়, খচাখচ ইত্যাদি

৬. আবেগ সূচক 'কী' যোগে : **কী খেলেছে!**

৭. **সমাসে : লাঠিহাতে** (অলুক বহুব্রীহি) ঢুকে পড়ল। **যথাসাধ্য** (অব্যয়ীভাব) চেষ্টা করলাম। কথাটা **বেমালুম** (বহুব্রীহি) চেপে গেল।

৮. বহুপদময় ক্রিয়াবিশেষণ : **খেল-কি-খেলনা,** উঠে গেল।
একটু আমি চোখের পাতা বুঁজেছি কি ওমনি সে এল।

৯. 'না' যোগে : এমন তো হয় **না।**

২৩.৩ ■ বিশেষণের তারতম্য

বিশেষণের তারতম্য বলতে বোঝায় বিশেষণের তুলনা দ্বারা উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নির্দেশ করা। তারতম্য শব্দটির মূলে আছে 'তর-তম' কথাটি। সংস্কৃতে দুয়ের মধ্যে তুলনা বোঝাতে যেমন বিশেষণের সঙ্গে 'তর' প্রত্যয় যুক্ত, তেমনি দুইয়ের বেশি ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে তুলনা বোঝাতে যুক্ত হয় 'তম' প্রত্যয়। সংস্কৃতের এই রীতি বাংলাতেও প্রচলিত আছে, যেমন
হিমালয় বিন্ধ্য হইতে বৃহত্তর
হিমালয় পর্বতসমূহের মধ্যে বৃহত্তম।

● কিন্তু তর-তম প্রত্যয় বাদ দিয়ে শুধু বিশেষণটি প্রয়োগ করাই চলিত বাংলার রীতি : দুয়ের মধ্যে তুলনা : হিমালয় বিন্ধ্যের চেয়ে বড়।
রাম শ্যামের চেয়ে বুদ্ধিমান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বহুর মধ্যে তুলনা :

হিমালয় সমস্ত পাহাড়ের চেয়ে বড় ।

অথবা হিমালয় সমস্ত পাহাড়ের মধ্যে বড় ।

● দুয়ের মধ্যে তুলনায় যার চেয়ে উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বোঝায় তার পর 'অপেক্ষা' বা 'চেয়ে' অনুসর্গ যুক্ত হয় ।

সাধু ভাষায় 'অপেক্ষা' অনুসর্গটি সরাসরি যুক্ত হয় ।

যেমন, রাম অপেক্ষা শ্যাম বুদ্ধিমান ।

কিন্তু চলিত ভাষার 'চেয়ে' অনুসর্গটির পূর্বপদে 'এর' বা 'র' বিভক্তি বসে ।

রামের চেয়ে শ্যাম বুদ্ধিমান ।

'চেয়ে' বাদ দিলেও তুলনাত্মক প্রকাশ বাংলা বাগ্‌বিধির অঙ্গ : 'সে মাটি সোনার বাড়া' ।

● চলিত ভাষায় বিশেষণের আগে 'বেশি' আর সাধু ভাষায় 'অধিক' বা 'অধিকতর' পদটি ব্যবহৃত হয় :

রামের চেয়ে শ্যাম বেশি চালাক ।

রাম অপেক্ষা শ্যাম অধিক বা অধিকতর বুদ্ধিমান ।

● আর, বহুর মধ্যে তুলনা বোঝালে চলিত ভাষায় 'সবচেয়ে' 'সবচাইতে' বা 'সবার', ব্যবহৃত হয় । আর সাধু ভাষায় 'সর্বাপেক্ষা' পদটি প্রযুক্ত হয় :

জন্তুদের মধ্যে হাতি সবচেয়ে বড়ো । সবার বড়ো ।

কিন্তু সাধুভাষায় 'সর্বাপেক্ষা বৃহৎ' ।

● সব চেয়ে বা সবার ইত্যাদি ব্যবহার না করেও এই তারতম্য প্রকাশ করা যায় :

যেমন রাম শ্যামের মতো চালাক নয় । (=শ্যাম রামের চেয়ে বেশি চালাক)

AMARBOI.COM

● **ছদ্মবেশী তারতম্য**

এবারে বৃষ্টি মন্দ হয়নি (অর্থাৎ গতবারের চেয়ে এবারে বেশি বৃষ্টি হয়েছে ।)

অত দিয়ো না (অর্থাৎ যা দিচ্ছ তার চেয়ে কম দাও ।)

তোর মতো বোকা আর কেউ নেই । (=তুই সবচেয়ে বোকা)

● সংস্কৃতে দুটি বা তার বেশি বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে তুলনা বোঝাতে তর-তমের মতো আর-দুটি প্রত্যয় হয় ঈয়স্‌-ইষ্ঠ । ঈয়স্‌ যুক্ত হলে শব্দটি পুংলিঙ্গে ঈয়ান্‌ এবং স্ত্রীলিঙ্গে ঈয়সী (ঈয়স্‌+ঈ), এবং ইষ্ঠ যুক্ত শব্দটি পুংলিঙ্গে 'ইষ্ঠ' এবং স্ত্রীলিঙ্গে-ইষ্ঠা হয় :

গুরু গরীয়ান গরিষ্ঠ

(স্ত্রীলিঙ্গে গরীয়সী, গরিষ্ঠা)

বৃদ্ধ বর্ষীয়ান বর্ষিষ্ঠ বা জ্যায়ান জ্যেষ্ঠ, স্ত্রীলিঙ্গে বর্ষীয়সী ও জ্যেষ্ঠা ।

● বাংলায় এই সব ঈয়স্‌-ইষ্ঠ যুক্ত শব্দ তুলনা-অর্থ হারিয়ে 'অতিশয়' অর্থ গ্রহণ করেছে ।

'বলিষ্ঠ বাহু' বলতে সবচেয়ে সবল বাহু না বুঝিয়ে অত্যন্ত সবল বাহুই বোঝায় ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেমন তুমি মহামহীয়ান
মহীয়সী মহিলা,
ভূয়সী প্রশংসা ইত্যাদি

'কনিষ্ঠ' মানে সবচেয়ে ছোট, কিন্তু বাংলায় তা দুয়ের মধ্যে ছোট বোঝায় ; বয়সে শ্যামের কনিষ্ঠ। সংস্কৃতে এক্ষেত্রে 'কনীয়ান্' হত। কিন্তু বাংলায় তা অবাচক হয়ে পড়েছে। 'শ্রেষ্ঠ' শব্দটি 'সবার চেয়ে ভাল' অর্থে চলে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলন যখন বলি তখন কারও লেখা খুব ভাল গল্পের সংকলনই বুঝি। 'শ্রেষ্ঠ' সংস্কৃতেও তার 'সবচেয়ে ভাল' অর্থ হারিয়েছে, না হলে 'শ্রেষ্ঠতর' শব্দের প্রয়োগ হবে কীভাবে ? 'ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ' (মহাভারত)

—মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর (বড়) কিছুই নেই।

বিশেষণের তারতম্য প্রকাশে বাংলার নিজস্ব ভঙ্গি ফোটে প্রবাদবচনে :

আপন চেয়ে পর ভাল, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়ো, বয়সে বাপের বড় ('চেয়ে' বাদ) ইত্যাদি।

২৩.৪ ■ বিশেষ্যরূপে বিশেষণ

বিশেষণ পদ বিশেষ্য হিসেবেও প্রযুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে বিশেষণ সবিভক্তিক হয়ে উঠতে পারে। যেমন ভালকে ভাল বলব না তো কী ? এখানে প্রথম 'ভাল' বিশেষ্য, দ্বিতীয় 'ভাল' বিশেষণ। আমি ভালর ভাল মন্দের মন্দ— এ বাক্যেও প্রথম 'ভাল' ও প্রথম 'মন্দ' বিশেষ্য।

AMARBOI.COM

২৩.৫ ■ বিশেষণ প্রয়োগে সতর্কতা

বিশেষণ এক ধরনের ভাষার অলংকারের মতো, সুপ্রয়োগে তা ভাষার লাবণ্য বৃদ্ধি করে। কিন্তু এর অপপ্রয়োগে বাংলা বাগ্‌বিধিই আহত হয়। ১৫ই অগস্টের '৯৫ আ. বা. সম্পাদকীয়তে ছাত্র ভর্তির সমস্যা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে 'পরম উদ্বেগ', এ প্রয়োগ সত্যিই উদ্বেগের কারণ। পরম সন্তোষ, পরম সৌভাগ্য, পরম জ্যোতি ইত্যাদি প্রয়োগ বাগ্‌বিধির অন্তর্গত। অত্যন্ত উদ্বেগ, অতিশয় উদ্বেগ ইত্যাদি আমরা অনায়াসে বলতে পারি কিন্তু 'পরম উদ্বেগ' বলতে পারি কি ?

বক্তব্যব্যাখ্যায় একাধিক বিশেষণ ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু অকারণে বেশি বিশেষণ ভাষায় কৃত্রিমতা আনে। সভাপতি যদি বলেন, এই অনুষ্ঠানে এসে আমি আনন্দিত, গর্বিত, পরিতৃপ্ত সম্মানিত ও অনুপ্রাণিত, তাহলে সভায় একটু গুঞ্জন উঠতেই পারে।

একাধিক বিশেষণের পারম্পর্যের দিকেও লক্ষ রাখা দরকার। তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ পদ যদি বেশি গুরুত্বপূর্ণ শব্দের পরে আসে তা হলে রসহানি হতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৪

অব্যয়

[অব্যয় কী— বাংলায় ব্যবহৃত সংস্কৃত ও বিদেশি অব্যয়— বাংলা অব্যয়ের গঠনগত ও অন্যান্য বিভাগ— ধ্বন্যাত্মক অব্যয়, অধ্বনিবাচক অব্যয়— 'ও' এবং 'আর'— অব্যয়ের বিচিত্র প্রয়োগ —অব্যয়ীভাব-অব্যয়— অব্যয়ের বাক্যব্যঞ্জনা।]

২৪.১ ■ অব্যয় কী

'ব্যয়' মানে পরিবর্তন। পরিবর্তন কীসে ? বচনে, লিঙ্গে ও বিভক্তিতে। কিন্তু যে পদে বচনে-লিঙ্গে-বিভক্তিতে কোনও পরিবর্তনই ঘটে না, তা অব্যয় (indeclinables or invariants)। হিন্দি ব্যাকরণে অব্যয়কে **'অবিকারী শব্দ'** বলা হয়েছে। পাণিনি অব্যয়ের ঠিক সংজ্ঞা দেননি, তবে কোন ধরনের শব্দকে অব্যয় বলা হবে তা বলতে গিয়ে একটি তালিকা দিয়েছেন। এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, স্বঃ, অন্তঃ, প্রাতঃ ইত্যাদি শব্দ, অব্যয়ীভাব সমাস, আর এমন সব কৃদন্ত শব্দ ও তদ্ধিতান্ত শব্দ যা সর্বত্র অপরিবর্তিত থাকে।

বাংলায় এই স্বঃ, অন্তঃ, প্রাতঃ শব্দের পৃথকভাবে প্রয়োগ নেই, এরা সমাসে পূর্বপদ হিসেবে প্রযুক্ত হয় ! স্বর্গত, অন্তর্বর্তী, প্রাতর্ভ্রমণ ইত্যাদি।

তদ্ধিতান্ত অব্যয় প্রায়শ < প্রায়শঃ ক্রমশ < ক্রমশঃ ইত্যাদি বাংলায় চলে কিন্তু কৃদন্ত অব্যয় শব্দের প্রয়োগ বাংলায় নেই। সংস্কৃতে কর্তুম্, কৃত্বা অব্যয় কিন্তু বাংলা করিতে করিয়া অসমাপিকা ক্রিয়া। কিন্তু 'করিয়া' যখন 'দিয়া' অর্থে অনুসর্গ তখন তা অব্যয়, যেমন, হাতায় করিয়া দাও, হাতে নয়।

২৪.২ ■ সংস্কৃত ও বিদেশি অব্যয়

বাংলার নিজস্ব অব্যয়ের সংখ্যা কম নয়, কিন্তু সংস্কৃত থেকে নেওয়া বেশ কিছু অব্যয়ও বাংলায় চলে। যেমন :

অকস্মাৎ, অতি, অতীব, অথবা, অদ্য, অধুনা, অন্যত্র, অন্যথা, অপিচ, অয়ি, অবশ্য, আঃ, অহো, ইতস্তত < ইতস্ততঃ, ইতি, ইদানীং, ঈষৎ, একত্র, একদা, কদাপি, কিংবা, কিঞ্চিৎ, কিন্তু, কেবল (< কেবলম্) ঝটিতি, তথা, তথাপি, নানা, পরশ্ব (< পরশ্বঃ), পশ্চাৎ, পুনঃ, পুনঃপুনঃ, মুহুঃ, মুহুর্মুহুঃ, যথা, যদি, যদ্যপি, বা, বিনা, বৃথা, সদ্য < সদ্যঃ, সম্প্রতি, সহ, স্বস্তি, সহসা, হা, হা হন্ত। (কোথা হা হন্ত, চিরবসন্ত, আমি বসন্তে মরি —রবীন্দ্রনাথ)।

● বিদেশি শব্দ থেকেও কিছু শব্দ এসেছে : আস্তে < ফা. আহিস্তা, ও (< ওয়্), বেশ (< বীশ), সাবাস, সেরেফ < সির্ফ্) ইত্যাদি। বাংলায় অর্থ পরিবর্তন ঘটেছে কয়েকটি সংস্কৃতে অব্যয়ের ক্ষেত্রে, যেমন—

প্রভৃতি, সুতরাং ইত্যাদি।

সংস্কৃতে প্রভৃতি মানে 'হইতে' (since), কিন্তু বাংলায় 'ইত্যাদি'।

সংস্কৃতে 'সুতরাং' (সু+তরাং) মানে 'অত্যন্ত', বাংলায় 'অতএব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কৃত 'সুষ্ঠু' পৃথকভাবে বাংলায় চলে না, ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় প্রয়োগে বাংলায় তা হয়েছে 'সুষ্ঠুভাবে'। অবশ্য বিশেষণ হিসেবে বাংলায় সুষ্ঠুর একক প্রয়োগ চোখে পড়ে : ব্যবস্থাটি সুষ্ঠু হয়েছে। 'সুষ্ঠু' শব্দটির ব্যুৎপত্তি সু-স্থা+উ, অর্থাৎ, 'যা ভালভাবে আছে'। অব্যয়ের এই ধরনের বিশেষণ বা ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় বা সম্পূর্ণ বাক্যের বিশেষণস্থানীয় ব্যবহার দেখেই সম্ভবত রামমোহন গৌড়ীয় ব্যাকরণে অব্যয়কেও বিশেষণীয় বিশেষণ, সম্বন্ধীয় বিশেষণ, সমুচ্চয়ার্থক বিশেষণ এবং অন্তর্ভাববিশেষণ হিসেবে ভাগ করেছেন।

২৪.৩ ■ অব্যয়ের গঠনগত বিভাগ

বাংলা অব্যয়ের গঠন-গত রূপ হিসেবে আমরা অব্যয়কে মৌলিক ও যৌগিক এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি।

মৌলিক	:	এবং, বরং, আর, হঠাৎ, বা বৈ ইত্যাদি
যৌগিক	:	বরঞ্চ (বরম্+চ), নতুবা (ন+তু+বা), যদ্যপি, তথাচ, তথাপি, হয়-তো, হয়-তো বা আর যদি, যদি-বা, কেন-না, আর-কি, ইত্যাদি

২৪.৪ ■ অন্যান্য বিভাগ

বাক্যে অব্যয়ের নানা ধরনের কাজ, অবস্থান বা অর্থ বিচারে অব্যয়কে নানাভাগে ভাগ করা চলে :

পদান্বয়ী অব্যয়

যে অব্যয় পদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাক্যের অন্য কোনও পদের সঙ্গে এর সম্বন্ধে প্রকাশ করে তাকে পদান্বয়ী অব্যয় বলে।

স্থানবাচক :
নিচে, উপরে, সঙ্গে, পাশে ইত্যাদি।

সীমাবাচক : যাবৎ, অবধি, পর্যন্ত, পেরিয়ে, ছাড়িয়ে, থেকে (from, till, since)।

উপমাবাচক : মতন, মতো, সম, প্রায়, পারা, যেমন, ইত্যাদি।
ব্যতিরেকবাচক : বিনা, ব্যতীত, বিহনে (উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথপুরে), বাদে, ব্যতিরেকে ইত্যাদি।

সমস্ত অনুসর্গই অব্যয়।
সমুচ্চয়ী অব্যয়

- সংযোজক : ও, আর, এবং, তথা ইত্যাদি : এমন খেলোয়াড় বাংলা তথা ভারতের গৌরব। (ও-আর-এবং সম্বন্ধে পৃথক আলোচনা পরে দেখুন)
  এই অব্যয় দুই বা তার বেশি পদ বা বাক্যকে যুক্ত করে।
- বিয়োজক : কিংবা, বা, অথবা, না-হয়, কি-কি
  কি কবিতা কি গল্প সব কিছুতেই সে দক্ষ। এই অব্যয় দুই পদ বা বাক্যকে পৃথক বা বিযুক্ত করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

• সংকোচক : কিন্তু, তবু, তথাপি, অথচ, বরং, বরঞ্চ
এই অব্যয় মূল বাক্যের অর্থকে সংকুচিত করে দেয়।

• সিদ্ধান্তসূচক :
অতএব, তাই, কাজেই, কাজে কাজেই, সুতরাং ইত্যাদি
তোমাকে ভালবাসি, তাই একথা বলছি।
এই অব্যয় কোনও সিদ্ধান্ত করে দুটি বাক্যকে যুক্ত করে দেয়।

• হেত্বর্থক : কেননা, যেহেতু, ব'লে।
এই অব্যয় হেতু বুঝিয়ে দুটি বাক্যকে যুক্ত করে :
সে অসুস্থ ছিল বলে আসতে পারেনি।

• নিত্যসম্বন্ধী :
বরং···তবু, বটে···কিন্তু, হয়···নয়, যদিও···তবুও, যেমন···তেমন।
যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল।
এই অব্যয় পরস্পর প্রযুক্ত হয়ে দুটি বাক্যকে সংযুক্ত করে।

সংক্ষেপক বা উপসংহারবাচক দীর্ঘ বাক্য বা একাধিক বাক্যের উপসংহারে 'মোটের উপর', 'মোট কথা' 'বলতে গেলে' বা 'ধরতে গেলে' ইত্যাদি অব্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হয় :

মোটের উপর ওকে দিয়েই কাজ চালাতে হবে।
মোট কথা তোমাকেই যেতে হবে।
বলতে গেলে প্রতিষ্ঠানের তুমিই সব।

AMARBOI.COM

অনন্বয়ী অব্যয়

যে অব্যয়পদের সঙ্গে বাক্যের অন্য কোনও পদের অন্বয় নেই তাকে অনন্বয়ী অব্যয় বলে :

অন্তর্ভাবপ্রকাশক, সম্বোধনবাচক, বাক্যালংকার, এবং সম্মতি বা অসম্মতিবাচক অব্যয় এই শ্রেণীতে পড়ে।

অন্তর্ভাবপ্রকাশক

হর্ষ	:	যাক ! শেষরক্ষা হল তা হলে !
বিষাদ	:	হায়, বিধবার একমাত্র সম্বলটিও গেল।
		কী গেরো ! এ ট্রেনটাও মিস হল !
ঘৃণা		ছিঃ, এমন কাজ তোর !
ভয়		ও মা ! রাতে নাকি সাপ বেরোয় এখানে।
বিরক্তি	:	ইস্ ! এখনও ওর টিকির দেখা নেই।
প্রশংসা	:	বাঃ, চমৎকার গোলটা !

('বা' বা 'বাঃ' এর দ্বিরুক্ত প্রয়োগ এসেছে ফার্সি 'ওয়াহ্ ওয়াহ্' থেকে।)

অবিশ্বাস	:	যাঃ, এ কখনও হতে পারে ?
বিস্ময়	:	মরি মরি ! কী রূপমাধুরী !
ব্যঙ্গ	:	আ মরে যাই ! কী সাজ !
ধিক্কার	:	ধিক্ ! মরণ ! রাম রাম, রামো ইত্যাদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় অব্যয় :

যখন, তখন, এখন, অধুনা, সম্প্রতি, ইদানীং, সবে (সে সবে কলকাতায় এসেছে)।

আগে, পরে (আগে তুমি যাও, পরে আমি যাব।)

'এদানিক' অব্যয়টি একসময় চলত : লেখা আমি এদানিক এরকম ছেড়ে দিয়েছি— প্রমথ চৌধুরী

সম্বোধনসূচক অব্যয় :

ওলো ! সাত সকালে এত সেজেছিস কেন ?
ওহে, যা বলছি শুনতে পাচ্ছ ?
হে ভারত ! ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ।
হ্যাদে গো নন্দরানী !
ওগো তুমি পঞ্চদশী।
এই রকম— রে, আরে, ওরে, হ্যালো ইত্যাদি।

বাক্যালংকার অব্যয় :

এক যে ছিল রাজা।
তুমি তো ভারি বোকা।
সে কি আর বলতে ?
তুমি যে বড় এলে না।

এখানে যে, তো, আর, বড় এ-সব অব্যয়ের নির্দিষ্ট কোনও অর্থ না থাকলেও এরা বাক্যে বিশেষ একটি মাধুর্য আনে, বা বাক্যকে বিশেষ একটি গতি দেয়, বাক্যে প্রাণ সঞ্চার করে।

আর কি, বলতে কি,— এই ধরনের প্রয়োগও এই বিভাগের অন্তর্গত।

'এক রাজা ছিল' না বলে যদি বলি 'এক যে ছিল রাজা' ওমনি ক্ষুদে শ্রোতারা নড়েচড়ে বসবে। ওই 'যে' যেন বাক্যের শরীরে একটা অলংকার জুড়ে দিল।

এইরকম 'না' 'কিনা' 'কো' ইত্যাদি বাক্যের অলংকার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে :

ওর না ডান হাতটা ভাঙা।

কোল ভাষার অর্থাৎ কিনা আধুনিক কোলভাষার অতি প্রাচীন রূপের প্রচার এদেশে ছিল—সুনীতিকুমার

দোয়েল কোয়েল গানের বিরাম জানে না কো—রবীন্দ্রনাথ।

'কো' সম্বন্ধে রামমোহন :

...কথোপকথন ও কবিতায় কো। ইহার সংযোগ অভাবঘটিত (নঞর্থক) ক্রিয়ার সহিত কদাচিৎ প্রযুক্ত হয়। ইহাতে কোন অর্থান্তর বোধ হয় না : অর্থাৎ আমি যাবনাকো অর্থাৎ আমি যাব না। (গৌড়ীয় বাংলা ব্যাকরণ : অব্যয় প্রকরণ, ৪১)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্মতি বা অসম্মতিসূচক :

হ্যাঁ, যাব আমি। ঠিক আছে,
আমি তোমার হয়ে ওকে অনুরোধ করব।
না, রে, আমার কাজ আছে,
যেতে পারব না তোর সঙ্গে।

এই রকম হুঁ বা উঁহু।

'হুঁ' সম্মতি ছাড়াও, অসম্মতি, বিরক্তি, সিদ্ধান্ত, অবিশ্বাস ইত্যাদি নানা অর্থেই ব্যবহার হতে পারে। 'আচ্ছা'ও তাই।

২৪.৫ ■ ধ্বন্যাত্মক অব্যয় :

যে-অব্যয় ধ্বনির অনুকরণে গড়ে উঠেছে তাকে ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বা অনুকার অব্যয় বলে।

একক প্রয়োগ	শাঁ করে ছুটে গেল তীরটা।
	ধপ্ করে তাল পড়ল
	খুট্ করে আওয়াজ হল।
দ্বিরুক্ত প্রয়োগ	বন্ বন্ করে লাট্টু ঘুরছে।
	বুক ধড় ফড় করছে।
	ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে।

AMARBOI.COM

লক্ষণীয় : ধ্বন্যাত্মক অব্যয়গুলির পরে 'করে' শব্দ এসেছে।
'করে' ছাড়াও ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ে প্রয়োগ হতে পারে।

আমরা 'ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি পড়ছে'ও বলতে পারি। সেক্ষেত্রে 'ঝমঝম্' ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় হয়ে পড়ে। কবিতায় 'করে' বাদ দিয়ে সরাসরি অব্যয় প্রযুক্ত হয় :

'বায়ু বহে শন্ শন্'।

- কাল্পনিক ধ্বন্যাত্মক অব্যয় :
  হট্টিমাটিমটিম্, হিংটিং ছট্ ইত্যাদি।
- মন্ত্রধ্বনি : ওঁং, স্বাহা, হ্রীং, ফট্ ইত্যাদি।

২৪.৬ ■ অধ্বনিবাচক ধ্বন্যাত্মক অব্যয়

কিন্তু শুধু ধ্বনি ধরেই ধ্বন্যাত্মক অব্যয় ক্ষান্ত নয়, নানা অব্যক্তভাব প্রকাশেও এগুলি বাংলা ভাষায় বিশেষ সম্পদ :

একটু **ছ্যাঁক ছ্যাঁক** করছে ওর গা-টা।
রাগে **রীরী করে উঠল গা-টা।**
টোটো করে ঘুরে বেড়ালেই হবে ?
গুম হয়ে বসে রইল সে।
খাঁ খাঁ করছে বাড়িটা।
ম্যাজম্যাজ করছে গা-টা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পা-টা যেমন **ঝিমঝিম** করছে।

তবে যে ভারী ল্যাজ উঁচিয়ে **পুটুসপাটুস** চাও ?

এইভাবে দেহ ও মনের নানা অবস্থা বোঝাতে আমরা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় ব্যবহার করি।

নঞর্থক অব্যয় :

না, নাই > নি, না—না (neither...nor)

আমি যাব না।

যাওয়া হয়নি।

না তাঁতি কুল না বোষ্টম কুল

'বয়ে গেছে' এই বাগ্‌বিধিটি অস্ত্যর্থক হয়েও নঞর্থে প্রযুক্ত হয় : আমার যেতে বয়ে গেছে অর্থাৎ আমি যাব না।

কচুপোড়া করবে, কাঁচকলা করবে বা ঘণ্টা করবে— অর্থাৎ কিছুই করতে পারবে না।

প্রশ্নাত্মক অব্যয়

কি, নাকি, না, ইত্যাদি বুঝি : তোরা যাবি কি ? যাবি **নাকি** ? যাবি না ? ও সব শুনে ফেলেছে বুঝি ?

AMARBOI.COM

২৪.৭ ■ অব্যয়ের বিচিত্র প্রয়োগ

মুদ্রাদোষ :

মানে, ইয়ে, মানে কি যে, কথা হচ্ছে, ধরুন গিয়ে, ওর নাম কি, কেমন কিনা, কি বলে গিয়ে, যা চ্চলে, আর কি, ব্যাপার হচ্ছে কি, বলছিলাম কি, যাকে বলে, নাকি বলেন, আপনার (তোমার, তোর) গিয়ে, বুঝলেন না (দ্রুত ও বিকৃত উচ্চারণে বুয়েন্না, বোয়ে ন্না) ইত্যাদি

কথার মধ্যে এই ধরনের পদ বা পদগুচ্ছ এসে পড়ে। এগুলোকে 'অব্যয়' হিসেবেই ধরা উচিত।

মধ্যাগম :

বলেছিলাম > বলে তো ছিলাম

এসেছিল > এসেও ছিল বা এসেও তো ছিল।

এখানে ক্রিয়াপদকে দ্বিখণ্ডিত করে তার মধ্যে জুড়ে বসেছে অব্যয়। এটি কথ্য বাংলার একটি বিশেষ ভঙ্গি।

নানা অর্থে 'ই'

তুমিই জান (অবধারণে)।

তুমিই সব (কেবলমাত্র)।

এসেই চলে যাবে, দুদিন থাকোই না।

(যথাক্রমে ক্ষণকালতা ও অনুরোধ)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেই তো ছি, এখন আর দোষ দিচ্ছ কেন :
(কারণ নির্দেশ)
দুষ্কৃতীকে দেখেই গুলি চালাল পুলিশ (সঙ্গে সঙ্গে)
বলেই দেখো না (অদোষ অর্থাৎ বলে দেখতে তো দোষ নেই)
ভালই তো দেখলাম ওকে (মোটামুটি)
দিনে দিনেই যেয়ো (অনতিক্রম অর্থাৎ দিন থাকতে থাকতে)
লিখতে লিখতেই লেখক (অভ্যাস)
রাগ করেই সব মাটি করল (হেতু)
মুখই চাঁদ। (অভেদ)

স্বার্থে টা—

হবেটা কী ? যাবটা কোথায় ?
এই 'টা' যোগে ক্রিয়াপদ বিশেষ্য হয়ে যাচ্ছে।

ছদ্মবেশী অব্যয়

যা মূলত অব্যয় নয়, অসমাপিকা ক্রিয়া এই রকম অব্যয়কেই ছদ্মবেশী অব্যয় বলতে চাইছি, যেমন :
গিয়া > গে : যাক্ গে।
খাও এসে > সে : খাও সে।

AMARBOI.COM

২৪.৮ ■ ও এবং আর

'ও' এসেছে ফারসি 'ওয়্' থেকে অথবা চর্যাপদের 'হো' থেকে।
'ও' সাধারণত শব্দযোজনে ব্যবহৃত :
রাম ও শ্যাম, রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ।
রাম ও শ্যাম যাবে—এটি ঠিক বাংলার বাগ্‌বিধি নয়, রাম যাবে, শ্যামও যাবে— এটাই বাগ্‌বিধি।
অথবা রামও যাবে শ্যামও যাবে ;
না হলে 'রাম আর শ্যাম যাবে।
'আর' এসেছে 'অপর' শব্দ থেকে।
বাংলা 'ও'-এর জায়গায় সাধারণত 'আর'-এর ব্যবহারই বেশি।
খাও আর গল্প বলো।
'এবং' কথাটি সংস্কৃত। এবম্ > এবং। 'এবম্' শব্দের অর্থ 'এইরূপ'।
নৃপঃ তুষ্টঃ, মন্ত্রী অপি এবম্ (তুষ্টঃ)
—রাজা তুষ্ট মন্ত্রীও এইরূপ তুষ্ট। সহজেই বাংলায় এই 'এবং' সংযোজক অব্যয় হয়ে উঠেছে, অর্থের সমতার দরুন।
'এবং' সাধারণত বাক্যাংশ বা বাক্যযোজনায় ব্যবহৃত :
বাক্যাংশে : তার কাছে সব শুনে এবং নিজে চোখে সব দেখে এই সিদ্ধান্তে এসেছি।
বাক্যে : আমি ওর কথা শুনলাম এবং ওর মাকে সব বললাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে 'এবং' দিয়ে দুটো বাক্য জোড়া হল বটে, কিন্তু এও বাংলায় বাগ্‌বিধি নয়, এ বাক্যটি আমরা এইভাবে বলি : আমি ওর কথা শুনে ওর মাকে সব বললাম।

আমরা 'ও' বা "আর' যেমন বাদ দিয়ে চলি, 'এবং'কেও রাখি উহ্য।

'অন্ন চাই প্রাণ চাই চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল চাই স্বাস্থ্য আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট।'

এখানে 'ও' বর্জিত।

'প্রিয়ম্বদা কেশর ফুলের হার নিলে,
অনসূয়া গন্ধ ফুলের তেল নিলে।'

এখানে 'এবং' বর্জিত।

আবার বলার বিশেষ ভঙ্গিতে আমরা 'আর' 'এবং' এর এর মিছিল গড়তে পারি, কী খেলাম ? কী খেলাম না ? পোলাও আর ফিশফ্রাই আর আলুরদম আর চিলিচিকেন আর রাবড়ি আর দই আর সন্দেশ।

এই বাক্যে এবং ব্যবহারেও কৌতুকরস বাড়ে বই কমে না।

ইংরেজিতে এই ধরনের বাক্যকে অলংকারের মধ্যে ধরা হয়। এর নাম Polysyndeton:

The king and the queen and the clown and the priest and the maid danced and sang and laughed and leaped.

একেবারে and-এর band বাজিয়ে দেওয়া!

ঠিক এর উল্টো হল asyndeton, যেখানে 'and' ঈপ্সিত হলেও একেবারেই বর্জিত। I came, I saw, I conquered. রবীন্দ্র-উদ্ধৃতিটি (অন্ন চাই প্রাণ চাই ইত্যাদি) এই অলংকারের মধ্যেই পড়ে।

AMARBOI.COM

২৪.৯ ■ এই তিনটি অব্যয়ের অন্যান্য অর্থ :

দুই ও চার কত হয় ? (দুই ও চার = দুই যোগ চার)
সে এল আর এবং বসে পড়ল (এবং = তারপর)
বৃষ্টিতে ভিজলাম আর জ্বর এসে গেল (আর = ফলে)
সে কাশী যেতে চায় আর আমি জয়পুর (আর = কিন্তু)
তুমি চাইলে আর আমি অতগুলো টাকা তোমাকে দেব ! (আর = সঙ্গেসঙ্গে)

২৪.১০ ■ অব্যয়ীভাব-অব্যয়

অব্যয়ীভাব সমাসের ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় প্রয়োগগুলিকেও অব্যয় হিসেবে ধরা চলে : আজানু, আসমুদ্রহিমাচল, যথাসাধ্য ইত্যাদি, কারণ এগুলির বিভক্তিযোগে কোনও রূপান্তর সম্ভব নয়।

২৪.১১ ■ অব্যয়ের বাক্য-ব্যঞ্জনা

যখন আমরা বলছি ধিক্ বা ছিঃ তখন তা পূর্ণ বাক্যের শক্তি (potency)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে ধ্বনিত।

'তোমার বা তার কাজ অত্যন্ত গর্হিত' এই সম্পূর্ণ বাক্যেরই প্রতিনিধি ওই ছোট্ট শব্দটি 'ধিক্' বা 'ছিঃ'।

কেউ যখন বলে, আমি জানতাম, তাই।

এই যে 'তাই' বলে বক্তা চুপ করে গেলেন, তাঁর বক্তব্য 'তাই একথা বলেছি' বা অন্য এমন কিছু স্পষ্টতই বোঝা যায়।

সম্পূর্ণ কবিতার বক্তব্যকেই তুলে ধরে এক্কেকটি অব্যয়-শিরোনাম, যেমন তা নইলে (নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)।

'কিছু পেলে কিছু দিয়ে দিবি
তা নইলে পৃথিবী
চলতে চলতে একদিন চলবে না।'

এমনি, তাই, না, ধিক্, যদি— শঙ্খ ঘোষের কয়েকটি কবিতার শিরোনাম।

'তাই' আর 'তো' তো সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সুপরিচিত কবিতা— 'তো' থেকে একটু উদ্ধৃতি দিই—

'যত সুবিধে ভাড়াও তত
লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়বেই তো,
দিন দিন যা ট্যাক্সের বহর
মশাইয়ের বাড়ি ছাড়বেই তো।'

নাটকের নামকরণেও অব্যয় তাৎপর্যবাহী হয়ে ওঠে :

এবং ইন্দ্রজিৎ। এই 'এবং' অনেক বাক্যের একটি কেলাসিত রূপ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৫

ক্রিয়া

[ক্রিয়া ও ক্রিয়ার স্বরূপ— ধাতু—ধাতুর শ্রেণীবিভাগ— ক্রিয়ায় শ্রেণীবিভাগ— সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া— অকর্মক ক্রিয়ার সকর্মকত্ব— সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া— অসমাপিকা ক্রিয়ার স্বরূপ— যৌগিক ক্রিয়া— ক্রিয়ার ভাব— ক্রিয়ার কাল— মৌলিক ও যৌগিক কাল— ক্রিয়ারূপ— ক্রিয়া বিভক্তি ও কালবাচকতা,— আদৌ কোনও কাল বোঝায় না এমন ক্রিয়াপদ—]

২৫.১ ■ ক্রিয়া ও ক্রিয়ার স্বরূপ

বাক্য বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি কারও সম্বন্ধে কিছু বলা হচ্ছে। যার সম্বন্ধে কিছু বলা হচ্ছে সে 'উদ্দেশ্য' আর এই উদ্দেশ্যের সম্বন্ধে যা বলা হচ্ছে তা বিধেয়। এই উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্তা, আর তার হওয়া বা কোনও কিছু করা যে-শব্দে বোঝায় তা হচ্ছে ক্রিয়া। এই ক্রিয়া বিধেয়-অংশে থাকে। বিধেয়-অংশে শুধু ক্রিয়াও থাকতে পারে, এই ক্রিয়াকে বিশেষিত করছে এমন শব্দও থাকতে পারে, যেমন ঘোড়া ছোটে, সূর্য ওঠে, জল পড়ে, পাতা নড়ে ইত্যাদি বাক্যে শুধু উদ্দেশ্য বা কর্তা আছে এবং ক্রিয়া আছে। ছোটে, ওঠে, পড়ে, নড়ে— এই শব্দগুলো যথাক্রমে ঘোড়া, সূর্য, জল ও পাতার কোনও কাজ করা বোঝাচ্ছে।

যদি বিধেয়াংশে একটি বাড়তি শব্দ এনে বলি ঘোড়া দ্রুত ছোটে— তা হলেও 'ছোটে'ই যে মূলত ঘোড়ার বিশেষ-কিছু-করা বোঝাবে তা বলাই বাহুল্য।

'হওয়া' ক্রিয়াটি অনেক সময় উহ্য থাকে যেমন ফুলটি সুন্দর। ইংরেজিতে The flower is beautiful. বললে 'is' verbটিকে চোখে দেখা যায়, কিন্তু বাংলায় আমরা 'ফুলটি হয় সুন্দর' কিছুতেই বলব না। বিধেয়াংশের এই বিশেষণটিকে বলা হয় বিধেয় বিশেষণ। 'ফুলটি সুন্দর' বললে কালের আভাস কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে, কালটি বর্তমান। অতীত হলে ক্রিয়াপদটি উল্লিখিত হত— ফুলটি সুন্দর ছিল, ভবিষ্যৎ বোঝাতে বলা হত ফুলটি সুন্দর হবে (অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হলে)।

বোঝা যাচ্ছে ক্রিয়ার সঙ্গে কালের একটা বোধ জড়িয়ে থাকে কিছু হওয়া বা করার বোধের সঙ্গে।

জার্মান Zeitwort এবং Tatwort শব্দ দুটোতে আছে এই ভাবটি। Zeitwort (ৎসাইট্ ভর্ট্) মানে time-word আর Tatwort (টাট্ভর্ট) মানে deed-work. ইংরেজি Verb (< লা. verbum) ক্রিয়াপদের বৈশিষ্ট্যের তেমন কোনও ইঙ্গিত দেয় না। ব্যুৎপত্তিগতভাবে verb মানে 'শব্দ'। আরবি-ফারসি 'ফিল' মানে action বা performance. ক্রিয়ার অর্থের ইঙ্গিত শব্দটিতে আছে। ক্রিয়া বোঝানোর চিনা শব্দ 'তুং', ভাবলিপি বিশ্লেষণ করলে যার অর্থ দাঁড়ায় 'to

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

exert', 'to rise to action'।

ক্রিয়াপদের প্রাচীন পরিভাষা ছিল 'আখ্যাত', অর্থাৎ কর্তার কিছু করা যার দ্বারা আখ্যাত হয় তাই ক্রিয়া— ক্রিয়াবাচকমাখ্যাতম্ (ঋক্‌প্রাতিশাখ্য)। 'আখ্যাত' শব্দটি 'ধাতু'-কেও বোঝাত।

২৫.২ ■ ধাতু

ধাতুই ক্রিয়ার মূল এবং ক্রিয়ার বাচক— ক্রিয়াবচনো ধাতুঃ, (মহাভাষ্য)। 'ধাতু' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'ধারক', অর্থাৎ ক্রিয়ার্থের ধারক। ক্রিয়াপদ থেকে বিভক্তি বাদ দিলে যা থাকে তা-ই 'ধাতু' অর্থাৎ 'ক্রিয়ামূল'। করে, করিল, করিবে ইত্যাদির মূল √ কর্। (এ, ইল, ইবে যথাক্রমে বিভক্তি-অংশ)।

২৫.৩ ■ ধাতুর শ্রেণীবিভাগ

যে-ধাতুকে আর ভাঙা যায় না তা **সিদ্ধ** বা **মৌলিক ধাতু** আর যে-ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করে নতুন ধাতু গড়ে ওঠে তাকে **সাধিত ধাতু** বলে

প্রযোজক ধাতু :

যে ধাতু অন্যকে দিয়ে কিছু করানো বোঝায় তাকে প্রযোজক ধাতু বলে।

√ পড়্+আ=√পড়া (আমি ওকে পড়াই)

√খা+আ=√খাওয়া (মা শিশুকে খাওয়ান)

√বল্+আ=√বলা। (আমি ওকে দিয়ে গল্প বলাই)।

যেমন ধাতু থেকে আ-প্রত্যয়যোগে নতুন ধাতু গঠিত হতে পারে, তেমনি শব্দ থেকেও আ-প্রত্যয়যোগে ধাতু গঠিত হতে পারে

AMARBOI.COM

নাম ধাতু :

যে ধাতু নামপদ অর্থাৎ বিশেষ্য ও বিশেষণ থেকে গঠিত হয় তাকে নামধাতু বলে :

আগল+আ=√আগলা (ঘর আগলাও)

হাত+আ=√হাতা (অন্যের সম্পত্তি হাতিয়ে বড় লোক হয়েছে যে)

জুতা+আ=√জুতা (জুতিয়ে মুখ লম্বা করে দেব)

লতা+আ=√লতা (গাছটা লতিয়ে উঠেছে)

বিষ+আ=√বিষা (সারা শরীর বিষিয়ে গেল)

চমক+আ=√চমকা (বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে)

কাছ+আ=√কাছা (কাছিয়ে এসেছে পূজো)

এই রকম √ঘুমা, √আঁচড়া, √চড়া, √বেতা √বাহিরা (বাহিরায় নদী যাবে সিন্ধুর উদ্দেশে)

বিনা প্রত্যয়যোগে বা শূন্য প্রত্যয় যোগেও নামধাতু হতে পারে :

ঘাম > √ঘাম (গা ঘামছে)

কম > √কম (দাম কমবে না)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাত > √তাত (তেতে উঠেছে মাটি)
কবিতায় তৎসম শব্দ থেকে গড়ে ওঠা এই ধরনের নাম ধাতুর ব্যবহার প্রচুর
শাস্তি > √শাস্তি (শাস্তি নরাধমে)
আঘাত (আঘাতিতে তারে)
দান (দানিল বিপ্র)
জনম < জন্ম > √জনম (জনমিল নয়নাগ্নি)
উত্তর √ উত্তর (উত্তরিলা বিভীষণ)
বিমুখ > √বিমুখ (কোন্ দেববলে বিমুখে সমরে মোরে)
নির্বীর > √নির্বীর : নির্বীরিব লঙ্কাপুর আজি।

ধ্বন্যাত্মক নামধাতু

ধ্বন্যাত্মক শব্দের 'আ' যোগে এই ধাতু গঠিত হয় :
চন্‌মন্‌+আ=√চনমনা (চনম্‌নিয়ে রোদ উঠল)
ধড়ফড়+আ=√ধড়ফড়া (বুক ধড়ফড়াছে)
এই রকম : ছট্‌ফটা, কড়কড়া, খন্‌খনা তড়বড়া ইত্যাদি।
বিনা প্রত্যয়যোগে :
নদী কলকলে = কলকল করে।

সংযোগমূলক ধাতু :

বিশেষ্য বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক শব্দের সঙ্গে √কর্, √হ্, √যা, √পা, √খা, √বাস্ প্রভৃতি ধাতু যোগ করে যে ধাতু তৈরি হয় তাকে সংযোগমূলক ধাতু বলে :

√কর্— √গান কর্, √স্নান কর্, √স্বীকার কর্, √শুরু কর্, √শেষ কর্, √নালিশ কর্, ইত্যাদি। সে গান করছে এই বাক্যে ক্রিয়া 'গান করছে', গান কর্মকারক নয়। কিন্তু সে ভক্তিমূলক গান করছে। —এখানে করছে ক্রিয়া 'গান' কর্ম, 'ভক্তিমূলক' তার বিশেষণ।

√হ্— √রাজি হ্, √উদয় হ্,
√দে— √জবাব দে, √শাস্তি দে, √সাজা দে, √ভোট দে, √শিক্ষা দে
√পা— √লজ্জা পা, কষ্ট পা, বৃদ্ধি পাওয়া, √(খাওয়া)। √খা— হাবুডুবু খা
বাস— √ভাল বাস্, √মন্দ বাস্, √ভয় বাস্ ইত্যাদি ; 'ভাল'র সঙ্গে এখন শুধু 'বাস্' ধাতুর প্রয়োগ হয়, অন্য শব্দের সঙ্গে নয়।

ইংরেজি শব্দের সঙ্গে, কর্ যোগে ধাতু তৈরি করে নেওয়া এখন বাংলা বাগ্‌বিধির অন্তর্গত
নিজেই ড্রাইভ করব (√ ড্রাইভ্ কর্)
অ্যাপ্লাই তো করে দে, পরে দেখা যাবে। (√অ্যাপ্লাই কর্)
পরীক্ষায় স্ট্যান্ড করেছে। (√স্ট্যান্ড কর্) ইত্যাদি।

২৫.৪ ■ ক্রিয়ার শ্রেণীবিভাগ

এতক্ষণ ধাতুপর্যায়ে আমরা যে আলোচনা করলাম তাতে দেখলাম ধাতুর উদাহরণ দিতে গিয়ে আমরা ক্রিয়াপদেই এসে পড়ছি। তাই প্রযোজক ধাতু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে যে ক্রিয়া তাকে আমরা 'প্রযোজক ক্রিয়া' বলতে পারি, তেমনি 'নামধাতু' থেকে যে ক্রিয়া তাকে বলতে পারি 'নামধাতুজ ক্রিয়া', আর এই ক্রিয়ার বিশেষ বিভাগটিকে বলতে পারি 'ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া'। আর সংযোগমূলক ধাতু থেকে যে ক্রিয়া তাকে বলতে পারি 'সংযোগমূলক ধাতু-জ ক্রিয়া' বা সংযোগমূলক ক্রিয়া।

আচার্য সুনীতিকুমার বলেন সংযোগমূলক ক্রিয়াটি হাইফেনযুক্ত করে লেখাই ভাল। আমরা অন্ন আহার-করি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই মিশ্র বা সংযোগমূলক ক্রিয়া স্বীকার করেননি। তিনি বলেছিলেন— 'বাংলার ব্যাকরণকারদিগের অতি অদ্ভুত আবিষ্কার মিশ্রক্রিয়া (=সংযোগমূলক ক্রিয়া)। তাঁহারা বলেন 'আহার করা' 'প্রচার করা' এ সকল মিশ্র ক্রিয়া ; দুয়ে মিশিয়াছে বলিয়া উহার নাম মিশ্র ক্রিয়া ; পাণিনির চৌদ্দ পুরুষেও এত উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতে পারেন নাই। বাংলা ব্যাকরণকারেরা বলেন, যদি আহার করা ক্রিয়া না হয়, তবে অন্ন আহার করিতেছে এ স্থলে অন্ন কর্মকারক কীরূপে হইবে। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে করে ক্রিয়ার কর্ম আহার। অন্ন ওই ক্রিয়ার কর্ম হইতে পারে না। অন্ন পদটি আহার এই কৃদন্ত পদের কর্ম।'

(বাংলা ব্যাকরণ। সাহিত্যপরিষদ পত্রিকা প্রথম সংখ্যা ১৩০৮)

অর্থাৎ শাস্ত্রীমহাশয় বলতে চেয়েছেন কৃদ্‌যোগে কর্মে ষষ্ঠী এটি সংস্কৃতের নিয়ম, বাংলার নয়, অতএব ষষ্ঠীর জায়গায় দ্বিতীয়া বিভক্তি, এক্ষেত্রে শূন্যবিভক্তিযুক্ত অন্ন 'আহার'-এর কর্ম আর করিতেছে ক্রিয়ার কর্ম 'আহার'। কিন্তু বাংলায় ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও বিশেষণ শব্দের সঙ্গে কর্ ইত্যাদি ধাতুযোগেও এই সংযোগমূলক ক্রিয়া হয়। সেক্ষেত্রে 'চক্‌চক করছে' এই বাক্যাংশে 'চক্‌চক্'কে করেছের কর্মপদ কী করে বলি ? তেমনি দুটিপত্র গ্রথিত করো, এখানে 'গ্রথিত'ও তো কর্মপদ হতে পারে না।

এবারে আমরা ক্রিয়ার অন্যান্য বিভাগগুলি আলোচনা করব।

২৫.৫ ■ সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া

নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে ক্রিয়ার কর্ম আছে তাকে সকর্মক ক্রিয়া বলে, যেমন :

সে চিঠি লিখছে। তুমি ছবি আঁকছ।

আমি চাঁদ দেখছি।

এই তিনটি বাক্যে লিখছে, আঁকছ আর দেখছি ক্রিয়া সকর্মক কারণ তাদের কর্ম আছে, কর্মগুলি যথাক্রমে চিঠি, ছবি ও চাঁদ।

দ্বিকর্মক ক্রিয়া

কোনও কোনও ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকতে পারে। এই রকম ক্রিয়ার নাম দ্বিকর্মক ক্রিয়া, যেমন

সে মাকে চিঠি লিখছে।

মা আমাকে গল্প বলছেন,

আমি তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম।

এখানে 'লিখছে', 'বলছেন' এবং 'জিজ্ঞেস করলাম' ক্রিয়ার যথাক্রমে দুটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে কর্ম :

মাকে ও চিঠি, আমাকে ও গল্প, তাকে ও কারণ।

দেখা যাচ্ছে দুটি কর্মের মধ্যে একটি ব্যক্তিবাচক এবং আর-একটি বস্তুবাচক। বস্তুবাচক কর্মের নাম মুখ্যকর্ম (Direct object) আর ব্যক্তিবাচক কর্মের নাম গৌণ-কর্ম (Indirect object)। দ্বিকর্মক ক্রিয়াকে অবলম্বন করে 'কী' জিজ্ঞেস করে যে উত্তর পাওয়া যায় তা মুখ্য কর্ম আর 'কাকে' জিজ্ঞেস করে যে উত্তর পাওয়া যায় তা গৌণ কর্ম।

সংস্কৃতে দুহ্, যাচ্, পচ্ ইত্যাদি ষোলোটি ক্রিয়ার দুটি করে কর্ম হয়। কিন্তু বাংলায়— লেখা, বলা, জিজ্ঞেস করা ইত্যাদি সামান্য কয়েকটি ধাতুই দ্বিকর্মক হতে পারে।

মুখ্য-গৌণ এই দুটি নামের তাৎপর্য

মুখ্য কর্ম বলতে বোঝায় এমন কর্ম যেখানে কর্ম ছাড়া অন্য কারক হতেই পারে না। আর গৌণ কর্ম বলতে বোঝায় সেই কর্ম যেখানে অর্থানুযায়ী অন্য কারকের প্রয়োগও সম্ভব হতে পারে। সংস্কৃত উদাহরণ নিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। সংস্কৃতে দ্বিকর্মক ক্রিয়ার প্রকাশটি এইরকম : বৃক্ষং পুষ্পং চিনোতি, অর্থাৎ বৃক্ষকে পুষ্প চয়ন করিতেছে।

কিন্তু বাংলায় এভাবে তো আমরা বলবই না। আমরা বলব, বৃক্ষ হইতে পুষ্প চয়ন করিতেছে। সংস্কৃতেও অর্থের দিক দিয়ে তা 'বৃক্ষাৎ পুষ্পং চিনোতি', তাই এই অপাদান কারকের প্রয়োগ সম্ভব হলেও যেখানে আমরা কর্ম কারকের প্রয়োগ করছি সেখানে সেই কর্ম মুখ্য নয় বা একমাত্র প্রযোজ্য নয়, অর্থাৎ তা গৌণ বা অপ্রধান। বাংলাতেও ছাত্রকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে এ বাক্যে

ছাত্রকে=ছাত্রের কাছ থেকে।

তেমনি, মাকে চিঠি লিখছে=মার কাছে চিঠি লিখছে।

ইংরেজিতেও, He wrote his mother a letter= He wrote a letter to his mother.

AMARBOI.COM

অকর্মক ক্রিয়া

যে ক্রিয়ার কর্ম নাই তা-ই অকর্মক ক্রিয়া। যেমন, সে রোজ এখানে আসে, সে মাটিতে শোয়, সে রোজ সেখানে যায়, সে ভাল দৌড়োয়, সে অল্পক্ষণ ঘুমোয়।

এখানে আসে, শোয়, যায়, দৌড়োয়, ঘুমোয় এগুলি অকর্মক ক্রিয়া, এদের কোনও কর্ম নাই। এ-সব ক্রিয়াকে অবলম্বন করে 'কী' বা 'কাকে' প্রশ্ন করে কোনও উত্তর পাওয়া যাবে না।

অকর্মক ক্রিয়ার সকর্মক ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহার

কতকগুলি অকর্মক ক্রিয়া নিজেরা যে ধাতু থেকে এসেছে সেই ধাতু থেকেই ভাববাচক কর্ম বানিয়ে নিয়ে সকর্মক হিসেবে ব্যবহৃত হয় :

কী ঘুম ঘুমিয়েছি, কী খেলাই খেললে ! এমন দৌড় দৌড়োলাম ইত্যাদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই অকর্মক ক্রিয়ার কর্মকে **সমধাতুজ** কর্ম বলে (Cognate object)

২৫.৬ সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া

যে ক্রিয়াপদ বাক্যের পূর্ণতা বা পরিসমাপ্তি ঘটায় তাকে **সমাপিকা ক্রিয়া** বলে।

আমি ভাত খাচ্ছি। সে রোজ গান শোনে। তারা দিল্লি যাবে। এখানে খাচ্ছি, শোনে, যাবে এই ক্রিয়াপদগুলি বাক্যের পরিসমাপ্তি এনেছে তাই এরা সমাপিকা।

কিন্তু যদি বলি

আমি ভাত খেয়ে, আমি ভাত ফেলে, কিংবা আমি ভাত খেতে বা আমি ভাত খেতে খেতে— তা হলে বাক্য অসমাপ্তই রয়ে যাবে।

তাই যে-সব ক্রিয়াপ্রয়োগে বাক্য অসম্পূর্ণ থাকে তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে।

এখানে খেয়ে, খেলে, খেতে বা খেতে খেতে অসমাপিকা ক্রিয়া। তার মানে ইয়া >এ, ইলে>লে, ইতে<তে প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি অসমাপিকা ক্রিয়ার পর্যায়ে পড়ে।

খাইয়ে > খেয়ে, খাইলে > খেলে, খাইতে > খেতে, খাইতে খাইতে < খেতে খেতে।

এই বাক্যগুলিতে পূর্ণতা আনতে আমাদের সমাপিকা ক্রিয়ার সাহায্য নিতেই হবে। আমি ভাত খেয়ে অফিসে যাব, আমি ভাত খেলে, তবে সে যাবে, আমি ভাত খেতে চাই, আমি ভাত খেতে খেতে কাগজ পড়ি।

● অসমাপিকার 'ইয়া' প্রত্যয় এসেছে ল্যপ্ প্রত্যয় থেকে। সংস্কৃতে ক্ত্বাচ্ বা ল্যপ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ অব্যয়, তেমনি 'ইতে' বাচক তুমুন্নন্ত শব্দও সংস্কৃতে ক্রিয়া নয়, অব্যয়। তাই এগুলোকে অসমাপিকা ক্রিয়া না বলে ক্রিয়াবাচক অব্যয় বললে কেমন হয়? 'বলিয়া' (রাম বলিয়া একটি বালক ছিল) 'করিয়া' (হাতায় করিয়া দাও) অনুসর্গ তো অব্যয়ই। 'দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে জাগিয়া উঠিল শিখ'— এখানেও 'দেখিতে দেখিতে' ক্রিয়া বিশেষণস্থানীয় অব্যয় নয় কি?

আর যেখানে 'আমি তাহাকে যাইতে দেখিলাম' বাক্যে, যাইতে=যাওন্ত। এই 'ইতে' শতৃ-প্রত্যয়ের সগোত্র, কিন্তু রূপান্তর নেই বলে অব্যয়। এটিও ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় অব্যয়। 'যাইতে' দেখিলাম ক্রিয়া-কেই বিশেষিত করছে।

'ইতে ইতে' এই দ্বৈত শব্দে তো শতৃর ভাবটি স্পষ্ট কিন্তু দেখিতে দেখিতে যাইতেছি, এই বাক্যে 'দেখিতে দেখিতে' যাইতেছি-ক্রিয়ার বিশেষণ: এই যুগ্ম প্রয়োগটিও অব্যয়স্থানীয়।

● আর 'ইলে' আসলে ইল+এ।

ইত>ইড়>ইল।

সে আসিলে আমি যাইবে,

এই বাক্যের আসিলে মূলত 'আগতে'।

তস্মিন্ আগতে অহম্ গমিষ্যামি?

বাংলা 'তস্মিন্'-এ সপ্তমী বিভক্তির বদলে প্রথমা বিভক্তি বা শূন্য বিভক্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে, একে আমরা নিরপেক্ষ কর্তা বলি। (ইং Nominative Absolute) 'আসিলে'র বিভক্তির চিহ্ন আসলে—

আ+ইত>ইড়>ইল+এ = আইলে।

তথাকথিত অসমাপিকাকে এইভাবে দেখলে তা

ক্রিয়াবাচক অব্যয়-ই হয়ে পড়ে। (এই প্রসঙ্গে অধিকরণ কারক পর্যায়ে ভাবাধিকরণ দ্রষ্টব্য)

ইংরেজিতে infinite verb কথাটা থাকলে তা কখনও noun কখনও adjective, কখনও adverb

I see him go.

= I see him to go = I see him going. go এখানে Adjective

He has a house **to live in.**

স্থূলাক্ষর শব্দগুচ্ছ এখানে Adj.

He came **to see me.**

স্থূলাক্ষর শব্দগুচ্ছ এখানে Adv.

To see him is **to love** him.

এখানে স্থূলাক্ষর অংশগুলি Noun.

Having done it he returned home.

স্থূলাক্ষর শব্দ এখানে বিশেষণস্থানীয়।

তবে ক্রিয়াবাচকতা সবক্ষেত্রেই আছে, কোনওটা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য কোনওটা ক্রিয়াবাচক বিশেষণ বা ক্রিয়াবিশেষণ। অসমাপিকা যথার্থই স্বীকৃত হলে ইংরেজি ব্যাকরণে Participle, participial adjective, past participle, simple infinitive ও gerundial infinitive ইত্যাদি term-এর উদ্ভব হয়তো হত না।

AMARBOI.COM

যৌগিক ক্রিয়া (Compound Verb)

ইয়া বা ইতে প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার সঙ্গে হ, আছ্, থাক্, রহ্, চল্, যা, আস্, বস্, উঠ্, দে, নে, পা, লাগ্, ফেল্, পড়, চাহ্, দেখ্, বাস্ ইত্যাদি ধাতু-জাত সমাপিকা ক্রিয়া যোগ করে যে ক্রিয়া গঠিত হয় তাকে **যৌগিকক্রিয়া** বলে।

ইতে : হাসিতে থাকিল > হাসতে থাকল, দিতে গেলাম, খেতে বসলাম, দেখতে পেলাম।

ইয়া : উঠিয়া পড়িলাম > উঠে পড়লাম, দেখে ফেললাম, হেসে উঠল, শুনে রাখ, হয়ে উঠল।

ক্রিয়ার ভাব বা প্রকার (mood)

- ক্রিয়ার কাজ যে-ভাবে (mood) প্রকাশিত হয় তাকে ক্রিয়ার ভাব (mood) বা 'প্রকার' বলে। রামমোহন রায় 'প্রকার' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

নির্দেশক ভাব (Indicative mood): যে-ভাবে কোনও ঘটনার ঘটাটি নির্দেশিত করে তাকে অবধারক বা নির্দেশক ভাব বলে, যেমন

সূর্য উঠেছে।

নদীতে মাঝিরা নৌকা বাইছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে-ভাবে আবেদন, অনুমতি, অনুরোধ, আদেশ, আমন্ত্রণ, আশীর্বাদ, প্রার্থনা ইত্যাদি প্রকাশ করে তাকে **'অনুজ্ঞা'-ভাব বলে** (Imperative mood)

Imperative শব্দটির মূলে আছে লা. imperare = to command.]

আবেদন। দয়া করে একবার দেখবেন ব্যাপারটা।

অনুমতি। হ্যাঁ, ওখানেই যাও।

অনুরোধ। অনুগ্রহ করে এই অনুচ্ছেদটার অর্থ বুঝিয়ে দিন।

আদেশ। এক্ষুনি বেরিয়ে যাও।

আমন্ত্রণ। সপরিবারে আসুন।

আশীর্বাদ। বেঁচে থাকো, বাবা।

প্রার্থনা। কৃপা করো, ভগবান।

অনুজ্ঞাকে বিভক্তিযোজনার প্রকার-ভেদে দু-ভাগে ভাগ করা হয় : বর্তমান অনুজ্ঞা ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা : (বর্তমানকালের বিভক্তি যোগ)

বর্তমান অনুজ্ঞা : করো, খাও, যাও ইত্যাদি। কাজটি মন দিয়ে করো।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা : করবে, খাবে, যাবে অথবা কোরো, খেয়ো, যেয়ো।

(ভবিষ্যৎকালের বিভক্তিযোগে)

কাজটি মন দিয়ে করবে বা কোরো।

ইংরেজিতে Imperative মধ্যম পুরুষের সঙ্গেই সম্পর্কিত, বাংলায় মধ্যমপুরুষ ও প্রথম পুরুষের সঙ্গে এর পূর্ণরূপ আমরা পরে দেখাব।

সংস্কৃতে অনুজ্ঞা বোঝাতে শুধু লোট্-এর বিধিলিঙ ও লৃট্-এর প্রয়োগও দেখা যায় ইদং কুরু, ইদং কুর্য্যাঃ, ইদং করিষ্যসি (যথাসাধ্যম্)

ঘটনা-আপেক্ষিত ভাব (Subjunctive mood): যদি বৃষ্টি হয় ফসল ভাল হবে।

কামনাত্মক ভাব (Optative mood): ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

যেন তাই হয়।

যদি তোমার মতো দাদা পেতাম।

AMARBOI.COM

একটি নামকরণ

● Indicative এর বাংলা করা হয়েছে 'নির্দেশক'। কিন্তু এটি ইংরেজি সংজ্ঞাটির যথার্থ অনুবাদ নয়। Indicative = expressing a word in which an act or condition is stated as an actual fact.

এই stating-এর অর্থ নির্দেশক শব্দটি ঠিক বহন করে না। বরং 'অনুজ্ঞা' সংজ্ঞাটির সঙ্গে প্রায় সমার্থক হয়ে পড়ে। তাই অনুজ্ঞা থেকে তাকে পৃথক করে বোঝানোর জন্যে 'ঘটনাবাচক' বলাই ভাল বলে মনে হয়। সুনীতিকুমার 'অবধারক' কথাটি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু অবধারক মানে নিরূপক, নির্ণায়ক নির্ধারিক বা নিশ্চিতরূপে কথিত। এর কোনও অর্থই মূল পরিভাষাটির সঠিক অর্থ বহন করে না।

২৫.৭ ■ ক্রিয়ার কাল

ক্রিয়ার কাল বোঝাতে সংস্কৃতে 'ল' পরিভাষাটি চলত। বাংলায় স্বতন্ত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনও পরিভাষা নাই। ইংরেজি Tense শব্দটি 'কাল'-বাচক (লা. Temps > tense = time)।

● বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ এই তিনটির সঙ্গে সম্পর্কিত করে 'ক্রিয়ার কাল' বিবেচিত হয়। যে কাল বর্তমানের সঙ্গে সম্পর্কিত তা বর্তমান কাল (present tense), যা অতীতের সঙ্গে সম্পর্কিত তা অতীত কাল, আর যা ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্পর্কিত তা ভবিষ্যৎ কাল। যায়, গিয়াছিল ও যাইবে—যথাক্রমে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়া।

ক্রিয়ার সম্পন্নতা, অসম্পন্নতা, ঘটমানতা, দূরবর্তিতা, নিত্যবৃত্ততা, ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার (aspect) অনুসারে কালের বিভাগও নানারকম। যেমন

● যা নিত্যই ঘটে, সামান্য বর্তমান বা নিত্য বর্তমান : সে আসে, যা ঘটছে বা ঘটে চলেছে, তা ঘটমান বর্তমান : সে আসিতেছে > আসছে, যা ঘটছে।

● ভবিষ্যতে যে ক্রিয়ায় কাজ ঘটতে থাকবে তা বোঝাতে যে কাল তার নাম ঘটমান ভবিষ্যৎ (Future continuous)।

একদিন যন্ত্রই সব করিতে থাকিবে > করতে থাকবে।

● পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ যা অতীতে ঘটেছে কিন্তু যা ঠিক স্মরণে আসছে না এমন ভাব বোঝাতে যে কাল তাকে পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ বলা হয়। যেমন, হয়তো বলিয়া থাকিব > বলে থাকব কিন্তু মনে পড়ছে না।

আসলে এই কালটি অতীতেরই অন্তর্ভুক্ত, বিভক্তিটি ভবিষ্যতের, তাই একে আরবি-ফারসিতে মাজ়ী ইহ্‌তিমালী বা মাজ়ী শাক্কিয়া বলা হয়েছে, এর অর্থ সন্ধিগ্ধ ভূত। উর্দু ব্যাকরণেও তাই।

হিন্দি ব্যাকরণে উর্দুর অনুকরণেই এর নামকরণ হয়েছে 'সন্ধিগ্ধ ভূত'। 'মৈঁনে কহা হোগা লেকিন য়াদ নহী'—হয়তো বলেছি কিন্তু মনে নাই। ইংরেজিতে একে Dubious Past বলা হয়।

AMARBOI.COM

২৫.৮ ■ মৌলিক ও যৌগিক কাল

● গঠনের দিক দিয়ে কালকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। মৌলিক কালে ধাতু স্বয়ং বিভক্তি থেকে বা প্রত্যয় ও বিভক্তি থেকে ক্রিয়ারূপ সৃষ্টি করে :

সাধারণ বর্তমান, সাধারণ অতীত, সাধারণ ভবিষ্যৎ ও নিত্যবৃত্ত অতীত মৌলিককাল।

সাধারণ বর্তমান :

√কর্+ই=করি, √কর্+অ=কর, √কর্+এ=করে।

সাধারণ অতীত :

√কর্+ইল্+আম=করিলাম > করিলাম > করলাম

√কর্+ইল্+এ=করিলে > করলে > করলি

√কর্+ইল্+অ=করিল √ করিল > করল

সাধারণ ভবিষ্যৎ :

√কর্+ইব্+অ=করিব > করব

√কর্+ইব্+এ=করিবে > করবে

√কর্+ইব্+এ=করিবে > করবে

নিত্যবৃত্ত অতীত :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

√কর্+ইত্+আম=করিতাম > করতাম
√কর্+ইত্+এ=করিতে > করতে
√কর্+ইত্+অ=করিত > করত
ই, এ, অ —এগুলি বিভক্তি
ইল্, ইব্, ইত্—এগুলি প্রত্যয়। এগুলির বিশেষ নাম ধাত্ববয়ব অর্থাৎ ধাতুর অবয়ব।

যৌগিক কাল

• যৌগিক কালে ধাতু অন্য ধাতুর সাহায্যে ক্রিয়াপদ গঠন করে। মূল ধাতুর সঙ্গে ইয়া বা ইতে যুক্ত হয়, তার সঙ্গে আছ্ বা থাক্ ধাতু যুক্ত হয়। তারপর তা মৌলিক ধাতুর মতোই প্রত্যয় ও বিভক্তি গ্রহণ করে।

ঘটমান বর্তমান :
(√কর্+ইতে)+আছ্+ই=করিতে-আছি > করিতেছি > করছি।
পুরাঘটিত বর্তমান :
(√কর্+ইয়া)+√আছ্+ই=করিয়াছি > করেছি
পুরাঘটিত অতীত :
(√কর্+ইয়া)+√আছ+ইল্ আম=করিয়াছিলাম > করেছিলাম
ঘটমান অতীত :
(√কর্+ইতে)+√আছ্+ইল্+আম =করিতেছিলাম > করতেছিলাম।
ঘটমান ভবিষ্যৎ :
(√কর্+ইতে)+ √থাক্+ইব্+অ= করিতে থাকিব > করতে থাকব।

AMARBOI.COM

২৫.৯ ■ ক্রিয়া-রূপ

(প্রথমটি উত্তমপুরুষ, দ্বিতীয়টি মধ্যমপুরুষের এবং তৃতীয়টি প্রথম পুরুষের সর্বত্র এক বচন ও বহুবচনের একই রূপ)।
কর্ ধাতু (সামান্যার্থে তুমি, তোমরা, সে তাহারা ইত্যাদি যোগে)

বর্তমান

সাধারণ বর্তমান :
করি কর করে
ঘটমান বর্তমান :
করিতেছি > করছি   করিতেছ > করছ   করিতেছে > করছে।
পুরাঘটিত বর্তমান :
করিয়াছি > করেছি   করিয়াছ > করেছ   করিয়াছে > করেছে।

অতীত

সাধারণ অতীত :
করিলাম > করলাম   করিলে > করলে   করিল > করল
ঘটমান অতীত :
করিতেছিলাম > করছিলাম   করিতেছিলাম   করিতেছিল > করছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরাঘটিত অতীত :

করিয়াছিলাম > করেছিলাম করিয়াছিলে > করেছিলে করিয়াছিল > করেছিল

নিত্যবৃত্ত অতীত :

করিতাম > করতাম করিতে > করতে করিত >করত

ভবিষ্যৎ

সাধারণ ভবিষ্যৎ :

করিব > করব করিবে > করবে করিবে > করবে

ঘটমান ভবিষ্যৎ :

করিতে থাকিব > করতে থাকব, করিতে থাকিবে > করতে থাকবে, করিতে থাকিবে > করতে থাকবে।

পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ :

করিয়া থাকিব > করে থাকব, করিয়া থাকিবে > করে থাকবে, করিয়া থাকিবে > করে থাকবে

কর্ ধাতু

- **সম্ভ্রমার্থে (আপনি-আপনারা তিনি তাঁহারা ইত্যাদি যোগে)**

সাধারণ বর্তমান :

করি করেন করেন

ঘটমান বর্তমান :

করিতেছি > করছি, করিতেছেন > করছেন, করিতেছেন >করছেন

পুরাঘটিত বর্তমান :

করিয়াছি > করেছি করিয়াছেন > করেছেন করিয়াছেন > করেছেন।

অতীত

সাধারণ অতীত :

করিলাম > করলাম করিলেন > করলেন করিলেন >করলেন

ঘটমান অতীত :

করিতেছিলাম > করছিলাম করিতেছিলেন > করছিলেন করিতেছিলেন > করছিলেন

পুরাঘটিত অতীত :

করিয়াছিলাম > করেছিলাম করিয়াছিলেন > করেছিলেন করিয়াছিলেন > করেছিলেন।

ভবিষ্যৎ

সাধারণ ভবিষ্যৎ :

করিব > করব করিবেন > করবেন করিবেন > করবেন

ঘটমান ভবিষ্যৎ :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিতে থাকিব > করতে থাকব   করিতে থাকিবেন > করতে থাকবেন
করিতে থাকিবেন > করতে থাকবেন
পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ :
করিয়া থাকিব > করে থাকব   করিয়া থাকিবেন > করে থাকবেন,
করিয়া থাকিবেন > করে থাকবেন

কর্ ধাতু

(তুচ্ছার্থে। তুই, তোরা যোগে)

শুধু মধ্যমপুরুষেই ভেদ

বর্তমান

মধ্যমপুরুষ

সাধারণ বর্তমান :
করিস্
ঘটমান বর্তমান :
করিতেছিস > করছিস
পুরাঘটিত বর্তমান :
করিয়াছিস > করেছিস

অতীত

সাধারণ অতীত :
করিলি > করলি
ঘটমান অতীত :
করিতেছিলে > করছিলি
পুরাঘটিত অতীত :
করিয়াছিলি > করেছিলি
নিত্যবৃত্ত অতীত :
করিতিস > করতিস

ভবিষ্যৎ

সাধারণ ভবিষ্যৎ :
করিবি > করবি
ঘটমান ভবিষ্যৎ :
করিতে থাকিবি > করতে থাকবি
পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ :
করিয়া থাকিবি > করে থাকবি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্তমান অনুজ্ঞা :

করো করুক

কর্ করুন

করুন

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা :

করিবে > করবে বা করিও > কোরো

করিস

করিবেন > করবেন

২৫.১০ ■ ক্রিয়াবিভক্তি ও কালবাচকতা

● বাংলায় ক্রিয়াবিভক্তি দেখে সব সময় কাল বোঝা যায় না। যেমন, 'এই আসছি' (ঘটমান বর্তমান) 'এইমাত্র এসেছি' (পুরাঘটিত বর্তমান) বোঝাতে পারে। আবার 'এই আসছি' বললে ভবিষ্যৎ কালও বোঝাতে পারে। ভবিষ্যৎ অর্থে বর্তমানের প্রয়োগ সংস্কৃত বাগবিধি থেকেই এসেছে মনে হয়। অহমেব অনুপদমেব আগচ্ছামি (=আগমিষ্যামি)। হিন্দি-উর্দুতেও এধরনের প্রয়োগ ভুরিভুরি—মৈঁ অভী আতা (=আউঙ্গা)।

"আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল", এখানে 'ছিল'র মানে যে 'আছে', তা বলা বাহুল্য। 'সেদিন পুটু যাচ্ছে, ওদিক থেকে নিতু আসছে, দুজনের দেখা হয়ে গেল।' এখানে যাচ্ছে আর আসছে ঘটমান বর্তমানের ক্রিয়া হয়েও ঘটমান অতীত বোঝাচ্ছে।

আমরা সাধুভাষার সঙ্গেই চলিত ভাষার রূপ > চিহ্ন দিয়ে দেখিয়েছি। চলিত ভাষার ক্রিয়ার রূপগুলিকে সাধারণভাবে সাধু ভাষার পূর্ণাঙ্গ রূপের সংক্ষেপণ বলা চলে। স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, দ্বিমাত্রিকতা, হ-কার লোপ-প্রবণতা—এক কথায় আধুনিক বাংলায় স্বকীয় উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের দরুন অনেকাংশে সাধু ভাষায় সুরক্ষিত প্রাচীন বাংলার পূর্ণতর রূপ পরিবর্তিত হয়ে চলিত বাংলায় ক্রিয়াপদ এসেছে। সাধারণ সম্ভ্রমাত্মক ও তুচ্ছার্থক প্রকাশেও বৈচিত্র্য এসেছে, যেমন করছে, করছেন, করছিস ইত্যাদি।

২৫.১১ ■ আদৌ কোনও কাল বোঝায় না এমন ক্রিয়া পদ :

● **হল তো**। এখন যা খুশি করো।

খেয়েছে! তুই ওকে ওকথা বলতে গেলি কেন ?

কী আর করি, ওকে সব খুলে বললাম।

শোনো কথা, আজই চলে যাবি ?

এমন চাল দিয়েছি বাছাধনকে, **হুঁহু বাবা, এবারে এসো**।

আমি তখন দে দৌড়, **যেই-না-বলা, আর কোথায় যাবে**, দিল এক পেল্লায় লাফ।

—এই সব বাক্যে স্থূলাক্ষর ক্রিয়াপদগুলি অব্যয়স্থানীয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৬

বাচ্য

[বাচ্য কী—কর্তৃবাচ্য—কর্মবাচা—ভাববাচ্য— ছদ্মবেশী কর্মবাচ্য— কর্মকর্তৃবাচ্য—কর্তৃক ও দ্বারা]

২৬.১ ■ বাচ্য কী

● ভাষার ক্ষেত্রে বাচ্য একটি বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গি। 'বাচ্য' মানে বক্তব্য। ইংরেজি voice শব্দটির আত্মীয়তাও বচ্ ধাতুর সঙ্গে। কর্তা বা কর্ম ক্রিয়াসম্পর্কে কীভাবে উক্ত হবে তা-ই হল বাচ্য। সংজ্ঞা দিতে হলে এই ভাবে দেওয়া চলে : ক্রিয়াপদ কর্তা বা কর্ম কাকে অবলম্বন করে প্রযুক্ত হয়েছে এবং বাক্যে উভয়ের মধ্যে কার প্রাধান্য সূচিত হচ্ছে অথবা ক্রিয়া নিজেই প্রধান হয়ে উঠছে কি না তা ক্রিয়ার যে-শক্তি বা রূপভেদ থেকে বোঝা যায় তাই বাচ্য।

২৬.২ ■ কর্তৃবাচ্য

যে বাচ্যে কর্তা ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে এবং বাক্যের মধ্যে প্রধানভাবে প্রতীয়মান হয় তাকে কর্তৃবাচ্য বলে। যেমন, আমি পত্র লিখিতেছি।

এখানে 'আমি' উত্তমপুরুষ, 'লিখিতেছি' ক্রিয়াটিও উত্তম পুরুষেই। কর্তাই যে এখানে ক্রিয়াসম্পাদক তা স্পষ্ট।

২৬.৩ ■ কর্মবাচ্য

● 'কিন্তু, আমা দ্বারা পত্র লিখিত হইতেছে। এখানে কর্তা 'আমি' অপ্রধান হয়ে গিয়েছে, প্রাধান্য নিয়েছে 'পত্র'। 'হইতেছে' ক্রিয়াপদটি প্রথমপুরুষ পত্রের অনুগামী।

তাই, যে-বাচ্যে কর্মই প্রধান হয়ে ওঠে এবং ক্রিয়া তাকেই অনুসরণ করে, তাকে কর্মবাচ্য বলে।

কর্তৃবাচ্যে কর্তার সক্রিয়তার ইঙ্গিত আছে ইংরেজির active voice এর 'active' কথাটিতে, তেমনি কর্তার নিষ্ক্রিয়তার ইঙ্গিত দেয় passive voice এর 'passive' কথাটি। আরবি-ফারসি ব্যাকরণে 'মারুফ' আর 'মাঝুল' কথাটির অর্থও যথাক্রমে active ও passive. সংস্কৃতে কর্মবাচ্যের নিষ্ক্রিয় কর্তার নাম **অনুক্ত কর্তা**। আর প্রধানরূপে প্রতীয়মান কর্মপদটির নাম **উক্তকর্ম**। আগের উদাহরণে 'আমার দ্বারা' অনুক্ত কর্তা। অনুক্ত কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি বিহিত। 'দ্বারা' সেই তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন। আর উক্তকর্মে প্রথমা বিভক্তি বিহিত, 'পত্র' এই প্রথমাবিভক্তিযুক্ত। বিভক্তির এই চিহ্নটি দৃশ্য নয় বলে তাকে আমরা শূন্যবিভক্তি বলি।

কিন্তু চলিত বাংলায় সংস্কৃতের এই নিয়ম সবসময় চলে না।

'পুলিশ চোর ধরেছে' কর্তৃবাচ্যের এই বাক্যটি কর্মবাচ্যে দাঁড়ায় : পুলিশের চোর ধরা হয়েছে। অথবা, পুলিশের হাতে চোর ধরা পড়েছে। দ্বিতীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাক্যটিই বাংলার বাগ্‌বিধি। এখানে পুলিশ দ্বারা যে-অর্থ প্রকাশ করে, পুলিশের বা পুলিশের হাতে সেই অর্থই প্রকাশ করে। তেমনি আমার দ্বারা বইটি পড়া হয়নি, এমন না বলে আমরা বলি আমার বইটি পড়া হয়নি। 'কারকবিভক্তি' পরিচ্ছেদে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করব।

এবারে কর্মবাচ্যে ক্রিয়াপদের গঠনের দিকে তাকানো যাক। সাধু ভাষায় ক্রিয়াপদের ধাতুটির সঙ্গে 'ত' প্রত্যয় যুক্ত করে তার সঙ্গে 'হ' ধাতুর ক্রিয়াপদ যুক্ত করা হয়। যেমন পঠিত (পঠ্+ত) হইতেছে, লিখিত (লিখ্+ত) হইতেছে। শ্রুত (শ্রু+ত) হইয়াছিল, পূজিত (পূজ্+ত) হয় ইত্যাদি। প্রাচীন বাংলায় 'ত' প্রত্যয়ান্ত বিশেষণের জায়গায় ক্রিয়া বাচক বিশেষ্যেরও প্রয়োগ ছিল : "সকল পণ্ডিতগণ হইল পরাজয় ?" চলিত বাংলায় ওই 'ত' প্রত্যয়ের স্থান নেয় 'আ' প্রত্যয় : লেখা হয়, পড়া হয়, শোনা হইয়াছিল। 'হ' ধাতুর জায়গায় 'যা' ধাতু 'পড়্' ধাতুও ব্যবহৃত হয়। যেমন ধরা পড়েছে, শোনা গিয়েছে ইত্যাদি।

প্রাচীন বাংলায় করা, খাওয়া, দেখা ইত্যাদির জায়গায় করন, খাওন, দেখন ইত্যাদি ব্যবহার হত। পূর্ববাংলায় এখনও এই রীতি প্রচলিত। আর কী দেওন যায় = আর কী দেওয়া যায়। এই 'অন' প্রত্যয় যুক্ত পদে 'এ'ও যুক্ত হত : 'মহাঘোর যুদ্ধ হয় না যায় লিখনে'।

এখন আমরা বলি 'আমাকে দেখা যায়, বা আমাকে দেখা হয়' আগে বলা হত আমি দেখা পাই বা আমি দেখা পড়ি।

AMARBOI.COM

২৬.৪ ■ ভাববাচ্য

• **যে বাচ্যে কর্তা নয়, কর্ম নয়, ভাব বা ক্রিয়াই প্রধান হয়ে ওঠে তাকে ভাববাচ্য** (Neuter voice, Neutral Voice) বলে, যেমন আমার যাওয়া হল না। এখানে 'যাওয়া'ই (√যা+আ) যেন কর্তা হয়ে উঠেছে। ক্রিয়াপদ তারই অনুগামী। কর্তৃবাচ্যে এটি প্রকাশ করলে বাক্যটি দাঁড়াত : আমি যেতে পারলাম না। অকর্মক ক্রিয়ারই ভাববাচ্য হয়। কর্ম থাকলে কর্ম প্রধান হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু কর্মই নেই বলে ক্রিয়াই প্রধান হয়ে ওঠে ভাববাচ্যে। 'ক্রিয়া' বলতে এখানে বোঝাবে ক্রিয়াত্মক বিশেষ্যটি যা 'হ' ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়, যেমন তোর এখনও খাওয়া হয়নি ? তোমার শোয়া হবে কোথায় ?

বাংলা বাগ্‌বিধিতে ভাববাচ্যের একটি বিশেষ স্থান আছে। প্রথম পরিচয়ে 'মহাশয়, কোথায় থাকেন' না বলে আমরা বলি 'মহাশয়ের কোথায় থাকা হয় ? অনেক সময় কর্তাকে 'আপনি' বলব না 'তুমি' বলব এমন সংশয়ে ভাববাচ্যের আশ্রয় নিই আমরা। যেমন, তা কী করা হয় এখন ?

একটি বিষয় লক্ষণীয় :

যখন বলি আমার গান গাওয়া হল না। তখন গানকে কর্ম ধরলে বাক্যটি কর্মবাচ্য হবে, আর গান-গাওয়া যুক্তপদ ধরলে তা ভাববাচ্য হবে। কর্তৃবাচ্য বললেও চলবে। বলা বাহুল্য 'আমার গানটি গাওয়া হল না' এ বাক্যটি স্পষ্টত কর্মবাচ্যের।

এই ভাববাচ্যের গঠনগত চেহারা দেখে একে কর্তৃবাচ্য বলতে ইচ্ছে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেক্ষেত্রে 'হল না' ক্রিয়ার কর্তা হবে 'আমার গান গাওয়া' বা 'আমার গানটি গাওয়া'।

২৬.৫ ■ ছদ্মবেশী কর্মবাচ্য

● চেহারায় ধরা পড়ে না কিন্তু অর্থে ধরা পড়ে এমন বাচ্যও বাংলায় চলে। যেমন, 'কী চাই ?' আপনি কী চান ? না বলে যখন আমরা 'আপনার কী চাই' বলি তখন তা কর্মবাচ্য। চাই = চাওয়া হচ্ছে। (চাহ্যতে > চাহিয়তি > চাইয়ই > চাই)। 'এমন করে না সোনা' বলে যখন কোনও কিছু থেকে শিশুকে নিবৃত্ত করতে চাই তখন এই 'করে না' = করা হয় না। প্রাচীন বাংলায় 'করিয়ে' কর্মবাচ্যের ক্রিয়া (ক্রিয়তে > করিয়দি > করিঅই > করে। আঞ্চলিক প্রয়োগ : অত টাকা দিয়ে না (=দীয়তে ন)।

হিন্দি : দীজিয়ে, লীজিয়ে—মূলত কর্মবাচ্যের ক্রিয়া। রাম নে রোটী খাঈ, মূলত কর্মবাচ্যের বাক্য। 'নে' তৃতীয়ান্ত 'এন' বিভক্তির পরিবর্তিত রূপ। আমাদের শুভঙ্করের ছড়ায় 'কুড়বা লিজ্জে'র লিজ্জে কর্মেবাচ্যের ক্রিয়া। দিজ্জই কন্তা খাই গুণবন্তা—এখানে 'দিজ্জই' ও 'খাই' দুটোই মূলত কর্মবাচ্যের ক্রিয়া। কিন্তু চেহারায় বাক্যগুলি কর্তৃবাচ্যের। আই, ই, অয়ি, ইজই, ইজে, ইয়ে, সবই কর্মবাচ্যের ক্রিয়াসূচক। ভয় লাগে, শীত লাগে = ভয় বা শীত অনুভূত হয়।

এটা ভাল দেখায় না (=দৃষ্ট হয় না), তোমাকেও মানায় না ইত্যাদি।

ণিজন্ত রূপের কর্মবাচ্যও বাংলায় আছে, যেমন এত কি সহায়ে। (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)।

'আছে'—'নাই'

● পড়া, দেখা, লেখা ইত্যাদি 'আ' যুক্ত কৃদন্ত পদের সঙ্গে 'আছে' বা 'নাই' যুক্ত হলে তা কর্মবাচ্য প্রকাশ করে। ওটা আমার পড়া আছে বা পড়া নাই।
'ইতে' প্রত্যয় যুক্ত শব্দের সঙ্গে : বাপ মায়ের এ দেখতে নেই। একথা বলতে নেই। এমন কথা কি বলতে আছে ?

২৬.৬ ■ কর্মকর্তৃবাচ্য :

আগের উদাহরণে 'চাই' কর্মবাচ্যের ক্রিয়াবিবর্তনে এসেছে। কিন্তু যথার্থই কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া অর্থাৎ কর্তৃ-পরিচালিত ক্রিয়া, কিন্তু অর্থের দিকে দিয়ে তা কর্মবাচ্যর এমন প্রয়োগও বাংলায় আছে। একে আমরা কর্মকর্তৃবাচ্য বলি। (২৬) যেমন বাঁশি বাজে, বাঁশি তো নিজে বাজে না, বাঁশি বাজানো হয়। তেমনি সভা ভাঙে, কাপড় ছেঁড়ে, দুয়ার খোলে, দিন কাটে ইত্যাদি।

ইংরেজিতে কর্মকর্তৃবাচ্যকে বলা হয় Quasipassive (= half passive) অথবা middle voice বলে। The rose smells (= is smelt) sweet. Honey tastes (=is tasted) sweet. The play reads (= is read) well

বাংলা পরিভাষাটি সংস্কৃত থেকেই নেওয়া। সংস্কৃত উদাহরণ : ওদনং পচ্যতে ; বৃক্ষঃ ভিদ্যতে।

কর্তৃবাচ্যে দ্বিকর্মক ক্রিয়া থাকলে কর্মবাচ্যে পরিণত হলে শুধু মুখ্য কর্মটিই উক্ত হয়, যেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্তৃবাচ্য : তোমাকে একথা বলেছি।
কর্মবাচ্য : তোমাকে একথা বলা হয়েছে।

২৬.৭ ■ কর্তৃক ও দ্বারা

'কর্তৃক শব্দটি বহুব্রীহি সমাসে পরপদ হিসেবে সংস্কৃতে চলত। সমাসবদ্ধ শব্দটি বিশেষণ হওয়ায় তিন লিঙ্গেই তার রূপান্তর ঘটত, যেমন তৎকর্তৃকঃ সমুদয়ঃ, তৎকর্তৃকম্ সর্বম্, তৎকর্তৃকী সৃষ্টিঃ। রাবণকর্তৃক সীতাহরণম্ সংঘটিতম্ = রাবণকর্তৃক সীতাহরণ সংঘটিত হইল। এখানে লক্ষণীয় বাক্যটি কর্মবাচ্যে নেই আছে কর্তৃবাচ্যে।

বাংলায় যখন সমাসবদ্ধ কর্তৃক এল তখন তা আর বিশেষণ না হয়ে ক্রিয়া-বিশেষণ স্থানীয় হয়ে উঠল। দশাননকর্তৃক সীতা অপহৃতা হইলেন। পরে কর্তৃক অনুসর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হল 'দ্বারা'র মতোই। (দ্বারার পরেও বিভক্তি যোগ হত : দ্বারা + এ = দ্বারায়, বা দ্বারাতে)

কর্মবাচ্যের কর্তায় (অনুক্তকর্তায়) কখনও কর্তৃক কখনও দ্বারার প্রয়োগ হত। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বললেন,

> 'আমার বিবেচনায় ক্রিয়ার কর্তৃত্ব বুঝাইবার জন্য 'কর্তৃক' এবং 'করণত্ব' বুঝাইবার জন্য দ্বারা ব্যবহার করা উচিত। যোগেন্দ্র দ্বারা মুদ্রিত না বলিয়া যোগেন্দ্র কর্তৃক মুদ্রিত লিখিলেই ভাল হয়। যোগেন্দ্রের মত জীয়ন্ত মানুষটা করণকারকে পরিণত না হইয়া উহার কিঞ্চিত কর্তৃত্ব থাকে। তাহাতেই তাহার মর্যাদা রক্ষিত হইবে।' (বাংলায় কর্তৃক, মর্মবাণী, ১৩ শ্রাবণ, ১৩২২)

www.amarboi.com

এখন ব্যক্তিবাচক পদেও দ্বারা ব্যবহার করলে কেউ মানহানির মোকদ্দমা করবে না। এখন আমরা বলি তোমার দ্বারা এ কাজ হবে না দেখছি।

'শিক্ষকের দ্বারাই শিক্ষাবিধান হয়।
প্রণালীর দ্বারা হয় না।' (শিক্ষা, রবীন্দ্রনাথ)

এখানে কর্তা করণ উভয় ক্ষেত্রেই 'দ্বারা'। আসলে বাংলা বাগ্‌বিধিতে কর্তৃক বা দ্বারা বাদ দিয়ে বলার প্রবণতাই দেখা যায়। এখন আমরা যোগেন্দ্র কর্তৃক মুদ্রিত বা যোগেন্দ্র দ্বারা মুদ্রিত কিছুই না বলে বলব—যোগেন্দ্র মুদ্রিত।

বইটি তাহার রচিত।

এ বাক্যে কর্তৃপদে '**র**' বিভক্তি প্রয়োগে কর্তৃক দ্বারা এড়ানো গেল। আবার তাঁর আভা দ্বারা সমস্ত বিভাত, না বলে বলা হল 'তাঁর আভাতেই সমস্ত বিভাত' (রবীন্দ্রনাথ)।

এখানে করণে তে বিভক্তি প্রয়োগ করে '**দ্বারা**' বাদ দেওয়া হল।

পুলিশ কর্তৃক চোর ধৃত হয়েছে বা পুলিশ দ্বারা চোর ধৃত হয়েছে না বলে আমরা বলি পুলিশের হাতে চোর ধরা পড়েছে। এখানে 'হাতে' অনুসর্গের কাজ করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৭

বাংলা ধাতুর গণবিভাগ

[বাংলা ধাতুর গণবিভাগ ও রূপ—অশিষ্ট ধাতু—অসম্পূর্ণ ধাতু—কবিতায় প্রযুক্ত ধাতু]

সংস্কৃতে ধাতুর দশটি গণ (২৭)—

ভাদি (ভূ-আদি), অদাদি (অদ্-আদি), ক্র্যাদি (ক্রী-আদি ইত্যাদি)।

এই গণবিভাগ গড়ে উঠেছে ক্রিয়ারূপের বিভিন্নতা বা বৈশিষ্ট্য দেখে, যেমন, ভূ—ভবতি, অদ্—অত্তি, ক্রী—ক্রীণাতি।

২৭.১ ■ বাংলা ধাতুর গণবিভাগ ও রূপ

বাংলা ধাতুর গণবিভাগে প্রধানত প্রত্যেকটি গণের একটি করে প্রতিনিধিস্থানীয় ধাতু ধরে তার সঙ্গে সংস্কৃতের মতোই 'আদি' শব্দটি যোগ করে গণের নামকরণ করা হয়েছে।

সাধু ও চলিতে প্রথম পুরুষের, বর্তমান অনুজ্ঞার এবং অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ :

AMARBOI.COM

কহাদি গণ

ধাতুর স্বর অ, হ্ ব্যঞ্জনান্ত। (কহ্ + আদি = কহাদি)

কহে > কয়, কহিতেছে > কইছে, কহিয়াছে > কয়েছে, কহিল > কইল, কহিতেছিল > কইছিল, কহিয়াছিল > কয়েছিল, কহিত >কইত, কহিব > কইব, কহিতে থাকিবে > কইতে থাকবে

কহ > কও, কহিয়া > কয়ে, কহিতে > কইতে, কহিলে > কইলে।

কহাদি গণে আছে—বহ্, রহ্, সহ্, নহ্ ইত্যাদি।

চলাদি গণ

ধাতুর স্বর 'অ', অন্যব্যঞ্জনান্তি

চলে, চলিতেছে > চলছে, চলিয়াছে > চলেছে, চলিল > চলল, চলিতেছিল > চলছিল, চলিয়াছিল > চলেছিল, চলিত > চলত, চলিবে > চলবে, চলিতে থাকিবে > চলতে থাকবে, চলিয়া থাকিবে > চলে থাকবে।

চল

চলিয়া > চলে, চলিতে > চলতে, চলিলে > চললে।

এই গণে আছে : কর্, কষ্, খস্, গড়্, ঘষ্, চর্, চষ্, জম্, ঝর্, টল্, ঢল্, ধর্, ধ্বস্, নড়্, পড়্, ফল্, বক্, বল্, বস্, ভর্, সর্, মল্, সর্, হট্ প্রভৃতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খা-আদি গণ

ধাতুর স্বর আ-স্বরান্ত

খায়, খাইতেছে > খাচ্ছে, খাইয়াছে > খেয়েছে, খাইল > খেল, খাইতেছিল > খাচ্ছিল, খাইয়াছিল > খেয়েছিল, খাইত > খেত,

খাইবে > খাবে, খাইতে থাকিবে > খেতে থাকবে, খাইয়া থাকিবে > খেয়ে থাকবে

খাও, খাইয়া > খেয়ে, খাইতে > খেতে, খাইলে > খেলে

খা-আদি গণে পড়ে পা, দা, যা ইত্যাদি এবং প্রতিধ্বনি-ধাতু 'দা'—খায় দায়।

গাহাদি গণ

ধাতুর স্বর 'আ', অন্যব্যঞ্জনান্ত, গাহ > গা

গাহে > গায়, গাহিতেছে > গাইছে, গাহিয়াছে > গেয়েছে, গাহিল > গাইল, গাহিতেছিল > গাইছিল, গাহিয়াছিল > গেয়েছিল, গাহিত > গাইত।

গাহিবে > গাইবে, গাহিতে থাকিবে > গাইতে থাকবে, গাহিয়া থাকিবে > গেয়ে থাকবে।

গাহ > গাও, গাহিয়া > গেয়ে, গাহিতে > গাইতে।

এই গণে আছে চাহ্, বাহ্, নাহ্ প্রভৃতি ধাতু।

কাটাদি গণ

ধাতুর স্বর 'আ', অন্যব্যঞ্জনান্ত।

কাটে, কাটিতেছে > কাটছে, কাটিয়াছে > কেটেছে, কাটিল > কাটল, কাটিতেছিল > কাটছিল, কাটিয়াছিল > কেটেছিল, কাটিত > কাটত।

কাটিবে > কাটবে, কাটিতে থাকিবে > কাটতে থাকবে, কাটিয়া থাকিবে > কেটে থাকবে।

কাট-কাটো

কাটিয়া > কেটে, কাটিতে > কাটতে, কাটিলে > কাটলে।

কাটাদি গণের মধ্যে আছে : আঁক্, আছ্, আস্, খাট্, গাঁথ্, ঘাম্, জ্বাল্, টান্, ডাক্, ঢাক্, ঢাল্, তাত্, থাক্, দাগ্, নাচ্, নাড়্, পাক্, ফাট্, কাঁপ্, বাছ্, বাজ্, বাড়্, বাধ্, বাঁধ্, বাস্, ভাঙ্, ভাঁজ্, ভাস্, মাখ্, মাপ্, মার্, রাগ্, রাঁধ্, লাগ্, সাধ্, সার্, হাঁট্, হাস্ ইত্যাদি।

শিখাদি গণ

ধাতুর স্বর 'ই', অন্যব্যঞ্জনান্ত।

শিখে-লেখে, শিখিতেছে > শিখছে, শিখিয়াছে > শিখেছে।

শিখিল > শিখল, শিখিতেছিল > শিখছিল, শিখিয়াছিল > শিখেছিল, শিখিত > শিখত।

শিখিবে > শিখবে, শিখিতে থাকিবে > শিখতে থাকবে, শিখিয়া থাকিবে > শিখে থাকবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেখো

শিখিয়া > শিখে, শিখিতে > শিখতে, শিখিলে > শিখলে।

শিখাদি গণে আছে : বিন্, গিল্, চিন্, চির্, ছিড়্, জিত্, টিক্, টিপ্, নিব্, পিঁজ্, পিট্, পিষ্, ফির্, বিঁধ্, ভিজ্, মিল্, মিশ্, লিখ্ প্রভৃতি ধাতু।

শু বা শো গণ

ধাতুর স্বর শু বা শো, স্বরান্ত।

শোয়, শুইতেছে > শুচ্ছে, শুইয়াছে > শুয়েছে

শুইল > শুল, শুইতেছিল > শুচ্ছিল, শুইয়া > শুয়েছিল, শুইত > শুত।

শুইবে > শোবে, শুইতে থাকিবে > শুতে থাকবে, শুইয়া থাকিবে > শুয়ে থাকবে।

শোও

শুইয়া > শুয়ে, শুইতে > শুতে, শুইলে > শুলে।

শু-বা শো-আদি গণে আছে : দু বা দো, ধু বা ধো ইত্যাদি ধাতু।

দু-আদি গণ

দু বা দো (< দোহ্)

ধাতুর স্বর উ বা ও, অন্তের হ্ লুপ্ত হওয়ার ফলে স্বরান্ত।

'শু' বা 'শো' গণের মতোই এই গণ, সামান্য রূপভেদের জন্য পৃথকভাবে গণ্য

শোবে কিন্তু দোবে নয়, দুইবে

শুচ্ছে কিন্তু দুচ্ছে নয়, দুইছে।

AMARBOI.COM

শুন্ বা শোন্-আদি ধাতু : ধাতুর স্বর উ বা ও, অন্যব্যঞ্জনান্ত।

শুনে-শোনে, শুনিতেছে > শুনছে, শুনিয়াছে >শুনেছে

শুনিল > শুনল, শুনিতেছিল > শুনছিল, শুনিয়াছিল > শুনেছিল, শুনিত > শুনত।

শুনিবে > শুনবে, শুনিতে থাকিবে > শুনতে থাকবে, শুনিয়া থাকিবে > শুনে থাকবে।

শুন > শোনো

শুনিয়া > শুনে, শুনিতে > শুনতে, শুনিলে > শুনলে।

শুনাদি গণের মধ্যে আছে : উঠ্, উড়্, উব্, কুট্, খুঁজ্, গুল্, গুন্, সুর্, চুক্, চুষ্, ছুট্, ছুঁড়্, ঝুঁক্, ডুব্, ঢুক্, তুল্, দুল্, ধুন্, ঝুল্, বুঝ্, বুন্, মুছ্, মুড়্, শুঁক প্রভৃতি এবং ও স্বরের ধাতু উ-স্বরে পরিবর্তিত—রোষ্ > রুষ্, রোধ্ > রুধ্, ভোগ্ > ভুখ্, ভোল্ > ভুল্, তোষ্ > তুষ্, দোষ্ > দুষ্ প্রভৃতি।

দে-আদি গণ

ধাতুর স্বর এ, স্বরান্ত

দেয়, দিতেছে > দিচ্ছে, দিয়াছে > দিয়েছে।

দিল, দিতেছিল > দিচ্ছিল, দিয়াছিল > দিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিবে > দেবে, দিতে থাকিবে > দিতে থাকবে, দিয়া থাকবে > দিয়ে থাকবে।

দিও

দিয়া > দিয়ে, দিতে, দিলে

এই গণের অন্তর্ভুক্ত 'নে' ধাতু।

খেল্-আদি গণ

ধাতুর স্বর এ, অন্যব্যঞ্জনান্ত।

খেলে, খেলিতেছে > খেলছে, খেলিয়াছে >খেলেছে।

খেলিল > খেলল, খেলিতেছিল > খেলছিল, খেলিয়াছিল > খেলেছিল, খেলিত > খেলত।

খেলিবে > খেলবে, খেলিতে থাকিবে > খেলতে থাকবে, খেলিয়া থাকিবে > খেলে থাকবে।

খেল-খেলো

খেলিয়া > খেলে, খেলিতে > খেলতে, খেলিলে > খেললে।

খেল্-আদি গণের অন্তর্ভুক্ত—এড়্, খেপ্, ঘেঁষ্, ঠেল্, ফেস্, লেপ্, বেচ্, বেড়্, ফেল্, সেঁক্, হেল্ প্রভৃতি ধাতু।

১২ থেকে ১৮ আ-প্রত্যয়ান্ত প্রযোজক ও নামধাতু এবং কিছু অজ্ঞাত মূল ধাতু।

করা-আদি গণ

করায় ইত্যাদি।

এই ধাতু গণে আছে :

কষা, খসা, চলা, ধরা ; গড়া, ঝরা, বওয়া। তা ছাড়া গরজা, ঘষ্টা, চট্কা, চম্কা, চল্কা, টপ্কা, থম্কা, বদ্লা, মট্কা, সম্ঝা, হড়্কা প্রভৃতি ধাতু।

আঁকা-আদি গণ

মূল ধাতু 'আঁক' রূপ করা-আদি গণের মতোই এই গণে আছে :

আনা, কাচা, কাটা, ঝাড়া, কাঁড়া, খাটা, ঘাঁটা, ছাড়া, জাগা, জানা, ডাকা, থামা, নাচা, গাওয়া, পাওয়া, ভাঙা, মাখা, লাফা, হাঁদা প্রভৃতি এবং আট্কা, আঁচ্ড়া, কাম্ড়া, খাম্চা, ঠাওরা, সাম্লা, সাঁত্রা প্রভৃতি ধাতু।

শিখা-আদি গণ

মূল ধাতু শিখ্।

এই গণে আছে গিলা, ছিটা, জিরা, পিতা, পিছা, পিটা, বিছা, মিটা, মিশ প্রভৃতি। এছাড়া চিম্টা, ছিট্কা, ঠিক্রা, পিছ্লা, তিষ্ঠা, বিগ্ড়া, শিউরা, সিট্কা প্রভৃতি ধাতু।

চলিত ভাষায় দুটি রূপ লভ্য : শেখায়, শিখোয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠা-আদি গণ

মূল ধাতু উঠ্‌।

উড়া, গুছা, ঘুচা, ঘুরা, চুকা, জুটা, ঝুলা, টুকা, ফুলা, বুজা, মুছা, শুঁকা, গুনা প্রভৃতি এবং উস্‌খা, উগলা, উয়ড়া, উলটা, চখমা, তুপ্‌ড়া, মুচড়া প্রভৃতি এই গণের অন্তর্ভুক্ত।

চলতি রূপ অনেক ক্ষেত্রে একাধিক : উঠাই-ওঠাই-উঠোই।

এড়া-আদি গণ

এগা, এলা, খেদা, খেপা, খেলা, চেঁচা, চেনা, ঠেঙা, দেওয়া, নেওয়া, পেরা, ডেঙা এবং নেংচা, বেরা, ভেংচা, ভেস্তা, লেপ্‌টা প্রভৃতি ধাতু।

এগা, বেরা, পেরা—একয়টি ধাতুর একাধিক রূপ : এগোবে-এগুবে, এগোচ্ছে-এগুচ্ছে, বেরোচ্ছে-বেরুচ্ছে, বেরোবে-বেরুবে, পেরোবে-পেরুবে ইত্যাদি।

সাধুভাষায় 'করা'-আদি গণের ধাতুরূপের মতো।

ঘোলা-আদি গণ

এই গণে আছে, কোঁচা, খোঁচা, খোলা, চোবা, ঝোলা, দোনা এবং কাঁকড়া, কাঁচ্‌কা, ছোব্‌লা, জোব্‌ড়া, ঠোক্‌রা, মোচড়া। চলিতে দুটি রূপ লভ্য। ঘোলায়-ঘুলোয়, চোবায়-চুবোয় ইত্যাদি।

'দৌড়া' আদি গণ

এই গণে পড়ে 'পৌঁছা' ধাতু।

সাধুভাষায় এদের রূপ করা-আদি গণের ধাতুরূপের মতো। চলিতে একাধিক রূপ লভ্য।

দৌড়ায়, দৌড়োয়, দৌড়াতে-দৌড়োতে-দৌড়ুতে ইত্যাদি।

২৭.২ ■ অশিষ্ট ধাতু

√পেঁদা (প্রচণ্ড প্রহার করা)

√গেঁড়া (হাতানো, চুরি করা)
√খেঁচা (টানা)
√লেদা (অলস বা নিরুপায় হওয়া)
√হেদা (নষ্ট হওয়া)
√গেঁজা (নিরর্থক আলোচনায় সময় কাটানো)
√ধেড়া (শোচনীয়ভাবে হারা বা অকৃতকার্য হওয়া)

এইসব ধাতুকে √করা বা √এড়া গণের মধ্যে ফেলা যেতে পারে।

২৭.৩ ■ অসম্পূর্ণ ধাতু

বাংলায় কতগুলো ধাতু আছে যার পূর্ণ রূপ নাই, অর্থাৎ সব কালে বা ভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(mode)-এ তার রূপ পাওয়া যায় না। অন্য ধাতুর রূপ দিয়ে সে-অভাব পূরণ করতে হয়। ইংরেজি Defective verb-এর অনুকরণে একে পঙ্গু ক্রিয়া নামেও চিহ্নিত করা হয়। যেমন—

১. আছ্ ধাতু। এই ধাতু একটি প্রাকৃত ধাতু থেকে এসেছে।

ক) আছে-আছ-আছি। কিন্তু আছিতেছে, আছিবে এমন পদ হয় না, তখন ডাক পড়ে থাক্-ধাতুর। থাকিবে, থাকিত, থাকিয়া ইত্যাদি।

খ) যায়, যাইতেছে, যাইবে, কিন্তু অতীতে গেল, গিয়াছিল ইত্যাদি। এই 'গ' ধাতু সংস্কৃত গম- ধাতুজ।

গ) 'বট্' ধাতু এসেছে সংস্কৃত 'বৃৎ' ধাতু থেকে।

বটে বটি। কিন্তু বটিয়াছিল বা বটিবে এমন রূপ হয় না। এই ধাতুর কোনও সম্পূরক নেই।

ঘ) নহ্ ধাতু।

নঞর্থক ন আর হ-ধাতু মিলে এই ধাতু গড়ে উঠেছে।

কেবল সামান্য বর্তমানের নহে নহ নহিরূপ আছে আর অসমাপিকা নহিলে রূপ আছে। এ ধাতুরও কোনও সম্পূরক নেই।

ঙ) 'আস্' ধাতু।

'আস্' ধাতু এসেছে সংস্কৃত 'আ-বিশ্' থেকে।

কোনও কোনও কালে সংস্কৃত 'আ-যা' ধাতুজাত আ-ধাতুর রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন এল, এলে।

২৭.৪ ■ কবিতায় বিশেষ প্রয়োগ

শুনিতেছে > শুনিছে।

শুনিলাম > শুনিনু (লাম > নু)

ছিলাম > ছিনু

কহিল > কহিলা (আ-যোগ)

শুনিয়া > শুনি (আ লোপ)

কবিতায় বিশেষ কতগুলি ধাতু তৈরি করে নেওয়া হয়েছে : না-পার্ = নার্, পারি না = নারি, পারিলাম না = নারিনু।

দেখ্ এর অর্থে হের্। দেখো = হেরো।

প্র-বিশ্ থেকে পশ্ 'পশিল'

সংস্কৃত ধাতুর সঙ্গে সরাসরি বিভক্তি যোগ : ভ্রম্—ভ্রমিনু, বন্দ্—বন্দিল।

বিশেষ্য বা বিশেষণ-সরাসরি নামধাতু করে নিয়ে প্রত্যয় যোগ :

মোহ > √মোহ + ইল = মোহিল

উন্মূল > √উন্মূল + ইল = উন্মূলিল

বিমুখ > √বিমুখ + এ = বিমুখে (= বিমুখ করে)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৮

কারক-বিভক্তি-অনুসর্গ

[কারক-বিভক্তি-অনুসর্গ—বিতর্ক—বিভিন্ন কারক : একই কারকে বিভক্তি ও অনুসর্গ—সম্বন্ধ পদ : নানার্থক-সম্বন্ধ—সম্বন্ধপদের বিভক্তি—সম্বোধন পদ]

২৮.১ ■ কারক-বিভক্তি-অনুসর্গ

মানুষ প্রথমে তার মনের কথা শব্দ দিয়ে প্রকাশ করেছিল, না প্রথমেই বাক্য হয়ে তা প্রকাশ পেয়েছিল, সে বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব হয়নি। তবে প্রথম প্রথম বাক্যগুলোতে শব্দগুলোর সম্পর্ক বোঝানো যে বেশ দুরূহ ব্যাপার ছিল তা কল্পনা করা যায়। এই দুরূহতা দূর করার প্রয়োজন থেকেই হয়তো অন্বয়দ্যোতক কারক-বিভক্তির উদ্‌ভব।

ভীম রণক্ষেত্র গদাঘাত দুর্যোধন উরু ভাঙিয়াছিলেন।

এই বাক্যটিতে অন্বয়সূচক কোনও যোজনা নেই। কিন্তু যদি বলি : ভীম রণক্ষেত্রে গদাঘাতে দুর্যোধনের উরু ভাঙিয়াছিলেন, তাহলে বাক্যটির অর্থ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'ভাঙিয়াছিলেন' ক্রিয়াপদটিকে আশ্রয় করে যদি প্রশ্ন করি কে ভাঙিয়াছিলেন ? উত্তর হবে : ভীম। যে ক্রিয়া পরিচালনা করে সে কর্তা। কী ভাঙিয়াছিলেন ? উত্তর হবে : উরু। ক্রিয়ার ফল যার উপরে গিয়ে পড়ে তা কর্ম।

এই ভাঙনক্রিয়া সম্পন্ন হল কীসে ?—গদাঘাতে। ক্রিয়া সম্পাদনায় যা প্রধান সহায় তা 'করণ'। কোথায় ভাঙিয়াছিলেন ?—রণক্ষেত্রে। ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ বলে। কর্তা, কর্ম, করণ, অধিকরণ এই চারটিই এখানে কারক, ক্রিয়ার সঙ্গেই এরা অন্বিত। 'উরু' পদটির সঙ্গে অন্বয় 'দুর্যোধনের', ক্রিয়ার সঙ্গে এর কোনও অন্বয় নেই। 'দুর্যোধনের ভাঙিয়াছিলেন' এমন কোনও অন্বয় সম্ভব নয়, কিন্তু কার উরু ? 'দুর্যোধনের'। 'দুর্যোধনের' পদটি সম্বন্ধপদ।—'দুর্যোধনের' এবং উরু পদটি পরস্পর সম্বদ্ধ। ক্রিয়ার সঙ্গে যার অন্বয় আছে, তা-ই **কারক**।

এই উদাহরণে দুটি কারক (করণ ও অধিকরণ) প্রকাশিত হয়েছে 'এ' চিহ্ন দ্বারা। এবং সম্বন্ধ-পদটি প্রকাশিত হয়েছে 'এর' (দুর্যোধনের) চিহ্ন দ্বারা (গদাঘাতে ও রণক্ষেত্রে)। বিভিন্ন কারক ও সম্বন্ধপদ যে-চিহ্ন দ্বারা প্রকাশিত হয় তাকে **বিভক্তি** বলে। 'এ' বিভক্তি সব কারকেই প্রযুক্ত হয়। কারক প্রকাশক অন্যান্য চিহ্নগুলি 'কে' ও 'তে' (**তোমাকে, তোমাতে**)। অর্থাৎ বাংলায় বিভক্তির সংখ্যা মোট চারটি—এ, কে, তে, র বা এর। আলোচ্য উদাহরণে কর্তৃপদ ভীম ও কর্মপদ 'উরু'তে কোনও বিভক্তি দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু বিভক্তিহীন পদ তো বাক্যে প্রযোজ্য নয়। এখানে এই অদৃশ্য বিভক্তিকে **শূন্য বিভক্তি** নাম দেওয়া হয়েছে। বাংলায় সমস্ত কারকেই শূন্য বিভক্তির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রয়োগ আছে।

কর্তা, কর্ম, করণ ও অধিকরণ ছাড়া সংস্কৃতে আরও দুটি কারক স্বীকৃত : এরা সম্প্রদান ও অপাদান কারক। স্বত্বত্যাগ করে কাউকে কিছু দিলে সেই দান-ভাজন ব্যক্তিটি সম্প্রদান কারক হবে। যেমন, দরিদ্রকে বস্ত্র দাও। কিন্তু স্বত্বত্যাগ না করে কিছু দিলে দানের পাত্রটি সম্প্রদান কারক হবে না যেমন, ধোপাকে কাপড় দাও। পানুকে কদিনের জন্যে বইটা দিয়েছি, এখানে ধোপা বা পানু কেউ-ই সম্প্রদান কারক নয়। লক্ষণীয় যে ধোপা বা পানুতেও 'কে' বিভক্তির প্রয়োগ, আর দরিদ্রপদেও ওই 'কে' বিভক্তিরই প্রয়োগ। এক কর্ম দিয়েই তো সম্প্রদান কারকের কাজ চলতে পারে। রামমোহন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কেউ সম্প্রদান স্বীকার করেননি। রবীন্দ্রনাথও বাংলায় সম্প্রদান কারক রাখার বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেছেন, 'তাহাকে দিলাম যদি সম্প্রদান কারকের কোঠায় পড়ে, তবে তাহাকে মারিলাম সন্তাড়ন কারক, ছেলেকে কোলে লইলাম সংলালন কারক, সন্দেশ খাইলাম সম্ভোজন কারক। মাথা নাড়িলাম সঞ্চালন কারক, এবং এক বাংলা কর্মকারক হইতে এমন সহস্র সঙের সৃষ্টি হইতে পারে *(শব্দতত্ত্ব)*। না, এই রকমের সহস্র-সঙ সৃষ্টি প্রাচীন বৈয়াকরণদের অভীপ্সিত ছিল না। তাঁরা বহুরকমের দানপাত্রের থেকে ওই স্বত্বত্যাগপূর্বক দানের পাত্রকে পৃথক করে দেখাতে চেয়েছিলেন তার বিশিষ্টতার জন্যে। অন্যান্য অর্থেও সম্প্রদান প্রাচীন ব্যাকরণে স্বীকৃত। তা ছাড়া বিশেষ একটি বিভক্তিও সম্প্রদানের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু বাংলায় দুটিতেই 'কে' বিভক্তি আছে বলে কর্ম রেখে সম্প্রদানকে বর্জন করতে চাইছি আমরা।

এবার অপাদান কারকের কথায় আসি। অপাদান (অপ + আদান) কথাটির মূল অর্থ 'সরিয়ে নেওয়া'। যা থেকে কিছু বিশ্লিষ্ট, বিচ্যুত, উদ্‌গত, অথবা নিঃসৃত হয়, তা অপাদান। যেমন,

গাছ থেকে ফল পড়ছে।
দুধ থেকে দই হয়।
পাহাড় থেকে নদী বেরোয়।
সে গ্রাম থেকে আসছে।

এই সব বাক্যে গাছ, দুধ, পাহাড় ও গ্রাম অপাদান। যা থেকে ভয় পাওয়া যায় এবং যা থেকে ত্রাণ বা রক্ষা করা বোঝায়, তাও অপাদান।

সে ব্যাঘ্র হইতে ভীত হইতেছে।
বিপদ হইতে রক্ষা করো।

এখানে ব্যাঘ্র ও বিপদ অপাদান। আরও বিভিন্ন অর্থে অপাদান হতে পারে।

২৮.২ ■ বিতর্ক

এই সব উদাহরণে অপাদানের চিহ্ন হিসেব কোনও বিভক্তি যুক্ত হয়নি, যুক্ত হয়েছে 'হইতে' অনুসর্গ। হইতে, থেকে, দিয়া, দ্বারা, কর্তৃক, মধ্যে, উপরে—এগুলি অনুসর্গ। যে-সব অব্যয় শব্দের পরে বসে কারক-প্রকাশ করে তাকে অনুসর্গ বলা হয়। অপাদান অবশ্য অন্য বিভক্তিতেও প্রকাশিত হতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে, সে আলোচনা আমরা পরে করব।

অনুসর্গ দিয়েও অন্বয় প্রকাশিত হয়, অপাদানের জন্যে শব্দের পৃথক রূপের অনস্তিত্বের যুক্তিতে রামমোহনও অপাদান স্বীকার করেননি। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও অনুসর্গ যোগে কারকত্ব স্বীকার করেননি। 'উহাদের (= অনুসর্গগুলির) পূর্বপদেও কারকত্ব অর্পণ করা চলিবে না'। কিন্তু যখন বলব এ মেঘে (= এ মেঘ থেকে) বৃষ্টি হবে না, তখন ? এখানে তো 'এ' বিভক্তি মেঘের সঙ্গে জমাটবাঁধা। 'এ'-বিভক্তিযোগে কারকত্ব আর 'হইতে'-যোগে অকারকত্ব এমন বিধান কি মানা চলে ? অর্থ দেখেই কারক বুঝতে হবে, আর চিহ্ন থেকে বিভক্তি বা অনুসর্গ। অনুসর্গ কারকত্বের প্রতিবন্ধক হবে কেন ? অনেক ক্ষেত্রে তা বিভক্তির প্রতিরূপক বা ছদ্মবেশী বিভক্তি।

বস্তুত কারকের সংখ্যা নিয়ে মতান্তর থাকলেও বাংলায় এখনও সংস্কৃতের নিয়ম অনুযায়ী (২৮) ছয়টি কারক (কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ) মানা হচ্ছে, এদের ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলে। সংস্কৃতে ক্রিয়ার ব্যাপারটিকে বাক্যে বড় স্থান দেওয়া হয়েছে:—'সর্বং হি ক্রিয়য়া পরিসমাপ্যতে।' এবং এই ক্রিয়াসাধন ব্যাপারে যারা সহায়ক তারাই কারক, কারক মানে 'সাধন' অর্থাৎ যোগসাধক। তাই এই ক্রিয়ার সঙ্গে যার যোগ নেই এমন পদকে কারক বলা হয়নি সংস্কৃত ব্যাকরণে।

সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ তাই কারক নয়। ইংরেজি ব্যাকরণের মতে সম্বন্ধও case, সম্বোধনও case। কারণ ইংরেজি ব্যাকরণের মতে বাক্যে যে-কোনও পদের সঙ্গে অন্য পদের সম্পর্ককেই case বলা হয়—'expressing relation to some other word' *(Concise Oxford Dictionary).*

ইংরেজি 'case' মানে 'পতন' অর্থাৎ শব্দগুলো বাক্যগঠনের জন্যে একত্রে পতিত হয়, পরস্পর অন্বিত হয়ে।

রামমোহন রায় 'পরিণাম' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাৎপর্যগত-ভাবে তা 'case' কথাটির অর্থই বহন করে। রামমোহন সম্বন্ধকেও কারক বলে মেনেছেন গৌড়ীয় ব্যাকরণে—'রামের ঘর কহিলে অন্যের ঘর না বুঝাইয়া রামের সহিত যে ঘরের সম্বন্ধ আছে তাহাকেই বুঝায়। এই কারণে তাহাকে সম্বন্ধ পরিণাম কহি।'

সংস্কৃতে বিভিন্ন কারকে সম্বন্ধ পদের ব্যবহারের বিধান আছে নানা ক্ষেত্রে, যেমন মাতুঃ (= মাতরম্ অর্থে) স্মরতি। ব্রহ্মদ্বিষস্তে প্রণিহন্মি (ব্রহ্মদ্বিষঃ = ব্রহ্মদ্বিষম্), নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাম্ (= কাষ্ঠৈঃ), স দিনস্য (= দিনে) দ্বিঃ খাদতি।

এই সব ব্যবহার থেকে সম্বন্ধের কারকত্ব স্বীকার করার প্রবণতা হতেই পারে।

কিন্তু সম্বোধনপদের গতি কী হবে ? সে কি বাক্যের দ্বারপ্রান্তে অবস্থিত অবাঞ্ছিত অতিথিমাত্র ? সমস্ত বাক্যই এর অনুবর্তী অথচ পৃথকভাবে কোনও পদের সঙ্গেই সে সম্পর্কিত নয়। ইংরেজি ব্যাকরণে সে 'case'-আখ্যা (vocative case) পেয়েছে বটে, কিন্তু বাংলা ব্যাকরণে তার কারকত্ব অস্বীকৃত।

সংস্কৃত ব্যাকরণে অকারক-বিভক্তির প্রয়োগ, কারক-বিভক্তি থেকে স্বতন্ত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে দেখানো হয়েছে। যেমন—

স অক্ষ্ণা কাণ: (সে চোখে কাণা)
জটাভিস্তাপসমপশ্যম্ (জটা দ্বারা উপলক্ষিত তাপসকে দেখলাম)
সঃ অন্নেন অত্র বসতি (সে অন্নের জন্যে অর্থাৎ অন্ন হেতু এখানে বাস করে।) ইত্যাদি।

কিন্তু আচার্য সুনীতিকুমার এসব করণকারকের মধ্যে ফেলতে চান বিভিন্ন নামে। উপলক্ষণাত্মক করণ, হেত্বাত্মক করণ ইত্যাদি। তেমনি অকারক 'চেয়ে' বা 'হইতে' বিভক্তির ক্ষেত্রগুলিকেও অপাদান কারকের বিভাগের মধ্যে এনেছেন তিনি। স্বর্গ অপেক্ষা জন্মভূমির গৌরব অধিক—এই বাক্যে স্বর্গকে তিনি তারতম্যবাচক অপাদান বলেছেন। এতে অকারক বিভক্তির বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ন হয়েছে বলেই মনে করি।

আমরা এবারে কারকের বিভিন্ন শ্রেণী এবং তাতে বিভিন্ন বিভক্তি ও অনুসর্গের প্রয়োগ আলোচনা করব। আর তা করতে গিয়ে কারকের সংজ্ঞাগুলিরও তাৎপর্য লক্ষ করব।

২৮.৩ ■ বিভিন্ন কারক : একই কারকে বিভিন্ন বিভক্তি ও অনুসর্গ

কর্তা

ব্যুৎপত্তিগত অর্থে (√কৃ+তৃ) যে করে সে-ই কর্তা। ব্যাকরণ কৌমুদীর সূত্র—'ক্রিয়াসম্পাদকঃ কর্তা'। ইংরেজির nominative case এবং আরবি ফারসি ফা'ইল (ক্রিয়াপরিচালক) একই অর্থ বহন করে। পাণিনির সূত্র—'স্বতন্ত্রঃ কর্তা' অর্থাৎ যে অপরের অধীন না হয়ে ক্রিয়া সম্পন্ন করে সে-ই কর্তা। কর্তায় বিভক্তি-চিহ্ন প্রায়ই উহ্য থাকে, একে কর্তার শূন্য-বিভক্তি বলা হয়। **সবাই** একথা জানে। **কে** এল ? **কানাই** কোথায় গিয়েছে ? **সে ও তার ভাই** এসেছে।

কর্তায় 'এ' বিভক্তি :

লোকে তো কত কথাই বলে।
পাগলে কী না বলে।
আগে গেলে **বাঘে** খায়।

স্বরান্ত শব্দের পর 'এ' 'য়'-তে রূপান্তরিত হয়।

বেদেয় চেনে সাপের হাঁচি।
মায়ে বলে, **ব্যাটায়** শোনে।

কর্তায় 'তে' :

ঘোড়াতে গাড়ি টানে।
ওরা **দুটিতে** বেড়াতে বেরিয়েছে।

কর্মবাচ্যে বা ভাববাচ্যে কর্তায় 'কে' :

আমাকে যেতে হবে।
তোমাকে এসব শুনতে হবে।

কর্মবাচ্যে বা ভাববাচ্যের কর্তায় 'র' :

আমার বইটা পড়া হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার যাওয়া হল না।

প্রযোজক কর্তায় শূন্য বিভক্তি হয়। আর প্রযোজ্য কর্তায় 'কে' বা 'কে দিয়ে'

মা **শিশুকে** খাওয়ান।

সে **আমাকে দিয়ে** কাজটা করাচ্ছে।

[কর্তা অন্যকে দিয়ে কিছু করালে তাকে **প্রযোজক কর্তা** বলে, আর যাকে দিয়ে কিছু করানো হয় সে **প্রযোজ্য কর্তা**।]

নিরপেক্ষ কর্তায় শূন্য বিভক্তি :

সূর্য উঠিলে কুয়াশা কাটিয়া গেল।

[ইলে প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ায় কর্তাকে **নিরপেক্ষ কর্তা** বলে। ইংরেজিতে Nominative Absolute.বলে।]

'ইতে' প্রত্যয় যোগে বা 'বর্তমানে' বা 'বিদ্যমানে' শব্দযোগে নিরপেক্ষ কর্তা হতে পারে।

প্রাণ থাকিতে সে একাজ করিবে না।

পিতা বর্তমানে বা বিদ্যমানে সে এরূপ করিল কেন ?

এগুলিকে ভাবাধিকরণে শূন্য বিভক্তির উদাহরণ হিসেবেও ধরা চলে (ভাবাধিকরণ দেখুন)।

'বর্তমানে' বা 'বিদ্যমানে'র বদলে 'এ' বাদ দিয়ে শুধু 'বর্তমান' ও 'বিদ্যমান' শব্দেরও প্রয়োগ পাওয়া যায় পুরনো বাংলায়।

'অগ্নিতে পোড়ায় সৈন্য দ্রোণ বিদ্যমান।

সংস্কৃত বাগ্‌বিধি থেকে বাংলা বাগ্‌বিধি কীভাবে সরে আসে এসব উদাহরণে তা বোঝা যায়।

AMARBOI.COM

কর্মকারক

কলাপ ব্যাকরণে খুব সহজ কথায় বলা হয়েছে 'যৎ ক্রিয়তে তৎ কর্ম'। কিন্তু এতে কর্মবাচ্যের আভাস আসে। তাই ব্যাকরণকৌমুদীর সূত্র 'ক্রিয়য়াক্রান্তং কর্ম' কর্মের সংজ্ঞা হিসেবে উপযুক্ত মনে হয়। অর্থাৎ কর্তা ক্রিয়ার দ্বারা যা অবলম্বন করে তা কর্মকারক।

ক) কর্মে 'কে' বিভক্তি :

সাধারণত মনুষ্যবাচক শব্দে কর্মে 'কে' বিভক্তি হয়।

আমি **তাকে** চিনি।

রামকে ডাকো।

গৌণকর্মে 'কে' বিভক্তি হয়।

কবিতায় এই 'কে' 'রে' তে পরিণত হয়।

আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা।

উদ্দেশ্যকর্মে 'কে' :

পিতামাতাকে সাক্ষাৎ দেবতা জানিবে।

খ) কর্মে 'এ' বিভক্তি :

সাধারণত কবিতায় কর্মে এ বিভক্তি হয় :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনেছি রাক্ষসপতি মেঘের গর্জনে।
মানুষ হইয়া তুমি জিনিলে রাবণে।
কৃপা করো দীনজনে।

গ) কর্মে শূন্য বিভক্তি :
সাধারণত পশুপাখি বা অচেতন পদার্থের ক্ষেত্রে কর্মে শূন্য বিভক্তি হয় :
দুটো পাখি দেখছি। সে ভাত খেয়েছে।
দাঁত মাজো। ঘর মোছো।
বিশেষ করে বোঝালে 'কে' হবে দাঁতগুলোকে তো শেষ করে এনেছ।
ঘরটাকে মোছো ভাল করে। হাতকে যত্ন করে তোলো।
ঈশ্বর, ঈশ্বরতুল্য বা অতিপূজনীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'কে' না হয়ে শূন্য বিভক্তি হয়, যেমন, রাম ভজো, গুরু ভজো। ইত্যাদি।

গৌণকর্মে শূন্য বিভক্তি :
সে আমাকে অঙ্ক শেখাচ্ছে।
জাতিবাচক হলে মনুষ্যবাচক শব্দে শূন্যবিভক্তি হয় :
মানুষ পাই কোথায় ?

ঘ) কর্মে 'য়', স্বরের পর 'এ' বিভক্তি 'য়' হয়
আমায় সব বলো। (আমাএ=আমায়, য়—শ্রুতি)
কে তোমায় ডেকেছে ? (তোমাএ=তোমায়, য়-শ্রুতি)

AMARBOI.COM

করণকারক

ক্রিয়ানিষ্পত্তির ব্যাপারে যা প্রধান সহায় তাকে করণ বলে। ('সাধকতমং করণম্')।

করণে এ :
এ কলমে কী করে লিখব।
টাকায় (এ>য়) কী না হয় ?
খড়্গে কাটে ছাগে।
আকাশ মেঘে ঢাকা।

করণে শূন্য বিভক্তি :
ওরা তাস খেলছে।
ঠেঙা মারল মাথায়।
খার কেচে উঠলাম।
তুলনীয় : beating the cane (beating with the cane)
hitting the hammer (hitting with the hammer) ইত্যাদি।

করণে অনুসর্গ : দিয়া>দিয়ে, দ্বারা, ক'রে
কী দিয়া পূজিব তোমা ?
ছুরি দিয়া >দিয়ে কাটো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী ক'রে হাত কাটলে ?

অনেক সময় বিভক্তি ও অনুসর্গের যুগ্মপ্রয়োগ দেখা যায় :

হাতায় করে দাও।

গেলাসে করে দাও।

এ কলমটাকে দিয়ে আর লেখা চলছে না।

সম্প্রদান

পাণিনিমতে দান ক্রিয়ার কর্মের যে অভিপ্রেত সে সম্প্রদান, আর এই দান অপুনর্গ্রহায়, অর্থাৎ একেবারে স্বত্বত্যাগ করে দান। এ কথা আগেই আমরা আলোচনা করেছি।

[মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির মতে অবশ্য দানার্থক ধাতুর প্রয়োগ থাকলেই সম্প্রদান হবে। অর্থাৎ শিষ্যকে চাপেটাপ্রহার দিচ্ছে—এবাক্যে শিষ্য সম্প্রদান কারক।]

সম্প্রদানে 'কে'-বিভক্তি :

ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও।

সম্প্রদানে 'এ' বিভক্তি :

অন্ধজনে দেহ আলো।

কৃষ্ণে মন সমর্পণ করো।

সম্প্রদানে 'তে' :

সমিতিতে চাঁদা দাও।

সম্প্রদানে শূন্য বিভক্তি :

কী দিব তোমা ?

AMARBOI.COM

সংস্কৃতে দানক্রিয়ার পাত্র ছাড়াও আরও অনেক কিছুতে সম্প্রদানত্ব : ক্রোধের পাত্র, সম্প্রদান। রুচ্যর্থক ধাতুর যোগে প্রীয়মাণ সম্প্রদান। রামায় ক্রুধ্যতি, মহ্যং রোচতে। কিন্তু বাংলায় আমরা 'সে রামকে রাগ করছে' না বলে বলি রামের উপর রাগ করছে, 'আমাকে ভাল লাগে' না বলে আমরা বলি 'আমার ভাল লাগে' (হিন্দিতে অবশ্য মুঝকো আচ্ছা লগতা), তাই সংস্কৃতের ক্ষেত্রগুলো বাংলায় প্রযোজ্য নয় বলে, সম্প্রদান স্বীকারের প্রয়োজন বাংলায় নেই। আমরা সম্প্রদানকে গৌণকর্ম বলতে পারি।

অপাদান কারক

পাণিনি অপাদানের সংজ্ঞা করেছেন 'ধ্রুবমপায়ে অপাদানম্'। অপায় বা বিশ্লেষ ঘটলে যা ধ্রুব তাই অপাদান। সৈনিকের অশ্ব যখন পাহাড় থেকে পড়ল তখন পাহাড় অপাদান। আবার অশ্ব থেকে যখন সৈনিক ছিটকে পড়ল তখন অশ্ব অপাদান। আবার সৈনিকের মাথা থেকে যখন তার শিরস্ত্রাণটি বিচ্যুত হল তখন সৈনিকের মাথা হল অপাদান। ইংরেজিতে এ কারকের নাম দেওয়া হয়েছে ablative case, ablative মানে 'what is carried off from something.

এই বিশ্লেষের অর্থ ছাড়াও যা থেকে কিছু উৎপন্ন হয়, যা থেকে পরিত্রাণ ঈপ্সিত, যা থেকে বিরতি ঈপ্সিত তাও অপাদান। যা থেকে ভয় বা লজ্জা তাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপাদান।

অপাদানে 'এ'

পাপে বিরত হও।
নহিলে আমি **রাজধর্মে** পতিত হইব।
জলে বাষ্প ওঠে।
তর্কে বিরত হও।
ঠাণ্ডায় বাঁচাও ভাই।

অপাদানে 'তে' :

চক্ষুতে জলের ধারা বহিল।
'মূর্ছিত হইয়া বীর **রথেতে** পড়িল।'

হ্যালহেড অনুবাদে 'from' ব্যবহার করেছেন। (এই 'তে' সংস্কৃত তঃ<তস্ থেকে) এটিকে অবশ্য অধিকরণও ধরা চলে, যদি রথের মধ্যেই পতন ঘটে থাকে।

অপাদান কারকে 'কে' :

আমাকে লজ্জা কী ?
আমাকে ভয় কী ?

অপাদানে অনুসর্গ :

হইতে (হতে), থেকে, নিকট হইতে (কাছ থেকে), দিয়া (দিয়ে) :
লোভ হইতে পাপ জন্মে।
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া।
বন থেকে বেরল টিয়ে।
পিসিমার **কাছ থেকে** আসছি।
তার চোখ **দিয়ে** জল ঝরছে।

AMARBOI.COM

অধিকরণ কারক

ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ বলে, (আধারোঽধিকরণম্)

অধিকরণে 'এ' :

অধিকরণকে অর্থভেদে চার ভাগে ভাগ করা হয় :
স্থানাধিকরণ, কালাধিকরণ, বিষয়াধিকরণ, ভাবাধিকরণ,
উদাহরণ যথাক্রমে :
ঘরে আয়, বাইরে কেন ?
'**বসন্তে বসন্তে** তোমার কবিরে দাও ডাক।'
ভাষায় তার অদ্ভুত দখল।
সূর্যোদয়ে পদ্ম ফোটে।

একটি ঘটলে আর কিছু ঘটে—এমনটি বোঝালে যদি পূর্ববর্তী ঘটনাটি বিশেষ্যস্থানীয় হয় তবে তাকে 'ভাব' বলে। এই 'ভাবে' 'এ' বিভক্তি হয়। পাণিনি সূত্র : 'যস্য চ ভাবেন ভাবলক্ষণম্' অর্থাৎ যে ভাবের দ্বারা অন্য ভাব নিরূপিত হয় তার উত্তর সপ্তমী বিভক্তি হয়। সূর্যোদয়ে পদ্ম ফোটে—এখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সূর্যোদয়ে' ভাবাধিকরণে 'এ'। আর যদি 'সূর্যের উদয়ে পদ্ম ফোটে' বলি তা হলে 'উদয়ে' পদকেও ভাবাধিকরণে এ বিভক্তি বলতে পারি। আর এক্ষেত্রে যদি 'ইলে' প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ব্যবহার করে বলি 'সূর্য উঠিলে পদ্ম ফোটে' তা হলে 'সূর্য' পদটিকে আমরা ভাবাধিকরণে শূন্য বিভক্তি বলতে পারি। কারণ উঠিলে আর 'উদিত' যে সগোত্র তা আগে দেখানো হয়েছে (২৫.১০ দ্রষ্টব্য)। তথাকথিত নিরপেক্ষ কর্তা আসলে 'ভাব'।

ইংরেজিতে অধিকরণকে locative case বলে, এতে শুধু স্থানাধিকরণই বোঝাতে পারে। অন্যান্য ধরনের অধিকরণের ক্ষেত্রে তা অব্যাপ্ত।

অধিকরণ সামীপ্য বা নৈকট্যও বোঝায় :

দুয়োরে বাঁধা হাতি।
ওরা গঙ্গায় ঘর বেঁধেছে।

অধিকরণে 'তে' :

ঘরেতে ভ্রমর এল গুন্‌গুনিয়ে।
তখন আমাতে আর আমি নেই।

অধিকরণ শূন্য বিভক্তি :

সে বাড়ি নেই। (বাড়ি=বাড়িতে)
গঙ্গা নাইতে চল। (গঙ্গা=গঙ্গায়)
আজ সে দিল্লি গেল। (দিল্লি=দিল্লিতে)

অধিকরণে 'কে' বিভক্তি :

আজকে সে আসবে। কালকে এসো।

অধিকরণে অনুসর্গ :

মধ্যে, মাঝে, ভিতর (ভিতরে)
খাঁচার ভিতর অচিন পাখি।
ঘরের মধ্যে ঘর।
মনের মাঝে বাঁশি বাজে।

২৮.৪ ■ সম্বন্ধ পদ

আগেই বলা হয়েছে ক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক নেই তবে বাক্যের অন্য কোনও পদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলে সম্বন্ধদ্যোতক পদকে **সম্বন্ধপদ** বলে। সম্বন্ধ অনেকটা বিশেষণস্থানীয়। যখন বলি সোনার গয়না, গুণের ছেলে, তখন তা বিশেষণের সগোত্র হয়।

সম্বন্ধ নানারকম হতে পারে। কয়েকরকমের সম্বন্ধ এখানে উল্লিখিত হল।

অঙ্গ সম্বন্ধ : মাথার চুল, পায়ের নখ, গাছের ছাল
অধিকার সম্বন্ধ : আমার বই, তোমার ভাই, তার বাড়ি,
নিমিত্ত সম্বন্ধ : জামার কাপড়, বিয়ের বাজনা, জপের মালা,
কার্যকারণ সম্বন্ধ : অগ্নির উত্তাপ, চাঁদের আলো
রূপক সম্বন্ধ : জ্ঞানের আলো, দেহের খাঁচা (অর্থাৎ জ্ঞানরূপ আলো, দেহরূপ খাঁচা)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

সাদৃশ্য সম্বন্ধ : মাটির মানুষ, ননীর পুতুল
ব্যাপ্তি সম্বন্ধ : একদিনের ছুটি, তিনমাসের ভ্রমণ
সাধারণ সম্বন্ধ : নদীর তীর, পুকুরের পাড়
পূরণ বা ক্রম সম্বন্ধ : পাঁচের পাতা, সাতের ঘর
তারতম্য সম্বন্ধ : রামের বড়, আমার ছোট
উপাদান সম্বন্ধ : খড়ের চাল, ছানার বড়া, রুপোর নথ ইত্যাদি।
জন্যজনক সম্বন্ধ : পিতার পুত্র, গাছের ফল
হেতু সম্বন্ধ : বিদ্যার বড়াই, টাকার গরম
উপযোগিতা সম্বন্ধ : খাবার সময়, যাবার মতো
উপলক্ষ সম্বন্ধ : পূজার ছুটি, পূর্ণিমার উপোস
পটুতা সম্বন্ধ : কিল মারবার গোঁসাই, কোঁদলের ওস্তাদ।

কারক সম্বন্ধ :
কর্তৃসম্বন্ধ : আমার যাওয়া, তোমার লেখা
কর্মসম্বন্ধ : গুরুর সেবা, দেবীর অর্চনা
করণ সম্বন্ধ : অস্ত্রের আঘাত, কলমের খোঁচা
সম্প্রদান সম্বন্ধ : দেবতার ধন (দেবতাকে প্রদত্ত ধন)
অপাদান সম্বন্ধ : রূপের ভয়, চোখের জল
অধিকরণ সম্বন্ধ : বনের বাঘ, মনের আগুন, জলের মাছ

AMARBOI.COM

২৮.৫ ■ সম্বন্ধ পদের বিভক্তি

- র বা এর :

আমার বই, রামের ভাই, ঘরের চাল। যে সব পদের উচ্চারণ স্বরান্ত তার সঙ্গে 'র', আর যাদের উচ্চারণ হলন্ত তাদের সঙ্গে 'এর' বিভক্তি বিধেয়।

- কার> কের :

সময়, দিক, অবস্থান এবং সমষ্টিবাচক শব্দের উত্তর 'কার' হয় :

আগেকার, আজিকার>আজকের, প্রথমবার, সেদিনকার, বছরকার (দিন), এখানকার, সেখানকার, কবেকার, কোথাকার, সবাইকার।

'সত্যকার' কথাটি চলিত বাংলায় সত্যিকার বা সত্যিকারের হিসেবে চলে। সাধুভাষায় 'সত্যিকার' না ব্যবহার করাই ভাল।

২৮.৬ ■ সম্বোধন পদ

কাউকে ডেকে নিজের দিকে ফেরানোর জন্যে যেসব শব্দ বা অব্যয় ব্যবহার করা হয় তাকে সম্বোধনপদ বলে। পারিভাষিক নাম 'সম্বুদ্ধি'। ইংরেজিতে একে বলে Vocative case, ব্যুৎপত্তিগত ভাবে যার অর্থ calling or drawing somebody's attention.

সম্বোধনপদে বাংলায় কোনও বিভক্তি যুক্ত হয় না, সরাসরি কাউকে নাম ধরে ডাকতে পারি, যেমন রূপক, কোথায় যাচ্ছিস ? অথবা কোথায় যাচ্ছিস রূপক ? আবার এই নামের আগে কোনও অব্যয়ও যোগ করা যেতে পারে, এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে রূপক। কোথায় যাচ্ছিস।

হে, ওহে, ওগো, ওলো, হ্যাঁগা, ইত্যাদি অব্যয়ও সম্বোধন পদ। (অব্যয় দ্র.)

পশুপাখিকে সম্বোধন করার জন্যেও কিছু অব্যয় আছে, আ তু, আ চুকচুক, ইত্যাদি।

সংস্কৃত শব্দের রূপান্তর ঘটে সম্বোধনে, যেমন হরি>হরে, প্রভু>প্রভো ইত্যাদি।

সুধী শব্দের সম্বোধনে 'সুধী' তাই আমন্ত্রণপত্রে 'সুধী' লিখতে হবে, সুধি নয়।

সংস্কৃতের সম্বোধন পদ আমরা বাংলায় ব্যবহার করি না। বিশেষ রচনায় রাজন্, মহাত্মন্, ভদ্রে, ইত্যাদি পদের ব্যবহার অবশ্য চলে।

পুরনো বাংলায় সম্বোধনে 'এ'র প্রয়োগ ছিল

শুন নৃপবরে!

এই 'এ' বিচ্ছিন্নভাবে শব্দের আগেও বসত :

'এ নাথ তুমি মোরে করিলা পরাধিন'—

এ উদাহরণ দিয়েছেন হ্যালহেড সাহেব।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৯

বিভক্তি ও শব্দরূপ

[চলিত ও সাধুভাষায় প্রযুক্ত বিভক্তি—শব্দরূপ]

২৯.১ ■ চলিত ও সাধুভাষায় প্রযুক্ত বিভক্তি

কারক	একবচন	বহুবচন
কর্তা	১. শূন্যবিভক্তি, ২. এ বা এ > য় বিভক্তি [স্বরবর্ণের পর 'য়'] ৩. তে (ই, ঈ, উ, ঊ কারান্ত শব্দের সঙ্গে) ৪. এতে (ব্যঞ্জনান্ত শব্দ এবং অ, আ, এবং ও-কারান্ত শব্দের সঙ্গে)	১. মূল শব্দ অপরিবর্তিত ২. 'রা' স্বরান্ত শব্দের পর এরা ৩. গুলা, গুলি, গুলো ৪. সমূহ, গণ ইত্যাদি দ্বারা ৫. গুলি, গুলিতে, ৬. সকলে ইত্যাদি।
কর্ম ও সম্প্রদান	১. শূন্যপ্রত্যয় ২. 'কে' ৩. রে, এরা (পদ্যেই বেশি ব্যবহার) ৪. এ, য় (পদ্যেই বেশি ব্যবহার)	১. দিগকে, দিগে ('দিকে' আঞ্চলিক) ২. দের, দের, দেরকে ৩. গুলা গুলি গুলো
করন্ধ	১. এ, এ > য় (স্বরান্ত শব্দে) ২. তে, এতে ৩. দিয়া, দিয়ে, করিয়া ইত্যাদি অনুসর্গ যোগে	১. দিগ-দ্বারা, দিগের দ্বারা, দিগকর্তৃক, দের দিয়া ইত্যাদি ২. গুলা, গুলি+দ্বারা, কর্তৃক
অপাদান	১. এ ২. অনুসর্গ হইতে থেকে, হতে ইত্যাদি মূল শব্দে র বা এর	১. দিগ গুলা, গুলি সকল ইত্যাদি যুক্ত শব্দের সঙ্গে হইতে, থেকে ইত্যাদি। ২. দিগের বা এর যুক্ত মূল শব্দের সঙ্গে নিকট হইতে বা কাছ থেকে। ৩. তারতম্য বা তুলনাবাচক অপাদানে, র-যুক্ত বহুবচন+অপেক্ষা বা চেয়ে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্বন্ধ পদ	১. র, এর ইত্যাদি ২. কার বা কের (কতগুলি বিশেষ শব্দ)	১. দিগের, দের ২. গুলোর, গুলির, গুলোর বা সকলের বা সবার সকলকার, সবাকার (পদ্যে) ইত্যাদি।
অধিকরণ	১. এ, এ > য় ২. তে, এতে	১. দিগতে গুলা গুলি সকল + এ, তে, এতে
	৩. র যুক্ত রূপ + কাছে, নিকটে, মধ্যে, মাসে ইত্যাদি	৩. বহুবচন, র বা এর যুক্ত রূপ + কাছে, নিকটে, মধ্যে ইত্যাদি।
সম্বোধন	১. মূল শব্দের আগে বা পরে হে, ওহে, ওগো ইত্যাদি ব্যবহার করে। ২. অনেক জায়গায় সাধু ভাষায় সংস্কৃতে প্রযুক্ত সম্বোধন পদের রূপ ব্যবহৃত হয়।	১. একবচনের মতোই।

উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের সম্বোধনের রূপ হয় না।

AMARBOI.COM

২৯.২ ■ শব্দরূপ

বিশেষ্য

মানুষ

কারক	একবচন	বহুবচন
কর্তা	মানুষ, মানুষে (মানুষ+এ)	মানুষেরা (মানুষ + এরা) মানুষগুলি-গুলো, মানুষগণ, মানুষসকল মানুষদের।
কর্ম	মানুষকে (মানুষ+কে)	মানুষদিগকে, মানুষদেরকে (দিগ+কে) (দের+কে)
করণ	মানুষ দ্বারা, মানুষ দিয়া > দিয়ে মানুষকে দিয়ে	মানুষগুলি দ্বারা, মানুষগুলিকে দিয়ে
সম্প্রদান	কর্মের মতো	
অপাদান	মানুষ হইতে, মানুষ হতে, মানুষ থেকে, মানুষের কাছ থেকে	মানুষদিগ হইতে, মানুষদের কাছ থেকে; মানুষগুলির কাছ থেকে
সম্বন্ধ পদ	মানুষের	মানুষদিগের, মানুষদের, মানুষগুলির।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধিকরণ	মানুষের	মানুষদিগের, মানুষগণের মানুষগুলির, মানুষদের
সম্বোধন	হে মানুষ !	হে মানুষগণ, মানুষসব

গাছ

কর্তা	গাছ	গাছেরা, গাছগুলি-গুলো
কর্ম ও সম্প্রদান	গাছে, গাছকে	গাছগুলিকে গাছেদের, গাছগুলির-গুলোর
করণ	গাছ দ্বারা গাছ দিয়ে	গাছেদের দ্বারা, গাছগুলির দ্বারা গাছগুলোকে দিয়ে
অপাদান	গাছ হইতে, গাছ থেকে গাছের নিকট হইতে গাছের কাছ থেকে	গাছগুলি হইতে গাছগুলির থেকে গাছগুলির নিকট হইতে গাছগুলির কাছ থেকে
সম্বন্ধ	গাছের	গাছদিগের > গাছদের, গাছগুলির, গাছগুলোর
অধিকরণ	গাছে, গাছেতে, গাছের মধ্যে	গাছদিগের মধ্যে, গাছদের মধ্যে, গাছগুলির-গুলোর মধ্যে
সম্বোধন	ওগো গাছ! ও গাছ। গাছ !	ওগো গাছেরা ! ও গাছেরা ! গাছেরা !

মানুষ ও গাছ শব্দের মতোই প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক শব্দের রূপ হবে। অকারান্ত শব্দের পর এ, এরা, এর এতে ইত্যাদি বিভক্তিতে য়-শ্রুতি হবে :

মায়েরা, মায়ের, মায়েতে ইত্যাদি

সর্বনাম

আমি

কর্তা	আমি	আমরা, আমরা-সব, আমরা-সকলে
কর্ম ও সম্প্রদান	আমাকে	আমাদিগকে > আমাদের, আমাদেরকে
করণ	আমা দ্বারা, আমার দ্বারা আমাকে দিয়া > দিয়ে	আমাদিগের দ্বারা, আমাদের দ্বারা, আমাদেরকে দিয়ে
অপাদান	আমা হইতে > হতে	আমাদিগ হইতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

	আমার কাছ থেকে	আমাদিগের নিকট হইতে আমাদের কাছ থেকে
সম্বন্ধ	আমার, মোর (পদ্যে)	আমাদিগের > আমাদের, মোদের (পদ্যে) আমা সবাকার (পদ্যে)
অধিকরণ	আমাতে, আমার মধ্যে	আমাদিগেতে, আমাদিগের মধ্যে > আমাদের মধ্যে

'আমি' তুমি, তুই, সে, আপনি, কে কর্তার একবচন ছাড়া অন্য কারকে যথাক্রমে আমা, তোমা, তো, তাহা > তা, আপনা ও কাহা হয়ে যায়। কাহা > কা।

আমি ও তুমি শব্দে আমি+রা = আমরা, তুমি+রা = তোমরা।

সর্বনাম শব্দে সম্বোধন হয় না।

তুমি

কর্তা	তুমি	তোমরা, তোমরা সব
কর্ম ও সম্প্রদান	তোমাকে	তোমাদিগকে, তোমদেকে, তোমাদেরকে
করণ	তোমার দ্বারা তোমাকে দিয়া > দিয়ে	তোমাদিগের দ্বারা, তোমাদের দ্বারা, তোমাদিগকে দিয়া, তোমাদের দিয়ে
অপাদান	তোমা হইতে > হতে তোমার নিকট হইতে তোমার কাছ থেকে	তোমাদিগ হইতে তোমাদিগের নিকট হইতে তোমাদের কাছ থেকে তোমাদিগের > তোমাদের তোমা সবাকার
সম্বন্ধ	তোমার তব (পদ্যে)	তোমাদিগের > তোমাদের তোমা সবাকার (পদ্যে)
অধিকরণ	তোমাদিগেতে তোমাদিগের মধ্যে, তোমাদের মধ্যে	তোমাদিগেতে তোমাদিগের মধ্যে তোমাদের মধ্যে

সে

কর্তা	সে	তাহারা > তারা, তারা সব
কর্ম ও সম্প্রদান	তাহাকে > তাকে	তাহাদিগকে > তাদেকে তাদেরকে
করণ	তাহা দ্বারা, তাহার দ্বারা তাহাকে দিয়ে তাকে দিয়ে	তাহাদিগ দ্বারা তাহাদের দ্বারা তাদের দিয়ে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপাদান	তাহা হইতে তাহার নিকট হইতে তার কাছ থেকে তার কাছ থেকে	তাহাদিগ হইতে তাহাদিগের নিকট হইতে
সম্বন্ধ	তাহার, তার, তস্য*	তাদের কাছ থেকে তাহাদিগের, তাহাদের > তাদের
অধিকরণ	তাহাতে, তাহার মধ্যে > তাতে, তার মধ্যে	তাহাদিগেতে, তাহাদিগের মধ্যে

তুই

কর্তা	তুই	তোরা, তোরা সব
কর্ম ও সম্প্রদান	তোকে	তোদেকে তোদেরকে
করণ	তোর দ্বারা তোকে দিয়ে	তোদের দ্বারা তোদের দিয়ে তোদেকে দিয়ে তোদেরকে দিয়ে
অপাদান	তোর থেকে তোর কাছ থেকে	তোদের থেকে তোদের কাছ থেকে
সম্বন্ধ পদ	তোর	তোদের
অধিকরণ	তোকে তোর মধ্যে	তোদের মধ্যে

AMARBOI.COM

আপনি

কর্তা	আপনি	আপনারা, আপনারা সব
কর্ম ও সম্প্রদান	আপনাকে	আপনাদিগের, আপনাদের, আপনাদেরকে
করণ	আপনার দ্বারা আপনাকে দিয়ে > দিয়ে	আপনাদিগের দ্বারা আপনাদের দিয়া > দিয়ে আপনাদেরকে দিয়ে
অপাদান	আপনা হইতে আপনার নিকট হইতে আপনার কাছ থেকে	আপনাদিগ হইতে আপনাদের কাছ থেকে,
সম্বন্ধ পদ	আপনার	আপনাদিগের, আপনাদের

* সংস্কৃত পদ, বাংলো ঠাট্টাবিদ্রূপে এবং দলিলাদিতে ব্যবহৃত :
কুটুম্বস্য কুটম্ব তস্য কুটুম্ব, জীবনধন রায় তস্য পুত্র জগদীশ রায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধিকরণ	আপনাতে আপনার মধ্যে	আপনাদিগেতে আপনাদিগের মধ্যে আপনাদের মধ্যে

ইহা

কর্তা	ইহা এ	ইহারা > এরা
কর্ম ও সম্প্রদান	ইহাকে > একে	ইহাদিগের, ইহাদের > এদের এদেরকে
করণ	ইহা দ্বারা ইহাকে দিয়া একে দিয়ে এ দিয়ে	ইহাদিগ দ্বারা ইহাদের দ্বারা এদের দ্বারা এদের দিয়ে এদেরকে দিয়ে
অপাদান	ইহা হইতে এর থেকে, এর কাছ থেকে	ইহাদিগ হইতে এদের থেকে এদের কাছ থেকে
সম্বন্ধ	ইহার > এর	ইহাদিগের, ইহাদের > এদের
অধিকরণ	ইহাতে, ইহার মধ্যে এতে, এর মধ্যে	ইহাদিগেতে, ইহাদের মধ্যে এদের মধ্যে

AMARBOI.COM

তাহা

কর্তা	তাহা > তা	তাহারা > তারা, তারা সব
কর্ম ও সম্প্রদান	তাহাকে > তাকে	তাহাদিগকে > তাদেকে, তাদেরকে
করণ	তাহা দ্বারা, তা দ্বারা, তা দিয়ে তাকে দিয়ে	তাহাদিগ দ্বারা তাদের দ্বারা তাদের দিয়ে তাদেরকে দিয়ে
অপাদান	তাহা হইতে, তা থেকে তার কাছ থেকে	তাহাদিগ হইতে, তাহাদিগ দ্বারা, তাদের দ্বারা, তাদের দিয়ে, তাদেকে দিয়ে
সম্বন্ধ	তাহার > তার	তাহাদিগের > তাদের
অধিকরণ	তাহাতে, তাহার মধ্যে তাতে, তার মধ্যে	তাহাদিগেতে, তাহাদিগের মধ্যে, তাদের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উহা

কর্তা	উহা, ওটা, ও	উহারা > ওরা, ওগুলি-গুলো
কর্ম ও সম্প্রদান	উহাকে, ওকে, ওটাকে	উহাদিগকে > ওদেকে, ওদের, ওদেরকে, ওগুলিকে-গুলোকে
করণ	উহা দ্বারা, ওর দ্বারা, ওকে দিয়ে	উহাদিগ দ্বারা, ওগুলির দ্বারা, ওদের দ্বারা, ওদের দিয়ে, ওদেরকে দিয়ে, ওগুলিকে দিয়ে
অপাদান	উহা হইতে, ওর থেকে ওর কাছ থেকে	উহাদিগ হইতে ওগুলি হইতে ওদের থেকে, ওগুলি থেকে ওদের কাছ থেকে ওগুলির কাছ থেকে
সম্বন্ধ পদ	উহার > ওর	উহাদিগের > ওদের ওগুলির-গুলোর
অধিকরণ	উহাতে > ওতে, উহার মধ্যে > ওর মধ্যে	উহাদিগেতে, ওগুলিতে উহাদিগের মধ্যে > ওদের মধ্যে, ওগুলির-গুলোর মধ্যে

AMARBOI.COM

কে

কর্তা	কে	কাহারা > কারা, কারা সব
কর্ম ও সম্প্রদান	কাহাকে, কাকে	কাহাদিগকে, কাহাদের > কাদের, কাদেরকে
করণ	কাহা দ্বারা, কাহার দ্বারা > কার দ্বারা, কাহাকে দিয়ে > কাকে দিয়ে	কাহাদিগ দ্বারা, কাহাদের দ্বারা, কাদের দ্বারা, কাদের দিয়ে, কাদেরকে দিয়ে
অপাদান	কাহা হইতে, কার থেকে কার কাছ থেকে	কাহাদিগ হইতে, কাহাদের নিকট হইতে, কাদের থেকে, কাদের কাছ থেকে
সম্বন্ধ পদ	কাহার > কার কস্য*	কাহাদিগের, কাহাদের > কাদের
অধিকরণ	কাহাতে > কাতে কার মধ্যে	কাহাদিগেতে, কাহাদের মধ্যে > কাদের মধ্যে

* সংস্কৃত পদ, দলিলাদিতে ব্যবহৃত : কস্য কবুলিয়ত পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে ইত্যাদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি

কর্তা	তিনি	তাঁহারা > তাঁরা, তাঁরা সব
কর্ম ও সম্প্রদান	তাঁহাকে > তাঁকে	তাঁহাদিগকে, তাঁহাদের > তাঁদের, তাঁদেরকে
করণ	তাঁহা দ্বারা তাঁহাকে দিয়া > তাঁকে দিয়ে	তাঁহাদিগ দ্বারা তাঁহাদিগের দ্বারা তাঁদের দ্বারা তাঁদের দিয়ে তাঁদেরকে দিয়ে
অপাদান	তাঁহা হইতে, তাঁর থেকে তাঁহার নিকট হইতে তাঁর কাছ থেকে	তাঁহাদিগ হইতে তাঁদের থেকে তাঁহাদের নিকট হইতে তাঁদের কাছ থেকে
সম্বন্ধ পদ	তাঁহার > তাঁর	তাঁহাদিগের > তাঁদের
অধিকরণ	তাঁহাতে তাঁহার মধ্যে তাঁতে, তাঁর মধ্যে	তাঁহাদিগেতে তাঁহাদিগের মধ্যে তাঁহাদের মধ্যে তাঁদের মধ্যে

AMARBOI.COM

ইনি

কর্তা	ইনি	ইঁহারা > এঁরা, এঁরা সব
কর্ম ও সম্প্রদান	ইঁহাকে > এঁকে	ইঁহাদিগকে, এঁদেরকে ইঁহাদিগের > এঁদের এঁদেরকে
করণ	ইঁহা দ্বারা এঁর দ্বারা এঁকে দিয়ে	ইঁহাদিগ দ্বারা ইঁহাদিগের দ্বারা এঁদের দ্বারা এঁদের দিয়ে এঁদেরকে দিয়ে
অপাদান	ইঁহা হইতে এঁর থেকে ইঁহার নিকট হইতে এঁর কাছ থেকে	ইঁহাদিগ হইতে এঁদের থেকে ইঁহাদের নিকট হইতে এঁর কাছ থেকে
সম্বন্ধ পদ	ইঁহার > এঁর, এনার*	ইঁহাদিগের > এঁদের

• এই পদটি আঞ্চলিক, মান্য চলিতভাষায় ব্যবহার না-করাই ভাল।
'এনা'কে stem ধরে সমস্ত বিভক্তিই যুক্ত হতে দেখা যায় আঞ্চলিক ভাষায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধিকরণ	ইঁহাতে, > এঁতে	ইঁহাদিগেতে
	ইঁহাদের মধ্যে >	ইঁহাদের মধ্যে
	এঁদের মধ্যে	এঁদের মধ্যে

সর্বত্রই কর্ম ও সম্প্রদানে (বা গৌণকর্মে) ‘কে’ বিভক্তির জায়গায় পদ্যে ‘রে’ বিভক্তি হয়, আমারে, তোমারে তাহারে, ইঁহারে ইত্যাদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩০

সমাস

[সমাস কী—সমাসে সন্ধি—সমাসের শ্রেণীভেদ ও নামকরণের তাৎপর্য—নিত্যসমাস—মিশ্রসমাস—একশেষ—একশেষ কি সমাস ?—অসংলগ্ন সমাস—সমাসান্ত প্রত্যয়—ছদ্মবেশী সমাস—সমাসে অর্থান্তর—সমাস-সৌষ্ঠব]

৩০.১ ■ সমাস কী

'সমাস' কথাটির অর্থ সংক্ষেপ। পরস্পর সম্পর্কিত দুই বা তার বেশি শব্দ একসঙ্গে মিলে সমাস হয়। ব্যাঘ্রের ভয়ে কেহ এই বনের মধ্যে প্রবেশ করে না। এই বাক্যটিকে আমরা এইভাবেও বলতে পারি—

ব্যাঘ্রভয়ে কেহ এই বনের মধ্যে প্রবেশ করে না।

এই বাক্যে 'ব্যাঘ্রভয়' সমস্ত পদ বা সমাসবদ্ধ পদ। ব্যাঘ্রের ভয়—এই অংশটি দুটি ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহ বাক্য। আর 'ব্যাঘ্রের' আর 'ভয়ে'—সমস্যমান পদ অর্থাৎ যা যুক্ত হতে চলেছে। এখানে লক্ষণীয় পূর্বপদের 'এর' বিভক্তিটি সমাসবদ্ধ পদে লুপ্ত হয়েছে। সমাসে সাধারণত পূর্বপদের বিভক্তি লুপ্ত হয়, আর যে সমাসে তা হয় হয় না সেখানে তাকে অলুক সমাস বলে। যেমন তেলে ভাজা = তেলেভাজা, গোরুর গাড়ি = গোরুরগাড়ি। এখানে আগেরটিতে 'এ' এবং পরেরটিতে 'র' বিভক্তি লোপ পায়নি।

সংস্কৃতে বহুপদ সমাসের প্রচলন আছে। (২৯) যেমন প্রবর-নৃপ-মুকুট-মণি- মরীচি-চয়-চর্চিত-চরণ-যুগল, এটি নয়টি পদের সমাস। বাংলায়—সাধারণত বেশি পদের সমাস হয় না। তবে সঙ্গীত-রচনায় কখনও কখনও বহুপদ সমাসের ব্যবহার দেখা যায়।

নীলসিন্ধুজলধৌতচরণতল
অনিলবিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল
অম্বরচুম্বিতভাল হিমাচল
শুভ্রতুষারকিরীটিনী।

চলিত বাংলায় পদবহুল সমাস চলে না। তা চলিত বাংলার চলনবিরোধী। তবে অর্ধ-শতাব্দী-প্রাচীন প্রেসকর্নার (আ.বা.) বা সবুজ-লাল-নীল-পতাকা-হাতে (ছেলেমেয়েরা)—এধরনের প্রয়োগকে স্বাগত জানাতে বাধা নেই।

৩০.২ ■ সমাসে সন্ধি

তৎসম শব্দের সমাসে সমস্যমান পদে সন্ধির অবকাশ থাকলে সন্ধি করতেই হবে—সমাসে সন্ধির্নিত্যা। যেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্ঞানালোক (জ্ঞান + আলোক)

কিন্তু বাংলায় এই সন্ধি ঐচ্ছিক, প্রয়োজনে সন্ধি বর্জন করে হাইফেন দিয়ে যুক্ত করা যেতে পারে। যেমন

'জ্ঞান-আলোকের কিরণমালা'।

এইরকম জীবনেতিহাস না লিখে বাংলায় জীবন-ইতিহাস লেখা চলে। কিন্তু সে শ্বশুরালয়ে যাচ্ছে, এখানে শ্বশুর-আলয়ে যে চলবে না তা বলাই বাহুল্য। তার মানে সমাস করা না করা বাংলার বাগ্‌বিধির উপর নির্ভর করবে।

তার ভাইয়ের বৌ বাপের বাড়ি যাচ্ছে।

এখানে তার ভাই-বৌ বাপের বাড়ি যাচ্ছে বলাই বাগ্‌বিধিসম্মত। 'বাপের বাড়ি' আসলে সমাস-ই। অলুক সমাস, বাংলা পূর্বপদে বিভক্তি লোপ না করেই বহুক্ষেত্রে বাগ্‌বিধি, যেমন—গোরুরগাড়ি, কলে-ছাঁটা, কোলেপিঠে ইত্যাদি।

৩০.৩ ■ সমাসের শ্রেণীভেদ ও নামকরণের তাৎপর্য

সমাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—সমস্যমান পদদুটি কোথাও দুটি বিশেষ্যের সংযোগ, কোথাও তা বিশেষ্য-বিশেষণ ভাবাপন্ন, কোথাও তাদের একটি অব্যয়, কোথাও সমস্যমান পদদুটি নিজেদের অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কিছু বোঝায়। সমাসের এই সব বিভিন্নতা দেখে সমাসকে দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু, অব্যয়ীভাব ও বহুব্রীহি—প্রধানত এই ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

AMARBOI.COM

দ্বন্দ্ব

দ্বন্দ্ব মানে যুগ্ম বা জোড়া। শব্দটি নিজেই এই সমাসের বৈশিষ্ট্যের আভাস দেয়।

ও, এবং ইত্যাদি সংযোগমূলক অব্যয়ের দ্বারা পরস্পর অন্বিত দুই বা ততোধিক বিশেষ্যপদের প্রাধান্য যে-সমাসে অক্ষুণ্ণ থাকে তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে।

সংস্কৃত : এই সমাসে যে পদটি অপেক্ষাকৃত অল্পাক্ষর তা সাধারণত আগে বসে। ইষ্ট ও অনিষ্ট = ইষ্টানিষ্ট, গুরু ও শিষ্য = গুরুশিষ্য, পাপ ও পুণ্য = পাপপুণ্য, চর ও অচর = চরাচর, রাম ও লক্ষ্মণ = রামলক্ষ্মণ, এইরকম যাতায়াত, দেবদেবী, শুদ্ধ্যশুদ্ধি, লিখন-পঠন ইত্যাদি।

দুয়ের বেশি বিশেষ্য পদের দ্বন্দ্ব : সত্য-শিব-সুন্দর, নদী-গিরি-বন, ঘৃত-তৈল-তণ্ডুল, ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্‌ব্যোম, রূপরসশব্দগন্ধস্পর্শ ইত্যাদি।

বাংলা : ভাই ও বোন = ভাইবোন, এইরকম ভালমন্দ, দাসদাসী, জলহাওয়া, তেলনুন, বরকনে, আনাগোনা, উতোর-চাপান ইত্যাদি।

দুইয়ের বেশি পদে দ্বন্দ্ব—ইটকাঠচূনসুরকি, হাত-পা-নাক-কান, ডাল-ভাত-শাক-তরকারি ইত্যাদি।

কয়েকটি বিশিষ্ট দ্বন্দ্ব সমাস : অহঃ ও রাত্রি = অহোরাত্র, অহঃ ও নিশা = অহর্নিশ, জায়া ও পতি = দম্পতি, জম্পতি, জায়াপতি, দ্যৌঃ (স্বর্গ) ও পৃথিবী = দ্যাবাপৃথিবী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অলুক দ্বন্দ্ব

সংস্কৃতে অলুক দ্বন্দ্ব নেই। 'মাতাপিতরৌ' শব্দে 'মাতা' প্রথমা-বিভক্ত্যন্ত নয় 'ডা (আ) প্রত্যয়ান্ত।

বাংলায় : আগে ও পিছে = আগেপিছে ; এইরকম মায়েঝিয়ে, বুকেপিঠে, হাতেপায়ে, হাটেমাঠে, দুধেভাতে ইত্যাদি।

ইত্যাদি অর্থে দ্বন্দ্ব : সহচর ও অনুচর বা অনুকার শব্দের সঙ্গে একধরনের দ্বন্দ্বসমাস বাংলায় প্রচলিত। যেমন চড়চাপড়, কাপড়চোপড়, চুরিচামারি, অলিগলি, ঘুষঘাষ, তুকতাক ইত্যাদি।

এগুলোকে অবশ্য শব্দদ্বৈতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা চলে।

সমার্থক দ্বন্দ্ব

রাজাবাদশা, ডাক্তারবৈদ্য ঠাট্টামস্করা ইত্যাদি সমাসবদ্ধ পদে দেখা যায় সমস্যমান পদগুলি সমার্থক। এগুলির কোনওটিতেই সমস্যমান পদের কোনওটির অর্থই না বুঝিয়ে ব্যঞ্জনায় 'তজ্জাতীয়' বা 'সেইধরনের কিছু' এমন অর্থ বোঝায়। যেমন রাজাবাদশার অর্থ রাজার ন্যায় ব্যক্তিরা, ডাক্তারবৈদ্য বলতে বোঝায় বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসকসমূহ। তেমন ঠাট্টামস্করা মানে রসিকতার কথা। এই ধরনের সমস্তপদকে সমার্থক দ্বন্দ্ব বলা চলে। এই ধরনের আরও শব্দ : কাগজপত্র, হাটবাজার, কাজকর্ম, ভুলভ্রান্তি, জনমানব, মাথামুণ্ডু, শাকসব্জি, কোর্টকাছারি ইত্যাদি।

এগুলিকে সমাস না বলে সমার্থক শব্দদ্বৈত বলা যায়।

ইংরেজিতে hearth and home, bread and butter, fire and fury, kith and kin, মূলত দ্বন্দ্ব সমাসেরই উদাহরণ ; সংযোজক 'and' এখানে অলুপ্ত।

AMARBOI.COM

তৎপুরুষ

পূর্বপদে কর্ম প্রভৃতি কারকের বিভক্তি বা বিভক্তিস্থানীয় অনুসর্গযুক্ত পদের সঙ্গে অথবা সম্বন্ধপদের সঙ্গে সমাস হয়ে যদি পরপদের অর্থ-প্রাধান্য থাকে তাকে **তৎপুরুষ সমাস** বলে।

কর্মাদির নির্দিষ্ট বিভক্তি অনুযায়ী শ্রেণীগুলির নামকরণ করা হত, যেমন—দ্বিতীয়া বিভক্তির সঙ্গে পরপদের সমাসকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়ান্ত পদের সঙ্গে সমাসকে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস ইত্যাদি। কিন্তু এখন বিভক্তি অনুযায়ী নামকরণের পরিবর্তে কারক অনুযায়ী নামকরণ করা হচ্ছে। যেমন—কর্ম তৎপুরুষ, করণ তৎপুরুষ, সম্প্রদান তৎপুরুষ, অপাদান তৎপুরুষ ও অধিকরণ তৎপুরুষ। সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি নির্ধারিত বলে ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত শব্দের সঙ্গে পরপদের সমাস হলে ষষ্ঠী তৎপুরুষ বলা হত। এখন সম্বন্ধ তৎপুরুষ বলা হচ্ছে।

কর্ম তৎপুরুষ

সংস্কৃত : গত, আগত, শ্রিত, আশ্রিত, পন্ন, আপন্ন, প্রাপ্ত ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে এই সমাস হয় :—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিকে গত = ব্যক্তিগত, শরণকে আগত = শরণাগত, চরণকে আশ্রিত = চরণাশ্রিত, সঙ্গতিকে পন্ন = সঙ্গতিপন্ন, বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন, বয়ঃকে প্রাপ্ত = বয়ঃপ্রাপ্ত ইত্যাদি।

গত, আগত, শ্রিত পদের মূলে যথাক্রমে গম্, শ্রি, পদ্, আপ্ ইত্যাদি ধাতু আছে, তাই সংস্কৃতে শরণম্ আগত, চরণম্ আশ্রিত ইত্যাদি বলা হয়, বাংলাতেও এই ব্যাসবাক্যের অনুকরণে শরণকে, চরণকে বলা হয়। যদিও এভাবে বলাটা বাংলা বাগ্‌বিধিসম্মত নয়, বলতে ভাল লাগবে 'চরণে আশ্রিত'। সে ক্ষেত্রে কর্ম তৎপুরুষ না বলে অধিকরণ তৎপুরুষও বলা চলে।

ব্যাপ্তি অর্থে ক্ষণস্থায়ী, চিরস্থায়ী ইত্যাদি পদকেও এই সমাসের মধ্যে ধরা হয়।

'চির'কে ক্রিয়াবিশেষণও ধরা যেতে পারে। অর্ধমৃত (অর্ধরূপে মৃত), নিমরাজি (নিম বা অর্ধরূপে রাজি), ঘনসন্নিবিষ্ট ইত্যাদি সমস্তপদকেও এই সমাসের মধ্যে ধরা হয়।

কিন্তু ব্যাপ্তি বা ক্রিয়াবিশেষণকে সরাসরি কারক বলা যায় না বলে ব্যাপ্তিকর্ম বা ক্রিয়াবিশেষাত্মক কর্ম স্বীকার করে নিয়ে এদের কর্মতৎপুরুষের মধ্যে ফেলা চলে। সংস্কৃতে ব্যাপ্তি-অর্থে দ্বিতীয়া বিভক্তি নির্দিষ্ট ছিল বলে অনায়াসে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ বলা চলত। অর্ধমৃত ঘনসন্নিবিষ্ট প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃতে সুপ্‌সুপা বা সহসুপা সমাস বলে চিহ্নিত। যে-সব সমাসকে কোনও শ্রেণীতে ফেলা যায় না সেগুলোকে ওই সহসুপা শব্দের মধ্যে ফেলা হত। যেমন পূর্বং ভূতঃ = ভূতপূর্বঃ।

বাংলা : কাঠ (কর্ম) কাটা = কাঠকাটা, ঘর (কর্ম) ধোয়া = ঘরধোয়া, এইরকম ধানকাটা, হাঁড়িঠেলা, জলতোলা, রথদেখা, কলাবেচা, মাথাগোঁজা, মাথাখাওয়া, নিয়মমানা, ইত্যাদি।

ইংরেজিতে job-hunting, home-building, myth-making, job-oriented, country-wide, life-long ইত্যাদি কর্ম তৎপুরুষের উদাহরণ।

করণ তৎপুরুষ

সংস্কৃত : শ্রীদ্বারা যুক্ত = শ্রীযুক্ত, পদ দ্বারা দলিত = পদদলিত, বিনয় দ্বারা অবনত = বিনয়াবনত, গুণ দ্বারা সম্পন্ন = গুণসম্পন্ন ইত্যাদি এইসব উদাহরণ শ্রী, পদ, বিনয় ইত্যাদি পদে করণত্ব স্পষ্ট।

কিন্তু যেখানে পূর্বপদে করণত্ব নেই হেত্বর্থ বা ঊনার্থ আছে সেখানে তাকে করণ তৎপুরুষের গণ্ডিতে আনি কী করে ?

ছায়া দ্বারা শীতল = ছায়াশীতল এখানে 'দ্বারা' দিয়ে ব্যাসবাক্য লিখলেও ছায়া যে শীতলতার হেতু তা তো স্পষ্ট। তেমনি, তৃণশূন্য, তৃণহীন প্রভৃতি সমাসে সংস্কৃত মতে তৃণের করণত্ব স্বীকৃত নয়।

তাই করণ তৎপুরুষের মধ্যে এই সব সমাসকে অন্তর্ভুক্ত করতে হেত্বাত্মক করণ, ঊনার্থক করণ ইত্যাদি স্বীকার করে নিতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলা : ঢেঁকি দ্বারা ছাঁটা = ঢেঁকিছাঁটা, মন দ্বারা গড়া = মনগড়া, তেমনি মধুমাখা, লোহাপেটা, চিনিপাতা, পাতাছাওয়া (কুটির), ঝাঁটাপেটা ইত্যাদি 'পোয়াকম' শব্দটির—সুনীতিবাবু 'পোয়া'কে করণবাচক বলেছেন, কিন্তু 'কম' শব্দটিতে কোনও ধাতু নেই, তাই পোয়ার করণত্ব আসবে কী করে ? উনার্থক করণ ধরলে অবশ্য তা সম্ভব।

ইংরেজি hand-made, god-given, horse-driven, famine-stricken, wonder-struck ইত্যাদি করণ তৎপুরুষ।

সম্প্রদান তৎপুরুষ

দেবকে দত্ত = দেবদত্ত, কৃষ্ণকে সমর্পিত = কৃষ্ণসমর্পিত।

সম্প্রদান কারক স্বীকার না করলে এ সমাসকে কর্ম তৎপুরুষ বলতে হবে। ব্যাসবাক্য একই থাকবে।

উদ্দেশ্য বা নিমিত্ত তৎপুরুষ

সংস্কৃত : সম্প্রদান তৎপুরুষ না বলে এই ধরনের সমাসকে উদ্দেশ্য তৎপুরুষ বলা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ব্যাসবাক্য হবে, দেবের উদ্দেশ্যে দত্ত, কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সমর্পিত।

যূপের জন্য কাষ্ঠ = যূপকাষ্ঠ, নিমিত্ত তৎপুরুষ। এই রকম শিশুবিভাগ, দেশভক্তি, তীর্থযাত্রা, যাত্রীনিবাস, সেবাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

বাংলা : ডাকের জন্য মাশুল = ডাকমাশুল, এইরকম, জীয়নকাঠি, রান্নাঘর, মেয়েস্কুল, মড়াকান্না, জীবনবীমা ইত্যাদি।

ইংরেজি cooking-stove, looking-glass, store-house, drinking-water, writing-desk ইত্যাদি এই সমাসের অন্তর্গত।

AMARBOI.COM

অপাদান তৎপুরুষ

সংস্কৃত : লোক থেকে ভয় = লোকভয়, স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট = স্বর্গভ্রষ্ট, এইরকম পদচ্যুত, ঋণমুক্ত, তজ্জাত ইত্যাদি।

বাংলা : বিলাত থেকে ফেরত = বিলাতফেরত। এইরকম জেলখালাস, বোঁটাখসা (আম), দলছুট, চাকভাঙা ইত্যাদি।

ইংরেজি woman-born কে অপাদান তৎপুরুষ বলা চলে।

অধিকরণ তৎপুরুষ

সংস্কৃত : বনে জাত = বনজাত, বিশ্বে বিখ্যাত = বিশ্ববিখ্যাত, ধ্যানে মগ্ন = ধ্যানমগ্ন। এইরকম পাঠরত, পরিহাসপটু, রণনিপুণ ইত্যাদি।

বাংলা : বাক্সে বন্দি = বাক্সবন্দি, রাতে কানা = রাতকানা। এইরকম কোণঠাসা, ঘরপাতা (দই), গোলাভরা (ধান), জলবন্দি, ঘাড়ধাক্কা, মুখ-ফাজিল।

স্থল বিশেষে পূর্ববর্তী পদের পরনিপাত হয়, যেমন পূর্বে ভূত = ভূতপূর্ব, পূর্বে দৃষ্ট = দৃষ্টপূর্ব। এইরকম অনাস্বাদিতপূর্ব, অনুচ্চারিতপূর্ব ইত্যাদি।

ইংরেজি bed-ridden, night-show, city-pent, home-spun ইত্যাদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধিকরণ তৎপুরুষের সগোত্র।

সম্বন্ধ তৎপুরুষ

নদীর তট = নদীতট, গণের শিক্ষা = গণশিক্ষা। এইরকম রাজপুত্র, পণ্ডিতমহল, মেঘমালা, তদন্তাধীন, তত্ত্বাবধান, পদোন্নতি ইত্যাদি।
ছাগদুগ্ধ = ছাগীর দুগ্ধ। এখানে জাতিবাচক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গের জায়গায় পুংলিঙ্গ হয়েছে)।
ধনিগণ, গুণিগণ (ইন্ ভাগান্ত ধনিন্ শব্দের 'ন্' লোপ)।
ভ্রাতৃগণ (ভ্রাতৃ = প্রতিপদিক), তাই ভ্রাতাগণ, শ্রোতৃবর্গ না লেখাই সমীচীন ইত্যাদি।
'হৃদয়' শব্দ সমাসের পূর্বপদে 'হৃদ্' হয়ে যায়। যেমন হৃদয়ের রোগ (diseases of the heart) = হৃদ্‌রোগ। এই হৃদ্-এর হস্ অবশ্যই বজায় থাকবে। কিন্তু দেখছি হৃদরোগ লেখা হচ্ছে। (আ. বা. ১৭, ১২. ৯৩)
কালী, দেবী, চণ্ডী, ষষ্ঠী ইত্যাদি শব্দের পর 'দাস' শব্দ থাকলে নাম বোঝাতে সমাসে পূর্বপদের দীর্ঘ-ঈকার হ্রস্ব-কার হয়ে যায়। যেমন—কালিদাস, চণ্ডিদাস, দেবিদাস, ষষ্ঠিদাস ইত্যাদি।
উপাসক অর্থে 'ঈ' বজায় থাকবে কালীদাস, চণ্ডীদাস ইত্যাদি।
বাংলা : বটের তলা = বটতলা, ঠাকুরের পো = ঠাকুরপো, এইরকম শ্বশুরবাড়ি, ধানক্ষেত, মৌচাক, ভাইঝি ইত্যাদি।
সম্বন্ধ তৎপুরুষে শ্রেষ্ঠবাচক রাজন্ শব্দের পূর্বনিপাত হয় :
পথের রাজা = রাজপথ, হংসের রাজা = রাজহংস, এইরকম রাজমিস্ত্রী।
সম্বন্ধ তৎপুরুষ একদেশবাচক পদের সঙ্গে যে সমাস হয় তাকে একদেশী সম্বন্ধ তৎপুরুষ অথবা একদেশী সমাস বলে। কায়ের পূর্ব (পূর্বভাগ) = পূর্বকায়, এইরকম, পূর্বাহ্ণ, মধ্যরাত্রি, মাঝদরিয়া ইত্যাদি।
ইংরেজি earring, wayside, railway ইত্যাদি সম্বন্ধ তৎপুরুষের উদাহরণ।

নঞ্ তৎপুরুষ

নঞ্ এই না-বাচক অব্যয়-উপসর্গের সঙ্গে বিশেষ্য বা বিশেষণের যে তৎপুরুষ সমাস তাকে নঞ্ তৎপুরুষ সমাস বলে।
ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকলে নঞের জায়গায় অ হয়, স্বরবর্ণ থাকলে অন্ হয়, যেমন নয় ধর্ম = অধর্ম, নয় স্থির = অস্থির, নয় আদর = অনাদর, নয় অলস = অনলস, এইরকম অনেক, অনভ্যাস।
'নঞ্' এর জায়গায় 'ন'ও হয়। যেমন ন অতিশীতোষ্ণ = নাতিশীতোষ্ণ। ন অতিদীর্ঘ = নাতিদীর্ঘ ইত্যাদি।
বাংলায় 'ন' এর জায়গায় 'অ', আ, অনা, না, নাই ইত্যাদি হয়, যেমন—
নয় কাজ = অকাজ (ন > অ), নয় (কুৎসিত) গাছ = আগাছা (ন > আ), নয় দৃষ্টি = অনাদৃষ্টি (ন > অনা), নয় জানা = নাজানা (নয় > না), নয় মামা = নাইমামা (ন > নাই) ইত্যাদি।
হিন্দিতে 'ন' 'অন' হয়েছে : অনকহা, অনগিনত, অনজান, অনপঢ়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনপচ ইত্যাদি।

আবার ফারসির প্রভাবে 'না'-ও হয়েছে। না-মঞ্জুর, নারাজ ইত্যাদি। ইংরেজি উদাহরণ unborn, incorrect, non-paying ইত্যাদি।

উপপদ তৎপুরুষ

সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়যুক্ত পদের আগে যেমন উপসর্গ বসে, তেমনি অন্য শব্দও বসে। যে কৃদন্ত পদ একাকী ব্যবহৃত হতে পারে না তার পূর্ববর্তী পদকে 'উপপদ' বলে। এই উপপদের সঙ্গে ওই ধরনের কৃদন্ত পদের যে সমাস তাকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন, অগ্রে গমন করে যে=অগ্রগামী। এখানে 'গামী'র স্বতন্ত্র প্রয়োগ নাই। অগ্রে গামী বললে চলবে না, ব্যাসবাক্য হবে অগ্রে গমন করে যে।

তেমনি কুম্ভ করে যে=কুম্ভকার। এইরকম, সত্যবাদী, ব্রহ্মচারী, জলজ (জলে জন্মে যা), পঙ্কজ, জলদ, (জল দেয় যা), মধুপ (মধু পান করে যে), নৃপ (নৃকে পালন করে যে) ইত্যাদি।

উদক ধারণ করে যে=উদধি (উদক>উদ),

বাংলা : পকেট মারে যে=পকেটমার, এই রকম হালুইকর, বাস্তুহারা, বর্ণচোরা, সাঁঝঘুমনি, পাড়াবেড়ানি, কান্নেখেকো (ঘুড়ি) ইত্যাদি।

ইংরেজি উদাহরণ : wood-cutter, man-eater, show-maker, heart-rending, pick-pocket ইত্যাদি।

AMARBOI.COM

প্রাদিতৎ পুরুষ

প্র প্রভৃতি উপসর্গ বা আবিঃ প্রভৃতি অব্যয়ের সঙ্গে কৃদন্ত বা নামপদের সমাসকে প্রাদিতৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন প্র (প্রগত) পিতামহ=প্রপিতামহ, অনু (পশ্চাৎ) তাপ=অনুতাপ, এইরকম, প্রভাত, অতিমানব, উপাচার্য, স্বয়ংসিদ্ধ, আবির্ভাব, তিরোভাব ইত্যাদি।

ইংরেজি উদাহরণ : by-word, under-tone, upland, inland, after-glow, fore-father, pretest ইত্যাদি।

অলুক তৎপুরুষ

যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লুপ্ত হয় না তাকে অলুক তৎপুরুষ বলে।

সংস্কৃত : ভ্রাতুঃ পুত্র=ভ্রাতুষ্পুত্র, যুধি স্থির=যুধিষ্ঠির, এইরকম খেচর, অন্তেবাসী ইত্যাদি।

বাংলা : গায়েপড়া, হাতেগড়া, গোরুরগাড়ি, হাতেকাটা, হাতেগরম ইত্যাদি।

ইংরেজি উদাহরণ : Sales-man, batsman, stone's-throw, Cat's-Paw, heart's-ease, man-of-war, man-at-arms, dog-in-the manger. ইত্যাদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্মধারয়

'কর্ম' শব্দের অর্থ 'ভেদকর্ম' অর্থাৎ যা নামপদকে অন্যকিছু থেকে পৃথক্ করে বা বিশেষিত করে, আর ধারয়=ধারক অর্থাৎ নির্ধারক। অর্থাৎ যা ভেদকর্ম-সম্পাদক তা-ই কর্মধারয় (ধারয়তি ইতি ধারয়:, ধারকো বা), কীরকম আকাশ ? লাল, সাদা না নীল ? বলা হল 'নীলাকাশ' অর্থাৎ আকাশকে নীল শব্দটি বিশেষিত করল। 'গুরুদেব' পদে দুটোই বিশেষ্য, কিন্তু পরপদটিই এখানে বিশেষণস্থানীয়। দেব=দেবোপম। আবার যখন নীললোহিত, অম্লমধুর বলছি তখন পূর্ব বিশেষণটি পরবর্তী বিশেষণের বৈশিষ্ট্যদ্যোতক হয়ে উঠছে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, কর্মধারয় নামটিই সমাসের স্বরূপের আভাস দিচ্ছে।

তৎপুরুষের সমাসের মতো কর্মধারয় সমাসেও পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়। বস্তুত কর্মধারয় তৎপুরুষের অন্তর্ভুক্ত। অন্য তৎপুরুষে সমস্যমান পদ-দুটি ব্যধিকরণ অর্থাৎ ভিন্নবিভক্তিক। আর কর্মধারয়ে সমবিভক্তিক, অর্থাৎ বিশেষণ-বিশেষ্য ভাবাপন্ন। এই জন্যে একে প্রথমাতৎপুরুষও বলা চলে।

যে-তৎপুরুষ সমাসে সমস্যমান পদদুটি সমবিভক্তিক অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবাপন্ন অথবা অভেদ সম্বন্ধে একার্থপ্রতিপাদক, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে।

এই আলোচনার ভিত্তিতে সাধারণ কর্মধারয় সমাসকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : ক) বিশেষণে বিশেষ্যে খ) বিশেষ্যে বিশেষ্যে গ) বিশেষণে বিশেষণে।

www.amarboi.com

ক) বিশেষণ+বিশেষ্য :

সংস্কৃত : মহান জন=মহাজন, পুণ্যা ভূমি=পুণ্যভূমি, এইরকম মহাষ্টমী, পরমেশ্বর, নবপল্লব, পরমাত্মা, ইত্যাদি।

সংস্কৃতে কর্মধারয় সমাসে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণটি সাধারণ বিশেষণের (ভাষিত পুংস্ক) রূপ নেয়। যেমন পুণ্যা ভূমিঃ=পুণ্যভূমিঃ, তপ্তা স্থালী=তপ্তস্থালী। কিন্তু পরা কাষ্ঠা=পরাকাষ্ঠা ('পরকাষ্ঠা' নয়)।

বাংলা : কাঁচা কলা=কাঁচকলা, বাঁকা নল=বাঁকনল এইরকম, ভাঙাহাট, খাসতালুক, কানাকড়ি, তুরুকজবাব ইত্যাদি।

ইংরেজি উদাহরণ : noble-man, strong-hold, free-trade, humming-bird, finishing-stroke etc.

বিশেষণ অনেক সময় পরে বসে, যেমন, ভাজা বেগুন=বেগুনভাজা, বাটা হলুদ=হলুদবাটা।

খ) বিশেষ্য+বিশেষ্য :

(একই বস্তু বা একই ব্যক্তিকে বোঝাতে)

সংস্কৃত : যিনি দেব তিনিই ঋষি=দেবর্ষি,
যিনি পিতা তিনিই দেব=পিতৃদেব,
এইরকম ভূলোক, গণ্ডদেশ, গঙ্গানদী, মথুরাপুরী, কাশীধাম, পণ্ডিতজন ইত্যাদি।

বাংলা : যিনি গিন্নি তিনিই মা=গিন্নিমা, যিনি দাদা তিনিই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠাকুর=দাদাঠাকুর।

এইরকম ডাক্তারবাবু, খাঁসাহেব, ঠাকুরমশাই, গোলাপফুল, পণ্ডিতমশাই ইত্যাদি।

ইংরেজি উদাহরণ : headmaster-secretary, surgeon-super, producer-director ইত্যাদি।

গ) **বিশেষণ+বিশেষণ**

সংস্কৃত : কঠিনও বটে কোমলও বটে, অথবা যা কঠিন তা-ই কোমল, অথবা কঠিন হয়েও কোমল=কঠিনকোমল। এইরকম হিংস্রকুটিল, অম্লমধুর, দত্তাপহৃত, সুপ্তোত্থিত (পূর্বে সুপ্ত, পরে উত্থিত) ইত্যাদি।

রবীন্দ্রপ্রয়োগ : উদার-উদাসীন, করুণ-নিপুণ, গূঢ়গম্ভীর ইত্যাদি।

বাংলা : কাঁচা তবু মিঠে=কাঁচামিঠে, চালাকচতুর, মিঠেকড়া ইত্যাদি।

ইংরেজি : slow and steady, safe and sound, hale and hearty ইত্যাদি পদবন্ধনকে এই বিভাগে আনা যায়, দুটি বিশেষণের মাঝখানে 'and' থাকলেও মূলত এ-ধরনের শব্দযুগ্মকে compound বলা যায়।

মধ্যপদলোপী কর্মধারয় :

যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের ব্যাখ্যামূলক পদ বা পদগুচ্ছ লুপ্ত হয় তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় বলে, যেমন,

সংস্কৃত : ভিক্ষালব্ধ অন্ন=ভিক্ষান্ন, অশ্বারোহী সৈন্য=অশ্বসৈন্য, আকাশপথে চালিত বাণী=আকাশবাণী, ষট্ অধিক দশ=ষোড়শ, দ্বি-অধিক দশ=দ্বাদশ ইত্যাদি।

বাংলা : দমকল, ঘরজামাই, সিঁদুরকৌটো, জলছবি, শুচিবাই ইত্যাদি।

(আ. বা. পত্রিকাতে ২০. ১২. ৯৩ তারিখে 'সুচিবায়ুগ্রস্ততা'য় 'শুচি' 'সুচি' হল কী করে তা ভাববার বিষয়)।

অর্থ বোঝাতে অন্য শব্দ আনতে হবে ইংরেজির horse-race, backbite, wine-merchnt, boatman, ইত্যাদি শব্দে। এগুলোকে মধ্যপদলোপীর সগোত্র বলা চলে।

ক) উপমান কর্মধারয় :

উপমানের সঙ্গে গুণবাচক শব্দের সমাসকে উপমান কর্মধারয় বলে :

সংস্কৃত : তুষারের মতো ধবল=তুষারধবল, ঘনের মতো শ্যাম=ঘনশ্যাম, এইরকম শৈলোন্নত, দূর্বাদলশ্যাম।

বাংলা : শশের মতো ব্যস্ত=শশব্যস্ত, মিশির মতো কালো=মিশকালো, দুধের মতো সাদা=দুধসাদা, ফুটির মতো ফাটা=ফুটিফাটা, কাজলের মতো কালো=কাজলকালো।

ইংরেজি উদাহরণ : snow-white, blood-red, coal-black, sky-blue, ice-cold ইত্যাদি।

খ) উপমিত কর্মধারয়

উপমেয়ের সঙ্গে উপমান পদের যে সমাস তাকে উপমিত কর্মধারয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাস বলে।

পুরুষ সিংহের ন্যায়=পুরুষসিংহ

এইরকম মুখপদ্ম, নরসিংহ, ইত্যাদি।

বৌরানি, বৌদিমণি, খোকনসোনা ইত্যাদি শব্দকে সাধারণ কর্মধারয়ের মধ্যে না ফেলে উপমিত কর্মধারয় সমাসের মধ্যে আনাই ভালো। কারণ এখানে উপমার ভাবটি স্পষ্ট।

গ) রূপক কর্মধারয় সমাস :

উপমেয় ও উপমানের অভেদ কল্পনা করে যে সমাস তাকে রূপক কর্মধারয় সমাস বলে,

সংস্কৃত : জ্ঞানরূপ আলোক=জ্ঞানালোক, বিষাদরূপ সিন্ধু=বিষাদসিন্ধু, এইরকম শোকসাগর, ভবনদী, শোকানল, দেহপিঞ্জর ইত্যাদি।

বাংলা : প্রাণ রূপ পাখি=প্রাণপাখি, এইরকম আঁখিপাখি, চাঁদমুখ, মনমাঝি ইত্যাদি।

ইংরেজি উদাহরণ : moon-face, eye-window etc.

একই সমাসবদ্ধ শব্দ উপমিত কর্মধারয় ও রূপক কর্মধারয় সমাস হতে পারে। প্রয়োগের উপর তা নির্ভর করে। যেমন, সেই 'পুরুষসিংহকে নমস্কার' এখানে পুরুষসিংহে উপমিত কর্মধারয়, কারণ—অভেদার্থ এখানে নেই। 'সিংহ' এমনিতে প্রণম্য নয়, কিন্তু পুরুষসিংহ গর্জন করে উঠল—এখানে পুরুষসিংহে রূপককর্মধারয়, কারণ সিংহ গর্জন করে থাকে, পুরুষ এখানে সিংহের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গিয়েছে।

AMARBOI.COM

দ্বিগু

যে-সমাসে প্রথম পদটি সংখ্যাবাচক হয় এবং সমস্তপদটি সমাহার বা সমষ্টি অর্থ প্রকাশ করে তাকে দ্বিগু সমাস বলে। দ্বি (দুই) গো-র সমাহার=দ্বিগু। এই শব্দটির থেকেই এই সমাসের নাম হয়েছে।

সংস্কৃত : পঞ্চ ভূতের সমাহার=পঞ্চভূত, পঞ্চ বটের সমাহার=পঞ্চবটী, এইরকম নবান্ন, ত্রিভুবন, পঞ্চশতী, পঞ্চরাত্র ইত্যাদি।

বাংলা : সপ্ত অহের সমাহার=সপ্তাহ, এইরকম তেমাথা, চৌমোহনি।

দ্বি, ত্রি, পঞ্চ ইত্যাদি সংখ্যাবাচক বিশেষণ। দ্বিগু সমাসে এই সংখ্যাবাচক বিশেষণের সঙ্গে বিশেষ্যের সমাস হচ্ছে, তাই এ সমাস কর্মধারয়ের সগোত্র।

অব্যয়ীভাব

যে-সমাসে পূর্বপদে অব্যয় থাকে এবং ওই অব্যয়ের অর্থই প্রাধান্য পায় তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে।

এই সমাসে সমাসবদ্ধ পদটি অব্যয় হয়ে যায় এবং ক্রিয়াবিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সমীপ অর্থে। কূলের সমীপে=উপকূল

অক্ষির সমীপে=প্রত্যক্ষ

সংস্কৃতে প্রয়োগ ছিল :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপকূলং তিষ্ঠতি বৃক্ষঃ। এখানে উপকূলং ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয়।

কিন্তু বাংলায় উপকূল বিশেষ্য। 'প্রত্যক্ষ' বিশেষণস্থানীয় (প্রত্যক্ষ পরিচয়)।

বীপ্সা অর্থে—দিনে দিনে=প্রতিদিন,

ক্ষণে ক্ষণে=অনুক্ষণ।

সংস্কৃতের মতো বাংলাতেও এগুলি বিশেষণস্থানীয় (প্রত্যক্ষ পরিচয়)।

অনতিক্রম অর্থে—শক্তিকে অতিক্রম না করে=যথাশক্তি। এইরকম, যথাসাধ্য, যথেচ্ছ, যথেষ্ট ইত্যাদি।

এইগুলিতেও বাংলায় অব্যয়ত্ব এবং ক্রিয়াবিশেষণত্ব বজায় আছে।

আদি বা অভিবিধি অর্থে—

জন্ম হইতে=আজন্ম

সমুদ্র পর্যন্ত=আসমুদ্র। এইরকম আজানু, আপাদমস্তক, আশৈশব ইত্যাদি।

বাংলাতে এগুলির ব্যবহার ক্রিয়াবিশেষণাত্মক।

অভাব অর্থে—ভিক্ষার অভাব=দুর্ভিক্ষ।

বাংলায় দুর্ভিক্ষ বিশেষ্য, অব্যয়ীভাব সমাসের যা বৈশিষ্ট্য তা এখানে নেই, তেমনি নেই অনুগমন (পশ্চাদর্থে),

প্রতিমূর্তি (সাদৃশ্যার্থে),

উপগ্রহ (ক্ষুদ্রার্থে) ইত্যাদি শব্দে। এগুলো বাংলায় বিশেষ্য পদ।

বাংলা হররোজ, ভরপেট, জনপ্রতি, সটান ইত্যাদি শব্দে অব্যয়ীভাবের বৈশিষ্ট্য বজায় আছে। এগুলোর ব্যবহার ক্রিয়াবিশেষণের মতো। যে সব শব্দ বিশেষ্য (উপকূল, প্রতিমূর্তি, উপগ্রহ ইত্যাদি) সেগুলিকে প্রাদি সমাসের অন্তর্ভুক্ত করা চলে।

AMARBOI.COM

বহুব্রীহি

বহুব্রীহি নামটাতেই আছে এর স্বরূপের আভাস। 'ব্রীহি' মানে ধান। 'বহুব্রীহি' মানে 'বহু ধান' নয় 'বহু ধান আছে যার এমন কেউ', অর্থাৎ সম্পন্ন কোনও মানুষ। যে-সমাসে সমস্যমান পদের দুইটির কোনওটির অর্থ না বুঝিয়ে অতিরিক্ত অন্য কোনও অর্থ বোঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে।

সমানাধিকরণ বহুব্রীহি

যে বহুব্রীহি সমাসে সমস্যমান দুটি পদই সম-বিভক্তিক অর্থাৎ বিশেষণ-বিশেষ্য ভাবাপন্ন তাকে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি বলে।

সংস্কৃত : পীত অম্বর যার=পীতাম্বর, দশ আনন যার দশানন। মহান আশয় যার=মহাশয়। নদী মাতা যার=নদীমাতৃক, অল্প বয়স যার=অল্পবয়স্ক, প্রোষিত ভর্তা যার=প্রোষিতভর্তৃকা, সৎ অর্থ যার=সদর্থক ইত্যাদি।

শেষের তিনটি উদাহরণে সমাসান্ত 'ক' প্রত্যয় হয়েছে। (সমাসান্ত প্রত্যয় দ্রষ্টব্য।) সংস্কৃতে ব্যাসবাক্যের স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ পুংলিঙ্গের মতো হবে সমস্ত পদে। এই কারণেই যুবতী জায়া যার=যুবজানি। এইরকম দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যার=দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কৃত বিদ্যা যৎকর্তৃক=কৃতবিদ্য, হত আশা যার=হতাশ, বীত স্পৃহা যার=বীতস্পৃহ, ভগ্ন শাখা যার=ভগ্নশাখ (বৃক্ষ)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লক্ষণীয় স্ত্রীলিঙ্গ আ-কারান্ত শব্দ বহুব্রীহি সমাসের শেষে থাকলে স্ত্রীলিঙ্গ না বোঝালে তা 'অ'-কারান্ত হয়, কিন্তু কর্মধারয় সমাস হলে এই-আ-কার বজায় থাকবে : ভগ্ন শাখা=ভগ্নশাখা, কিন্তু ভগ্ন শাখা যার=ভগ্নশাখ (বহুব্রীহি)।

বাংলা : এক গোঁ যার=একগুঁয়ে, লাল পাড় যার লালপেড়ে (শাড়ি), দুটি নল যার=দোনলা, মুখ-আলগা, বারফট্টকা, খ্যাঙ্‌রাগুঁপো, বরাখুরে, একঘরে, নাদাপেটা ইত্যাদি।

[এইসব উদাহরণে 'এ' ও 'আ' সমাসান্ত প্রত্যয় হয়েছে। সমাসান্ত প্রত্যয় দ্রষ্টব্য।]

ইংরেজি উদাহরণ : one-eyed, noble-minded, double-faced, whole-hearted ইত্যাদি।

বিশেষণ শব্দটি অনেকসময় পরে বসে :

ধৃত নদীজপমালা যার দ্বারা=নদীজপমালাধৃত

পরিহিত শিরস্ত্রাণ যার=শিরস্ত্রাণপরিহিত

ঝোলা ল্যাজ যার=ল্যাজঝোলা। ছন্ন মতি যার=মতিচ্ছন্ন।

ব্যধিকরণ বহুব্রীহি :

বিভিন্ন কারকের দুটি বিশেষ্য পদে (একটিতে কর্তৃবাচক অপরটিতে অধিকরণ কারক) যে-সমাস হয় তাকে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি বলে।

সংস্কৃত : বীণা পাণিতে যার=বীণাপাণি,

আশীতে বিষ যার=আশীবিষ (সাপ),

পদ্ম নাভিতে যার=পদ্মনাভ (সমাসান্ত 'অ' প্রত্যয়), এইরকম দণ্ডপাণি, শূলপাণি, পদ্মনাভ ইত্যাদি।

বহুব্রীহি সমাসে ধর্ম শব্দ পরে থাকলে 'অন্' প্রত্যয় হয় : সমান ধর্ম যার=সমানধর্মা বা সমধর্মা (<সমধর্মন্), তবে বাংলায় সমধর্মী ও বিধর্মী শব্দই বেশি চলে। এই দুটি শব্দ ইন্ প্রত্যয় যোগে গঠিত (সমধর্ম+ইন্) হতেই পারে।

'বন্ধু' অর্থে সুহৃদ (শোভন হৃদয় যার : হৃদয়>হৃদ্), অন্য অর্থে 'সুহৃদয়'।

বাংলা : পিছুতে পা যার=পিছপা, গোঁফে খেজুর যার=গোঁফখেজুরে (সমাসান্ত 'এ' প্রত্যয়) অনেক সময় অধিকরণ পদটির বিভক্তি লুপ্ত হয় না, ছড়ি হাতে যার=ছড়িহাতে, চাদর গলায় যার=চাদরগলায় (বাবুটি), চশমা নাকে যার=চশমানাকে, গামছা-কাঁধে ইত্যাদি।

মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি

যে বহুব্রীহি সমাসে মাঝখানকার পদ লোপ পায় তাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি বলে।

গরুড় অঙ্কিত ধ্বজা যার=গরুড়ধ্বজ (বিষ্ণু),

বিশ্বব্যাপী কেতু যার=বিশ্বকেতু (অনিরুদ্ধ),

গজের মতো আনন যার=গজানন,

চিরুনির মতো দাঁত যার=চিরুনদাঁতি, এইরকম বিড়ালচোখো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুতোমচোখী, নাদাপেটা ইত্যাদি।

এইরকম ধর্মঘট, (ধর্মপ্রতিষ্ঠানার্থে ঘটস্থাপন যাতে), ভাইফোঁটা, বৌভাত ইত্যাদি।

পরবর্তী উদাহরণগুলিতে উপমা আছে বলে এগুলিকে **উপমাত্মক** বহুব্রীহিও বলা যায়।

শেষপদলোপী বহুব্রীহি

বিশগজ দৈর্ঘ্য যার=বিশগজি, দশ মণ ওজন যার=দশমণি ইত্যাদি।

শেষপদলোপী বহুব্রীহিও মধ্যপদলোপী নামে চলে।

নঞ্ বহুব্রীহি বা নঞর্থক বহুব্রীহি

নঞর্থক কোনও অব্যয়ের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস তাকে নঞ্‌বহুব্রীহি বা নঞর্থক বহুব্রীহি বলে :

সংস্কৃত : নাই বোধ যার=অবোধ, নির্বোধ, নাই হিংসা যার=অহিংস, নাই অন্তর যাতে=নিরন্তর, নাই সীমা যার=অসীম, নিঃসীম, নাই উদ্বেগ যার=নিরুদ্বেগ, নাই দয়া যার=নির্দয়। এইরকম নীরস, নিরপেক্ষ, নিরক্ষর, নিস্তরঙ্গ, অতন্দ্র, বিশ্রী, অনাদি, অসীম ইত্যাদি।

নির্ উপসর্গটি নঞর্থক। বহুব্রীহি সমাসেই তার প্রয়োগ হয়, তৎপুরুষে নয়। কিন্তু অনাসক্ত, অনুদ্বিগ্ন অনুৎসুক ইত্যাদি শব্দকে যথাক্রমে নিরাসক্ত, নিরুদ্বিগ্ন, নিরুৎসুক, ইত্যাদি লেখা হয়। এগুলো বাংলায় স্বীকার করে নেওয়াই ভাল। সংস্কৃতেও এ ধরনের প্রয়োগ দেখা যায়।

বাংলা : নাই বুঝ যার=অবুঝ, নাই সাড়া যাতে=অসাড়, নাই খুঁত যাতে=নিখুঁত, নাই হুঁশ যার=বেহুঁশ, নাই সুর যাতে=বেসুরো। এইরকম নিলাজ, নিদন্ত, নিখাদ, নাহক ইত্যাদি।

ইংরেজি উদাহরণ : non-sense (rhyme), no-meal (day) etc.

সহার্থক বহুব্রীহি

সহার্থক পূর্বপদের সঙ্গে বিশেষ্য উত্তরপদের যে বহুব্রীহি সমাস হয় তাকে সহার্থক বহুব্রীহি বলে।

সংস্কৃত : প্রসঙ্গের সঙ্গে বর্তমান=সপ্রসঙ্গ, ফলের সঙ্গে বর্তমান=সফল (সহ>স) বান্ধবের সঙ্গে বর্তমান=সবান্ধব, শঙ্কার সঙ্গে বর্তমান=সশঙ্ক, স্ত্রীর সঙ্গে বর্তমান=সস্ত্রীক, অর্থের সঙ্গে বর্তমান=সার্থক, সহ (সমান) উদর যার=সহোদর, সোদর (স+উদর), ক্ষীর উদক যাতে=ক্ষীরোদ (উদক>উদ)।

ব্যতিহার বহুব্রীহি

পারস্পরিক ক্রিয়া বোঝালে একই বিশেষ্যপদের পুনরুক্তিতে যে বহুব্রীহি সমাস হয় তাকে ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস বলে। সাধারণত সমস্যমান পদের প্রথমটিতে 'আ' এবং শেষেরটি 'ই' হয়। বাংলায় 'আ' 'ও'তেও রূপান্তরিত হতে পারে।

সংস্কৃত : কেশে কেশে আকর্ষণ করে যে যুদ্ধ=কেশাকেশি, দণ্ডে দণ্ডে যে যুদ্ধ=দণ্ডাদণ্ডি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলা : লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ=লাঠালাঠি, হাতে হাতে যে যুদ্ধ=হাতাহাতি , তেমনি ঘুষোঘুষি, চুলোচুলি, মুঠোমুঠি ঠ্যাঙাঠেঙি, হানাহানি ইত্যাদি।

শুধু যুদ্ধ নয় অন্যান্য অর্থেও ব্যতিহার বহুব্রীহি দেখা যায় (হ্যালহেডের ভাষায় 'implying cooperation' or 'mutual opposition')। কানে কানে যে কথা=কানাকানি, কোলে কোলে যে মিলন=কোলাকুলি।

ইংরেজি : hand-to-hand, face-to-face, tete-a-tete ইত্যাদি শব্দে ব্যতিহার বহুব্রীহির সুর আছে।

রাতারাতি, ঠেলাঠেলি, দৌড়োদৌড়ি, গড়াগড়ি, ইত্যাদিকে ব্যতিহার বহুব্রীহি না বলে, শব্দদ্বৈতের উদাহরণ হিসেবেই দেখা উচিত।

অলুক বহুব্রীহি

যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদের বা পরপদের বিভক্তির লোপ হয় না তাকে অলুক বহুব্রীহি সমাস বলে, যেমন,

গায়েহলুদ=গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে, হাতেখড়ি=হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে। চশমা নাকে যার=চশমানাকে।

৩০.৪ ■ নিত্যসমাস

যে-সমাসে সমস্যমান পদগুলি নিত্যই (=সর্বদাই) সমাসবদ্ধ থাকে তাকে নিত্যসমাস বলে। যে নিত্যসমাসে ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্য হয় না তাকে **অবিগ্রহ নিত্য** বলে, যেমন কৃষ্ণসর্প। এটি বিশেষ একটি সর্পপ্রজাতি। ব্যাসবাক্যে তার অর্থ অলভ্য। এইরকম, নাম হিসেবে কালিদাস বা ষষ্ঠিদাসও তাই। 'শিয়ালকাঁটা'ও অবিগ্রহ, শিয়ালের সঙ্গে কাঁটার কোনও সম্পর্ক নেই।

যে নিত্যসমাসে ব্যাসবাক্য করতে সমস্যমান পদের বাইরে কোনও পদের আশ্রয় নিতে হয় তাকে অ-স্বপদবিগ্রহ নিত্যসমাস বলে, যেমন 'দেশান্তর' পদটি ভাঙতে গেলে 'দেশের অন্তর' বললে চলবে না, বলতে হবে অন্য দেশ, এমনি মতান্তর, গ্রামান্তর ইত্যাদি। তেমনি জলমাত্র=কেবল জল, ফেননিভ=ফেনের ন্যায়, কুন্দসন্নিভ=কুন্দের ন্যায় ইত্যাদি।

৩০.৫ ■ মিশ্রসমাস

দুয়ের বেশি পদে সমাস হলেই একাধিক সমাসের নিয়ম সেখানে কাজ করবে। এই বহুপদময় সমাসকে আমরা মিশ্রসমাস বলতে পারি।

দ্বারলগ্নকর্ণ। দ্বারে লগ্ন=দ্বারলগ্ন, অধিকরণতৎপুরুষ। দ্বারে লগ্ন কর্ণ যার, বহুব্রীহি। শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিতযামিনী॥ শুভ্র জ্যোৎস্না=শুভ্রজ্যোৎস্না, কর্মধারয়। তাতে পুলকিত=শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিত, করণতৎ। সেইরকম যামিনী=কর্মধারয়। এইরকম নতনেত্রপাত, ভুবনমনমোহিনী, মৃত্যুতরণতীর্থ, আত্মজাতিমাংসলুব্ধ, শুভ্রতুষারকিরীটিনী, উচ্ছলজলধিতরঙ্গ, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য ইত্যাদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবন যৌবন ধন মান পদবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সমাস না করে পৃথক পৃথক ভাবে পদগুলি লিখেছেন। সমাস করলে তা দ্বন্দ্ব সমাসের মধ্যে পড়ত, মিশ্রসমাস নয় ; হীরামুক্তামাণিক্যও মিশ্রসমাস নয়,—এখানেও শুধু দ্বন্দ্ব।

৩০.৬ ■ একশেষ কি সমাস ?

দুটির মধ্যে একটি বা তিনটির মধ্যে একটি যদি অবশিষ্ট থাকে তাকে বলা হয় **একশেষ**।

সংস্কৃতে মাতা চ পিতা চ=পিতরৌ (পিতৃশব্দের দ্বিবচন)। বাংলায় তো দ্বিবচন নেই, আছে বহুবচন, কিন্তু সংস্কৃতে মাতরশ্চ পিতরশ্চ মিলে যেমন পিতরঃ হতে পারে বাংলায় তা হবে না, মাতারা এবং পিতারা মিলে শুধু 'পিতারা' বাংলায় অকল্পনীয়, ইংরেজিতে parents কথাটির মধ্যে অবশ্য মাতা ও পিতা দুইই আছে।

বিশেষ্যের ক্ষেত্রে একশেষ বাংলায় চলবে না কিন্তু সর্বনামে সংস্কৃতের মতো বাংলাতেও তা চলতে পারে ; যেমন আমি ও তুমি=আমরা, তুমি ও সে=তোমরা, আমি, তুমি ও সে=আমরা। এগুলোকে অনেকে দ্বন্দ্ব সমাসের মধ্যে ফেলবার পক্ষপাতী, কিন্তু সমাসে যে কয়টি পদে সমাস তারা সবাই অক্ষুণ্ণ থাকে দম্পতি শব্দে 'দম্' জায়ার প্রতিনিধি বা বিকল্প (substitute)। কিন্তু একশেষে তা থাকে না। তাই একশেষ সমাস নয়, বৃত্তি। (৩০)

বাংলায় উভয়লিঙ্গ শব্দগুলো একশেষের মতো। যখন বলি বন্ধুরা তখন তার মধ্যে কিশোরকিশোরী, তরুণতরুণী দুই-ই থাকতে পারে। ইংরেজিতে ladies and gentlemen-এর জায়গায় বাংলায় শুধু 'সুধী' শব্দ চলতে পারে।

AMARBOI.COM

৩০.৭ ■ অসংলগ্ন সমাস

সমাসে সমস্যমান পদগুলিকে সংলগ্ন করেই লেখা হয়, কোনও কোনও ক্ষেত্রে বোঝার সুবিধার জন্যে হাইফেন ব্যবহার করা হয়। কিন্তু কোনও সংস্থা বা সম্মেলনাদির নাম মূলত সমাসবদ্ধ হলেও সমস্যমান পদগুলি বিযুক্ত ভাবে লেখা হয়। যেমন

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

সারা ভারত পশু ক্লেশ নিবারণী পরিষদ ইত্যাদি।

ইংরেজিতেও Loose compound-এর ব্যবহার দেখা যায়, যেমন Life Insurance Company, Cash Sale Department ইত্যাদি।

আর-এক ধরনের অসংলগ্নতাও দেখা যায়, যেমন, যখন বলি বাংলা ও হিন্দিভাষী তখন 'বাংলা' বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, অথচ আমরা 'ভাষী শব্দটার পুনরুক্তি এড়াতে চাই। এই সব ক্ষেত্রে প্রথম শব্দটির পরে একটি হাইফেন দেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ বাংলা - ও হিন্দিভাষী। এই ধরনের অসংলগ্নতায়, ব্যাকরণগত সমস্যাও অনেক সময় দেখা দিতে পারে, যেমন, 'কল্লোলিনী নদীতট' বলা তো ঠিক হবে না, 'নদী' কল্লোলিনী হতে পারে। কিন্তু তা বিচ্ছিন্ন হওয়াতে আর নদীতট সমাসবদ্ধ হওয়াতে 'কল্লোলিনী' শব্দটি তটের বিশেষণ হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু তা তো এক্ষেত্রে ঈপ্সিত নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কৃত

সমস্তপদের উত্তর যে প্রত্যয় হয় তাকে সমাসান্ত প্রত্যয় বলে।

১. ঈকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ এবং ঋকারান্ত শব্দ বহুব্রীহি শব্দের শেষে থাকলে সমস্ত পদের উত্তর 'ক' প্রত্যয় হয়। যেমন,

পত্নীর সঙ্গে বর্তমান=সপত্নীক (অথচ হিমসিম সপত্নী রাষ্ট্রদূত আ. বা. ২২. ৬. ৯৫—সপত্নী (সতিন)=সমান পতি যার)। তেমনি

সস্ত্রীক, অভীক, নির্ভীক ইত্যাদি

নদী মাতা যার=নদীমাতৃক,

২. প্রতি, পর সম্ উপসর্গের পর অক্ষি শব্দ থাকলে তার সঙ্গে অ প্রত্যয় যুক্ত হয় :

প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, সমক্ষ, বিরূপাক্ষ, হর্যক্ষ, মৃগাক্ষী (মৃগাক্ষ+ঈ)

৩. অপ্ এর পর অ : দ্বি অপ্ যার=দ্বীপ, এইরকম সমীপ, অন্তরীপ, অনূপ, প্রতীপ

৪. পথিন্ শব্দের উত্তর অ—জলপথ, দক্ষিণাপথ, বিপথ, কুপথ ইত্যাদি।

৫. অস্‌ভাগান্ত শব্দের পরে বিকল্পে 'ক' হয়, যেমন অন্য মনঃ যার=অন্যমনস্ক বা অন্যমনাঃ (বাংলায় এই বিসর্গ বর্জিত)

৬. 'মূল' শব্দ সমাসের শেষে থাকলে 'ক' হতে হবে এমন কোনও বিধান সংস্কৃতে নেই। কিন্তু বাংলায় কোথাও 'মূলে'র পর 'ক' পাচ্ছি, কোথাও পাচ্ছি না। যেমন 'দৃঢ়মূল', 'বদ্ধমূল', কিন্তু 'দ্বন্দ্বমূলক'। দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'মূল' শব্দের আগে বিশেষণ থাকলে 'ক' হচ্ছে না, কিন্তু বিশেষ্য থাকলে হচ্ছে, যেমন ছিন্নমূল, গাঢ়মূল, কিন্তু সন্দেহমূলক, বিভেদমূলক। নঞ্ বহুব্রীহিতে 'অমূলক'। কিন্তু নির্মূল।

বাংলা

আ	॥	একচোখ যার=একচোখ+আ=একচোখা এইরকম একরোখা, একতারা, দোতারা, দোনলা, নির্জলা, সর্বনাশা।
ইয়া>এ	॥	হাঘর+এ=হাঘরে নকড়ি+এ=নকড়ে উনপাঁজুর+এ=উনপাঁজুরে, অলপ্পেয়ে, একপেশে, বারমেসে ইত্যাদি।
উয়া>ও	॥	ডাকাবুক+ও=ডাকাবুকো, এইরকম হুঁকোমুখো, বিড়ালচোখো, জয়কেতো।
ই, ঈ	॥	বে-আইন+ই=বেআইনি, -নী তেমনি -নী, দোমহনি-নী ইত্যাদি। সাবধানী ('ওরে সাবধানী পথিক', রবীন্দ্রনাথ)
ইয়া>য্যা	॥	বারমাস+ইয়া>য্যা=বারমাস্যা (বারমাসের [দুঃখ]-কাহিনী : ফুল্লরার বারমাস্যা)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩০.৯ ■ ছদ্মবেশী সমাস

মূলত সমাসবদ্ধ পদ কিন্তু ধ্বনিগত রূপান্তরের ফলে তাদের আর চেনাই যায় না। যেমন, ভাজ<ভ্রাতৃ-জায়া, ভাশুর<ভ্রাতৃশ্বশুর, কুমোর<কুম্ভকার, কামার<কর্মকার, চামার<চর্মকার, আমানি<অম্লাম্ন, আটাসে (আটমেসে), অঘ্রান (<অগ্রহায়ণ), আখড়া <অক্ষবাট, বাসর <বাসগৃহ, পাঁচড়া < পঞ্চবট, গাঙ্গুলি (গঙ্গকুলিক) ইত্যাদি।

এই সব শব্দ মূলত সমাসবদ্ধ, কিন্তু চোখে তা ধরাই যায় না, এই রকম শব্দের সংখ্যা বাংলায় নেহাত কম না। এগুলোকে **ছদ্মবেশী সমাস** বলতে ইচ্ছে করে।

বিদেশি নামে এমন সব উদাহরণ মেলে, সেগুলো যে সমাসবদ্ধ পদ তা চট করে ধরা পড়ে না। যেমন Johnson=son of John, বেনজামিন=জামিনের ছেলে, Dickson=son of Dick ইত্যাদি।

৩০.১০ ■ সমাসে অর্থান্তর

সমাসে একটি পদের অর্থ প্রাধান্য পেতে পারে, পদের অর্থ বুঝিয়ে অন্য অর্থও বোঝাতে পারে, যেমন, দ্বন্দ্বে উভয় পদের অর্থ, কর্মধারয় ও তৎপুরুষে দ্বিতীয় পদের অর্থ, অব্যয়ীভাবে অব্যয়ের অর্থ, দ্বিগুতে সমাহারের অর্থ এবং বহুব্রীহিতে সমস্যমানপদের অর্থ না বুঝিয়ে তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য পদের অর্থ প্রধান ভাবে প্রতীয়মান। এ ছাড়া বিভিন্ন সমাসে ব্যঞ্জনায় বহুক্ষেত্রেই সমস্যমান পদের অর্থকে ছাপিয়ে যাবার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেমন,

রকে বসে **রাজা-উজির** মারছে,
ছাইভস্ম কী সব লিখেছিস,
অনেক **কাঠখড়** পুড়িয়ে চাকরিটা পেলে।

এই সব দ্বন্দ্ব সমাস সবই বিশিষ্টার্থ প্রকাশ করছে।

ইত্যাদি অর্থে দ্বন্দ্বেও নিরর্থক শব্দটি সার্থক হয়ে উঠছে,

চা-টা, কাপড়চোপড়, জল-টল শব্দে টা, চোপড়, টল পৃথকভাবে নিরর্থক কিন্তু পূর্বপদের সংস্পর্শে অর্থবান হয়ে উঠেছে। অলুকদ্বন্দ্বের বুকেপিঠে, দুধেভাতে, হাতেকলমে সবই বিশিষ্টার্থক। উপপদ তৎপুরুষের পঙ্কজ, জলজ, মধুপ, অন্তেবাসী, ইত্যাদি সবই যোগরূঢ়। বহুব্রীহি সমাসের বীণাপাণি, দণ্ডপাণিও যোগরূঢ়। নঞ তৎপুরুষের নঞ যে বহু অর্থেই চলে তা আমরা আগে আলোচনা করেছি।

পুরুষসিংহ, নরশার্দূল, ভারতর্ষভ, নরপুঙ্গব ইত্যাদি সমস্তপদের সিংহ, শার্দূল, ঋষভ, পুঙ্গব ইত্যাদি শ্রেষ্ঠত্ববাচক।

সমাসবদ্ধ শব্দ যেমন ব্যঞ্জনায় নানার্থবোধক হতে পারে তেমনি, নিজেদের মূল অর্থও হারাতে পারে, নাম (Proper noun) বোঝাতে, যেমন ইন্দ্রজিৎ, অনুজ, মনোজ, পীতাম্বর, চিদানন্দ ইত্যাদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩০.১১ ■ সমাস-সৌষ্ঠব

সমাস শুধু যান্ত্রিক সংক্ষিপ্তকরণ বা শব্দযোজন মাত্র নয়। ভাষাগত শিল্পসৌষ্ঠব রক্ষাতেও সমাস অপরিহার্য। বহু সমাসবদ্ধ শব্দ বাগ্বিধির অন্তর্গত হয়ে বাংলায় শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি করেছে, ভাষার মাধুর্য বাড়িয়েছে। আধুনিক কবিতায় সুপ্রযুক্ত সমাসের প্রয়োগ বাক্-প্রতিমা গড়ায় সাহায্য করে, অথবা বক্তব্যের তাৎপর্য গভীর করে তোলে। কিছু উদাহরণ নেওয়া যাক আধুনিক কবিদের রচনা থেকে।

একদিন তুমি ছিলে **মেরুনিশীথের** স্তব্ধ সমুদ্রের মতো
(কবিতা। জীবনানন্দ দাশ)

তুমি তো কখনও **বিপদ-প্রাজ্ঞ** নও।
(উটপাখি। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

নির্মম বালুর ছুরি কাটে
কঠিন সমুদ্র নীল, **উট-ঘন্টা** ধমনীতে।
(চিন্তিত মানুষ। অমিয় চক্রবর্তী)

কার সে মুখ কার ?
জানে কি **তারা-ছিটোনোঅন্ধকার** !
(মুখ। প্রেমেন্দ্র মিত্র)

পাথরখোদাই পেশিগুলো
সঙ্গীত হয়ে ওঠে।
(নোনাঘাস: কড়া রোদ্দুর। বিমলচন্দ্র ঘোষ)

ঝরোঝরো-শাখা ঝাউয়ের শিয়রে
(পূর্বরাগ। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

কার্পেট-চৌচালা-ঘরে দুটি প্রাণী আছি নিরিবিলি।
(পাঁচবিঘে ও আমি। সুশীল রায়)

আশাভঙ্গের রঙ **ভাদ্র-শেষ** পশ্চিম আকাশে
(মহুয়ার রাত। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়)

এখানে **নক্ষত্রপল্লী** ; ট্যাঁকে টুকরো **অর্ধদগ্ধ** বিড়ি।
(নির্বাচনিক। সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

আকাশ **অপরাজিতা-নীল** কিন্তু গোলাকার,
দিগন্তও **চক্রনেমিক্রম**।
(সরলরেখার জন্য। জগন্নাথ চক্রবর্তী)

দুপুরে **বাতাসভরা**
কেঁপেওঠা অশথের পাতা
যেমন নির্জন শব্দ তোলে
(আরুণি উদ্দালক। শঙ্খ ঘোষ)

অন্য দুজন তার আদর্শে গড়া
জীবন-অন্য-করা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(ঘুম। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত)

তারপর কত চন্দ্রভুক অমাবস্যা চলে গেল কিন্তু সেই বোষ্টুমী
আর এলো না।

(কেউ কথা রাখে নি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

এইসব উদাহরণে সমাসবদ্ধ পদগুলি কবিকল্পনায় গড়া আশ্চর্য সব নির্মিতি।

ব্যবহার হতে হতে যা বাগ্‌বিধিতে দাঁড়িয়েছে সে-রকম সমাসবদ্ধ পদের সংখ্যাও প্রচুর, যেমন, আবালবৃদ্ধবনিতা, স্বকপোলকল্পিত, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, দোলাচলচিত্তবৃত্তি; কিংকর্তব্যবিমূঢ় ইত্যাদি। এখানে সমাসবদ্ধপদে কোনও পরিবর্তন চলবে না, চলবে না আবালবৃদ্ধরমণী, নিজকপোলকল্পিত, হিতাহিতজ্ঞানহীন ইত্যাদি।

দিবসরজনী, দিনরজনী, দিবসবিভাবরী চলবে কিন্তু 'দিনবিভাবরী' চলবে কি? বরকনে, বরবধূর জোড়ের জায়গায় পতিবধূ লিখলেই ভরাডুবি। এই প্রসঙ্গে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর একটি কবিতার অংশ স্মরণীয়—

'দোষ ছিল না শব্দে, শুধু
দোষ ছিল জোড় বাঁধায়,
ভুল বিবাহের বরকনে তাই
গড়ায় ধুলো কাদায়। (শব্দ, শুধু শব্দ)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩১

শব্দদ্বৈত

[শব্দদ্বিরুক্তির গঠনগত দিক—নানা অর্থে শব্দদ্বিরুক্তি—অনুকার ও বিকারগত শব্দদ্বৈতে ভাষার ইঙ্গিত]

বাংলা শব্দদ্বৈত একটি বিশিষ্ট বাগ্‌বিধি। সংস্কৃত-সূত্রেই তা আমরা পেয়েছি। সংস্কৃত ব্যাকরণে দ্বিরুক্তি প্রক্রিয়া একটি বিশিষ্ট স্থান নিয়ে আছে।

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব, যেন যেন বিযুজ্যন্তে, স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং, উপর্যুপরি পশ্যন্তঃ, ভীতভীতঃ প্রয়াতঃ, পঠতি পঠতি বিপ্রঃ, গর্জগর্জ ক্ষণং মূঢ় ! ইত্যাদি প্রয়োগ সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্য জুড়ে আছে।

এখানে আমরা বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ, ক্রিয়ার অব্যয় ইত্যাদি পদের দ্বৈতপ্রয়োগ লক্ষ করছি।

বাংলার বাগ্‌বিধিতে বিভিন্ন অর্থে এই ধরনের প্রয়োগবৈচিত্র্য সত্যিই বিস্ময়কর।

AMARBOI.COM

৩১.১ ■ শব্দদ্বিরুক্তির গঠনগত দিক

গঠন-গত দিক থেকে আমরা এই দ্বৈতকে তিনভাগে ভাগ করতে পারি,

ক) একই শব্দের পুনরাবৃত্তি
ঘরে ঘরে, হাসিহাসি, চোরচোর

খ) একই শব্দের সমার্থক আর একটি শব্দযোজনা :
হাটবাজার, রাজাবাদশা, হাড়িপাতিল ইত্যাদি। (এগুলো সমার্থক দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে)

গ) অনুকার বা বিকারজাত শব্দযোগে :
বকাঝকা, চুপচাপ, অলিগলি, আঁটসাঁট

ঘ) ধ্বন্যাত্মক শব্দ :
ঝন্‌ঝন্, টুপটাপ, পটপট্, পটাপট্, ঝিরঝির ইত্যাদি।

৩১.২ ■ নানা অর্থে শব্দদ্বৈত

ক) বহুত্ব বোঝাতে :
গাড়ি গাড়ি (ইট), হাঁড়ি হাঁড়ি (সন্দেশ), সাদা সাদা (ফুল), বড় বড় (বাড়ি) কাঁড়ি কাঁড়ি (টাকা) ইত্যাদি।

খ) সাদৃশ্য বা ঈষদ্ভাব অর্থে :
জ্বরজ্বর (ভাব), নিভুনিভু (বাতি) পড়োপড়ো (চাল), কাঠ কাঠ (চেহারা) ইত্যাদি।

গ) সংযোগ অর্থে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওকে চোখে চোখে রাখো, পিঠে পিঠে বয়ে নিয়ে যাও মালগুলো ইত্যাদি।

ঘ) ক্রিয়ার অসম্পূর্ণতা বা ঘটমানতা বোঝাতে :
যেতে যেতে কথা বলো, দেখতে দেখতে চলো।

ঙ) প্রকার বোঝাতে :
বিশেষণ : হাসিহাসি মুখ
ক্রিয়ার বিশেষণ : ভালোয় ভালোয় এসো
অসমাপিকা ক্রিয়া : হাসতে হাসতে কাজ করছে। (ইতে)
অসমাপিকা ক্রিয়া (ইয়া > এ) : নেচে নেচে আয় মা।

চ) পারস্পরিকতা অর্থে :
গলাগলি, মুখোমুখি, খোলাখুলি, পিঠোপিঠি।

ছ) প্রকর্ষ অর্থে :
চেঁচামেচি, ধরাধরি, দৌড়োদৌড়ি, হাঁকাহাঁকি ইত্যাদি।
চ—ছ প্রসঙ্গে হ্যালহেড :
This kind of alliteration found is particularly pleasing to Bengalies. তাঁর মতে এগুলো 'noun of reciprocation'.

জ) ইত্যাদি অর্থে : অনুকার বা বিকারজ শব্দের অর্থে
কাপড়চোপড়, জলটল ইত্যাদি [ইত্যাদি অর্থে দ্বন্দ্ব দ্রষ্টব্য]

ঝ) আবেগসূচক অব্যয় ব্যবহারে :
ধিক্ ধিক্, এমন দেশদ্রোহীকে।
রাম রাম ! এ কী করছে ?
ছি ছি ! তুমি এমন কাজ করলে ?
হাঁ হাঁ ! করে কী ?

ঞ) অনুকরণ বোঝাতে :
ঘোড়াঘোড়া (খেলা) চোর চোর (খেলা) ইত্যাদি অর্থাৎ ঘোড়া বা চোরের নকল করে খেলা।

৩১.৩ ■ অনুকার বা বিকারজাত শব্দদ্বৈতে ভাষার ইঙ্গিত

১. স্বরধ্বনি পরিবর্তনে অর্থান্তর :
ঠুকঠুক থেকে যেই ঠকাঠক এল, ধ্বনির প্রাবল্য ও পৌনঃপুন্যও তেমনি বোঝাল। কুটুস্‌কুটুস আর কটাসকটাস যে যথাক্রমে মৃদু আর প্রবলতর ভাব বয়ে আনে তা বলাই বাহুল্য।

২. লুচিটুচি বললে যে সাধারণ ভাব প্রকাশিত হয়, লুচিফুচি বললে তার মধ্যে কেমন অবজ্ঞার ভাব আসে :
রাত্রে লুচিটুচি কিছু খাই।
রাত্রে লুচিফুচি কিছু খাইনে, স্রেফ ভাত।
লুচিমুচিও অপ্রসন্নতার ভাব আনে।
অন্যান্য প্রদেশের বিকারজাত শব্দ :
মৈথিলি : ঘোড়া-তোরা, হিন্দি ঘোড়ে উড়ে, গুজরাটি ঘোড়োপেড়ো, মরাঠি ঘোড়াবিড়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. যুগ্মের দুটোই নিরর্থক, কিন্তু বিশেষ একটি ভাবের দ্যোতনা তা থেকে হয় ; উস্‌খুস (অস্থিরভাব), কাচুমাচু (অপদস্থতার ভাব) নিশ্‌পিশ্‌ (অধৈর্যের ভাব) আবোলতাবোল, (অসংলগ্নতার ভাব), আঁকুপাঁকু (ব্যাকুলতার ভাব) হাঁস-ফাঁস, আইঢাই (অস্বাচ্ছন্দ্যের ভাব), উস্তম্‌ খুস্তম্‌ (জ্বালাতন) ইত্যাদি।

এ ধরনের অজস্র শব্দ বাংলায় ছড়িয়ে আছে। অনেক সময় জোড়াশব্দের একটিকে মূল শব্দ বলে আমরা শনাক্ত করি বটে কিন্তু তাতে হয়তো ভ্রান্তির সম্ভাবনাই বেশি, যেমন ফস্টিনস্টি ও উসকো-খুশকো শব্দে 'নষ্টি'কে সুনীতিবাবু 'নষ্ট' শব্দজাত বলেছেন, 'খুশকো'-কে বলেছেন ফারসি খুশ্‌ক্‌ শব্দজাত। হতেও পারে, আবার না-ও হতে পারে। 'ফস্টি'ই তার জুড়ি ডেকে এনেছে হয়তো (অভিধানে 'ফস্টি' রঙ্গরস অর্থে পৃথক শব্দ হিসেবে চিহ্নিত)। তেমনি, উস্‌কোই খুশকোকে ডেকে এনে থাকতে পারে তার ফারসি মানে না জেনেও। 'উস্‌কোই' মূল শব্দ হতে পারে, যেমন 'উসকো মাটিতে বিলাই হাগে' (প্রবাদ)।

ইংরেজিতে এই ধরনের অনুকার-বিকারজাত শব্দের সংখ্যা নেহাত কম নয়, যেমন : humdrum, dilly-dally, rat-tat, riff-raff, hotch-potch, bow-wow helter-skelter, higgledy-piggledy ইত্যাদি।

হিন্দিতেও অণ্ডবণ্ড, অম্বরডম্বর, উলটপুলট, আমনাসামনা, অঞ্জরপঞ্জর, এঁচপেঁচ, ঝুঠমুঠ ইত্যাদি অনুকার বা বিকারজাত শব্দ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাক্যতত্ত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩২

বাক্য

[বাক্যের স্বরূপ—বাক্যের গঠনগত বিভাগ—বাক্যের অর্থগত বিভাগ—বাক্যের উক্তিভেদ—ক্রিয়াহীন বাক্য]

৩২.১ ■ বাক্যের স্বরূপ

বাক্য শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কথ্য বা কথিত বিষয়। যথাযথ বিন্যস্ত শব্দসমষ্টি যদি একটি সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে তাকে **বাক্য** বলে। মহাভাষ্যে বাক্যলক্ষণ এইভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

'আখ্যাতং সাব্যয়ং সকারকং সকারকবিশেষণং বাক্যসংজ্ঞকং ভবতি।' অর্থাৎ

অব্যয়যুক্ত কারকযুক্ত এবং কারকের বিশেষণযুক্ত ক্রিয়াকে বাক্য বলা হয়। অর্থাৎ শুধু অব্যয় আর ক্রিয়াতেও বাক্য হতে পারে, কোনও একটি কারকযুক্ত ক্রিয়াতেও বাক্য হতে পারে, আর ওই সব কারকের বিশেষণ থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে।

এই সংজ্ঞায় ক্রিয়ার গুরুত্ব লক্ষণীয়। 'সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ' করায় ব্যাপারটা এখানে উল্লিখিত হয় নাই, 'ক্রিয়ান্বয়ী কারক'ই সে-কাজ করে বলে। ইংরেজি sentence কথাটির মধ্যে মনোভাব প্রকাশের বিষয়টি প্রচ্ছন্ন আছে। শব্দটির মূলে আছে 'sentir' ধাতুটি, যায় অর্থ, feel বা express.

● সাহিত্যদর্পণের মতে যোগ্যতা- আকাঙ্ক্ষা- আর আসত্তি- যুক্ত পদসমুচ্চয়কে বাক্য বলে (বাক্যং স্যাদ্ যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ)। এই সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে বাক্যের যে লক্ষণগুলো আমরা পাই তা হল :

১. বাক্যে অর্থসংগতি থাকতে হবে।
২. অন্যপদের আকাঙ্ক্ষা থাকবে না, অর্থাৎ পূর্ণ অর্থ চাই।
৩. পরস্পর অন্বিত পদগুলোকে কাছাকাছি থাকতে হবে, তা না হলে অর্থবোধে কাঠিন্য আসবে।

অর্থাৎ সাহিত্যদর্পণকারের মতে 'ছিপ দিয়ে আম পাড়লাম' 'সে অনেক দেখেও—,' 'মস্ত ধরলাম তালদিঘিতে একটা মাছ', এগুলো বাক্যের মধ্যে পড়বে না।

কারণ ছিপ দিয়ে কেউ আম পাড়ে না, দ্বিতীয়টিতে মনের ভাব অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে, আর তৃতীয়টিতে পরস্পর অন্বিত বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবাপন্ন পদদুটি অতি-বিযুক্ত।

যোগ্যতার (Compatibility) প্রশ্নটি কিন্তু একটু গোলমেলে, কারণ আপাতদৃষ্টিতে অযোগ্য বা অসংলগ্ন মনে হলেও কবিকল্পনায় বা কৌতুকরসসৃষ্টিতে তা মনোজ্ঞও হয়ে উঠতে পারে।

এমনিতে রোদের কোনও গন্ধ নেই। কিন্তু 'ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিল', জীবনানন্দের এই অবিস্মরণীয় পঙ্‌ক্তিটির বাক্যত্ব তো কেউ অস্বীকার করবে না। তেমনি আকাশে আর কে কবে ঝুল ঝুলতে দেখেছে? কিন্তু 'আকাশেতে ঝুল ঝোলে কাঠে তাই গর্ত'। এ কি সত্যিই আবোল-তাবোল?

আর অসংলগ্ন বা অসঙ্গত যদি কোনও 'পদসমুচ্চয়'কে মনেই হয় তাহলে তো প্রশ্ন উঠবে, বাক্যত্ব স্বীকৃত হবার পরেই তো তার সংগত বা অসংগত হবার প্রশ্ন উঠেছে।

আর আসত্তির ব্যাপারে লেখকের কোনও পরিকল্পনাও থাকতে পারে। 'উট অনেকদিন জল না খেয়ে থাকতে পারে' এই বাক্যটি 'জল অনেকদিন না খেয়ে থাকতে পারে উট'। এমন করেও কেউ বলতে বা লিখতে পারেন যদি জলের ওপর তিনি বিশেষ জোর দিতে চান, বা আগে যদি জলের কোনও প্রসঙ্গ থেকে থাকে।

আর বাগ্‌বিধিতে বা কথার পৃষ্ঠে কথায় অসম্পূর্ণ বাক্যেও সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ পেতে পারে, অথবা বিশেষ কোনও কারণে বাক্যের অংশবিশেষকে অনুচ্চারিতও রাখতে পারে। যেমন প্রিয়ংবদা বললেন, 'তারপর ভরা বসন্তে তার উন্মাদক রূপ দেখে...' বাক্য অসম্পূর্ণ রাখলেন তিনি। রাজা বললেন, 'পরেরটুকু সহজেই বোঝা যাচ্ছে।'

• সাহিত্যদর্পণকার বাক্যলক্ষণ হিসেব যেগুলির উল্লেখ করেছেন সেগুলিতে বাক্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নিশ্চয়ই, তবু বলতে চাইছি বাগ্‌ভঙ্গি বিচিত্র আর বাগ্‌ভঙ্গির পরিচালক মানুষের মন বিচিত্রতর, তাই ধরাবাঁধা নিয়ম কোথাও খাটে না।

আমরা সাধারণভাবে বলছি উদ্দেশ্য-অংশ আগে বিধেয় অংশ পরে। কিন্তু অজস্র উদাহরণে দেখছি এর ব্যতিক্রম, তবু—

• মূল নিয়ম একটা দরকার, ব্যতিক্রমগুলোর জন্যেও হয়তো অন্য নিয়মের দরকার।

রামু কাল দমদমে গিয়েছিল। এখানে রামু উদ্দেশ্য এবং 'কাল দমদমে গিয়েছিল' বিধেয়। কিন্তু 'কাল দমদমে গিয়েছিল রামু'ও তো আমরা বলতে পারি। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিধেয়াংশ আগে বসেছে, তারপরে এসেছে উদ্দেশ্য। আবার এমনও বলতে পারি 'কাল রামু দমদমে গিয়েছিল' এখানে বিধেয়ের একটি অংশকে উদ্দেশ্যের আগে বসানো হল।

• অবশ্য উদ্দেশ্যের বিবর্ধক এবং বিধেয়াংশের কর্মাদি কারকের বিবর্ধক যথাক্রমে উদ্দেশ্য এবং কর্মাদি কারকের আগে বসবে। যেমন,

সে ভাল ভাল বই পড়ে।

সে লাইব্রেরি থেকে আনা ভাল ভাল বই পড়ে।

এখানে বিশেষণ বা বিশেষণস্থানীয় পদগুলি বই এই কর্মপদের আগে বসেছে।

অন্য কারকপদ সম্বন্ধেও একই কথা। তেমনি পড়াশোনায় ফাঁকি দেওয়া ছেলেরা এই পরীক্ষায় নির্ঘাৎ ফেল করবে।

এখানে 'ছেলেরা' এই উদ্দেশ্য পদের বহুপদময় বিশেষণ ঠিক ওই পদের আগে বসেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩২.২ ■ বাক্যের গঠনগত বিভাগ

গঠনগত দিক দিয়ে বাক্যকে সরল, জটিল ও যৌগিক এই তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

সরলবাক্য

যে-বাক্যে একটি উদ্দেশ্য এবং একটি সমাপিকা ক্রিয়া তাকে সরলবাক্য বলে।

সে কাল আসবে। আমি এসব জানি না। তুমি কোথায় যাবে?

ক্রিয়াপদটি অবশ্য উহ্যও থাকতে পারে।

কে ওখানে?

এই বাক্যে ক্রিয়াপদটি (আছে) উহ্য।

মধ্যমপুরুষের অনুজ্ঞায় উদ্দেশ্যপদ তুমি বা তোমরা উহ্য থাকে।

এখন যাও। পরে এসো।

উত্তম পুরুষও উহ্য থাকতে পারে, ক্রিয়াই ওই 'পুরুষ'কে বুঝিয়ে দেবে:

শুই এবারে।

প্রথম পুরুষের কর্তা সে, তারা বা অন্য কেউ কেউ হতে পারে বলে, শুধু ক্রিয়া তেমন অর্থ বহন করবে না, যেমন 'যায়' বললে কে যায় কারা যায়, এমন নানা ধরনের প্রশ্ন হতে পারে। কিন্তু আগে কোনও প্রসঙ্গ থাকলে উহ্য পদটি সহজেই বোঝা যাবে।

রাম কি এসেছে?

—এসেছে।

এখানে 'এসেছে' ক্রিয়ার কর্তাকে 'রাম' তা বলাই বাহুল্য।

উহ্য-ক্রিয়া সরল বাক্যে বিশেষণ পদটি বিধেয়াংশে থাকলে তাকে **বিধেয় বিশেষণ** বলে যেমন,

রাম বুদ্ধিমান।

এখানে 'বুদ্ধিমান' বিধেয় বিশেষণ।

এই বুদ্ধিমানের যদি কোনও বিবর্ধক থাকে তাহলে তা ঠিক এর আগে বসবে: রাম অনেকের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান।

জটিল বাক্য

দুই বা ততোধিক বাক্য মিলে যদি এমন একটি বাক্য হয় যে তাতে অন্য বাক্য বা বাক্যগুলি একটি স্বনির্ভর প্রধানবাক্যের অঙ্গ বা অধীন হয়, তা হলে তাকে **জটিলবাক্য** (complex sentence) বলে। সেক্ষেত্রে প্রধান বাক্যটির অধীন বাক্য বা বাক্যগুলিকে খণ্ডবাক্য, অঙ্গবাক্য বা অধীনবাক্য বলে (subordinate clause)। যেমন

আমি জানি যে তুমি আসবে।

এই বাক্যে 'আমি জানি' প্রধান বাক্য, আর 'যে তুমি আসবে' অধীনবাক্য। এখানে দুটোই সরলবাক্য কিন্তু দ্বিতীয় অংশটি আগের বাক্যের অধীন। 'যে' শব্দটি উহ্যও রাখা চলে: আমি জানি তুমি আসবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাক্যটি আরও বড় হতে পারে :

আমি জানি যে তুমি আসবে যেহেতু গরজটা তোমারই।

'যেহেতু গরজটা তোমারই' এখানে আর-একটি অধীন বাক্য।

ইংরেজিতে 'clause' শব্দটির ব্যুৎপত্তি অর্থ 'আবদ্ধ'। অর্থাৎ এই অংশটি মুক্ত নয়, বদ্ধ—অধীন। অঙ্গ বাক্যটি প্রধানবাক্যের আগেও বসতে পারে :

তুমি যে আসবে তা আমি জানি।

প্রধান বাক্যের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হতে পারে অধীনবাক্য।

১. বিশেষ্য সম্বন্ধ :

আমি জানি—(যে) তুমি আসবে

এখানে দ্বিতীয় অংশটি বিশেষ্য স্থানীয়, প্রধানবাক্যের 'জানি' ক্রিয়াটি বিশেষ্য একটি।

তুমি যে আসবে তা আমি জানি এই বাক্যে 'তুমি যে আসবে' এই অংশটি প্রধানবাক্যের 'তা' শব্দটির সঙ্গে অভিন্ন (case-in-apposition)।

২. বিশেষণ সম্বন্ধ :

যে বিড়ালটি প্রাচীরে বসে আছে সেটি কাল মাছ নিয়ে পালিয়েছিল। যদি প্রশ্ন করি, 'সেটি' কোনটি ? উত্তর হবে 'যে বিড়ালটি প্রাচীরে বসে আছে'। এই অধীন বাক্যটি প্রধান বাক্যের সর্বনাম 'সেটি'কে বোঝাচ্ছে। এটি তাই বিশেষণস্থানীয় অধীনবাক্য (Adjective clause)

৩. যখন সে আসবে আমাকে বোলো। এখানে 'যখন সে আসবে' এই অধীনবাক্যটি প্রধানবাক্য 'আমাকে বোলো'র 'বোলো' ক্রিয়াটির বিশেষণস্থানীয় (Adverb clause).

ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় অঙ্গবাক্যকে আমরা 'বিশেষণস্থানীয়' বলতে চাই, কারণ ক্রিয়াবিশেষণও বিশেষণ।

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে/তবে একলা চলো রে।

এখানেও প্রথম অংশটি প্রধানবাক্যের 'চলো' ক্রিয়াটিকে বিশেষিত করছে।

'বিশেষণের বিশেষণ'কে বিশেষিত করছে এমন একটি অধীনবাক্য :

সে এত সৎ যে কিছুতেই একাজ করবে না। এখানে অধীনবাক্যটি 'এত' এই বিশেষণের বিশেষণটিকে বিশেষিত করছে।

এই অধীনবাক্যটিকে যদি ইংরেজি Adverb clause-এর অনুবাদ করে ক্রিয়া বিশেষণস্থানীয় অধীন বাক্য বলি তা ঠিক হবে না। কারণ 'এত' ইংরেজি ব্যাকরণের মতে Adverb. কিন্তু বাংলায় বিশেষণের বিশেষণ।

জটিলবাক্যকে মিশ্রবাক্য বলা ঠিক হবে কি ?

জটিলবাক্যকে সুনীতিকুমার মিশ্রবাক্য বলেছেন। জটিলবাক্য বোঝাতে এ কথাটির ব্যবহার না করাই ভাল, কারণ মিশ্র আর যৌগিক সাধারণত সমার্থক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা-ই 'মিশ্র' বললে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে।

যৌগিক বাক্য

(Compound Sentence)

দুই বা দুইয়ের অধিক **স্বাধীন** বাক্য যদি সংযোজক এবং যোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়ে একটি দীর্ঘতর বাক্য গঠন করে তাকে **যৌগিক বাক্য** (compound sentence) বলে।

সরল+সরল :

সে সৎ কিন্তু তার ভাই অসৎ।

এখানে দুটোই সরল বাক্য—দুটোই প্রধান বাক্য। 'কিন্তু' সংযোজক।

সরল বাক্যই যে হতে হবে তা নয়, সরলের সঙ্গে জটিলবাক্যও যুক্ত হতে পারে,

সরল+জটিল :

সে সৎ কিন্তু যে বন্ধুটি তার সঙ্গে এসেছিল সে অসৎ।

জটিল+জটিল

যদি জানতে চাও সে কেন আসে নি তা হলে বলব আমি জানি না, আর যদি জানতে চাও আমি কেন যাইনি তা হলে বলব আমার ইচ্ছে হল না তাই।

এই বড় বাক্যটিতে দুটি জটিলবাক্য 'আর' এই সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত।

এই ভাবে সরলে-সরলে, সরলে-জটিলে, জটিলে-সরলে, জটিলে-জটিলে নানাভাবেই যৌগিক বাক্য গঠিত হতে পারে।

যদি দুটি বাক্যে যৌগিক বাক্য গড়ে ওঠে তাকে ইংরেজিতে বলা হয় double sentence, আমরা বলতে পারি **দ্বিপর্ব যৌগিক বাক্য**। আর যদি দুটির বেশি বাক্য নিয়ে তা গড়ে ওঠে ইংরেজিতে তাকে বলে multiple sentence. আমরা বলতে পারি **বহুপর্ব যৌগিক বাক্য**।

যৌগিক বাক্যে একই কর্তার পুনরুক্তি হয় না। যেমন, সে এল, সব দেখল এবং চলে গেল। অনেক সময় সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয়টি উহ্য থাকে।

সে এসেছিল, কিছু বলল না, কাঁদতে লাগল—এই ত্রিপর্ব যৌগিক বাক্যটিতে সংযোজক উহ্য আছে। এ ধরনের যৌগিক বাক্যকে **সংক্ষেপিত যৌগিক বাক্য** (contracted compound sentence) বলা চলে।

- বিভিন্ন ধরনের যৌগিক বাক্যের উদাহরণ :

পাখির ছানা তো বি. এ. পাশ করিয়া উড়িতে শেখে না ; উড়িতে পায় বলিয়াই উড়িতে শেখে। —রবীন্দ্রনাথ।

ওঁর কাছেও কত দোষ করিয়াছি, কিন্তু কিছু বলিতেন না ; আর বলিলেও মনে করিতাম না, সেজদাদা ত, একটু পরেই আর কিছু মনে থাকিবে না। —শরৎচন্দ্র

পরেশবাবু ঘরে ঢুকে মনিব্যাগ ছাড়া পকেটের সমস্ত জিনিস টেবিলের উপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাললেন, তারপর দোতলায় উঠলেন। —পরশুরাম

বড় মেয়েটির খুব লম্বা, গোলগাল চেহারা ; মাথার চুলগুলো রুক্ষ ও অগোছালো—বাতাসে উড়িতেছে, মুখখানা খুব বড়, চোখ দু'টা ডাগর ডাগর ও শান্ত। —বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এতক্ষণ বাক্যের গঠনগত বিষয়টি আমরা আলোচনা করেছি এখন অর্থ অনুযায়ী বাক্যের বিভিন্ন বিভাগগুলির কথা বলি :

৩২.৩ ■ বাক্যের অর্থগত বিভাগ

বর্ণনাত্মক বাক্য (Assertive sentence)

বাক্যে কোনও ঘটনার ভাব বা অবস্থায় বিবৃতি থাকলে তাকে বর্ণনাত্মক বা ঘটনাত্মক বাক্য বলে।

সূর্য পূর্বদিকে ওঠে। সে রোজ এখানে আসে। আমি তাকে ভাল লোক বলেই জানি। সে আমার কোনও কথাই শোনে না।

বর্ণনাত্মক বা ঘটনাত্মক বাক্যকে নির্দেশাত্মক বাক্য বলা হচ্ছে। আমরা এর বিরোধী, কারণ নির্দেশ আর অনুজ্ঞা প্রায় সমার্থক। বর্ণনাত্মক বাক্যকে নির্দেশাত্মক বললে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে।

এই বর্ণনাত্মক বাক্য দু-রকমের হতে পারে :

সদর্থক (affirmative) ও নঞর্থক (negative)

সদর্থক : গল্পটা আমি জানি।

নঞর্থক : গল্পটা আমি জানি না।

এই পরিভাষাদুটিকে অস্ত্যর্থক ও নাস্ত্যর্থক অথবা হাঁ-বাচক ও না-বাচকও বলা হয়। সাহিত্যদর্পণে যথাক্রমে এ দুটি উপস্থাপনাত্মক ও অপোহনাত্মক নামে চিহ্নিত।

AMARBOI.COM

- **প্রশ্নাত্মক বাক্য (Interrogative sentence)**

কোনও ঘটনা, ভাব বা অবস্থা সম্বন্ধে কিছু জানবার ইচ্ছা প্রকাশ পেলে তাকে প্রশ্নাত্মক বাক্য বলে। যেমন—

কোথায় গিয়েছিলে সেদিন ?

এই কি সভ্যতা ?

কেন দেশের এই দুরবস্থা ?

- **অনুজ্ঞা-বাক্য (Imperative sentence)**

যে বাক্যে আজ্ঞা, উপদেশ, অনুরোধ, বা নিষেধ বোঝায় তাকে অনুজ্ঞা-বাক্য বলে। যেমন :

এক্ষুনি সেখানে যাও। সময় কাজে লাগাও।

দয়া করে আমাকে ভিতরে যেতে দিন। এখন যেয়ো না।

বাংলায় বর্তমান অনুজ্ঞার সঙ্গে নিষেধার্থক 'না' হয় না, হয় ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার সঙ্গে।

সময় নষ্ট কোরো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কক্‌খনও এমন কাজ করবে না।

- **আবেগসূচক বাক্য (Interjective sentence):**

যে বাক্যে আনন্দ, বিরক্তি, ভয়, দুঃখ ধিক্কার ইত্যাদি মনের আবেগ বোঝায় তাকে আবেগসূচক বাক্য বলে।

কী আনন্দ ! আমাদের টিম জিতেছে !
উঃ কী গরম!
হা অদৃষ্ট ! বিধবা একমাত্র ছেলেটিকেও হারাল।
ছিঃ এমন কাজ করলে কেন ?
[আবেগসূচক অব্যয় দ্রষ্টব্য]

ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য (Optative sentence)

ইস ! যদি পাখির মতো পাখা পেতাম !
এমন দুর্ভাগ্য যেন কারও না হয়।
ভারত যেন জয়লাভ করে।

কার্যকারণাত্মক বাক্য (Conditional sentence)

যদি কোনও বাক্যে ক্রিয়ানিষ্পত্তি কোনও বিশেষ শর্তের অধীন এমন বোঝায় তাহলে তাকে কার্যকারণাত্মক বাক্য বলে।

বৃষ্টি হলে ফসল ভাল হবে।
যদি বল, আসব।
এমন গা ঢিলে দিলে এক মাসেও কাজটা শেষ হবে না।

সন্দেহসূচক বাক্য (Dubitative sentence)

যদি কোনও বাক্যে ক্রিয়ানিষ্পত্তি সংশয় বা সন্দেহজনক হয় তবে তাকে সন্দেহসূচক বাক্য বলে।

আজ বোধ হয় বৃষ্টি হবে।
খেলাটা হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে।
সে পাশ করবে কি না ঠিক বুঝছি না।

- অনেক সময় আবেগসূচক বাক্য প্রশ্নাত্মক বাক্যের চেহারা নেয়, যেমন
  সে হৃদয় কে কী দিয়া গড়িয়া দিয়াছিল !—শরৎচন্দ্র

৩২.৪ ■ বাক্যের উক্তিভেদ

- বক্তার বাক্যটি যদি সরাসরি যেমন-আছে-তেমন ভাবে বিবৃত হয় বা উদ্ধৃত হয় তাকে প্রত্যক্ষ উক্তি (Direct speech) বলে। যেমন, মা ছেলেকে বললেন, 'তোর পাশের খবর আমি আগেই পেয়েছি। কী খুশি যে হয়েছি।'

এই বাক্যে মায়ের কথাটুকু হুবহু বজায় আছে, তাই উদ্ধারচিহ্নযুক্ত অংশটি প্রত্যক্ষ উক্তি।

- কিন্তু বক্তার কথাটির যথাযথ অনুবৃত্তি না করে যদি তার বক্তব্যটির অভিপ্রায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্য কারও জবানিতে প্রকাশিত হয় তাকে পরোক্ষ উক্তি (Indirect speech) বলা হয়।

আগের বাক্যটি পরোক্ষ উক্তিতে এইরকম দাঁড়াবে :

মা ছেলেকে বললেন যে তিনি তার পাশের খবর আগেই পেয়েছেন এবং এতে যে তিনি খুব খুশি হয়েছেন সে কথাও জানালেন।

এখানে জ্ঞাপকক্রিয়াটির (Reporting verb) কাল অনুযায়ী পরোক্ষ উক্তির ক্রিয়াপদটি পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ **ইংরেজির sequence of tense-এর নিয়ম বাংলায় খাটে না।**

● একজন একাধিক বাক্য বললে প্রত্যেকটি বাক্যের অর্থগত ভেদ দেখে জ্ঞাপকক্রিয়ার প্রয়োগ করতে হবে। ঘোষণা বা বর্ণনাত্মক বাক্যের জন্যে জ্ঞাপকক্রিয়া 'বললেন' বা তদর্থক ক্রিয়া প্রশ্নাত্মক বাক্য হলে তার জন্যে 'প্রশ্ন করলেন', 'জিজ্ঞাসা করলেন' বা তদর্থক ক্রিয়া, অনুজ্ঞাবাক্য থাকলে তার জন্যে 'আদেশ করলেন', 'অনুরোধ করলেন' ইত্যাদি জ্ঞাপকক্রিয়া, বিস্ময়সূচক বাক্য থাকলে 'আনন্দ, দুঃখাদি প্রকাশ করে বললেন', এই ধরনের জ্ঞাপকক্রিয়া ব্যবহার করতে হবে।

যথাক্রমে উদাহরণ :

১. প্রত্যক্ষ উক্তি : তিনি আমাকে বললেন, 'খেলা দেখতে যাব।'
পরোক্ষ উক্তি : তিনি আমাকে বললেন যে তিনি খেলা দেখতে যাবেন।

২. প্রত্যক্ষ উক্তি : তিনি আমাকে বললেন, 'তুই কি খেলা দেখতে যাবি ?'
পরোক্ষ উক্তি : তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি খেলা দেখতে যাব কি না।

৩. প্রত্যক্ষ উক্তি : তিনি আমাকে বললেন, 'আপনি তো দুটো টিকিট পেয়েছেন, আমাকে একটা দিন না।'
পরোক্ষ উক্তি : তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন আমি যখন দুটো টিকিট পেয়েছি, তাঁকে যেন একটা দিই।

৪. প্রত্যক্ষ উক্তি : তিনি বললেন, 'কী অসাধারণ গোলই না করেছে সঞ্জয় !'
পরোক্ষ উক্তি : তিনি সপ্রশংসভাবে বললেন যে সঞ্জয় সত্যিই অসাধারণ গোল করেছে।

একটি বিষয় অবশ্যই উল্লেখ্য, **জ্ঞাপক ক্রিয়াটি সাধুভাষায় থাকলে সম্পূর্ণ পরোক্ষ উক্তিটি সাধুভাষায় লিখতে হবে।** যেমন,
প্রত্যক্ষ উক্তি : সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় যাচ্ছিস ?'
পরোক্ষ উক্তি : সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল আমি কোথায় যাইতেছি।

৩২.৫ ■ ক্রিয়াহীন বাক্য

'রাম বুদ্ধিমান'—এই বাক্যে 'হয়' ক্রিয়াপদটি উহ্য এমন আমরা বলেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকি। ইংরেজিতে copulaর (is, am are ইত্যাদি) প্রভাবে (Ram is intelligent) আমরা বাংলায় 'হয়'কে উহ্য ধরছি। কিন্তু আমাদের উত্তমর্ণ সংস্কৃতে Copula-বর্জনই বাগ্‌বিধি : বালকশ্চতুর :, গতিস্ত্বং, কে বয়ম্ ? এইসব উদাহরণে যোজকক্রিয়া, ভবতি, ভবসি, ভবামঃ পরিত্যক্ত। বাংলায় এই রীতি অনুসরণ করেই আমরা বলি বালকটি চতুর, তুমিই গতি, আমরা কে ? পাণিনি সংযোজকক্রিয়াহীন বাক্য স্বীকার করেছেন। সূত্রতেও সর্বত্র সংযোজক ক্রিয়া বিবর্জিত—সাধকতমং করণম্। সুপ্তিমন্তং পদম্ ইত্যাদি।

Nexus (বিধেয়-বন্ধ) without verb অন্য ভাষাতেও স্বীকৃত।

রাশ্যান : Ja bolen=I ill অর্থাৎ I am ill.

ইংরেজিতেও এই Verbless nexus-এর প্রচুর উদাহরণ মেলে : what a fine morning! The more the merrier ইত্যাদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৩

পদবিন্যাস

[পদবিন্যাসের ক্রম ও ব্যতিক্রম—পদবিন্যাসের আদর্শ]

৩৩.১ ■ পদবিন্যাসের ক্রম ও ব্যতিক্রম

যা বাক্যে বাঁধা পড়ল এমন সব শব্দই পদ। কিন্তু যেমন-তেমন করে পদবিন্যাস করলেই পদগুচ্ছ বাক্য হয়ে ওঠে না। তার একটা নিয়ম আছে, যদিও সে-সব নিয়মের ব্যতিক্রম আছে এবং চলন্ত ভাষা নদীর মতোই গতি বদল করেছে। তবু মোটামুটি ভাবে আমরা কতগুলো নিয়মের কথা বলতে পারি।

১. বাক্যের লক্ষণ আলোচনা করতে গিয়ে আমরা যোগ্যতা-আকাঙ্ক্ষা-আসত্তির কথা আলোচনা করেছি, ওই লক্ষণের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে প্রধান নিয়মটি। সে নিয়মটি হল বাক্যটির শব্দগুলি এমনভাবে বিন্যস্ত হবে যার অর্থ বুঝতে কোনও অসুবিধা হবে না। পরস্পর-অন্বিত পদগুলি ছড়িয়েছিটিয়ে যাবে না, কাছাকাছি থাকবে। আমরা বাক্যলক্ষণ প্রসঙ্গে উদাহরণসহ এ আলোচনা করেছি।

২. সংস্কৃত বাক্যবিন্যাসে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া এই উপস্থাপনাই বাংলা সাধুভাষার স্বীকৃত ক্রম।

অহং তং পশ্যামি
আমি তাহাকে দেখিতেছি।

সংস্কৃতে তমহং পশ্যামি বা পশ্যাম্যহং তম্—এমন বিন্যাসও হতে পারে। কিন্তু সাধু বাংলায় দেখিতেছি আমি তাহাকে, বা তাহাকে দেখিতেছি আমি এধরনের বিন্যাস হয় না। সংস্কৃতের অহং-তং পশ্যামি ছকটিই সাধুবাংলার ছক।

ফারসিতেও এই ছক :
মন্ (আমি) উরা (তাহাকে) বীনম্ (দেখিতেছি)।

উনবিংশ শতকের গোড়াতে নির্মীয়মাণ বাংলা গদ্যে বাংলা গঠনরীতিতে ফারসির প্রভাব কিছুটা ছিল।

বিংশ শতকের সপ্তম দশক থেকে সাহিত্যে চলিতভাষার শুরু হবার পর গঠন রীতিতে পরিবর্তন দেখা দিল। সাধুভাষার নির্দিষ্টপথে সে ভাষা তেমন চলল না। 'আমি তাহাকে দেখিতেছি'র—পদক্রম অনুসরণে 'আমি তাকে দেখছি'র সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল 'তাকে দেখছি আমি'। উদ্দেশ্যের পর বিধেয় এ ক্রমও গেল বদলে, কর্মের পর ক্রিয়া, তার পর কর্তা এ ধরনের বিন্যাস সহজসঙ্গত হয়ে উঠল। চলিত বাংলার দ্বিমাত্রিকতা অথবা স্বরধ্বনিলোপ, ক্রিয়াধ্বনি-সংক্ষেপণ ইত্যাদি বিন্যাসভঙ্গিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈপরীত্য আনল, খুব স্বাভাবিক ভাবেই। সাধুভাষার euphony আর চলিত ভাষার euphony এক রইল না। আমরা সাধু-চলিত ভাষার আলোচনায় বহু উদাহরণ দিয়ে এবিষয়ে আলোচনা করেছি। (সপ্তম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

৩. উদ্দেশ্য বিধেয়ের স্থানপরিবর্তন ঘটলেও সাধুচলিত দুই ভাষাই একটি নিয়ম মেনে চলে,—বিবর্ধক বা বিশেষণ-স্থানীয় পদগুলি উদ্দেশ্য এবং বিধেয়ের ও কারকপদগুলির আগে বসে। এ আলোচনাও আমরা আগের পরিচ্ছেদে করেছি। এখানে আরও দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

সুধা পত্র লিখিতেছে।

বিবর্ধিত বাক্য : বিষ্ণুপদবাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা সুধা একটি সুদীর্ঘ পত্র লিখিতেছে।

এখানে কর্তৃপদের বিশেষণস্থানীয় পদ কন্যার আগে বসেছে। পত্রের বিশেষ্য পদটি ঠিক তার আগে বসেছে।

ক্রিয়ার বিবর্ধকটি (বিশেষণ স্থানীয় পদ) বিধেয়াংশ বা উদ্দেশ্যাংশে বসতে পারে। 'মায়ের নিকট' এই ক্রিয়ার বিবর্ধক প্রয়োগ করলে বাক্যটি দাঁড়াবে বিষ্ণুপদবাবুর জ্যেষ্ঠ কন্যা সুধা মায়ের নিকট একটি সুদীর্ঘ পত্র লিখিতেছে।

'মায়ের নিকট' পদগুচ্ছ বাক্যের একেবারে শুরুতেও বসতে পারে, তবে আসত্তি (Proximity)র নিয়মটি মানলে 'মায়ের নিকট একটি দীর্ঘ পত্র লিখিতেছে' এই ক্রমই অনুসৃত।

৪. জটিল বাক্যে সাধারণত বাক্যাংশটি প্রধান বাক্যের আগেই বসে 'যদি বলি উচ্চশিক্ষা, তাহা হইলে ভদ্র সমাজে খুব একটা উচ্চহাস্য উঠিবে।'
সে যখন এবিষয়ে কিছুই জানে না তখন কথা বলতে গেল কেন?
আমরা যে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও ভুলে যাই তাতে আর সন্দেহের কী আছে? যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল।

৫. ইংরেজিতে জ্ঞাপকক্রিয়া (reporting verb) প্রত্যক্ষ উক্তির আগেও থাকতে পারে, পরেও থাকতে পারে, উক্তিটির মাঝখানেও থাকতে পারে। কিন্তু বাংলায় সাধারণত আগেই বসে, যেমন—

অমিত বলল, 'তোর অসাফল্যের কারণ তোর অসুস্থতা।'

ইংরেজিতে Amit said দিয়ে বাক্য শুরু তো হতেই পারে, আবার প্রত্যক্ষ উক্তির পরে 'said Amit' দিয়েও শেষ হতে পারে। 'The reason of your failure is your illness,' said Amit. অথবা বাক্যটি দুভাগে ভাগ করে 'said Amit' মাঝখানেও বসতে পারে। 'The reason of your failure,' said Amit, 'is your illness.' কিন্তু বাংলায় এ অনুকরণ তেমন চলে না।

৬. নিত্যসম্বন্ধী শব্দগুলি (correlatives)র একটি ব্যবহার হলে আর একটির ব্যবহার বাঞ্ছনীয় :
যে-সে, যদি-তবে, যত-তত, যেমন-তেমন, তেমনি, বটে-কিন্তু ইত্যাদি।
'যদি' দিয়ে শুরু অন্যবাক্যের পর 'তবে' উহ্যও থাকতে পারে :
যদি সে অনুরোধ করে, তুমি না গিয়ে পারবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭. সংস্কৃতে ন করোমি, ন গচ্ছামি,—কিন্তু বাংলায় 'না' এই নঞর্থক অব্যয়টি সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসে।

যাই নাই, যাব না

'নাই' অতীতকালের দ্যোতক : যাই নাই > যাইনি

কিন্তু কবিতায় 'না' সমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসতে পারে, না ভজিনু, না করিয়া ইত্যাদি।

'না' অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসে : < সব না দেখে ওকে কথা দিলে কেন ?

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় 'না' পরে বসে : (বর্তমান অনুজ্ঞায় 'না' হয় না)

কিছু মনে কোরো না বা মনে করবে না। সমাপিকাক্রিয়াতে 'না' আগে বসতে পারে বৈকল্পিক দ্বিরুক্তিতে :

না এল, না কোনও খবর দিল।

সম্ভাবনা বোঝাতেও সমাপিকা ক্রিয়ার আগে 'না' বসে : যদি না দেন না দেবেন, কী আর করা যাবে ?

৮. বাক্যালংকার অব্যয় সাধারণত বাক্যের মধ্যে বসে।

এক যে ছিল রাজা।

তাই তো ভাবছি।

ভারী তো নম্বর।

পরেও যে বসে না তা নয়, যেমন, চলে এলে যে বড় ?

৯. জোর দেবার জন্যে বা বিশেষ বাগ্‌ভঙ্গিতে 'ও' 'ই' ক্রিয়াপদের মাঝখানেও বসতে পারে : বলেওছিল, বলেইছি। 'তো'ও মাঝখানে আসতে পারে : বলে তো ছিলাম।

১০. অনেকে টাটকা গোরুর দুধ, সরু জরির পাড়—এই সব পদবন্ধনের জায়গায় গোরুর টাটকা দুধ, জরির সরু পাড় ইত্যাদি লিখতে চান। আমরা মনে করি টাটকা গোরুর দুধ, সরু জরির পাড় ইত্যাদি প্রয়োগই বাগ্‌বিধিসম্মত। গোরুর দুধ, জরির পাড় ইত্যাদি অলুক সম্বন্ধ তৎপুরুষ সমাস। তৎপুরুষ সমাসে পরপদেরই প্রাধান্য।

১১. বাক্যে অতএব, সুতরাং এ দুটি অব্যয়ের স্থান প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে সাধু-চলিত ভাষা প্রসঙ্গে। এ দুটি সাধারণত সিদ্ধান্ত বাক্যের ঠিক আগে বসে। (সপ্তম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)

১২. চলিত বাংলার শব্দবিন্যাসে কিছুটা স্বাধীনতা আছে, আমরা সাধু-চলিত ভাষার আলোচনায় তা দেখিয়েছি, কিন্তু **ক্রিয়ার জোড় ভাঙা চলে না**। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "বাংলা বাক্যবিন্যাসে যদি স্বাধীনতা না থাকত তা হলে উপায় থাকত না। এই স্বাধীনতা আছে বটে, কিন্তু স্বেচ্ছাচার নাই।

"ভাসিয়ে একেবারে দিলে কেঁদে, কিংবা

'ভাসিয়ে দিলে একেবারে কেঁদে' বলি নে।

'সে পড়ে যাবার আছে পিছনে' কিংবা

'রেখে চালাকি দাও তোমার' হবার জো নেই ? তার কারণ জোড়া ক্রিয়ার জোড় ভাঙা অবৈধ।" *[বাংলা ভাষা পরিচয়]*।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কৃতে 'তরুর্নদ্যাস্তিষ্ঠতি কূলে' চলতে পারে, কিন্তু বাংলায় 'গাছটি নদীর আছে কূলে' এমন বিন্যাস কল্পনাই করা যায় না। বাংলায় জোর বজায় রেখে বলতে হবে গাছটি নদীর কূলে। 'আছে বা রয়েছে' (তিষ্ঠতি) কথাটিও বাংলায় না থাকলে চলে।

জোড় ভাঙা চলবে না, তবে যে-যে পদের জোড় তাদের বিন্যাস বদলাতে পারে, যেমন, সোনা আমার, মানিক আমার, কথা শোন্। এখানে 'আমার সোনা'র বদলে 'সোনা আমার'ই বাগ্‌বিধি।

১৩. পদবিন্যাসের সঙ্গে সমাসের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। সমাসে যে বাক্যসংকোচন ঘটে পদবিন্যাসেও তেমনি পরিবর্তন ঘটে। যেমন,

'উপায় ছিল না বলে সে একাজ করেছে।'

অংশত সমাসবদ্ধ করে আমরা বলতে পারি 'নিরুপায় হয়ে সে একাজ করেছে।' 'মুখে তার এক চিলতে হাসি, সে হাসি আছে কি নেই তা বোঝা গেল না।'

এ বাক্যটিকে সমাস করে বলতে পারি 'তার মুখে ছিল আছে-কি-নেই এক চিলতে হাসি।'

'যে লোকটি পাগড়ি পরে আছে তাকেই চাই।'

এখানে সমাসের আশ্রয় নিয়ে বলতেই পারি 'পাগড়ি-পরা লোকটিকেই চাই।'

প্রথম উদাহরণে প্রথমাংশে সমাপিকা পড়েছে বলে অনুসর্গের জায়গায় এসেছে অসমাপিকা ক্রিয়া 'হয়ে'। পরের দুটি বাক্যে ঘটেছে গঠনগত পরিবর্তন, জটিল বাক্য হয়ে গিয়েছে সরল।

AMARBOI.COM

৩৩.২ ■ পদবিন্যাসের আদর্শ

পদ বা পদগুচ্ছ বা বড় বাক্যে অধীন বাক্য এমনভাবে বিন্যস্ত হবে যাতে অর্থবোধে কোনও কাঠিন্য না হয়। আর বক্তার বিশেষ বক্তব্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি যেন গুরুত্ব পায়। (৩১) 'ভ্রমণ করতে করতে,—যা আমার নেশার মতো, আমি একটা কথাই ভেবেছি বহু কথার মধ্যে যে একা একা ভ্রমণে তেমন আনন্দ নাই যা কিনা আছে নিঃসন্দেহে প্রিয়জন বা বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে ভ্রমণে দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে দিতে ট্রেনে কিংবা স্টিমারে। কিন্তু প্লেনে চড়ায় তেমন আনন্দ পাই না যা নিমেষে গন্তব্যে পৌঁছে দেয় কিছুই দেখতে না দিয়ে।'

৫৩ শব্দের এই বাক্যটিতে প্রক্ষেপ (parenthesis) আছে, অধীনবাক্য আছে, সমাপিকা-অসমাপিকার ভিড় আছে। কোন্ অংশটির উপর বক্তা জোর দিতে চান তা এই ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে। মনে হচ্ছে অনেক বক্তব্যই তিনি ধরতে চেয়েছেন একটি বাক্যের আধারে, যেখানে একাধিক বাক্যের প্রয়োজন ছিল।

বাক্যরীতিতে এটি শিথিল (loose), একমুখী (periodic) নয়।

Whatley এই Period কথাটির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন—

'By a Period is to be understood any sentence, whether Simple or Complex, which is so framed that the grammatical construction will not admit of a close, before the end of it; in

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

which, in short, the meaning remains suspended, as it were, till the whole is finished.'

এরই বিপরীত হচ্ছে Loose. 'একা ভ্রমণে তেমন আনন্দ নাই' এই যদি বক্তার প্রধান বক্তব্য হয় (priority) তাহলে তা আগেই বলা হয়ে গেল, তার পর আবার অধীন বাক্য দিয়ে পরবর্তী অংশ শুরু হল। অর্থ আর suspended রইল না, বা শেষে গিয়ে unfolded হল না। অন্য বক্তব্যে stress এসে গেল। আমরা লেখার সময়ে তেমন খেয়াল করি না। কিন্তু এই ধরনের 'loose' construction হয়তো থেকে যায়। একটু সতর্ক হলেই পদবিন্যাসের এই ত্রুটি আমরা এড়াতে পারি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৪

বাক্যবিন্যাস

[বাক্যের ঈপ্সিত পরম্পরা ও যুক্তিক্রম-ইত্যাদি]

বাক্যবিন্যাসের আদর্শ

শব্দবিন্যাসের সঙ্গে বাক্যবিন্যাসের কথাও এসে পড়ে। বাক্যবিন্যাসের কিছু নিয়ম :

১. পরপর বাক্যবিন্যাসের প্রথম কথা হল যৌক্তিক বিন্যাস। একটি বাক্য যেমন পূর্ববর্তী বাক্যের অনুগামী হবে, পরবর্তী বাক্যকেও তা আমন্ত্রণ করে আনবে। বলা বাহুল্য প্রথম বাক্যটি কারও অনুগামী হবে না।

২. পরপর বাক্যগুলির অর্থগত দিক যেমন দেখতে হবে তেমনি গঠনগত দিকও দেখতে হবে। বড় যৌগিক বাক্য বা জটিল বাক্যের মধ্যে হঠাৎ খুব ছোট একটি সরলবাক্য তেমন মানানসই নাও হতে পারে।

৩. পরপর বাক্যগুলির অর্থবোধে কোনও কাঠিন্য না আসে তা দেখতে হবে, এজন্যে উপযুক্ত যতি চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে। যতি চিহ্নের একান্ত অভাবও যেমন সমীচীন নয়, তেমনি যতিচিহ্নকণ্টকিত রচনাংশও তেমন সুখপাঠ্য হয় না।

এবারে একটা উদাহরণ নেওয়া যাক।

> তুমি বার বার এক কথা জিজ্ঞেস করছ কেন ? তোমার কাছে আমার গোপন করবার তো কিছু নেই। ওর সঙ্গ আমার ভাল লাগে না। সে কথা তো ওর মুখের ওপর বলবার নয়। তাই আমি নিজেকে একটু সরিয়ে এনেছি।

এই অংশটির বাক্য বিন্যাসে আশা করি ত্রুটি ধরবার কিছু নেই। বক্তা বাক্যপরম্পরায় তার মনের ভাবটি যথাযথ ভাবে প্রকাশ করেছেন। গঠনগত ভাবেও বাক্যগুলি পরিমিতি-বিরোধী নয়, যতিচিহ্নেও কোনও আতিশয্য নাই।

কিন্তু এই অংশটিই ধরুন এইভাবে লেখা হত—

> তুমি বারবার এক কথা জিজ্ঞেস করছ কেন ? আমি নিজেকে একটু সরিয়ে এনেছি,—তোমার কাছে আমার গোপন করার তো কিছু নাই, ওর সঙ্গ আমার ভালো লাগে না ; সে কথা তো ওর মুখের ওপর বলবার নয়।

এই বাক্যগুলির পারম্পর্যে বক্তব্যের স্পষ্টতা কিছুটা ব্যাহত হল। যতিচিহ্নেও কিছু বাহুল্য এবং জটিলতা এল।

৪. আসল কথা, আমি কোন বিষয়টির উপর জোর দিতে চাই বাক্য-পরম্পরার বিন্যাস সেই মতো হবে।

৫. চিন্তার একেকটি সূত্র সাধারণত একেকটি অনুচ্ছেদে (paragraph) এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাখ্যাত বা সম্প্রসারিত হবে: বাক্য বিন্যাসও তদনুযায়ী হবে। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক।

'এই পৃথিবীতে আমরা নিজনিজ বুদ্ধিবিবেচনা অনুযায়ী প্রত্যেকটি বস্তুরই মূল্যায়ন করিয়া থাকি। এই হিসাবে জীবনেরও একটি মূল্য আমরা দিই। তাহা না হইলে কাহারও দীর্ঘ জীবন আমরা কামনা করিতাম না। বর্ষীয়ানরা কনিষ্ঠদের আশীর্বাদ করিতেন না।

'কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী জীবন তো পশুরও আছে। বহু পশুপক্ষী মানুষের চেয়ে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে। অথচ কেবল এই জন্যই মানুষের জীবন-মূল্যের চেয়ে উহাদের জীবন-মূল্যকে কেহ বেশি বলিয়া মনে করে না। ইহা হইতেই স্পষ্ট বোঝা যায় শুধু দীর্ঘস্থায়িত্বকেই আমরা জীবন-বিষয়ে মূল্য দিই না।

'ইহার কারণ, মানুষ পশু নয়, মানুষ—মানুষ। কেবল আহার নিদ্রার মধ্যে তাহার জীবন সীমাবদ্ধ নয়, স্বার্থপরতার উর্ধ্বে পরকল্যাণের জন্যও তাহার জীবন উৎসর্গীকৃত।'

এখানে তিনটি অনুচ্ছেদ আছে, চিন্তাক্রমটি ধরতে অসুবিধা হচ্ছে না। প্রথম অনুচ্ছেদে জীবনের মূল্যায়নই মূল বক্তব্য। তারপর পশুজীবনের সঙ্গে মানুষের জীবনের তুলনা, তারপর পশুজীবনের সঙ্গে মানুষের জীবনের উৎকর্ষের কারণ বিশ্লেষণ। বাক্যগুলির পারম্পর্য যুক্তিক্রমের অনুযায়ী।

৬. বাক্যের মধ্যে পরপর প্রশ্নবোধক বা বিস্ময়সূচক বাক্যের বিন্যাস বক্তব্যের স্বচ্ছন্দ গতিকে ব্যাহত করতে পারে। যেমন উদ্ধৃত রচনাংশে যদি বলা হত—

এই পৃথিবীতে আমরা নিজ নিজ বুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী প্রত্যেকটি বস্তুর মূল্যায়ন করিয়া থাকি না কি? এই হিসাবে জীবনেরও একটি মূল্য কি আমরা দিই না? যদি না দিতাম তাহা হইলে কাহারও দীর্ঘ জীবন কি আমরা কামনা করিতাম?

এই ধরনের বাক্য প্রায় প্রশ্নবাণ হয়ে উঠত, পাঠকরাও মনে মনে বলতেন, 'আজ্ঞে মূল্যায়ন করে থাকি, জীবনের মূল দিয়ে থাকি, কিন্তু আপনি ঠিক কী বলতে চান স্পষ্ট করে বলুন তো!'

৭. বাক্যে ভাষাবন্ধনেরও পারম্পর্য বজায় থাকা চাই। এই রচনাংশটির দুটি অনুচ্ছেদের ভাষাভঙ্গি থেকে সরে এসে তৃতীয়টিতে আমরা হঠাৎ যদি হালকা চালের বাক্য দেখি তাহলে তা আমাদের কানে লাগবেই। তৃতীয় বাক্যের গঠন যদি এমনি হয় 'মানুষ তো জানোয়ারের মতো কেবল খাওয়া আর ঘুমানোর মধ্যে জীবন কাটায় না, নিজের গরজকেই বড় করিয়া দেখে না' ইত্যাদি, তা হলে এটা 'গুরুচণ্ডালী' দোষের মধ্যেই পড়বে।

৮. একেকটা বাক্যগুচ্ছ একেকটা একক, কিন্তু এককগুলোতেও আবার একটি বৃহৎ একক। প্রথম বাক্যে যা উন্মুখতা আনবে পাঠকের সমাপ্তিতে তার পরিতৃপ্তি ঘটবে।

৯. পুনরুক্তি চলবে না। কখনও দীর্ঘ রচনায় পুনরুক্তি বক্তব্যের প্রয়োজনে আসতে পারে কিন্তু বলে নিতে হবে, 'আগেই বলেছি যে' ইত্যাদি।

১০. ভুললে চলবে না বাক্যাংশগুলি যেমন বাক্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরপর বাক্যগুলিও তাই। সবগুলি মিলিয়ে একটি বাক্যদেহ, বক্তব্য যার হৃদয়। (৩১) তাই ৩৩.২ অনুচ্ছেদের বক্তব্য এখানেও খাটে।

এইসব নিয়মের কথা আমরা বললাম বটে কিন্তু বাগ্‌ভঙ্গি এমনই জিনিস যে কোথাও কোথাও অনিয়মই নিয়ম হয়ে ওঠে। ত্র্যবয়ব 'ন্যায়ে' হেতুবাক্য থেকে আমরা সিদ্ধান্ত বাক্যে আসি। কিন্তু বাগ্‌-ব্যবহারে আমরা আগেই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করি। হেতুবাক্য যত চেপে যাই বলার ভঙ্গিতে সিদ্ধান্তটি যেন আরও জোরালো হয়ে ওঠে।

ও ফেল করবে না তো কে করবে? বেশ বোঝা যাচ্ছে হেতুবাক্যগুলো হয়তো—ও দিন রাত টো টো করে ঘুরে বেড়ায়, ঠিক মতো ইস্কুলেই যায় না, আর সবার উপর টিভির টান।

আপনার কাছে 'ম্যাচ' আছে?—সিগারেট হাতে কেউ শুধু এটুকু বললেই বোঝা যাচ্ছে, তিনি সিগারেট ধরাতে গিয়ে ম্যাচটি পাননি, ভুল করে ফেলে এসেছেন, যাঁকে সম্বোধন করে বলছেন তাঁর ম্যাচটা উনি চান, প্রশ্নটাও প্রশ্ন নয়, অনুরোধ।

তার মানে আমাদের বাক্যগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রতিনিধিবাক্য। তাই অনুচ্ছেদের, বাক্যপরম্পরায় পুনরুক্তি এড়ানোর দিকে খেয়াল রাখতে পারে।

অনেক সময় উক্তিপ্রত্যুক্তিতে একটি অংশ অনুক্ত থাকে।

খাবি?—আঁচাব কোথায়? এই-প্রবাদ উক্তির তাৎপর্য হল বক্তা খেতে খুবই আগ্রহী, কিন্তু 'খাব' এই কথাটা সরাসরি বলতে তাঁর সঙ্কোচ।

—আপনার চায়ে বোধ হয় চিনি দিতে ভুলে গিয়েছি।

—চিনি না খাওয়াই ভাল আমাদের বয়সে।

চিনি দেননি সরাসরি না বলে এখানে মঞ্জুভাষণের আশ্রয় নেওয়া হল।

এই প্রসঙ্গে নীরদবাবুর লেখা থেকে একটা উদ্ধৃতি দিই—

> "সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই 'বঙ্গ'দেরকে সমসাময়িক বাঙালি বলিয়াই স্থির করিয়া লিখিলেন, 'আমাদেরি সেনা যুদ্ধ করেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে।' অর্থাৎ বলিলেন জয়লাভ না করিলেও হিন্দুস্থানীদের সঙ্গে নৌসেনার সাহায্যে যুদ্ধ করাও কম বীরত্বের পরিচায়ক নয়'।"

(বাঙালীর কাছে আমার শেষ কথা, শারদীয় দেশ ১৪০২)

এখানেও অনুক্তিই মঞ্জুভাষণ, এই অনুক্তিই অভিপ্রেত। এই না-বলা কথাগুলোকে স্পষ্ট করতে গেলেই বাক্যবন্ধনের ভরাডুবি। নাটকেও অনেক কথোপকথন মাঠে মারা যায় ব্যাখ্যামূলক উক্তি প্রত্যুক্তিতে।

বাক্য পরম্পরায় এ বিষয়ে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে।

প্রতিটি বাক্য একেকটি পদক্ষেপ। আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে দাঁড়িয়ে নেই তা যেন পর-পর অনুচ্ছেদগুলো থেকে বোঝা যায়। প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি বাক্যাংশ, প্রতিটি বাক্য, এবং প্রতিটি অনুচ্ছেদ যেন আমাদের কোথাও পৌঁছে দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় ভাগ : নব্য ব্যাকরণ চিন্তা

পঁয়ত্রিশ ☐ বাক্যতত্ত্ব ও আধুনিক ব্যাকরণ
ছত্রিশ ☐ পাশ্চাত্যের ভাষাচিন্তা বা ব্যাকরণচিন্তার প্রেক্ষাপট
সাঁইত্রিশ ☐ চমস্কি : রূপান্তর-সঞ্জননী ব্যাকরণ
আটত্রিশ ☐ সোস্যুর—চমস্কি ও প্রাচীন ভারতীয় বাক্‌চিন্তা
উনচল্লিশ ☐ প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণ ও নূতন ব্যাকরণ ভাবনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৫

বাক্যতত্ত্ব ও আধুনিক ব্যাকরণ

[আমাদের বাক্যতত্ত্ব চিন্তায় পদ বনাম বাক্যের দ্বন্দ্ব—আধুনিক ব্যাকরণে বাক্য-প্রধান গবেষণা]

৩৫.১ ■ পদ বনাম বাক্যের দ্বন্দ্ব

আমরা বাক্যতত্ত্ব দিয়ে প্রথা-গত ব্যাকরণ-কথা শেষ করেছি। তাতে আমরা বাক্যের গঠন ও অর্থের দিক দিয়ে বাক্যের প্রকারভেদ আলোচনা করেছি, সেই সঙ্গে পদবিন্যাসরীতি ও বাক্যপরম্পরা-বিন্যাসের দোষ-গুণও আলোচনা করেছি। বাক্য নিয়ে আমাদের দেশে সুপ্রাচীন কাল থেকেই গভীরভাবে চিন্তা করা হয়েছে। ভর্তৃহরির বাক্যপদীয়-তে ঘটেছে তার পরাকাষ্ঠা। গ্রন্থটিতে যদিও দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে ভাষারহস্যকে, তবু তা বহু ক্ষেত্রেই বাস্তবভিত্তিক। নানা ভাবেই বাক্যের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। বাক্যে পদের প্রাধান্য ঘোষণা করেছিলেন একদল তাত্ত্বিক, আর একদল ঘোষণা করেছিলেন বাক্যেরই প্রাধান্য। প্রথম দলটিকে বলা হয়েছে পদবাদী, আর দ্বিতীয় দলটিকে বলা হয়েছে বাক্যবাদী। প্রথম দলটি মূলত বলতে চেয়েছেন অংশ থেকেই সমগ্র, পদসমন্বয়েই বাক্য, তাই পদই প্রধান। বাক্যবাদীরা বলছেন বাক্য অখণ্ড। বাক্যসম্পূর্তি ছাড়া পদের কোনও স্বাতন্ত্র্যই নাই—'অখণ্ডং বাক্যমথৈকম্ভাং'।

পাণিনি ও পতঞ্জলি উভয়েই যে বাক্যের অবিভাজ্যতা স্বীকার করেছেন বাক্যপদীয়ের টীকাকার পুণ্যরাজ তা সযত্নে উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু অখণ্ড তো খণ্ড নিয়েই। এই খণ্ড যদি তুচ্ছ হবে তা হলে এঁরা পদ-পদান্বয়চিন্তা এত সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলেন কেন? মধ্যপন্থীরা বলেন পদ ও বাক্য উভয়ে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, তবে বাক্য গঠিত হবার পর পূর্ণার্থ প্রকাশিত হলে পদ গৌণ হয়ে যায়। কবি-কথায়, হয়তো এই বক্তব্যকে একটু সহজ করে দেখা যায়—

ব্যক্তি ডুবে যায় দলে, মালিকা পরিলে গলে
প্রতি ফুলে কে বা মনে রাখে।

বাক্যবাদীদের বক্তব্যকে পুণ্যরাজ কাব্যিক ভাষাতেই প্রকাশ করেছেন,—স্বাদু পানীয়ে নানা উপাদান নিজেদের স্বতন্ত্র সুবাসকে বিসর্জন দেয়, পদগুলোও তেমনি করে বাক্যে তাদের স্বাতন্ত্র্য হারায়। (৩২)

অনেক সময় দু' পক্ষই একই উক্তিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। ঋক্‌প্রাতিশাখ্যের 'পদপ্রকৃতিঃ সংহিতা' এই উক্তিটিতে পদপ্রকৃতিকে দু' পক্ষ দু' ভাবে দেখেছেন। 'পদপ্রকৃতি' এই সমাসবদ্ধ শব্দটির ব্যাসবাক্য দু' ভাবেই করা চলে—'পদের প্রকৃতি' (ষষ্ঠী তৎপুরুষ বা সম্বন্ধ তৎপুরুষ), আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পদ প্রকৃতি যার' (বহুব্রীহি)। প্রথমটির অর্থ দাঁড়াবে—পদের জন্মস্থানই হল বাক্য, অর্থাৎ বাক্যের জন্যেই পদ, পদের স্বাতন্ত্র্য নেই। এই বিশ্লেষণ বাক্যবাদীদের পক্ষে যায়, আর দ্বিতীয় বিশ্লেষণটির অর্থ দাঁড়ায় বাক্যের আসল আশ্রয়ই হচ্ছে পদ। বলাবাহুল্য এ ব্যাখ্যা পদবাদীদের প্রসন্ন করে। সত্য হয় তো নীরবে হাসে।

৩৫.২ ■ বাক্য-প্রধান গবেষণা

ওদেশে আধুনিক ব্যাকরণ বাক্যগঠনের উপরেই জোর দিয়েছে। বাক্যের সাংগঠনিক দিক নিয়েই গড়ে উঠেছে বাক্যতত্ত্ব যাকে Structuralism আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। বিভাজন-সূত্রে বাক্যের উপাদানগুলির সম্পর্ক বিশ্লেষণের গুরুত্ব আছে এই তত্ত্বে। শব্দবোধ সম্বন্ধে নূতন চিন্তার উন্মেষ ঘটিয়েছে তা। ধ্বনির স্বরূপ, ধ্বনি ও শব্দের সম্পর্ক, শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক, বাক্যের সঙ্গে অর্থের, এই সব নানা ভাব-ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে এই গঠনগত পর্যবেক্ষণ থেকে। কেউ অর্থকে আমল না দিয়ে গঠনকেই বড় করে দেখেছেন, কেউ দুয়ের সমন্বয়ের উপরেই জোর দিয়েছেন। এরই পটভূমি হিসেবে ওদেশের ভাষাচিন্তার একটি ক্রমিক বিবরণ দেওয়া যাক খুব অল্প কথায়।

নব্যতম ব্যাকরণচিন্তার পথিকৃৎ নোয়াম চমস্কি এই ঐতিহ্যের পথ ধরেই ব্যাকরণাঙ্গনে এসেছেন। তাঁর বক্তব্য উপলব্ধির জন্যেও এই প্রাক্-পটভূমির প্রয়োজন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৬

পাশ্চাত্যের ভাষাচিন্তা বা ব্যাকরণচিন্তার প্রেক্ষাপট

[গ্রিসের ব্যাকরণভাবনা—ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন ধারা—গঠনবাদিতা]

৩৬.১ ■ গ্রিসের ব্যাকরণ ভাবনা

ওদেশের ব্যাকরণের ধারা আলোচনায় প্রথমেই আসে গ্রিসের কথা। গ্রিক দার্শনিকেরাই ওদেশে ভাষারহস্যের আবরণ-উন্মোচনে অগ্রণী হন। প্লাতো (Plato—৪২৭-৩৪৮ খ্রিঃ পূঃ) তাঁর *Dialogues* গ্রন্থের ক্রাতুলাস্ অধ্যায়ে শব্দ এল কী করে তা নিয়ে ভেবেছিলেন। ভাব বা বস্তুপ্রকাশক শব্দগুলোর সঙ্গে ধ্বনির কোনও অপরিহার্য সম্পর্ক আছে কি না তা নিয়েও তিনি চিন্তা করেছিলেন। তাঁর এ সম্পর্কে আলোচনা থেকেই দুটো দলের সৃষ্টি হল। একদল বললেন দুটোর মধ্যে সম্পর্ক আছে, আর একদল বললেন, নেই। শব্দ যাদৃচ্ছিক। শুধু শব্দ-ধ্বনির সম্পর্কই নয়। প্লাতো ওই গ্রন্থের অন্যত্র বললেন—ধ্বনিহীন স্বগত সংলাপই উচ্চারিত হয়ে ভাষারূপ নেয়। ভাষার বহিরঙ্গ-গঠন সম্বন্ধেও প্রাক্-চিন্তা তাঁরই। প্লাতোর শিষ্য আরিস্ততেল-এর লেখায় এই বহিরঙ্গ গঠন সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া গেল। তিনি বাক্যাংশগুলিকে চিহ্নিত করলেন বর্ণ, অক্ষর, সংযোজক, নির্দেশক, নাম, ক্রিয়া ও কারক-বন্ধ হিসেবে। এসবের মিলিত ফলই হল বাক্ (Speech)। অর্থাৎ তিনি ক্ষুদ্রতম উপাদান থেকে ক্রমশ বৃহত্তর উপাদানে যেতে চাইলেন। স্বর, ব্যঞ্জন অর্ধস্বর ইত্যাদি বর্ণবিভাগের প্রথম পরিকল্পনা তাঁরই।

আরিস্ততেল-নির্দেশিত বাক্যবিভাগের কাঠামোই পরে ইউরোপীয় ব্যাকরণচিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল।

খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত দিওনুসিয়োস্ থ্র্যাক্স্-এর (Dionusios Thrax) 'তেক্নে গ্রামাতিকে' গ্রিক ভাষার প্রথম ব্যাকরণ। একে পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ না বলা গেলেও এই স্বল্পায়তন গ্রন্থটি গ্রিক ব্যাকরণচর্চাকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল। বাক্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থের ঘাটতি পূরণ করলেন আপোলোনিওস দুসকোলোস (Appollonios Duskolos)।

লাতিন ভাষার ব্যাকরণগুলি গ্রিকধারাই অনুসরণ করে চলল। লাতিন ভাষায় পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন দেনাতুল, খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে। এর দু'শতক পরে রচিত হয় প্রিসকিয়ানুসের লাতিন ব্যাকরণ। এই ব্যাকরণটিকে বর্ণনামূলক ব্যাকরণের (descriptive grammar) প্রথম উদাহরণ বলা চলে। এতে ধ্বনিতত্ত্ব (phonology), রূপতত্ত্ব (morphology) এবং বাক্যতত্ত্ব (syntax) তিনটি পর্বেরই বিশ্লেষণ ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৬.২ ■ ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন ধারা

মধ্যযুগে আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাগুলির উপর লাতিন প্রভাব অব্যাহত রইল। সব ভাষার ব্যাকরণ লাতিন ব্যাকরণের ধাঁচেই গড়তে হবে এই ধারণা থেকেই নির্দেশমূলক ব্যাকরণের (normative grammar) জন্ম। স্কুলপাঠ্য বইগুলোতে চলতে লাগল এই নির্দেশমূলক ব্যাকরণেরই রাজত্ব। চলমান ভাষার গতিকে যে do's and don'ts দিয়ে বেঁধে রাখা যায় না সে কথা তখন কেউ ভাবতে পারেননি।

পঞ্চদশ-যোড়শ শতকে যে নবজাগরণের সূচনা হল তাতে নানা ব্যাপারে দৃষ্টিগত যে-সব পরিবর্তন এল তারই পরিপ্রেক্ষিতে এল তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব (Comparative philology) এবং ঐতিহাসিক ভাষাবিদ্যামূলক (Historical philology) ব্যাকরণের ধারা। নতুন নতুন পথ আবিষ্কার হওয়ার ফলে ভারতের সঙ্গে ইউরোপীয় ও অন্যান্য দেশের যোগাযোগ ঘটল। এক ভাষা অন্য ভাষার মুখোমুখি হল। ফলে সেই সব ভাষার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল।

এই তুলনামূলক ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে ১৭৮৯ একটি স্মরণীয় সাল। এই সালেই স্যর উইলিয়ম জোন্‌স্ (৩৩) অনূদিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকটি ভারত ও ইউরোপের মধ্যে একটি সেতু রচনা করল। গোয়্‌টে তা পড়ে একটি কবিতা লিখলেন যার মূল বক্তব্য হল—তরুণ বয়েসের ফুল আর পরিণত বয়সের ফল যদি কেউ একত্র দেখতে চায় সে শকুন্তলা পড়ুক, স্বর্গ ও মর্ত্যকে যদি কেউ একত্র দেখতে চায় সে শকুন্তলা পড়ুক। (৩৪)

এই অনূদিত নাটকটি পাঠের ফলেই সংস্কৃতের প্রতি ইউরোপীয় পণ্ডিতদের দৃষ্টি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হল। শ্লেগেল বা, হুম্‌বোল্ট্ যিনিই তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রবর্তক হোন না কেন, গবেষণাপত্রে স্যর উইলিয়ম জোন্‌স্ গ্রিক, লাতিন ও সংস্কৃতের মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখালেন তারই ভিত্তিতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চা জোরালো হল। ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব হাত ধরাধরি করে চলতে লাগল। ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব ভাষাগোষ্ঠী-বিভাজনে সক্রিয় হল আর তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ধ্বনিগত পরিবর্তন বিশ্লেষণ করে সম্ভাব্য মূল ভাষা গঠনের চেষ্টা করতে লাগল। যেমন : OE snoru OHG snura SKt snusa GR nuos পুত্রবধূবাচক এই শব্দগুলো তুলনা করা হল। যদি GR nuos এর সহোদর শব্দ হয় এরা, তা হলে nuos এর মূল কী হতে পারে? 'snuos' কে মূল ধরা হল ধ্বনিপরিবর্তনের ধারা দেখে। [OE=old Eng. OHF=old high German SKt=Sanskrit GK=Greek] এই মূলান্বেষণে ফ্রান্‌জ বপের (Franz Bopp) গবেষণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। (৩৫)

এইসব গবেষণায় ধ্বনিপরিবর্তনের কিছু সূত্র উদ্‌ভাবিত হতে থাকল। গ্রিমের (J. Grimm) ধ্বনিপরিবর্তনের সূত্রকে কিছুটা সংশোধিত বা বিবর্ধিত করলেন ভের্নার (K. Verner).

ফ্রিডরিশ পট্ (August Friedrich Pott) প্রমুখ গবেষকেরা ব্যুৎপত্তি-নির্ণয়ের বিশেষ কিছু পদ্ধতি আবিষ্কার করে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চাকে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করলেন, কারণ ব্যুৎপত্তিই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহোদর শব্দগুলিকে চিনিয়ে দেয়।

ব্রুগ্‌মান (Karl Brugmann) ডেলব্রুক (Bertold Delbruck) প্রমুখ ভাষাবিদ্‌দের গবেষণার পথ ধরেই মেইয়ে (Antoine Meillet) প্রাচীন ভাষাগুলির তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনা করলেন। এই ব্যাকরণটি নব্যবৈয়াকরণ্‌দের কাছে একটি স্মরণীয় অবদান।

এরই সঙ্গে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা চলতে লাগল। সংস্কৃতসাহিত্য-গবেষণায় মনীষী ম্যাক্‌স্‌মুলরের (F. Maxmueller) স্মরণীয় অবদান ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে একটি মহৎ প্রেরণা সঞ্চার করেছিল।

সংস্কৃতব্যাকরণ-রচনার ক্ষেত্রে গ্রিক ভাষার অধ্যাপক ভাকেরনাগেলের (Jacob Wackernagel) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি The Ancient Indian Grammar নামে একটি সুবৃহৎ ব্যাকরণ রচনা করেন। ভারতীয় লিপির পাঠোদ্ধারের কাজ এর আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। লিপির দুশ্ছেদ্য বাঁধন থেকে ছাড়া পাওয়া ভাষাগুলো ব্যাকরণ রচনা এবং তুলনামূলক ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে নূতন মাত্রা যোগ করল। ফলে শুধু প্রাচীন ভাষা নয়, পালি ও বিভিন্ন প্রাকৃতের ব্যাকরণচর্চা শুরু হল ইউরোপে।

ভারতে প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত পাশ্চাত্য মনীষীদের মধ্যে নব্যভারতীয় আর্যভাষা নিয়ে যাঁরা ব্যাপক অনুসন্ধান করেন তাঁদের মধ্যে গ্রিয়ার্সনের (Sir George Abraham Grierson) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাঁর *Linguistic Survey of India* গ্রন্থে তিনি ভারতীয় ভাষাগুলির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে ভাষাচর্চা এবং ব্যাকরণের ক্ষেত্রে এক নূতন দিগন্তের সূচনা করলেন।

আর্যভাষা নিয়ে তুলনামূলক অভিধানগ্রন্থ রচনা করলেন টার্নার (K.L. Turner)। গ্রন্থটির নাম A Comparative Dictionary of Indo-Aryan Languages. এর আগেই দ্রাবিড় ভাষাগুলির তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনা করেন বিশপ কাল্‌ড্‌ওয়েল (Bishop Caldwell)। এই গ্রন্থেরই প্রেরণায় আর্যভাষাগুলির তুলনাত্মক ব্যাকরণ রচনা করেন জন বিম্‌স্‌ (John Beams). মধ্যভারতীয় আর্যভাষা প্রাকৃতের ব্যাকরণ রচনা করেন রিচার্ড পিশেল (Richard Pischel). এইভাবে বহু ভাষাবিদের গবেষণায় এগিয়ে চলে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব। উনবিংশ শতকে ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ ভাষাবিজ্ঞানের (Linguistics Proper) সূচনা হয় জার্মানিতে। জার্মান মনীষী ভিল্‌হেল্‌ম্‌ ফন্‌ হুম্‌বোল্‌টের (Wilhelm von Humbolt 1767-1835) *On the Variety of Human Language Structure* প্রকাশিত হয় ১৮৩৬ সালে। এটি সাধারণ ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় গ্রন্থ। গঠনগত দিক দিয়ে ভাষাবর্গীকরণেরও তিনিই পথিকৃৎ। গঠনগত দিক দিয়ে ভাষার অযোগাত্মক (isolatory, যেমন : চৈনিক ভাষা) যৌগিক (agglutinative, যেমন : তুরকি বা সোয়াহিলি) ও সবিভক্তিক (inflexional, যেমন : গ্রিক, লাতিন) এই তিনটি বর্গের দিকে তিনিই প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, পরে ফন শ্লেগেল তাকে বিধিবদ্ধ করেন।

এই হুম্‌বোল্‌টই প্রথম বলেন মানুষের মধ্যে ভাষাসৃষ্টির অসীম ক্ষমতা থাকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলেই মানুষ সীমিত উপাদানের সাহায্যে অফুরন্ত বাক্যসৃষ্টি করে চলে। মানুষের এই অন্তর্নিহিত সৃজনীবৃত্তিকে তিনি বলেছিলেন : Erzeugung অর্থাৎ generation.

হুম্‌বোল্‌টের এই বাণীটিই আধুনিকতম ভাষাতত্ত্বের জন্মদাতা।

ডারউইনের (Charles Darwin) *Origin of Species* প্রকাশিত হবার পর (১৮৫৯) চিন্তাজগতে যে বিপ্লব আসে, ভাষাতত্ত্বেও তার প্রভাব পড়ে। ভাষাকে দৃঢ়তর বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে অভিব্যক্তিবাদ। ভাষারও যে একটি জীবন আছে আর প্রাণিজগতের অভিব্যক্তির মতো তারও অভিব্যক্তি আছে এ বিশ্বাসে ভাষাকে নূতন দৃষ্টিতে দেখবার প্রবণতা দেখা দিল। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, এই নূতন ধারার ভাষাচর্চাতে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণের প্রবল প্রভাব পড়েছিল। ওটো বোয়্‌ট্‌লিঙ্ক্ (Otto Bohtlingk) পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণের ইউরোপীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৮৮৭ সালে।

উনবিংশ শতকের শেষ পাদে প্রধানত পাণিনির বর্ণনামূলক পদ্ধতির প্রভাবে পাশ্চাত্যে ক্রমে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের চর্চা সূচিত হয়।

সুইস ভাষাবিজ্ঞানী অধ্যাপক ফ্যর্‌দিনাঁদ দ্য সোস্যুর (Ferdinand de Saussure 1857-1913) সম্পূর্ণ নূতন উপলব্ধি বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। পাণিনি-পদ্ধতির সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। দ্য সোস্যুরকেই পাশ্চাত্য বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের জন্মদাতা বলা চলে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর রেখে যাওয়া নোট্‌স্ থেকে *Course in General Linguistics* ১৯১৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন শার্ল বাল্লি (Charls Balley) ও আলবেয়ার শেখেই (Albert Sechehaye)। তাঁর আগে ভাষার উপাদানগুলিকে খণ্ড খণ্ড করে বিশ্লেষণ করা হত, তিনিই বললেন অখণ্ডরূপেই ভাষার তাৎপর্য। উপাদানগুলি পরস্পর অন্বিত হয়েই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

www.amarboi.com

৩৬.৩ ■ গঠনবাদিতা

দ্য সোস্যুরের এই মতবাদের উপরেই পরে অখণ্ড গঠনবাদী বা গঠন-সর্বস্ববাদী (structuralist) মতবাদ এসেছে। দ্য সোস্যুর ভাষায় অর্থের দিকটি পরিহার করে তার বহিরঙ্গ গঠনের দিকটির উপরে জোর দেন। তাই তাঁর মতকে অখণ্ড গঠনবাদের স্থাপয়িতা বলা চলে। দ্য সোস্যুর বহিরঙ্গ গঠনের এককালিক (Synchronic) বিশ্লেষণকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এই এককালিকতা আর বর্ণনাত্মকতা একই অর্থ বহন করে, অর্থাৎ বিশেষ একটি সময়ে প্রচলিত ভাষাকেই তিনি বেছে নেন বিশ্লেষণের জন্যে, পূর্বাপর ঐতিহাসিক পরিবর্তনকে নয়। দ্য সোস্যুরের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাজন হল langue আর parole. Langue=Language আর parol=speech অর্থাৎ লোকভাষা বা নিত্যব্যবহার্য ভাষা।

দ্য সোস্যুরের প্রভাবেই বিংশ শতকের ২য়-৩য় দশক থেকে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের চর্চা প্রধানত আমেরিকায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়।

এই সময় বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়েছিলেন এডোয়ার্ড সাপির (Edward Sapir) ও লিওনার্দো ব্লুম্‌ফিল্‌ড় (Leonardo Bloomfield).

ব্লুম্‌ফিল্‌ড় অখণ্ডগঠনবাদীদের (structuralist) পথপ্রদর্শক। তাঁর বিখ্যাত Language —(১৯৩৩) গ্রন্থে দেখা যায়, তিনি অর্থপ্রসঙ্গ ছাড়াই ভাষা-উপাদান বিশ্লেষণের পক্ষপাতী। দ্য সোস্যুরের বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানকে পূর্ণাঙ্গ তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠা তিনিই দিয়েছিলেন। ব্লুমফিল্‌ড় তাঁর তত্ত্বে আচরণবাদকে (Behaviourism) বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আচরণবাদীদের মত ছিল যে অ্যামিবা থেকে মানুষ stimuli-response নীতিতে কাজ করে। এর মধ্যে মনের কোনও স্থান নেই। তাই শিশুর যে ভাষাশিক্ষা তা-ও কোনও সংস্কারজনিত নয়, আচরণজনিত।

ব্লুম্‌ফিল্ডের মতবাদের চরম বিকাশ দেখা যায় তাঁর উত্তরসাধক জেলিগ এস্. হ্যারিস-এর (Zellig S. Harris) গবেষণায়। ১৯৫১ সালে তাঁর Methods in Structural Linguistics প্রকাশিত হয়, এতে তিনি উপাদান-বিশ্লেষণ করেন তাদের গঠন ও অবস্থানের দিক থেকে। পদার্থের কোনও স্থান এতে ছিল না। গঠনসর্বস্ববাদীদের মূল বক্তব্য ভাষার একটা বিন্যাস (structure বা pattern) ; একে নিয়মও আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কারণ এই বিন্যাসও তো নিয়মবদ্ধ। এ বিন্যাস ধ্বনির ক্ষুদ্রতম একক (phoneme) বা ধ্বনিমূলের মালা গেঁথে, বরং বলা যেতে পারে রূপমূলের (morpheme) মালা গেঁথে। রূপমূলের সঙ্গে সহ-রূপ বা পূরকরূপও (allomorph) অবশ্য থাকবে।

রূপমূলকে আমরা প্রাতিপদিক বলতে পারি। সেই হিসেবে 'তিন' একটি রূপমূল, এক্ষেত্রে ধ্বনিমূল হল ত্ ই ন্ রূপগুলি। যদি বলি তেমাথা বা তেভাগা, তা হলে 'তিন'কে পাই 'তে' হিসেবে। শেষের দুই শব্দে 'তিন'এর স্থান পূরণ করছে 'তে'। 'তিন', 'তে' কে বলা হয় পূরক রূপ বা সহরূপ।

গঠনবাদীরা প্রথমে দেখেন রূপমূল ও ধ্বনিমূলগুলো কী। ভাষা-উপাদানকে বিভাজন করে তাঁরা দেখেন একই ধরনের কোন এককগুলি তাতে আছে এবং রূপমূলগুলি কোন ধ্বনিমূল নিয়ে গড়ে উঠেছে এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কই বা কী। ভাষা এঁদের চোখে রূপধ্বনীমূলীয় (morphophonemic structure). এই বিন্যাস-অধ্যয়নে তাঁরা যেভাবে বাক্যবিশ্লেষণ করেন তাকে বলা হয় Immediate Constituent analysis, সংক্ষেপে IC analysis, অর্থাৎ পরস্পর ঘনিষ্ঠ উপাদানগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ করে যে বিভাজন, এককথায় তাকে বলা চলে আসত্তি-বিভাজন।

একটা ইংরেজি বাক্য নেওয়া যাক :

An old man with a stick followed a boy with a new toy.

একে আমরা প্রথমে ভাগ করব উদ্দেশ্যবিধেয় হিসেবে :

An old man with a stick/followed a boy with a new toy.

তারপর :

An old man/with a stick ‖ followed a boy/with a new toy.

আরও বিভাজন :

An old/man/with a stick/followed/a boy/with a new toy.

এর পরেও article বা prepositionগুলো পৃথক্ করে লেখা যেতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে :

An/old/man/ with/a/stick/ follow+ed/a/boy/with/a/new/toy

একে আমরা ব্র্যাকেট দিয়ে দিয়ে লিখতে পারি :

(((An) ((old) (man)))) ইত্যাদি

এতে ব্যাপারটা একটু জটিল হয়ে পড়ে।

Tree diagram-এ অর্থাৎ বৃক্ষচিত্রে এই আসত্তি-বিভাজন দাঁড়াবে এইরকম হবে :

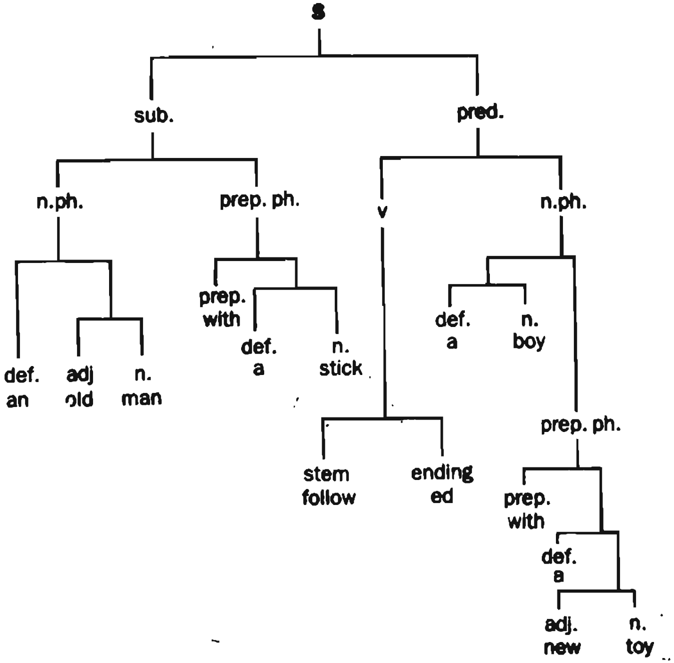

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা বাংলা বাক্য নেওয়া যাক :
বলাইয়ের ছোট ভাই নতুন বইটি পড়ছে

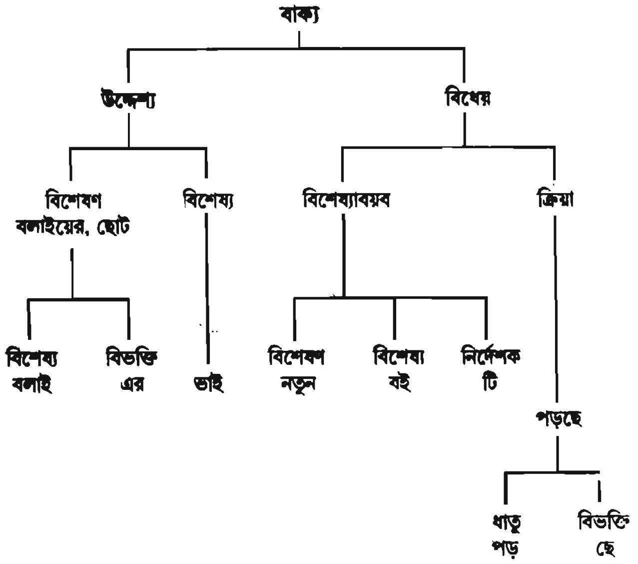

পদ-পরিচয় ছাড়াই এই বাক্যের অন্বয়টিকে এ-ভাবে প্রকাশ করা চলে, একে বলে নীড়ায়ন বা nesting.

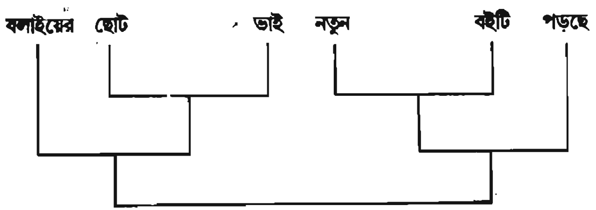

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি হিন্দি বাক্যের উদাহরণ নিই :
ছোটা বচ্চা জলদী সো গয়া

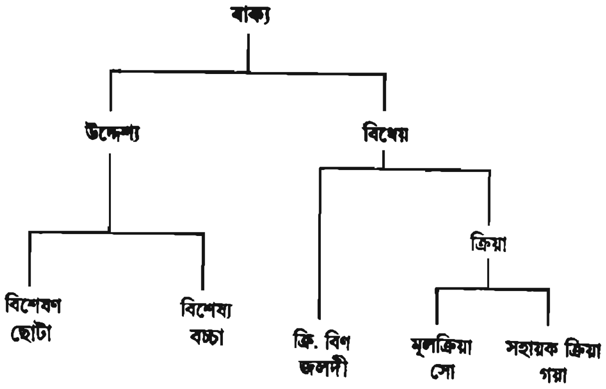

অথবা

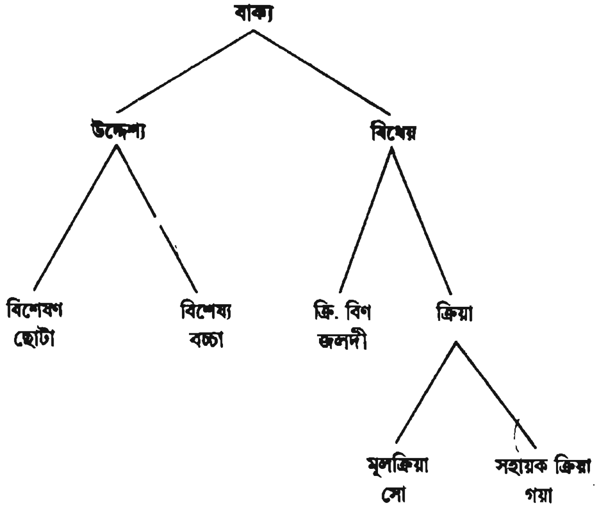

এই ধরনের বিশ্লেষণে পরস্পরসম্পর্কিত এককেকে যেমন পৃথক করে বোঝা যায়, তেমনি একক সম্মেলনে বাক্যের গঠনটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রথাগত ব্যাকরণেও বাক্যবিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। Nesfield সরল জটিল ও যৌগিক বাক্যের বিশ্লেষণ পদ্ধতি দেখিয়েছেন, বাংলাতেও তা অনুকৃত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে। উদ্দেশ্য বিধেয় এই প্রাচীন পরিভাষাই বলে দিচ্ছে সংস্কৃত ব্যাকরণেও বাক্যস্থ পদের পরস্পর সম্বন্ধ নিয়ে চিন্তা করা হয়েছে। গঠনসর্বস্ববাদীরা আরও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের পথে গিয়েছেন। আমরা যে উদাহরণগুলো দিলাম তাতে রূপমূল এবং দুটি ক্ষেত্রে সহ-রূপমূলের বিভাজন এনেছি, উহ্য রেখেছি রূপমূলের বিভাজনকে। এই বিভাজন আমাদের ধ্বনিমূলে নিয়ে যাবে। তাহলে একথা হয়তো আমরা বলতে পারি যে গঠনবাদীরা সমগ্র থেকে অংশে আসছেন, আসছেন বৃহৎ থেকে ক্ষুদ্রতম অংশে।

নব্যতর ব্যাকরণ এতেও সন্তুষ্ট হতে পারল না। সে যেন বলল হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনওখানে।

আমরা এবারে সেই অন্য কোনওখানে অর্থাৎ নব্যতর ব্যাকরণের প্রসঙ্গে আসছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৭

চম্‌স্কি : রূপান্তর-সঞ্জননী ব্যাকরণ

[চম্‌স্কি-পরিচিতি—তাঁর ভাষাচিন্তা]

আমরা এর আগের পরিচ্ছেদে যে নব্যতর ব্যাকরণের কথা বললাম তার প্রবর্তক নোয়াম্‌ চম্‌স্কি।

৩৭.১ ■ চম্‌স্কি পরিচিতি

১৯২৮ সালে চম্‌স্কির জন্ম হয় একটি ইহুদি পরিবারে। হিব্রুভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন তাঁর পিতা। চম্‌স্কি শৈশব থেকেই ভাষাচর্চায় উৎসাহী ছিলেন। দর্শন ও গণিতশাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। ডক্টরেট ডিগ্রি পান পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সাম্মানিক ডক্টরেট পেয়েছেন শিকাগো লন্ডন ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডক্টরেট দেন ১৯৭২ সালে। বিশ্বভারতী তাকে 'দেশিকোত্তম' সম্মানে ভূষিত করেন। গভীর মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ ছিলেন তিনি। ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে আমেরিকার আগ্রাসী নীতির তীব্র বিরোধিতা করার ফলে তাঁকে কারাবরণও করতে হয়েছিল। মানুষকে ভালবেসেই মানুষের ভাষাকে তিনি ভালবেসেছিলেন আর এইজন্যেই হয়তো মানুষের ভাষার মৌলিক কোনও ঐক্য-অন্বেষণ তাঁর সাধনা হয়ে ওঠে।

৩৭.২ ■ তাঁর ভাষাচিন্তা

চম্‌স্কি ১৯৫৭ সালে Syntactic Structures নামে যে বইটি লিখলেন (৩৬) তাতে তাঁর পরিকল্পিত নূতন ব্যাকরণের নাম দিলেন Transformational-generative Grammar বা রূপান্তর-সঞ্জননী ব্যাকরণ।

চম্‌স্কি বললেন, গঠনবাদী ব্যাকরণ বাক্যগঠন বোঝবার ব্যাপারে সহায়ক বটে, কিন্তু বাক্য রচনার রহস্যই সেখানে অনুদ্‌ঘাটিত। তিনি দাবি করলেন, তাঁর উদ্ভাবিত ব্যাকরণ শুধু তাৎক্ষণিক নয়, তা অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সর্বকালের সম্ভাব্য বাক্যগঠনের সূত্র বলে দেবে।

তিনি বললেন মানুষের ভাষায় আপাত-বিভিন্নতার মধ্যে একটি মূলগত ঐক্য আছে। তাঁর ব্যাকরণ যে-সূত্র গঠন করবে তা সমস্ত ভাষার পক্ষেই প্রযোজ্য হয়ে একটি বিশ্বজনীন ভাষা-ঐক্যের ইঙ্গিত দেবে।

এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, মানুষের ভাষাবোধ একটি সহজাত ব্যাপার। একে তিনি বললেন competence বা যোগ্যতা, আর এই ভাষাবোধ যখন বাক্‌খণ্ডের সাহায্যে রূপায়িত হবে তা হবে performance বা প্রয়োগ। এই competence বা সহজাতবোধ শিশুর ভাষাশিক্ষার ব্যাপারে লক্ষ করলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোঝা যাবে। শিশুর মধ্যে একটি সহজাত ভাষাবোধ কাজ করে বলেই সে ইচ্ছেমতো বাক্য গড়তে পারে। 'পাখি উড়ছে' এই বাক্যবোধেই সে 'ঘুড়ি উড়ছে' বাক্যটি গড়তে পারে. এবং পাখি ও ঘুড়ি শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দ জুড়েও বাক্য গড়তে পারে, যেমন : পাখি নেব বা ঘুড়ি নেব। বাবা ও মা এই শব্দদুটি সে জানে, যাব আর যাব না-র তফাত সে জেনেছে, তাই সম্মতি ও অসম্মতি জানাতে সে অনায়াসে বলতে পারে—মা যাব, বাবা যাব না।

চমস্কি তাই বললেন মানুষের মনের মধ্যে বাক্যগঠনের উপাদান থাকে, প্রয়োজনমতো সে তা থেকে একটি set বাইরে এনে তা দিয়ে বাক্য গড়ে . সেটি সীমিত কিন্তু ওই সীমিত শব্দসম্ভার দিয়ে সে অসীমের দিকে যেতে পারে, অর্থাৎ সংখ্যাতীত বাক্য গঠন করে। (৩৭) ইচ্ছেমতো নতুন বাক্য সৃষ্টিকে তিনি বললেন generation অর্থাৎ সঞ্জনন, আর যে ব্যাকরণসূত্রের সাহায্যে তা গঠন করবে তাকে বললেন ganerative grammar, আর সূত্রই সেই রূপান্তরের সংকেত দেবে, তাই ব্যাকরণকে তিনি নাম দিলেন transformational grammar–দুয়ে মিলে transformational-generative grammar (TG) অর্থাৎ রূপান্তরমূলক সঞ্জননী ব্যাকরণ।

এই বাক্য সমীক্ষণে আছে দুটি গঠন—একটি উপরি-গঠন (surface structure) আর একটি অন্তর্গঠন (deep structure)। অন্তর্গঠনের সেটটি উপরিগঠনে বিশেষ নিয়মে (=সূত্র) বাক্যরূপে দেখা দেয়। অন্তর্গঠনের 'শিশু + খেলনা + ভালবাসা' বহির্গঠনে 'শিশু খেলনা ভালবাসে' আকারে দেখা দেয়।

এই উৎপাদন ক্রিয়াটিকে চমস্কি একটি যন্ত্রের আনুপর্বিক উৎপাদনের সঙ্গে উপমিত করেছেন—start and stop শুরু হয়ে তা থামবে একটি নির্দিষ্ট জায়গায়। ব্যাকরণই যেন সেই যন্ত্র—যে ব্যাকরণ সীমিতাবস্থা (Finite State)। ব্যাপারটা এইভাবে ছবি দিয়ে বোঝানো চলে :

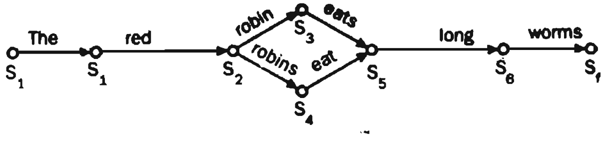

The red robin eats long worms.
The red robins eat long worms.

এখানে S_1 S_2 ইত্যাদি বিভিন্ন state, S_f হল final state.

এই ছবিতে initial state অর্থাৎ S_1 = start, আর final state = stop (S_f)। তীরগুলো দিক্‌নির্দেশক। বহু বাক্যেই এই নকশায় উৎপাদিত হতে পারে, বিশেষণ এবং বিশেষণের আগে very ইত্যাদি। বিশেষ্যগুলোর আগে fat, big ইত্যাদি উপসর্গও বসানো চলে। একে বলা হয় 'লুপ' (loop) ফাঁস।

এই চিত্রটিতে যদি long worms-এর আগে 'very' লুপ্‌টি (বিশেষণটি) বসাতে চাই তার চিত্রায়ণ হবে একইরকম :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

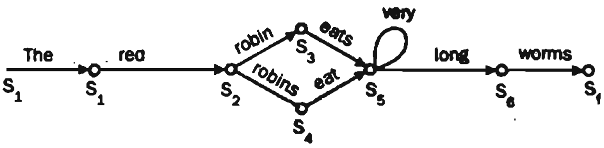

The red robin eats very long worms.
The red robins eat very long worms.

এই S উৎপাদনকে পুনর্লিখন সূত্রেও (rewrite rules) প্রকাশ করা হয়। এ ক্ষেত্রে একটি প্রতীককে অপর একটি প্রতীকে অথবা একগুচ্ছ প্রতীককে অন্য আর-এক গুচ্ছ প্রতীকে পুনর্লিখিত বা রূপান্তরিত করা হয় এবং শেষে বাক্যসৃষ্টি সম্ভব হয়। S (sentence) থেকে একটি বাক্য উৎপাদিত না হওয়া পর্যন্ত সূত্রগুচ্ছের পরম্পরা প্রতীক-পুনর্লিখন করতে থাকে।

একটা ইংরেজি বাক্য নেওয়া যাক : The boy eats an apple.
এটি সূত্রে কীভাবে derived বা উৎপন্ন হবে তা দেখানো হচ্ছে :

[S = Sentence
NP = Noun phrase
VP = Verb phrase
Det = Determinative (articles)
N = Noun
V = Verb]

AMARBOI.COM

1. S→NP + VP
2. VP→V + NP
3. NP→et + noun
4. Det→ The, an
5. Noun→ boy, apple
6. V→ eats.

রুল 1 বলছে S-কে NP+VP-তে পরিবর্তন করো,
রুল 2 বলছে VP-কে V+NP-তে " "
রুল 3 বলছে NP-র জায়গায় Det+Noun লেখো
রুল 4 বলছে Dt-র জায়গায় the, an লেখো
রুল 5 বলছে Noun-এর জায়গায় boy, apple লেখো
রুল 6 বলছে V-এর জায়গায় eats লেখ

এক এক করে এই সূত্রগুলো 'S' সংকেত প্রয়োগ করলে বাক্যের ব্যুৎপত্তি (derivation) পাওয়া যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

NP+VP (এক নং সূত্রের প্রয়োগে)
NP+V+NP (২ নং সূত্রের প্রয়োগে)
Det+noun+V+Dt+noun (৩ নং সূত্রের প্রয়োগ)
the+noun+V+an+noun (৪ নং সূত্রের প্রয়োগ)
the+boy+V+an+apple (৫ নং সূত্রের প্রয়োগে)
the+boy+eats+an apple (৬ নং সূত্রের প্রয়োগে)

কিন্তু ব্যুৎপত্তিতে

An apple eats the boy
An boy eats the apple
The apple eats an boy
এই ধরনের বাক্যও পাওয়া যায়।

আমরা যদি eat ক্রিয়াকে সচেতন কর্তার সঙ্গে নির্ধারিত করতে পারি তাহলে An apple eats the boy এ ধরনের বাক্যের উদ্ভব হবে না। এ ধরনের নির্ধারণের নিয়ম হল উপাঙ্গকে চিহ্নিত করা। শব্দের ধর্মকে চিহ্নিত করা যায় কতগুলি লক্ষণ (features) দিয়ে। এই লক্ষণে উপস্থিতির সংকেত +বা -চিহ্ন। যদি চেতনলক্ষণ '+' প্রথম Noun-এর সঙ্গে যুক্ত হয় আর '-' চিহ্ন দ্বিতীয় Noun-এর সঙ্গে যুক্ত হয় তাহলে অন্বয়ে বৈপরীত্য আসবে না।

কর্মবাচ্য (Passive Voice) নিয়ে যে সমস্যা ছিল আগেকার গঠনমূলক ব্যাকরণে তা-ও দূর হল। রূপান্তর সূত্রের সাহায্যে সরাসরি কর্তৃবাচ্যকে কর্মবাচ্যে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়। Passive Construction দেখাতে Verb-এর অংশ হিসেবে Aux (auxiliary) অংশটি সন্নিবেশ করতে হবে। সে ক্ষেত্রে The boy eats an apple এইভাবে পুনর্লিখিত হবে।

NP_1–Aux–V–NP_2→
NP_2–Aux+be+en–V–by+NP ....
এখানে NP-এর স্থানিক পরিবর্তন ঘটেছে
en এখানে past participle-এর প্রতীক।
প্রয়োগটা আমরা এইভাবে দেখাতে পারি :
NP_1 (the boy) + Aux (Present tense) + (MV) (eat) + NP_2 (an apple)
NP_2 (An apple) ? Aux (Pt) + be + en+ MV (eat) + by + NP_1 (the boy)
এই রূপান্তরকালে গ্রন্থি (string) দাঁড়াল—
An apple + Present + be + en+ by + the boy
Present + be = is
en + eat = eaten
বাক্যে পৌঁছতে গেলে :
An apple is eaten by the boy
এখানেও The boy is eaten by an apple-এ পৌঁছতে পারি আমরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই অসুবিধা দূর করতে collocation-এর উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে।

বিভিন্ন সমস্যা দূর করতে এবং Syntactic Structures-এ উপেক্ষিত দু-একটি বিষয়ে নূতন চিন্তার সংযোজন ঘটে ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত চমস্কির *Aspects of the Theory of Syntax* গ্রন্থে। অর্থের অন্তর্গ্রহনা সম্বন্ধে তিনি নূতন সিদ্ধান্তে আসেন। তাঁর ব্যাকরণে তিনটি অংশ স্বীকৃত হয় :

সংশ্লেষ (the syntactic), তাৎপর্য বা অর্থবত্তা (semantics) আর ধ্বনি (the phonologic)। সংশ্লেষ অংশ একদিকে তাৎপর্য সূত্রে অর্থ আর অপর দিকে ধ্বনির দ্বারা শ্রুতির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। তাৎপর্য বা অন্তর্গ্রহনা থেকে শুরু করে সংশ্লেষ বা বাক্য হয়ে ধ্বনিতে যাওয়া সম্ভব।

ধ্বনি ←———— [সংশ্লেষ] ←———— অর্থ

তেমনি সংশ্লেষকে কেন্দ্র করে—সংশ্লেষ থেকে ধ্বনি বা অর্থ যে কোনও দিকে যাওয়া যেতে পারে।

ধ্বনি ←———— [সংশ্লেষ] ————→ অর্থ

রূপান্তর অর্থপরিবর্তন ঘটাতে পারে কি ? ১৯৬৫-এর মডেল থিয়োরিতে বলা হয়েছে রূপান্তর অর্থের কোনও পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। তার মানে রূপান্তর গভীরতলের মূল অর্থকে মেনে নিয়ে কাজ করে।

মডেল থিওরি অবশ্য রূপান্তরের অন্য কয়েকটি কাজের কথা বলেছে, কাজ মানে এখানে রূপান্তরের ক্ষমতাকেই বুঝতে হবে। এগুলো হল :

১. বাক্যের কোনও আইটেমকে বাদ দিতে পারে (elision) : তুমি যাও>যাও

২. নকল করতে পারে (copying) :
ছেলেটি ম্যাজিক জানে>ছেলেটি কি ম্যাজিক দেখাতে পারত না ?

৩. অতিরিক্ত বাক্যিক উপাদান যুক্ত করতে পারে (addition) :
ছোট হলেও সে বুদ্ধি রাখে>ছোট হলেও সে বুদ্ধি রাখে, তাই না ?

৪. বাক্যে পদবিন্যাসে রদবদল করতে পারে (reordering) :
আকাশ যেন জুঁই ফুল ঝরিয়ে চলেছে> আকাশ যেন ঝরিয়ে চলেছে জুঁই ফুল।

পরের বছরই (১৯৬৬) Topic in the Theory of Generative grammar-এ তিনি আরও কিছুটা এগিয়ে যেতে চেষ্টা করলেন, ১৯৬৮-তে *Language and Mind*-এ অর্থতত্ত্বের মনস্তাত্ত্বিক দিক নিয়ে গভীরতর চিন্তার পরিচয় দিলেন।

চমস্কির প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রন্থটির চিন্তায় ভাষাতত্ত্বে যে বিপ্লব ঘটেছিল, সেই বিপ্লবের কালই এখনও চলছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৭.৩ ■ বিতর্ক

রূপান্তর-সঞ্জননী ব্যাকরণের রূপান্তর প্রক্রিয়া বা রূপান্তর সূত্রের প্রণালী বা প্রকৃতি নিয়ে মতান্তর চলেছেই, সেই সঙ্গে চলছে নূতন উদ্ভাবন। যেমন, case grammar। কারকপ্রক্রিয়াকে গুরুত্ব দিয়ে TG ব্যাকরণের ভিত্তিতে এই ব্যাকরণের উদ্ভাবক ফিল্‌মোর (Fillmore)। এখানে দেখছি deep structure আর surface structure-এর সম্পর্কের পার্থক্য। Deep structure-এ যে 'Key' ছিল instrumental case, (John opens the door with a key) সেই 'Key'-ই agentive case হয়ে উঠল surface structure-এ : The key opens the door.

এ প্রক্রিয়াটিও জটিল, আর এ জটিলতা সমাধানের চেষ্টায় হয়তো নূতনতর কোনও পদ্ধতি পাব আমরা। আসলে চমস্কি নিজেও তো অসুবিধা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করে চলেছেন। *Syntactic Structures* (1957)-এ যা ছিল না, তাই এল *Aspects of the Theory of Syntax*-এ। শুধু গঠনগত নয় মৌলিক চিন্তাটিই বদলে গেল— semantics পেল গুরুত্ব, যা আগে ছিল পরিত্যক্ত।

চম্‌স্কি-তত্ত্ব পরে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হল। কেউ কেউ বললেন অর্থ থেকে সরাসরি বাক্য সংজনন সম্ভব, 'deep structure' নিষ্প্রয়োজন। competence ও performance-এর দ্বৈতভাব নিয়েও তর্ক উঠল। অনেকেই নূতন পথের সন্ধানে প্রয়াসী হলেন. কিন্তু চম্‌স্কির মূলতত্ত্বটি তাতে অচল হল না। বরং তা অন্যান্য নানা শাস্ত্রেই প্রযুক্ত হতে থাকল। (৩৮)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৮

সোস্যুর-চমস্কি ও প্রাচীন ভারতীয় বাক্‌চিন্তা

[এঁদের মূল বক্তব্যে প্রাচীন ভারতীয় বাক্‌চিন্তার বিস্ময়কর সাদৃশ্য]

সোস্যুর-চমস্কির ভাষাচিন্তার পটভূমিতে আমাদের দেশের ব্যাকরণের তত্ত্বগত চিন্তার দিকে তাকালে বহু বিষয়েই প্রাক্‌চিন্তনের ইঙ্গিত পেতে পারি।

সোস্যুরকে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের জনক বলা যেতে পারে। তাঁর পিএচ. ডি-র থিসিস ছিল সংস্কৃত ব্যাকরণের 'সম্বন্ধ-পদ' নিয়ে। সোস্যুরই ও-দেশের ভাষাবিজ্ঞানকে প্রথম স্বতন্ত্র বিজ্ঞান বলেছিলেন। আমাদের দেশে এই স্বাতন্ত্র্যঘোষণা সুপ্রাচীন। ভাষাকে জীবনযাত্রার প্রথম সোপান হিসেবে ঘোষণাও এদেশে প্রথম—'ইদমাদ্যং পদস্থানম্'।

শব্দার্থের সম্পর্ক ও স্বরূপ সম্বন্ধে সোস্যুরের বক্তব্যের উৎসও সংস্কৃত ব্যাকরণের রূঢ়, যাদৃচ্ছিক ও সম্পৃক্তি শব্দে। ভাষার সামাজিক সম্পর্কচেতনাও এ দেশেরই—প্রয়োগাৎ হি শব্দানাং সাধুত্বম্। সোস্যুরের 'লাঙ্' ও 'পারোল'ও মূলত সংস্কৃত শাস্ত্রের মধ্যমা ও বৈখরী। (৩৯).

সোস্যুর কথিত সিন্‌ক্রোনিক ও ডায়াক্রোনিক ভাষা-অধ্যয়নের উদাহরণ আমাদের দেশেই সর্বপ্রথম দেখা যায়। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী—এককালিক অধ্যয়নের সর্বোত্তম উদাহরণ। এতে পাণিনির সময়ে প্রচলিত ভাষারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে। এ বর্ণনা অবশ্য প্রধানত লিখিত ভাষার। 'ভাষায়াম্' পদটিতে লৌকিক ভাষার দিকেও যে ব্যাকরণকারের লক্ষ্য ছিল তা বোঝা যায়। আর, ভাষায় বহুকালিক অধ্যয়নের উদাহরণ বররুচির প্রাকৃতপ্রকাশ। দীর্ঘদিন ধরে প্রাকৃত কীভাবে বিকশিত হয়েছে এই গ্রন্থটিতে আছে তার বর্ণনা।

আধুনিকতম ভাষাবিজ্ঞানের প্রবক্তা চমস্কিও ভাষাতাত্ত্বিক পুরাতন মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, প্রসঙ্গত পাণিনির উল্লেখও তিনি করেছেন। পূর্বসূরি হুম্‌বোল্ট ও হ্যারিসের কিছু তত্ত্বের উপরেই চমস্কির তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠা। চমস্কি তাঁর Syntactic Structure-এ বাক্যের উপরই জোর দিয়েছেন। বাক্যের এই প্রাধান্য বা গুরুত্ব ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞানেও স্বীকৃত : বাক্যপদীয়তে বলা হয়েছে : 'বাক্যই ভাষার স্ফূর্তি। সত্যি কথা বলতে কি বাক্যের পদও হয় না, আর পদেও বর্ণ হয় না। বর্ণেও খণ্ড নেই। পদ ও বর্ণের কল্পনা তো ভাষা শেখানোর সাধনমাত্র (১.৭৩)'। অন্যভাবেও বাক্যপ্রাধান্যের কথা বলা হয়েছে স্ফোট প্রসঙ্গে : বাক্যস্ফোটই প্রধান আটরকম স্ফোটের মধ্যে, অন্যেরা প্রয়োজনের সাধকমাত্র। চমস্কির competence আর performance মধ্যমা ও বৈখরী-বাক্ এর তাৎপর্য বহন করে। চমস্কি যে শিশুর সহজাত ভাষাবোধ ও প্রয়োগক্ষমতার কথা বলেছেন তা স্পষ্টত বাক্যপদীয়ে উল্লিখিত : 'মানুষের সমস্ত কার্যকলাপ ভাষার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপরে নির্ভর করে আছে। এ ব্যাপারে শিশুদের মধ্যে একটি সংস্কার আগে থেকেই সঞ্চিত থাকে। কথা বলার জন্যে প্রথমবার বাগিন্দ্রিয়ের সঞ্চালন, বায়ুকে উপরে ঠেলে দেওয়া এবং বিভিন্ন ধ্বনির উচ্চারণের জন্যে সেই সেই স্থান স্পর্শ করা ততক্ষণ সম্ভবই নয়, যতক্ষণ না শব্দের অর্থাৎ ভাষার সংস্কার থাকে।' (১-১২১-১২২)। সীমিত শব্দভাণ্ডার আর সীমিত বৈয়াকরণিক নিয়ম থেকে বক্তা সীমাহীন বা অসংখ্য বাক্য সৃষ্টি করতে পারে চম্‌স্কির এই বক্তব্যের সমর্থন ভারতীয় পরিভাষা 'আবাপ' ও 'উদ্‌বাপ' এর মধ্যে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে মম্মটভট্টের কাব্যপ্রকাশের 'অন্বিতাভিমান'বাদ স্মরণীয়।

মম্মট শিশুর সংকেত গ্রহণক্ষমতার আলোচনায় এইভাবে উদাহরণের আশ্রয় নিয়েছেন—মা শিশুকে বলেন গোরু দেখো, ঘোড়া দেখো। শিশু গোরু ঘোড়া ও দেখা শব্দ বোঝে যোগবিয়োগ প্রদ্ধতির (অন্বয়-ব্যতিরেকী) মাধ্যমে। দুটি বাক্যেই সাধারণ ক্রিয়া 'দেখো'। দর্শনক্রিয়ার বিষয়ীভূত 'গোরু'র জায়গায় 'ছাগ' বসিয়ে সেই শিশু কনিষ্ঠকে বলতে পারে 'ছাগ দেখো'।

'আবাপ' শব্দটির মূল অর্থ রক্ষণ আর 'উদ্বাপে'র অর্থ বর্জন বা বিতাড়ন। ক্রিয়াপদের সঙ্গে অন্বিত কোনও অভ্যস্ত পদকে শিশু যেমন রাখতে পারে, তেমনি তা সরিয়ে দিয়ে তার জানা অন্য পদও বসাতে পারে। তেমনি ক্রিয়াপদ সরিয়ে অন্য ক্রিয়াপদও যোজন করতে পারে (জল আনো>জল খাব)। ভর্তৃহরির ভাষায় এটি 'আবৃত্ত পরিপাক'। আর এই 'আবৃত্ত পরিপাক' আবার সংস্কারজ।

এইসব আলোচনা চম্‌স্কির উদ্ভাবনের গুরুত্বকে লাঘব করবার জন্যে নয়, শুধু ভারতীয় ভাষাচিন্তাও যে সুগভীর ছিল তাই দেখাবার জন্য। চম্‌স্কি নিজেও তাঁর চিন্তাকে মৌলিক বলে দাবি করেননি। প্রাক্‌চিন্তায় যা ছিল বীজ আকারে তাকেই তিনি মননের মাটিতে বপন করে দৃঢ়মূল তরুতে পরিণত করেছেন। যা ছিল অনুভবমাত্র তাকে তিনি প্রয়োগপরীক্ষণের মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞানসম্মত করে ভাষাচিন্তার জগতে আলোড়ন এনেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণ ও নূতন ব্যাকরণ ভাবনা

[বাংলা ব্যাকরণের নবায়নের সূত্রান্বেষণ]

আমরা বাংলাভাষার ব্যাকরণ নামে বাংলা ব্যাকরণের যে রূপরেখা রচনা করেছি, তাতে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য ব্যাকরণের কিছু স্পর্শ তো আছেই। ধ্বনিতত্ত্ব, ধ্বনিপরিবর্তনের ধারা ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রেই আধুনিক ব্যাকরণের বিশ্লেষণরীতি ও পরিভাষা গ্রহণ করা হয়েছে যাকে অনূদিত পরিভাষাই বলা চলে। বস্তুত সুনীতিকুমার ধ্বনিতত্ত্বের ক্ষেত্রে যে সব পরিভাষা সৃষ্টি করেছেন এ পর্যন্ত সেগুলিই চলছে। এবং বাংলা ব্যাকরণে তাঁর রচিত ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণের ধারা অব্যাহত। একথা আমরা আগেই বলেছি। তবু সেই সময়ের গবেষণার ভিত্তিতে পরিবর্তনাদির স্বরূপ বোঝাতে তিনি যে সব পরিভাষার সৃষ্টি করেছিলেন, কোথায় তা অব্যাপ্ত বা অতিব্যাপ্ত তা এখন একবার ভেবে দেখা দরকার। আমরা বিভিন্ন অনুচ্ছেদে প্রসঙ্গত তার উল্লেখ করেছি। যেমন দ্বিমাত্রিকতার (bimorism) জায়গায় দ্বিতীয় স্বরলোপ গ্রহণীয় কি না (৪০) বা ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষায় কিছু ধ্বনিবৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ধ্বনিপরিবর্তনের আরও কয়েকটি ধারা বাংলা ব্যাকরণে আনা উচিত হবে কি না, তাও ভেবে দেখতে হবে।

ধ্বনিতত্ত্বে 'বর্ণ' ও 'শব্দ' বিচারের সঙ্গে আধুনিক ব্যাকরণের ধ্বনিমূল বা স্বনিম (phoneme) এবং রূপমূল বা রূপিম (morpheme) এর ধারণাও হয়তো আনা যেতে পারে, স্বনিম যেমন একাধিক শব্দের মধ্যে অর্থের পার্থক্যসৃষ্টিকারী ক্ষুদ্রতম ধ্বনি-একক, 'বর্ণ' বলতে ঠিক তা বোঝায় কি না একথা ভেবে দেখা দরকার। রূপমূল বা রূপিমের সঙ্গে শব্দের পার্থক্যও এ প্রসঙ্গে এসে পড়বে। ধ্বনিমূলের মুক্তরূপ আর বদ্ধরূপের কথাও তারই সঙ্গে আলোচ্য। 'রাম' মুক্তরূপমূল, 'কে' বদ্ধরূপমূল। তা হলে 'রামকে' একটি মিশ্ররূপমূল। এদিক দিয়ে আমাদের প্রত্যয়, উপসর্গ বা প্রত্যয়কে আমরা বদ্ধরূপমূল হিসেবেও দেখতে পারি। একই বদ্ধরূপমূল মুক্তরূপমূলের সঙ্গে যুক্ত করে বহু শব্দই আমরা গড়ে তুলতে পারি। সমাসের ক্ষেত্রে একাধিক রূপমূল যুক্ত করে আমরা যৌগ রূপমূল সৃষ্টি করতে পারি অজস্র। ভাষার এই অজস্র শব্দগঠনের শক্তিকেও আমরা সঞ্জননী শক্তি (generation) আখ্যা দিতে পারি কি না তাও আমাদের চিন্তনীয়।

● সংস্কৃত পরিভাষা বাদ দিয়ে আমরা সমাসাদি প্রকরণকে হয়তো সহজ করে তুলতে পারি, যদি সমাসের নাম ও ব্যাসবাক্য বাদ দিয়ে বিভিন্ন পদের মিলিত বিন্যাস হিসেবে দেখি। বিশেষ্য-বিশেষণাদির জায়গায় N, Adj ইত্যাদি ব্যবহার করে বিষয়টাকে একটু বোঝানো যাক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেমন N+N
N+Adj
Adj+N
Adj+Adj
Adv+Adj

N+N, Adj+N ইত্যাদির জায়গায় যে বাংলা বি+বি, বিণ+বি ইত্যাদি লেখা হতে পারে তা বলাই বাহুল্য। অন্যান্য সমাসের প্রকৃতি দেখে তদনুযায়ী code ঠিক করা যেতে পারে।

● সন্ধির নিয়মগুলোকে ধ্বনিতত্ত্বের সূত্রেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা উচিত। আমরা সে চেষ্টা করেছি, এ বিষয়ে আরও গভীরতর পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন, বিশেষ করে বিসর্গের লোপ এবং স্ বা র্-তে পরিবর্তনের ব্যাপারে। সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্ব এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করতে পারে। (৪১)

এই তত্ত্ব শিশুজাতধ্বনির বাংলা উচ্চারণ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। এক ধরনের অতি-তালব্য শ উচ্চারণ কলকাতার শিক্ষিত মহলে দেখা যাচ্ছে, এই প্রবণতা রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনেও লক্ষণীয় : 'হৃদয় শুকাইল প্রেম বিহনে'। এই প্রবণতার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ খতিয়ে দেখা দরকার। বিশেষবর্ণে এই উচ্চারণ-আতিশয্যকে সংস্কৃত ধ্বনিতত্ত্বে অতিস্পর্শ দোষ বলে। এই অতিস্পর্শ দোষ র্-এর ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। এই উচ্চারণ দুটি যাদের ঘটে শাস্ত্রকারেরা তাদের 'বর্বর' আখ্যা দিয়েছেন— 'অতিস্পর্শো বর্বরতা চ রেফে' (ঋক্ প্রাতিশাখ্য)। আমরা এর ধ্বনিতাত্ত্বিক কারণ খুঁজে বার করতে চাই। সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্ব হয় তো ধরতে পারবে এর কারণ। এ বিষয়ে ডঃ পবিত্র সরকারের একটি আলোচনা থেকে কিছুটা দিকনির্দেশ পাওয়া যেতে পারে (সংবর্তনী-সঞ্জননী ভাষাতত্ত্ব, রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা ১৬শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা)।

একদিন Grammar বলতে শুধু লেখার ব্যাপারটাই বোঝাত। গ্রিক grammatike বা grammatike techne বোঝাত 'the art of writing'. এখন নব্য-ব্যাকরণ বলতে মুখের ভাষার ব্যাকরণই বোঝায়। এই জন্যে উচ্চারিত একটানা ধ্বনির পরস্পর সংঘাতে যে ধ্বনিগত পরিবর্তন, ধ্বনিগত সংযোজন বা ধ্বনিলোপ ইত্যাদি ঘটে তা মুদ্রিত লেখার দিকে তাকিয়ে বোঝবার উপায় নেই। এই জন্যে নব্যবাংলা ব্যাকরণে মুখের ভাষার উপরেই বেশি জোর দিতে হবে, তাতে বহুরকমের আশ্চর্য সব ধ্বনিগত রূপান্তর আমরা দেখতে পাব।

● বাংলা অভিধান ও ব্যাকরণের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হোক। অভিধান এগিয়ে আসুক ব্যাকরণের দিকে আর ব্যাকরণও এগিয়ে যাক অভিধানের দিকে। বাংলা ভাষাচর্চার পথে এ দুটি সহযাত্রী। অভিধানকে শুধু সহ-চর্চা না বলে বরং ব্যাকরণের একটি অঙ্গই বলা চলে। মনে পড়ে দ্য সস্যুরের উক্তি :

Is it reasonable to exclude lexicography from grammar?

এই দুটির যোগ নানাভাবেই ঘটতে পারে।

আধুনিক বানান যা ব্যাকরণ ঠিক করে দিল অভিধানে যদি তা গৃহীত না হয় তা হলে প্রশ্ন উঠবে কোনটা নেব। বানানের সমতাবিধানের চেষ্টার সঙ্গে অভিধানের চেষ্টাও মিলিত হওয়া চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

• মুখে মুখে যে-সব কথা আসছে অভিধান যদি সেগুলোকে ঠাঁই দেবার ব্যাপারে শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়, তাহলে অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাসেরই অবমাননা ঘটে। সেগুলো অবশ্য 'অশিষ্ট' বলে চিহ্নিত হতে পারে। অশিষ্টই যে একদিন শিষ্ট হতে পারে তা আমরা আলোচনা করেছি। শব্দব্যুৎপত্তির দিক থেকেও খাঁটি বাংলা শব্দকে তৎসম বা বিদেশি থেকে ব্যুৎপন্ন করতে কষ্টকল্পনার সাহায্য নেওয়া হচ্ছে কিন্তু আমাদের হাতের কাছে যে বাংলা ধাতু বা stem আছে তার দিকে চোখ পড়ে না। যেমন লাটাই শব্দের ব্যুৎপত্তি বঙ্গীয় শব্দকোষে 'নর্তকী' থেকে ধরা হল কিন্তু খাঁটি বাংলার 'লাট' থেকেই যে সুতো জড়াবার লাটাই তা মনে পড়ল না।

• তৎসম শব্দ সম্বন্ধে নতুন করে ভাববার আছে। তৎসম শব্দ বাংলায় রূপে সংস্কৃতের মতো হলেও ধ্বনিতে অন্য, তা-ই আদৌ তা তৎসম কি না সে প্রশ্ন তুলেছিলেন বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। সে প্রশ্ন কিন্তু এখনও অমীমাংসিত। তা ছাড়া আমরা মহান < মহান্, প্রথমত < প্রথমতঃ ইত্যাদি শব্দকে কি তৎসমই বলব না, এর অন্য নামকরণ প্রয়োজন ? সংস্কৃতে যেসব শব্দের প্রচলন ছিল না আমরা যেসব শব্দ সংস্কৃতের আদলে গড়ে তুলেছি পরিভাষাদির প্রয়োজনে তাকেও কি আমরা তৎসম বলব, না 'নব্যতৎসম' বা 'অনুতৎসম' এই ধরনের কিছু নাম দেব ? এ সব কথাও আমাদের ভাবতে হবে।

• বাক্যের ব্যাপারে আমরা রূপান্তরপ্রক্রিয়ায় শুধু কর্তৃবাচ্যে আসতে পারি কি না ভেবে দেখা দরকার। এ বিষয়ে আমরা বাচ্য প্রকরণে আলোচনা করেছি।

• কারকের ব্যাপারে বাংলার ক্ষেত্রে বোধ হয় সবচেয়ে বিতর্কিত। শুধু ক্রিয়ার সঙ্গে যার সম্পর্ক তা-ই কারক এই মত বর্জন করলে ব্যাপারটা হয়তো কিছুটা সহজ হয়ে আসবে। ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার করলেও 'যায় যাবে আমার যাবে, তোমার কী ?' 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।' 'গাছেরও খায় তলারও কুড়ায়।' —এইসব বাক্যে 'আমার', 'ঘরের', 'গাছের', 'তলার' এই সম্বন্ধ পদগুলির কারকত্ব বোধ হয় না মেনে উপায় নেই।

• অর্থপরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রথাগত ব্যাকরণে আমরা প্রধানত শব্দমাত্রের আলোচনা করছি। আমরা অবশ্য এই পর্যায়ে বাগ্‌বিধিও আলোচনা করেছি, কারণ শুধু শব্দমাত্রে নয়, শব্দগুচ্ছ বা পূর্ণ বাক্যেও নানা অর্থের সংকেত বা পরিবর্তন ঘটতে পারে। তা-ই বাক্যগত অর্থপরিবর্তনও এই বিভাগের বিষয়ীভূত হওয়া উচিত। বাংলায় দ্ব্যর্থকতা প্রায় প্রতিটি বাক্যে। এই অর্থান্তরের কারণ stress বা accent. যেমন : মিতা কাল এখানে এসেছিল। এই বাক্যের তিনটি অর্থ হতে পারে, 'মিতা'র উপর জোর দিলে একরকম,'কাল'-এর উপর জোর দিলে একরকম, আর 'এখানে'র উপর জোর দিলে এক রকম। প্রথম ক্ষেত্রে অন্য কেউ নয়, মিতা এখানে এসেছিল বক্তা তা-ই বলতে চায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মিতা কবে এসেছিল বক্তার বক্তব্য তা-ই। তৃতীয় ক্ষেত্রে কাল মিতা কোথায় এসেছিল বক্তা তা-ই বলতে চান। যখন কেউ কাউকে বলছে 'তোর যা খুশি করগে যা'। তখন বক্তার গলার স্বর থেকেই বোঝা যাচ্ছে তিনি মুখে যা বলছেন, মনে তা বলছেন না। এক্ষেত্রে বক্তার অভিপ্রায় যে বক্তব্যের বিপরীত তা স্পষ্ট। যখন কেউ কোনও মহিলাকে বলছেন, 'কী ভাগ্যবতী !' তখন প্রসঙ্গ অনুযায়ী সত্যিই তিনি অত্যন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাগ্যবতী এ কথা যেমন বোঝাতে পারে তেমনি তিনি পরম দুর্ভাগ্যের শিকার একথাও বোঝাতে পারে— কী ভাগ্যবতী ! আগে স্বামী গেল, তার পর একমাত্র ছেলেটি।

Semantics আজ বহুক্ষেত্রসঞ্চারী, তার যে-সব অংশ বাংলাভাষার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে সহায়ক তা ব্যাকরণে আসুক।

● আর-একটি বিষয় জরুরি বলে মনে হচ্ছে যে সব শব্দ বা প্রয়োগ আমাদের ভুল বলে মনে হচ্ছে সেগুলো কেমন করে লোকমুখে বা লেখায় এল তার phonological, semantical বা psychological ব্যাখ্যা আমাদের খুঁজে দেখা দরকার। আমরা যে 'লজ্জাকর' না বলে 'লজ্জাস্কর' বলছি ? এই ধরনের 'স্' সংস্কৃতে ভুরি ভুরি। বাংলায় কি সংস্কৃতের প্রভাবেই এল (তেজস্কর, যশস্কর ইত্যাদি) না অন্য কারণে ? এই বিষয়ে অন্যান্য ভাষায় কোনও উদাহরণ আছে কি ? আঞ্চলিক ভাষা বা লোকভাষায় ? আমরা যে 'আয়ত্তাধীন' কে ভুল বলছি, সেটা কি ঠিক হচ্ছে ? বহু প্রচলিত সমাসবদ্ধ শব্দেই তো সমার্থক দ্বৈত শব্দের মৌরসি পাট্টা। ভাষাতাত্ত্বিকেরা ব্যাকরণের গণ্ডিতে এসে এই প্রবণতার কারণ নির্দেশ করুন।

● Slang যখন আমাদেরও নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে তখন, ব্যাকরণেও শব্দসম্ভারের ক্ষেত্রে তাকে একটা আসন দেওয়া হোক। আমরা প্রসঙ্গত এ ব্যাকরণে এ বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করছি, কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিকদের বিষয়টির আরও গভীরে যাওয়ার দরকার বলে মনে করি।

● ধ্বন্যাত্মক শব্দের সঙ্গে বাংলার নাড়ির যোগ। ধ্বনিতত্ত্বের নতুন আলোকে তাদের বিশ্লেষণ করার চেষ্টা চলতে পারে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ধ্বন্যাত্মক শব্দ বিষয়ক প্রখ্যাত আলোচনাটির সম্ভাব্যতারও পুনর্বিচার প্রয়োজন।

● বাক্যবিশ্লেষণ তো বাংলা ব্যাকরণে ছিলই, Nesfield-এর ইংরেজির প্রভাবও তাতে কিছুটা পড়েছে। এই বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমরা বৃক্ষ-চিত্র বাংলা ব্যাকরণে আনতে পারি। এতে আমরা অব্যবহিত উপাদানগুলোকে আরও ভাল করে বিচার করতে পারব।

চমস্কির ভাষা সম্পর্কে মূল আদর্শ আমাদেরও গ্রহণীয়, তবে T-rule (রূপান্তর-সূত্র)-এর জটিলতার মধ্যে আমরা না গেলেও পারি। বাংলার বিচিত্র বাক্যগঠনে বহুরকম সংকেত ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়ে পড়বে, তাতেই জটিলতা বাড়বার সম্ভাবনা।

এখনও চমস্কিরই যুগ চলছে। নিজেও তিনি সংশোধন-সংযোজনের কথা ভেবে চলেছেন। তিনি যে চিন্তার তরঙ্গ তুলেছেন তাতে আমরাও দোলায়িত। বাংলায় প্রযোজ্য কোনও বিশেষ প্রক্রিয়া চমস্কিরই মৌলপ্রক্রিয়া থেকেই আমরা ভেবে বের করতে পারি কি না তাও আমাদের ভাবতে হবে। ওদেশের আধুনিক ভাষাতত্ত্ব বা ব্যাকরণ প্রধানত শুধু কথ্য ভাষাকে কেন্দ্র করেই পরিকল্পিত, বাংলা ব্যাকরণকে সাধুভাষার কথাও ভাবতে হবে, তা ছাড়া বাংলা ব্যাকরণ বাক্য বিশ্লেষণের নূতনধারা গ্রহণ করলেও শুধু বাক্যের উপর জোর দিতে পারবে না, ধ্বনি, রূপ ও বাগর্থতত্ত্বের দিকেও তাকে তাকাতে হবে।

আমরা অন্যের কাছাকাছি আসব, যতটুকু নেবার নেব, কিন্তু আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজস্বতাকে ঠিক মতো চিনে নেওয়াই যে আমাদের মূল লক্ষ্য হবে তা বলাই বাহুল্য। বিশ্লেষণের পথে চলতে চলতে আমরা ভাষার বিচিত্র সৌন্দর্যের রস যেমন গ্রহণ করতে পারি, তেমনি যেন পারি ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তিকে আবিষ্কার করতে। খাঁটি বাংলা ব্যাকরণের রূপরেখারচনায় একথাই আমাদের মনে রাখতে হবে।

আমরা শুরুতে ভাষারহস্যের কথা বলতে গিয়ে ঋগ্‌বেদের যে উদ্ধৃতি স্মরণ করেছিলাম তাতে ভাষা সম্বন্ধে আমাদের ঔদাসীন্যের ইঙ্গিত ছিল। এই ঔদাসীন্য পাঠক বা লেখককে যেন আচ্ছন্ন না করে। ভাষার প্রতি আমাদের উন্মুখতা যত বাড়বে অদৃশ্য বা অদৃষ্টপূর্ব রহস্যগুলো ততই আমাদের কাছে উন্মোচিত হবে। ব্যাকরণ বা ভাষাতত্ত্বের নূতন পথরেখাও সেই সঙ্গে রচিত হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টীকা

১. উত ত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচম্
উত ত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোতি এনাম্।
উতো ত্ব অস্মৈ তন্বং বি সস্রে—
জায়েব পত্য উশতী সুবাসা—
ঋগ্‌বেদ ১০/৭১/৪

২. প্রকৃতিবাদ অভিধানের এভাবে উল্লেখে মনটা একটু খারাপ হয়। কারণ ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত রামকমল বিদ্যালংকার রচিত সচিত্র এই অভিধানে তৎসম শব্দের সঙ্গে প্রচুর তদ্ভব এবং মুখের ভাষার শব্দ স্থান পেয়েছিল।

৩. শব্দব্যাখ্যান কথাটি এই সংকীর্ণ অর্থে গৃহীত হয়নি ওই সংজ্ঞার্থবাক্যে। শব্দ যখনই পদ হয়ে ওঠে তখনই তা বাক্যনির্ভর। তাই সাধারণভাবে ভাষাবিশ্লেষণই এই ব্যাখ্যান-বাক্যটির ঈপ্সিত ছিল।

৪. আরবিতে ব্যাকরণকে 'কোয়ায়েদ'ও বলা হয়। 'কোয়ায়েদ' কায়দা শব্দের বহুবচন। 'কায়দা' মানে রীতি, অর্থাৎ বাক্যব্যবহারের রীতি। ফারসি ও উর্দু ব্যাকরণও এই নামটিই গ্রহণ করেছে।

৫. রবীন্দ্রনাথ বাংলা-ভাষার সেই রহস্য ধরবার চেষ্টা করে খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ রচনার পথ দেখিয়েছিলেন। 'মনীষী স্মরণে' গ্রন্থে 'ব্যাকরণিয়া রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন সুনীতিকুমার।

৬. অল্পবয়সিরা হয়তো জানেনও না যে 'অম্বিষ্ট', 'অভিধা', 'ঐতিহ্য', 'প্রমা', প্রতিভাস', 'অবৈকল্য', 'ব্যক্তিস্বরূপ', 'বহিরাশ্রয়', 'কলাকৈবল্য' প্রভৃতি শব্দ ও শব্দবন্ধ—যা তাঁরা এখন ব্যবহার করেছেন—এগুলোর প্রথম ব্যবহার হয় সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় ও প্রবন্ধে, এমনকি 'ক্লাসিকাল' অর্থে 'ধ্রুপদী' শব্দটি তাঁরই উদ্ভাবনা।

'এই সব শব্দরচনার দ্বারা বাংলা ভাষায় সম্পদ ও সম্ভাবনাকে তিনি যে কতদূর বাড়িয়ে দিয়েছেন, তা হয়তো না বললেও চলে।' (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : কবি। বুদ্ধদেব বসু)

৭. জেরবার (জের-ই-বার) : ফারসি 'জের' মানে 'নীচে'। 'বার'=বোঝা। মানে, বোঝার নীচে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত।

আরবি ফারসি এবং অন্যান্য বিদেশি শব্দের তালিকার কয়েকটি শব্দব্যাখ্যা :

জ্বালাতন : আরবি 'জলা' মানে নির্বাসন। 'ওয়তন' মানে দেশ। কথাটির মূল অর্থ দেশ থেকে নির্বাসন। এই নির্বাসন খুবই দুঃখদায়ক। তাই 'জ্বালাতন' মানে দাঁড়িয়েছে 'পীড়ন'। ওই পীড়নের অর্থ বয়ে 'জলা' হয়ে উঠেছে 'জ্বালা' : লোকব্যুৎপত্তি।

তুলকালাম : আরবি তুল=বিস্তার। কলাম=কথা, দুটো মিলে অর্থ 'বাগ্‌বিস্তার', তার থেকে কথা কাটাকাটি, হৈচৈ, চিৎকার চেঁচামেচি।

নাস্তানাবুদ : ফারসি নীস্ত্ ওয়্ নাবূদ=নাই, ছিলও না। এর থেকে অর্থ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁড়াল অবর্ণনীয় দুর্দশা।

রুমাল : ফারসি 'রু'=মুখ। 'মাল' মানে যা মুছে দেয়। আসলে 'মাল' মানে 'মুছে দাও'। এটি অনুজ্ঞা পদ, সমাসে শেষ পদ হওয়ায় 'মুছে দাও' অর্থ দাঁড়িয়েছে 'মুছে দেয় যা'।

হেস্তনেস্ত : ফারসি 'হস্ত' ওয় নীস্ত=আছে বা নেই > থাকা বা না থাকা > যা হোক একটা কিছু > চরম বোঝাপড়া।

ক্যাঙারু : চলমান জন্তুটি দেখিয়ে একজন বিদেশি একজন অস্ট্রেলীয় বনবাসীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ওটা কী ?' বনবাসী উত্তর দিয়েছিল—কাং গা রু অর্থাৎ 'আমি জানি না'। প্রশ্নকর্তা ধরে নিলেন ওইটিই জন্তুর নাম।

ফাসিস্ট : লাতিন মূল 'facis'=বাণ্ডিল। মানে দাঁড়াল 'অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে দলবদ্ধ।'

নাৎসি : সতেরোটি হরফের শব্দ National Sozialist. এটি হল National Socialist Worker's Party. ১৯৩৩ সালে এই পার্টি ক্ষমতায় আসে হিটলারের নেতৃত্বে।

জুজুৎসু : জাপানি জু=মৃদু, জুৎসু=কৌশল। মূল অর্থ মৃদু কৌশলে অনেক শক্তিসাধ্য কাজ করা।

রিক্‌শা : সম্পূর্ণ শব্দ জিন-রিকি-শা=মানুষ-শক্তি-গাড়ি

সাম্পান : চিনের হালকা নৌকা বোঝায় শব্দটি। সান=তিন, পান=পাটাতন, মূল অর্থ তিন পাটাতনের নৌকা।

৮. এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য অধ্যাপক ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের গবেষণাগ্রন্থ : অপরাধজগতের ভাষা।

৯. O.K. কথাটি slang oll korrect (all correct) কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে ধরা হত। ১৯৪১ সালে নূতন তথ্য পাওয়া গেল। এই তথ্যের উৎস Saturday Review of Literature পত্রিকায় Allen Waker Reader-এর একটি বিশেষ রচনা। তিনি এই রচনায় বলেছেন OK শব্দটি OLD KINDERHOOK কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ। Van Buren এর জন্ম নিউইয়র্কের Old Kinderhook-এ। তিনি নির্বাচনে দাঁড়ালে OK হল দলের প্রতীক। প্রচারকেরা স্লোগান দিল vote for OK. OKকে vote দিলেই 'সব ঠিক'। 'OK'-এর অর্থ দাঁড়াল সব ঠিক > ঠিক আছে।

১০. 'জাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর জাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধু ভাষা কহেন আর সুনেন তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক।'

(অনুষ্ঠান পৃ. ৭ রামমোহন রচনাবলী। প্রধান সম্পাদক : অজিতকুমার ঘোষ)

১১. 'যদি বল ও-কথা বেশ ; বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোনটি গ্রহণ করব) প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান্ হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকেতার ভাষা।...কোন্ জেলার ভাষা সংস্কৃতের বেশি নিকট সে কথা হচ্ছে না—কোন্ ভাষা জিতছে সেইটে দেখ। যখন দেখতে পাচ্ছি যে কলকেতার ভাষাই অল্প দিনে সমস্ত বাঙ্গালাদেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথা-কওয়ার ভাষা এক করতে হয় তো বুদ্ধিমান অবশ্যই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এথায় গ্রাম্য ঈর্ষাটিকেও জলে ভাসান দিতে হবে।'

(বাঙ্গালা ভাষা। স্বামী বিবেকানন্দ)

১২. সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে বলা হয়েছে যা রসাপকর্ষক তাই দোষ। এ কথা যে-কোনও ভাষা সম্বন্ধেই সমান প্রযোজ্য। সাধু-চলিত যা-ই হোক না কেন প্রয়োগগত ত্রুটির জন্যে তা যদি রসসৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটায় তা হলে তা-ই হবে দোষ।

১৩. এই পরিবর্তনেরও কোনও স্পষ্ট নির্দেশ নেই ছাত্রছাত্রীদের কাছে।

ওরা চলিত থেকে সাধুতে রূপান্তরিত করার ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা মনে করে তা হল : তদ্ভব ইত্যাদি খাঁটি বাংলা শব্দের তৎসমত্ব এবং চলিত ক্রিয়াপদগুলির সংযোগমূলক ক্রিয়ায় রূপান্তর (শোনা > শ্রবণ করা)। ফলে যে-সব examination howlers পাওয়া যায় তার নমুনা—

ব্যাটারা ভারী পাজি > পুত্রেরা অত্যন্ত দুর্বৃত্ত। (দুর্বৃত্তের জায়গায় 'দুষ্কৃতী'ও লভ্য, সংবাদপত্রের প্রভাবে) শালারা টের পাবে > শ্যালকেরা উপলব্ধি করিবে। ডিঙি হয়ে ওঠে 'নৌকা', 'মাচা' হয়ে ওঠে 'মঞ্চ', উঁচু কাঠি হয়ে ওঠে 'উচ্চ দণ্ডকাষ্ঠ'। সব উদাহরণই শরৎচন্দ্রের নৈশ অভিযান থেকে। কারণ প্রত্যক্ষ উক্তি এই রচনাটিতেই আছে, আর আছে 'আরণ্যক'-এ। (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, উচ্চমাধ্যমিকে গদ্যাংশে (কৈ-ভাষা) সব পাঠ্যরচনাই সাধু ভাষায়, চলিত ভাষার রচনা একটিও নাই!) সাধু ভাষা থেকে চলিত ভাষায় রূপান্তর করার ব্যাপারেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্দেশ : ক্রিয়া ও সর্বনাম তো বটেই সমস্ত তৎসমের রূপান্তর এবং সমাসবিভাজন। ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বেত্রহস্ত, রঞ্জিতকুন্তল, মহাপাদুক বাবু' হয়ে ওঠেন :

'বেত-হাতে রাঙা-চুল বড়জুতোপরা বাবু'

হা বঙ্কিমচন্দ্র! তুমি কি জানিতে তোমার কৌতুক রসের ফেবিকলে আঁটা সমাসবদ্ধ পদগুলির ওই হাল হইবে?

পরিবর্তনের যথাযথ নির্দেশ যে পরীক্ষার্থীরা পায় না তা নয় কিন্তু নানা মতের মধ্যে পড়ে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

১৪. সংস্কৃতে এই উচ্চারণ ছিল বলেই নৈ+অক সহজেই 'নায়ক' হয়েছে, তেমনি নৌ+ইক সহজেই নাবিক হতে পেরেছে।

১৫. ণত্ব ও ষত্ব পর্যালোচনায় একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য, র, ঋ ইত্যাদি বর্ণের প্রভাব কোথাও অবাধে কোথাও বা বিশেষ বাধা সত্ত্বেও 'ন্'-এর বা স্-এর মূর্ধন্যীকরণে বর্তমান। কোথাও তা বাধা অতিক্রমণে অসমর্থ। বিদ্যুৎতরঙ্গ যেমন কোথাও পরিবাহী কোথাও অপরিবাহী তেমনি।

১৬. ১৩৬৮ সালের পঃ বঃ সরকার সংস্করণে রবীন্দ্র প্রয়োগে 'মানবক' দন্ত্য ন দিয়ে—'এই অজ্ঞাতমানবকের নিকট হইতে এই প্রকার নূতন প্রণালীর শিষ্টাচার প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞনাথ ভারী সন্তুষ্ট হইলেন।' (পৃ ৬৩)। কিন্তু অন্য দু-একটি সংস্করণে 'মাণবক' দেখেছি। এই ণত্বের একটি বিধি-সূত্র আছে :

অপত্যে কুৎসিতে মূঢ়ে মনোরৌৎসর্গিতঃ স্মৃতঃ
নকারস্য চ মূর্ধন্যস্তেন সিধ্যতি 'মাণবঃ'।

পা ৪.১.১৬১

১৭. সন্ধির আর এক নাম সংহিতা। পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা (পাণিনি)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থাৎ বর্ণের অতিশয়িত সান্নিধ্যজনিত মিলন বা পরিবর্তনের নাম সংহিতা।

১৮. আকাশবাণী ও দূরদর্শনে সংবাদপাঠে 'হয়নি', 'দেখা যায়নি' ইত্যাদি বাক্যাংশে (শ্বাসপর্বে) 'নি'-এর উপর ঝোঁক বা শ্বাসাঘাত দেওয়া হয়। এটি বাংলা উচ্চারণের স্বভাববিরোধী। 'নি' অংশটি শ্রোতারা যদি ঠিকমতো না শুনতে পায় তা হলে ঈপ্সিত নঞর্থক বাক্যটিও সদর্থক হয়ে পড়বে—এই ভয় পাঠক-পাঠিকাদের খুব অকারণ নয়। হয়তো কর্তৃপক্ষের কোনও বিশেষ নির্দেশও থাকতে পারে এ বিষয়ে। তবে কণ্ঠস্বরকে প্রয়োজনীয় উচ্চতায় রাখলে 'নি' অধঃপতিত বা অশ্রুত রইবে কেন?

১৯. যেমন লোপচিহ্ন (মাটির 'পরে, দু'জন), বর্জনচিহ্ন ইত্যাদি (কোন পঙ্ক্তি বা অনুচ্ছেদের অংশবিশেষ অনুদ্ধৃত রাখার চিহ্ন— তারপর ধরুন... সেই জারিগান, সেই ভাটিয়ালি গান ইত্যাদি)

সুনীতিকুমার এইসব চিহ্নকে, এমনকি পরিণতি দ্যোতক >, পূর্ববর্তী-রূপদ্যোতক < তুল্যতাদ্যোতক = ইত্যাদি চিহ্নকেও ধ্বনিতত্ত্বের অন্তর্গত যতিচ্ছেদ বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু এ সব চিহ্ন যে ধ্বনিনিরপেক্ষ তা বলাই বাহুল্য।

২০. কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের মধ্যে এমন সব প্রত্যয় আছে যেগুলো মূলত শব্দ, কিন্তু তা বোঝাই যায় না। এই সব ছদ্মবেশী প্রত্যয়কে প্রত্যয়াভাস বলে, যেমন—যেমন, অনীয় (অন্+ঈয়), তব্য (তু+য), শালিন্ (শাল্+ইন্), মাত্র (মা+ত্র) ইত্যাদি।

২১. শব্দকথা : ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

২২. শব্দের ঈপ্সিত অর্থে জোর দেবার জন্যেই একাধিক উপসর্গ যুক্ত হয়। অনেক সময় একই উপসর্গ দুবার ব্যবহৃত হয়, উপোপবেশন, অধ্যধিকরণ ইত্যাদি। 'বাচস্পতি' রচনায় 'সম্রাট'কে জোরালো করবার জন্যে যে সম্মমরাট্ করা হল, তাতে কৌতুক থাকলেও ভাষাবিজ্ঞানের একটি সূক্ষ্ম প্রবণতার ইঙ্গিত আছে।

২৩. বিভিন্ন ভাষাতে 'পুরুষ' কথাটিরই তর্জমা দেখা যায়। এটা প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুকরণ না স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ, জানতে ইচ্ছে হয়। সংস্কৃতে ব্যক্তি শব্দটির 'পুরুষ'-বাচকতা পরবর্তী কালে এসেছে, প্রাচীন কালে human being বোঝাতে এ শব্দটি আসেনি।

২৪. কবিতায় কোনও ছন্দের প্রয়োজনে কখনও বা অনুপ্রাসের প্রয়োজনে, এই বৈপরীত্য দেখা যায়, অর্থাৎ যা প্রাণিবাচক শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত তা অপ্রাণিবাচক শব্দে যুক্ত হয়েছে, আবার উল্টোটাও হয়েছে।

তারাগণ আর পাতাকুলের মতো বহু শব্দ দেখা যাবে পুরনো কবিতায়।

২৫. ইংরেজিতে adjective (qualifying word) শব্দটি থাকতে adverb শব্দটির কোনও প্রয়োজন ছিল কি? adverb কথাটির মূল অর্থ যা শব্দের বিশেষক।

২৬. সংস্কৃত শ্লোকে কর্মকর্তৃবাচ্য :

ক্রিয়মাণং তু যৎ কর্ম স্বয়মেব হি তিষ্ঠতি।
সুকরৈঃ স্বৈর্গুণৈঃ কর্তুঃ কর্মকর্তেতি তদ্বিদুঃ ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থাৎ কার্যকালে যে কর্মপদ কর্তার সহজসাধ্য বলে নিজগুণে স্বয়ং সিদ্ধ হয়, তাকেই কর্মকর্তা বলে। কর্মের কর্তৃত্বপ্রাপ্তি বোঝালেই এই বাচ্যের প্রয়োগ হয়।

২৭. অন্য সাতটি গণ :

হ্বাদি (হু আদি), দিবাদি (দিব্ আদি), তুদাদি (তুদ্ আদি), স্বাদি (সু আদি), তনাদি (তন্ আদি), রুধাদি (রুধ্ আদি), চুরাদি (চুর্ আদি)

মনে রাখার জন্য একটি শ্লোক প্রচলিত—

ভাদ্যদাদী জুহোত্যাদির্দিবাদিঃ স্বাদিরেব চ।
তুদাদিশ্চ রুধাদিশ্চ তনক্র্যাদিচুরাদয়ঃ ॥

এখানে 'জুহোতি' শব্দটি হ্বাদিগণকে বোঝাচ্ছে।

২৮. মহাভাষ্যে প্রথম আহ্নিকে সাতটি কারক উল্লিখিত 'সপ্তহস্তাসঃ সপ্তবিভক্তয়ঃ'। শুধু সম্বোধন পদের কারকত্ব অস্বীকৃত।

আবার অপাদানকেও কোনও কোনও ব্যাকরণে গৌণ কারক বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে কারকের সংখ্যা পাঁচে নেমে যায়।

২৯. ঋগ্‌বেদ থেকেই সমাসবদ্ধ পদের প্রয়োগ দেখা যায়। তবে দ্বি-পদ সমাসেরই প্রাধান্য ছিল, যেমন, 'বাচস্তেন' (বাক্-চৌর্য), ক্ষুধামার (অনশন-মরণ), ভদ্রবাদী (শুভভাষী) ইত্যাদি। আধুনিক ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে বহুপদময় সমাসগঠন একমাত্র জার্মান ভাষাতেই দেখা যায়। Fremdsprachenkorrespondentin (Fremd + Sprachen + Korrespondentin = Foreign language correspondent = bilingual Secretary)

Gepaeckaufbewahrungstelle
= Gepaeck + Aufbewahrung + Stelle
= lugguge + safe-keeping + office
= left-luggage office.

সংস্কৃতে বহু-পদ সমাস অনেক ক্ষেত্রেই সাহিত্যিক রীতিগত, কিন্তু জার্মান ভাষায় তা শুধু সাহিত্যে নয় কথোপকথনেও চলে।

এই সমাসবাহুল্যকে কটাক্ষ করবার জন্যেই নাকি বিসমার্ক druggist শব্দের জন্যে বিপুল দৈর্ঘ্যের একটি জার্মান শব্দ তৈরি করেছিলেন।

Gesundheitswiederherste-
Ullugsmittelzusammenmischungsverhaeltniskundig

এই শব্দটির—আক্ষরিক অনুবাদ সংস্কৃত মতে করলে দাঁড়াবে—

স্বাস্থ্যপুনর্দান-সর্বৌষধমিশ্রণতত্ত্ববিদ। গদ্যকাব্য কাদম্বরীর অর্ধপৃষ্ঠাব্যাপী সমাসবদ্ধবিশেষণ (রাজার) দেখে বহুপদময় জার্মান সমাসও যে বিপুলবিস্ময়বিস্ফারিতবিলোচন হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। Mark Twain একে বলেছেন alphabetical procession.

Welsh ভাষাতেও সমাসের আধিক্য আছে।

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantisiliogogoch

৫৮টি বর্ণের এই শব্দটি একটি গ্রামের নাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩০. কৃৎ, তদ্ধিত, সমাস একশেষ এবং সনাদি-অন্ত ধাতুরূপ—এই পাঁচটিকে বৃত্তি বলে।

বৃত্তি কথাটির মূল অর্থ অর্জন, যা নতুন অর্থ অর্জন করে তা-ই বৃত্তি। (পরার্থাভিধানং বৃত্তিঃ)।

বৃত্তির অর্থবোধক বাক্যকে বিগ্রহ বলে।

উদাহরণ :

কৃৎ—গমনের ভাব = গমন (গম্+অন)
তদ্ধিত—দশরথের পুত্র = দাশরথি (দশরথ +ই)
সমাস—গৃহের পতি = গৃহপতি
একশেষ—তুমি ও আমি = আমরা
সনাদ্যন্ত ধাতু—পান করিতে ইচ্ছুক = পিপাসু (পা+সন্+উ)

৩১. পদ ও বাক্যাদির দোষ প্রধানত অলংকারশাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে। কারণ বাক্যের যা অপকর্ষক তা-ই দোষ। গঠনগত বা অন্বয়গত দোষ। কয়েকটি দোষ :

অস্থানপদতা, ন্যূনপদতা, অধিকপদতা

প্রথমটি আলোচিত হয়েছে সপ্তম পরিচ্ছেদে।

শেষের দুটি প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে ব্যবহৃত দুটি বাক্য সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের মন্তব্যসহ উদ্ধৃত করি :

"তাহার দুর্বল হৃদয় ও প্রবুদ্ধ ধর্মবুদ্ধি—এই দুই প্রতিকূলগামী প্রচণ্ড প্রবাহ যে কেমন করিয়া কোন সঙ্গমে সম্মিলিত হইয়া এই দুঃখের জীবনে তাহার তীর্থের মত পবিত্র হইয়া উঠিবে। (শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব)

এই বাক্যটি ভাবে ও ভাষায় অতিশয় মধুর, কিন্তু প্রথম 'তাহার' অনাবশ্যক, দ্বিতীয় 'তাহার' শ্রুতিকটু।"

"ইহা সৌন্দর্যের পদমূলে অকপট ভক্তের স্বার্থগন্ধহীন নিষ্কলুষ স্তোত্র অজ্ঞাতসারে উদ্ভাসিত হইয়াছে।' (দত্তা)

...'ইহা' শুধু অনাবশ্যক নহে ; ইহার অন্বয় করাও অসম্ভব।"

প্রথম বাক্যটি অধিকপদতার উদাহরণ আর দ্বিতীয় পদটি যেমন অধিকপদতার উদাহরণ হিসেবে নেওয়া চলে, তেমনি ন্যূনপদতার উদাহরণ হিসেবেও নেওয়া চলে। স্তোত্র শব্দটির পর 'যাহা' ধরে নিলেই অন্বয়ে কোনও কাঠিন্য থাকে না। অন্বয়ের কাঠিন্যও যে পদবিন্যাসের দোষ তা আমরা আগে বলেছি।

৩২. অন্য উপমা : ময়ূরের ডিমের রসাংশ যেমন বিভিন্ন রঙের মিশ্রণে ভিন্নরূপ ধারণ করে, নরসিংহ যেমন নরও নয় সিংহও নয় অন্য কিছু তেমনি—

বাক্যবাক্যার্থয়োরখণ্ডত্বং পানকরসময়ূরাণ্ডরসচিত্ররূপ-নরসিংহগবয়চিত্র-জ্ঞানবৎ সমানমেবেবেত্যুচ্যতে। [পুণ্যরাজ টীকা পৃ ৭১]

৩৩. The Sanskrit language bears a stronger affinity to Latin and Greek both in the roots of verbs and in the forms of grammar, than could possibly have been produced by accident; so strong, indeed, that no philology could examine them all three without believing them to have sprung from some common source, which,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

perhaps, no longer exists.—১৭৮৬ সালের এক সভায় ২রা ফেব্রুয়ারি একটি লিখিত বক্তৃতায় তিনি এই মত তুলে ধরেন এবং তা Asiatic Researches-এর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ১৭৮৮ সালে।

৩৪. ১৭৯১-এ গ্যয়টে কবিতাটি লেখেন। G. B. Eastwick কৃত অনুবাদ :

> Wouldst thou the young year's blossom and
> the fruit of the decline,
> And all by which the soul is charmed
> enruptured, feasted, fed,
> Wouldst, thou the earth, and
> heaven itself in one sole name combine?
> I name the, O Sakontala! and
> all at once is said.

আলেকজান্ডার ফন্ হুম্‌বোল্‌ট, আগস্টাস উইলিয়াম ফন্ শ্লেগেল প্রমুখ বহু ভাষাতাত্ত্বিক শকুন্তলার গুণগান করেছেন।

৩৫. In 1816 in a work entitled The Sanskrit Conjugation System, Franz. Bopp studied the connextions between Sanskrit, Germanic, Greek, Latin etc. Bopp was not the first to observe these affinities or to consider that all these languages belonged to the same family. In that respect both had been forestalled naturally by the English Orientalist W. Jones.
—(Course in General Linguistics, F. de Saussure)

৩৬. Syntactic Structures-এর ভূমিকায় (পৃষ্ঠা ৬) এ ব্যাপারে চমস্কি তাঁর অধ্যাপক এবং পরে সহকর্মী Zellig. S. Harris-এর কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন।

During the entire period of this research I have had the benefit of very frequent and lengthy discussons with Zellig. S. Harris, so many of his ideas and suggestions are incorporated in the text below and in the research on which it is based that I will make no attempt to indicate them by special reference.

(Preface, Syntactic Structures : page 6)

৩৭. দ্য সস্যুরের একটি বর্ণনা অনুসরণ করে দাবাখেলার একটি উপমা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিশেষ একটি ভাষাভাষীকে তুলনা করা যেতে পারে একজন দাবাড়ুর সঙ্গে। দাবার নিয়মের সেটগুলি তিনি জানেন। এই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বিভিন্ন সিকোয়েন্সে সেই-সব সেটের প্রয়োগ করেন।

Course in General Linguistics (p. 87-88)

৩৮. Even if the attempt he has made to formalize the concepts employed in the analysis of languages should fail, the attempt itself will have immeasaurably increased our understanding of these concepts and that in this respect the 'chomskyan revolution' cannot but be successful.
(*Chomsky,* John Lyons p. 153)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৯. বাক্

পরা (নাদ)	পশ্যন্তী	মধ্যমা	বৈখরী

পরা ও পশ্যন্তী সূক্ষ্মস্ফোট, যোগ ব্যতীত শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয়। মধ্যমা জপাদি অভ্যাসে বোধ্য। বৈখরী বাগ্‌যন্ত্র দ্বারা উচ্চারিত ও সাধারণের শ্রুতিগ্রাহ্য—বাহ্যস্ফোট। এই বৈখরী সূক্ষ্মবাকের সঙ্গে সম্পর্কবিচ্ছিন্ন নয়।

তুলনীয় : তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি
ঋগ্‌বেদ ১. ১৬৪. ৪৫

তুলনীয় : রবীন্দ্রোক্তি :

বাক্যের যে ইন্দ্রজাল শিখেছি গাঁথিতে
সেই জালে ধরা পড়ে
অধরা যা চেতনার সতর্কতা ছিল এড়াইয়া
অগোচরে মনের গহনে।
(আরোগ্য ২৭)

৪০. দ্রষ্টব্য ডঃ পবিত্র সরকারের আলোচনা (দ্বিমাত্রিকতা, না দ্বিতীয় স্বর লোপ ? ভাষা ২য় বর্ষ। প্রথম প্রকাশ)

৪১. সঞ্জননী ধ্বানিতত্ত্ব মূলত ধ্বনিউচ্চারণ ও শ্রুতিতত্ত্বের (Phonetics) উপর নির্ভরশীল কারণ চম্‌স্কির দৃষ্টিতে ভাষায় ধ্বনিতাত্ত্বিক উদ্‌ঘাটন (Phonological representation) ধ্বনিগত তথ্যেরই আবেদন বা বিমূর্ত রূপ। চম্‌স্কির ভাষায় : The task in generative phonology is to relate phonological and phonetic representation by means of a set of phonological rules (or laws) in such a way that the rules state explicitly what is predicable or 'unique' in the sound system of language. একই K-ধ্বনি বিভিন্ন স্বরসান্নিধ্যে তার উদাহরণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে দেখা দেয় বা বাংলার ক্ষেত্রে একই শ-ধ্বনি বর্ণান্তরের সান্নিধ্যে কীভাবে রূপান্তরিত হতে পারে তার সূত্রনির্ণয় এই সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বের বিষয়। এখানে বহিস্তলে অন্তস্তলের ধ্বনি-ইঙ্গিত মেলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা ভাষা ও বাংলা ব্যাকরণ

Grammar of the Bengali Language : N. B. Halhed : Ananda Publishers 1980 Ed.

ODBL : Suniti Kumar Chatterjee : Rupa & Co., Cal. 1975 Ed.

গৌড়ীয় ব্যাকরণ : রামমোহন রায় : রামমোহন গ্রন্থাবলী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কলিঃ ১৩৯৮

বাংলা ভাষা পরিক্রমা : পরেশচন্দ্র মজুমদার (১ম ও ২য় খণ্ড) প্রথম সংস্করণ ১৩৯৮ দে'জ পাবলিশিং কলিঃ

বাঙালীর ভাষা : সুকুমার সেন ও সুভদ্র সেন : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রথম প্রকাশ ১৯৯০

সরল বাংলা ব্যাকরণ : শ্যামাপদ চক্রবর্তী, আই. পি. পি. কলিঃ ১৬শ মুদ্রণ ১৯৬৪

উপসর্গের অর্থবিচার : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : জিজ্ঞাসা, কলিঃ ১০৭৯ ভাষা প্রকাশ

বাংলা ব্যাকরণ : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : রূপা প্রথম সংস্করণ ১৯৮৮

বাগর্থ : বিজনবিহারী ভট্টাচার্য : জিজ্ঞাসা কলিঃ ৩য় সংস্করণ ১৯৭৭

বাংলা বানান : মণীন্দ্রকুমার ঘোষ : দে'জ পাবলিশিং কলিঃ দে'জ তৃতীয় সংস্করণ ১৪০০

মনীষী স্মরণে : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : জিজ্ঞাসা তৃতীয় সংস্করণ

ভাষা মনন : বাঙালি মনীষা : পুনশ্চ কলিঃ প্রথম প্রকাশ ১৯৯২

বাঙলা ভাষা প্রসঙ্গ : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা কলিঃ প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫

শব্দকথা : ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায় : উষাগ্রন্থমালা (২য় গ্রন্থ) সত্যপ্রসাদ ভট্টাচার্য প্রকাশিত

বাংলা : আজকাল, কলিঃ ১৪০০ বঙ্গাব্দ ১৯৪৭

শব্দ যখন গল্প বলে : জ্যোতিভূষণ চাকী : বেস্ট বুক্স্ কলিঃ ১৯৯১ প্রথম প্রকাশ

বাংলাভাষা চর্চা : সুভাষ ভট্টাচার্য : সাহিত্য সংসদ, ১৯৯২

শব্দের জগৎ : পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য : জিজ্ঞাসা, কলিঃ প্রথম সং ১৯৮০

A Comparative Grammar of East Bengali dialects : Gopal Haldar : Puthipatra, Cal. 1st Ed. 1986

বাংলায় দ্রাবিড় শব্দ : সত্যনারায়ণ দাশ : বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলা ভাষার ব্যাকারণ ও তার ক্রমবিকাশ : নির্মল দাশ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কলিঃ প্রথম প্রকাশ ১৩৯৪
বাংলা কী লিখবেন কেন লিখবেন : আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহারবিধি : সম্পাদনা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : পরিমার্জিত ২য় সংস্করণ ১৯৯৪
বাংলা গদ্য : জিজ্ঞাসা : সমতট

অন্যান্য ভাষার ব্যাকরণ ও ভাষা সমীক্ষা

সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ : পরেশচন্দ্র মজুমদার : দে'জ পাবলিশিং কলিঃ ২য় সংস্করণ (অখণ্ড) ১
Higher Persian Grammar : D. C. Phillott C. U. 1919
A Comprephensive Grammar of the Eng. Language : Bu Randolf and others : Longman Grout Limited 1986
English Grammar Series : J. C. Nesfield : Radha Publishers House, Cal. Second Ed. 1992
King's English : Fowler & Fowler
হিন্দী ব্যাকরণ : কামতাপ্রসাদ
বৃহৎ বাকরণ ভাস্কর : ড. বচনকুমার : ভারতী ভবন, পটনা-৩, ১৯৯১
বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তকৌমুদী : ম. ম. প. : গিরিধর শর্মা চতুর্বেদ ও ম. ম. প. পরমেশ্বরানন্দ বিদ্যাভাস্কর মোতীলাল বনারসী দাস, দিল্লি, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৯ পুনর্মুদ্রণ
A Vedic Grammar for Students : A. A. Macdonell : Oxford University Press Delhi, 10th Ed. 1986
Usage and Abusage : Eric Patridge : Penguin Books Rev. Ed. 1979
ভারতীয় ভাষাচিন্তন : ভারতীয় ভাষা পরিষৎ কলিঃ, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৭

AMARBOI.COM

সাধারণ ভাষাতত্ত্ব

Language : Bloomfield Leon & Motilal Benarasi 1980.
Course in General Linguistics : de Saussur, Ferdinand and Ed. G. C. Bally & Others : Peter Owan Ltd. 1960 Ed.
Language : Its nature, development & origin : Otto Jesperson, George Allen & Unwin Ltd. 1959
Modern Linguistics : Simeon Potter Andre Deautsch : Ed. 1957.
Elements of the Science of Language : I. J. S. Taraporwala : C. U. 1978 4th Ed.
বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, অষ্টম সংস্করণ ১৯৭৪
ভাষার ইতিবৃত্ত : সুকুমার সেন : ইস্টার্ন পাবলিশার্স চতুর্দশ সং, ১৯৮৩
সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা : রামেশ্বর শ, পুস্তক বিপণি কলিঃ, অখণ্ড ২য় সংস্করণ ১৩৯৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষাবিজ্ঞানের গোড়ার কথা : মোহিতকুমার রায় : মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ কলিঃ প্রথম প্রকাশ ১৯৮৮

Essays on Indo-European Linguistics : Ed. Satya Ranjan Banerjee : The Asiatic Society 1st Ed. 1990

ভাষাতত্ত্ব, বাংলা ভাষা পরিচয় : রবীন্দ্রনাথঠাকুর : পঃ বঃ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলী জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ ২৫শে বৈশাখ, ১৩৮৬

ভাষাবিজ্ঞান কী ভারতীয় পরম্পরা ঔর পাণিনি : রামদেব ত্রিপাঠী : বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষদ পটনা-৪, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৭

আধুনিক ভাষাতত্ত্ব : রূপান্তর সংজননী ব্যাকরণ

Syntactic structures : Noam Chomsky : Mouton, The Hague 1957.

Aspects of the Theory of Syntax : Noam Chomsky : MIT Press Cambridge, Massachusette 1965.

Grammar : Frank Palmer : Penguin Book 1st ed. reprint 1972-73

Learning about Linguistics : F. C. Stork & J. D. A. Widdowsons : Hutchinson and Co,. London 1985 Ed.

Transformational Grammar : John T. Grinder and S. H. Elgin.

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান কী ভূমিকা : মতীলাল গুপ্ত রঘুবীরপ্রসাদ : রাজস্থান হিন্দী গ্রন্থ অকাদমী, জয়পুর প্রথম সংস্করণ ১৯৭৪

ভাষাতত্ত্ব : রফিকুল ইসলাম : বুক ভিউ ঢাকা চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯২

ভাষার কথা : মহম্মদ দানীউল হক : ধানশীষ, ঢাকা ১৯৯০

আধুনিক ভাষাতত্ত্ব : আবুলকালাম মনজুর মুরশেদ : বাংলা একাডেমী, ঢাকা

ভাষাজিজ্ঞাসা : শিশিরকুমার দাশ : প্যাপিরাস, কলি. প্রথম সংস্করণ ১৯৯২

কথায় ক্রিয়াকর্ম : প্রবাল দাশগুপ্ত : দে'জ পাবলিশিং কলি. প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭

শব্দকোষ

A Practical Vedic Dictionary : Suryakant Oxford : University Press 1981 Ed.

A Dictionary of Sansk. Gram : K. V. Abhyankar : Oriental Institute, Baroda 1st Ed. 1961

Sans.—Eng. Dictionary : Monier Williams : Orient Publishers Delhi-6, New Ed.

বঙ্গীয় শব্দকোষ : হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্য একাদেমী সংস্করণ ১৯৬৭

অপরাধজগতের শব্দকোষ : ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক : নবভারত পাবলিশার্স কলিঃ প্রথম সংস্করণ ১৩৭৮

নিরুক্ত : পণ্ডিত শ্রীসুকুমার শর্মা ও মেহেরচাঁদ লছমন দাস সম্পাদিত, নিউদিল্লি, ১৩৮২

ভাষাবিজ্ঞান কোষ : ভোলানাথ তিওয়ারী : বারাণসী জ্ঞানমণ্ডল লিঃ প্রথম সংস্করণ ২০২০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধুনিক বাংলা প্রয়োগ অভিধান, সুভাষ ভট্টাচার্য : ডি এম লাইব্রেরি কলিঃ ২য় সং ১৯৮৬
Learners' Hindi—Eng. Dictionary Harder Bahri. Rajpal & Sons, Delhi-8, 11th Ed. 1994
Persian-English Dictionary :
Steingass : Routledge & Kegan Paul, London, 1963 Ed.
Perso-Arabic Elements in Bengali : Central Board for Development of Bengali 1st Ed. 1967.
আল-কাওসার (বাংলা-আরবি অভিধান) সংকলন : মওলানা মোঃ আবদুল বাতেল, কাওসার পাবলিকেশন, ঢাকা : ১৪০০ হিজরী

অলংকারশাস্ত্র ও ভাষাদর্শন

সাহিত্য দর্পণ : বিশ্বনাথ কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ ত্রিবেদী ও মেহরচন্দ লছমন দাস : ১৯৪২ সংস্করণ
কাব্যপ্রকাশ : মম্মট ভট্ট
The Philosophy of Word and Meaning : Gouri Shastri. Cal. Sanskrit College Research Series No. 5,1959
Rhetoric & Prosody : Rai R. N. Bose Bahadur : Chakrvarty & Chatterjee Ltd. Cal. 1937
বাক্যপদীয় : সম্পাদনা বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য : পঃ. বঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ : প্রকাশনকাল ১৯৯১
শব্দ ও অর্থ (শব্দার্থের দর্শন) রমাপ্রসাদ দাস : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৫

AMARBOI.COM

প্রবন্ধ (ব্যাকরণ : ভাষাতত্ত্ব)

বাঙ্গালার সর্বনামপদ : শ্রীবেদান্ত মাইতি : বঙ্গীয় সাহিত্য পর্ষৎ পত্রিকা বর্ষ ৬১, সংখ্যা চার।
বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা : চিন্তাহরণ চক্রবর্তী ঐ : বর্ষ ৫৭ সংখ্যা ১-২
বাঙ্গালা শব্দতত্ত্ব : জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস : ঐ বর্ষ ৮ সংখ্যা ১
শব্দচর্চা : দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় : ঐ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা ৪
বাংলা শব্দবিভক্তি সম্বন্ধে দুই একটি কথা : প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় : ঐ, বর্ষ ২১, সংখ্যা ৩
অনুবাদাত্মক সমাস : প্রণবেশ সিংহরায় বর্ষ ৫২ সংখ্যা ১-২
অতীতে ল ও ভবিষ্যতের প্রত্যয় : বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় : ঐ বর্ষ ২০, সংখ্যা ৪
ব্যাকরণের সন্ধি : বিজয়চন্দ্র মজুমদার : বর্ষ ১৮ সংখ্যা ১
বাঙলার বিশেষণরহস্য : ব্যোমকেশ মুস্তফী : ঐ বর্ষ ১৭ সংখ্যা ৩
সাঁওতালী ভাষার সঙ্গে বাঙলার ঘনিষ্ঠতা : ক্ষুদিরাম দাশ : আকাদেমি পত্রিকা, পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য আকাদেমি সংখ্যা ২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্কুলপাঠ্য বাংলা ব্যাকরণ : ব্যাধি ও প্রতিকার, পবিত্র সরকার, ঐ সংখ্যা।
বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় ভাষাতত্ত্বচর্চা : রফিকুল ইসলাম : ঐ, সংখ্যা ১
রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বিশেষ হ্যালহেড সংখ্যা বর্ষ ১৬ সংখ্যা ৪
বাংলা ভাষায় নিষেধাত্মক উপাদান : পবিত্র সরকার : বাংলা পত্রিকা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।
দ্বিমাত্রিকতা, না দ্বিতীয় স্বরলোপ : পবিত্র সরকার (ভাষা : দ্বিতীয় পর্ব ১ম সংখ্যা)
স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিত, অপশ্রুতি, নামকরণ বর্জনের পক্ষে একটি প্রস্তাব : পবিত্র সরকার (ভাষা : তৃতীয় বর্ষ ১ম প্রকাশ)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্দেশিকা

অঘোষবর্ণ ৭৭
অঘোষীভবন ৮৬
অতিস্পর্শদোষ ২৯৫
অধিকরণ ২২৩
অনাসিক্যীভবন ৮৭
অনুকার অব্যয় ১৮৩
অনুক্তকর্তা ২০১
অনুজ্ঞা (ভাব) ১৯৫
অনুবাদ শব্দ ৩৫
অনুসর্গ ২১৪
অন্তর্গঠন ২৮৭
অপশব্দ ৩৬
অপশ্রুতি ৮৪, ১২৩
অপাদান ২১৭
অপিনিহিতি ৮৩
অবনীন্দ্রনাথ ৫৩
অব্যয় ১২০, ১৭৯
অব্যয় (ছদ্মবেশী) ১৮৫
অব্যয়ীভাব ২৪০
'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' ২৭৮
অভিশ্রুতি ৮৩
অমিত্রাক্ষর ১১৫
অমিয় চক্রবর্তী ২৪৮
অযোগাত্মক (ভাষা) ২৭৯
অর্থ পরিবর্তন (কারণ) ৪০
অর্থের অপকর্ষ ৩৯
অর্থের উৎকর্ষ ৩৯
অর্থের বিস্তার ৩৯
অর্থের রূপান্তর ৩৯, ৪০
অর্থের সংকোচ ৩৯
অর্থের সংক্রমণ ৩৯
অর্থের সংশ্লেষ ৩৯
অর্ধচ্ছেদ ১১২
অল্পপ্রাণীভবন ৮৬
অষ্টাধ্যায়ী ২৮০
অসংলগ্ন সমাস ২৪৫
অসমাপিকা ক্রিয়া ১৯৩

আকাঙ্ক্ষা ২৫৫
আচরণবাদী ২৮১
আপোলোনিয়োস দুসকোলোস ২৭৭
আবাপ ২৯৩
'আবোলতাবোল' ২১
আভ্যন্তর যতি ১০৮
আরিস্ততেল ২৭৭
আসত্তি ২৫৫

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২৪

উক্তকর্ম ২০২
উক্তিভেদ ২৬১
উণাদি প্রত্যয় ১২৮
উদয়নারায়ণ সিংহ ২৬
উদ্ধৃতি চিহ্ন ১১৩
উদ্বাপ ২৯৩
উপরি গঠন ২৮৭
উপসর্গ (বিদেশি) ১৫২
উপসর্গ (স্বরূপ) ১৪৫
উপসর্গ (সংস্কৃত) ১৪৫
উপসর্গ (বাংলা) ১৫১
উপসর্গ (সংজ্ঞা) ১৪৫
উভয়লিঙ্গ ১৬৩
উষ্মবর্ণ ৭৫
উষ্মীভবন ৮৭
একশেষ ২৪৫

ঐন্দ্র (ব্যাকরণ) ২৩

কলাপ (ব্যাকরণ) ২৪
করণ ২১৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্তা ২১৪
কর্তৃক ও দ্বারা ২০৪
কর্তৃবাচ্য ২০১
কর্ম ২১২
কর্মকর্তৃবাচ্য ২০৩
কর্মধারয় ২৩৮-২৪০
কর্মবাচ্য ২০১
কাল্ড্ওয়েল, বিশপ ২৭৯
কাতন্ত্র (ব্যাকরণ) ২৩
কাত্যায়ন ২৩
কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ২৪৮
কারক ২১০
কালিদাস ৭৯
কৃৎ ১২২
কৃষ্ণযজুর্বেদ ২৩
কেরি, উইলিয়ম ২৪
ক্রাতুলাস ২৭৭
ক্রিয়া ১৮৮
ক্ষতিপূরক দীর্ঘায়ণ ১০৪
ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী ১০, ১১

খগেন্দ্রনাথ মিত্র ১০

গঠনসর্বস্ববাদী ২৮০
গণবিভাগ ২০৫
গুণ ১৪৭
গৌড়ীয় ব্যাকরণ ২৪
গৌণকর্ম ১৯২
গ্রিম ২৭৮
গ্রিয়ার্সন ২৪, ১৮০, ২৭৯

ঘোষবর্ণ ৭৭
ঘোষীভবন ৮৬
চম্‌স্কি, নোয়াম ২৫, ২৬, ২৭৬,
২৯২-৯৩, ২৯৭
চলিতভাষা ৪৮
চান্দ্র (ব্যাকরণ) ২৩
চারুচন্দ্র ঘোষ ১০

জগন্নাথ চক্রবর্তী ২৪৮
জীবনানন্দ দাশ ২৯, ৯৬, ২৪৮, ২৫৬
জৈনেন্দ্রীয় (ব্যাকরণ) ২৩
জোন্স, স্যর উইলিয়ম ২৭৮
জৌমর (ব্যাকরণ) ২৪
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০

ডেল্‌ব্রুক ২৭৯
ডারইউন, চার্লস্ ২৮০

তৎপুরুষ ২৩৩-৩৭
তৎসম শব্দ ২৭
তদ্ভব শব্দ ২৯
তারতম্য ১৭৬-৭৭
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৩
তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্ব ২৭৮
তেকনে গ্রামাতিকে ২৭৭

থ্র্যাক্স্, দিওনুসিয়োস্ ২৭৭

দগ্ধ দোষ ৮০
দৃষ্টান্তচ্ছেদ ১১২
দেশি শব্দ ৩৪
দো-আঁশলা শব্দ ৩৬
দ্বিকর্মক ক্রিয়া ১৯১
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০, ১১
দ্বিমাত্রিকতা ৮৬

ধাতু (অশিষ্ট) ২০৯
ধাতু (অসম্পূর্ণ) ২০৯
ধ্বনিবিপর্যয় ৮৪
ধ্বনিমূল-রূপমূল (বিন্যাস) ২৮১
ধ্বনিলোপ ৮৫
নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ ২৫, ১৬৩
নামধাতু ১৮৯
নাসিক্যীভবন ৮৮
নিত্যসমাস ২৪৪
নিরপেক্ষ কর্তা ২১৫
নিরুক্ত ২৩
নির্দেশাত্মক ব্যাকরণ ২৭৮
নিষ্ঠা ১২৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১৮৭, ২৪৮, ২৪৯
পট, ফ্রিড্‌রিশ ২৭৮
পতঞ্জলি ২০, ২১, ২৩, ২৭৫
পদ ২৭৫
পদযোজক চিহ্ন ১১৪
পদবাদী ২৭৫
পদবিন্যাস (আদর্শ) ২৬৪
পাণিনি ২০, ২১, ২৩, ২৭৫, ২৮০, ২৯২
পাদচ্ছেদ ১১১
পার্শ্বধ্বনি ৭৫
পুণ্যরাজ ২৭৫
পুরুষ ১৫৩
পুরুষোত্তমদেব ২৪
পূর্ণচ্ছেদ ১১২
প্রত্যয় ১২২
প্রভাবজাত শব্দ ৩৫
প্রযোজক কর্তা ২১৫
প্রযোজ্যকর্তা ২১৫
প্রশ্নচিহ্ন ১১২
প্রাতিপদিক ১১৯
প্রাতিশাখ্য ২৩
প্রাদেশিক শব্দ ৩৪
প্রেমেন্দ্র মিত্র ২৪৮
প্রৌঢ়মনোরমা ২৩
প্লাতো ২৭৭
ফিলমোর ২৯১

বঙ্কিমচন্দ্র ৪৮, ৫০-৫২, ৫৯
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১০
বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান ২৮০
ব-শ্রুতি ৮৪
বসন্তরঞ্জন রায় ১০
বহুবচন (বিনয়ে) ১৫৭
বাংলা ব্যাকরণ (সংজ্ঞা) ২০
বাক্য (স্বরূপ) ২৫৫
বাক্যপদীয় ২৩, ২৭৫
বাক্যবাদী ২৭৫
বাক্যবিনাস (আদর্শ) ২৭৫
বাগ্‌বিধি ৪২
বাচ্য (সংজ্ঞা) ২০১
বালমনোরমা ২৩
বিদেশি শব্দ ৩১-৩৪
বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ২৯৬
বিধুশেখর শাস্ত্রী ১১
বিপ্রকর্ষ ৮২
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ৫৮
বিভক্তি (সংজ্ঞা) ২১১
বিম্‌স্‌ ২৭৯
বিমলচন্দ্র ঘোষ ২৪৮
বিষমীভবন ৮৬
বিষ্ণু শর্মা ২১
বিশেষণ ১৭৩
বিশেষ্য ১৬৭
বিস্ময় চিহ্ন ১১৩
বীরেশ্বর পাঁড়ে ১১
বৃদ্ধি ১২৩
বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অফ লিটারেচার ১০
বোয়েট্‌লিঙ্ক, ওটো ২৮০
বৈখরী ২৯২
ব্যঙ্গার্থ ৩৮
ব্যঞ্জনাগম ৮৪
ব্যাকরণ ২০, ২৩
ব্যাকরণকৌমুদী ২৪
ব্যোমকেশ মুস্তফি ১০
ব্রজকিশোর গুপ্ত ২৪
ব্রুগম্যান, কার্ল ২৭৯

ভট্টোজি দীক্ষিত ২৪
ভর্তৃহরি ২৩, ২৭৫, ২৯৩
ভাকেরনাগেল ২৭৯
ভাব (mood) ১৯৪
ভাববাচ্য ২০২
ভাষা (সংজ্ঞা) ১৮
ভাষা (স্বরূপ) ১৮

মদনমোহন তর্কালংকার ১৫৭
মদনমোহন মিত্র ২৪
মধ্যমা ২৯২
মনজুর মোরশেদ, আবুল কালাম ২৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনিরুজ্জমান ২৬
মম্মটভট্ট ২৯৩
মলিয়ের ২১
মহাপ্রাণীভবন ৮৬
মহাভাষ্য ২০
মান্য চলিত ভাষা ১৮
মানোএল, দ্য আস্‌সুম্প্‌সাও ১০, ২৪
মিশ্রশব্দ ৩৫
মিশ্রসমাস ২৪৪
মুখ্যকর্ম ১৯২
মুগ্ধবোধ ২৪
মুদ্রাদোষ (অব্যয়) ১৮৪
মেইয়ে আঁতোয়ান ২৭৯
মৌলিককাল ১৯৬

য়-শ্রুতি ৮৪
যুক্তবর্ণ (উচ্চারণ) ১২০
যোগরূঢ় ১২০
যৌগিককাল ১৯৬
যৌগিক ভাষা ২৭৯
যৌগিক শব্দ ১২০
যৌগিক স্বর (যুগ্মস্বর) ৭১

রফিকুল ইসলাম ২৬
রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ৫৭
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০, ২৫, ২৯, ৪৫, ৪৮, ৫৪, ১০৭, ১১৩, ১৫০
রাজনারায়ণ বসু ১০
রাজশেখর বসু ১০
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ২৪
রামগতি ন্যায়রত্ন ১০
রামমোহন রায় ১০, ২৪, ২৫, ১৮২, ২১২
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ২৫, ৫৯, ২১১-১৩, ২৯৭
রূঢ়, রূঢ়ি (শব্দ) ১২১
রূপমূল ২৮১
রূপান্তর সঞ্জননী ব্যাকরণ ২৮৬-৮৭
রূপান্তর সূত্র ২৮৯
রূপিম ২৯৪

রেখাচিহ্ন ১১৩
লক্ষ্যার্থ ৩৮
লিওটার্ড, এল ১০
লোহারাম শিরোরত্ন ২৪

শঙ্খ ঘোষ ১৮৭, ২৪৮
'শনিবারের চিঠি' ৫৮
শব্দ (সংজ্ঞা) ১১৯
শব্দদ্বৈত ২৫০
শরৎচন্দ্র ১১৩
শরণদেব ২৪
শহিদুল্লাহ, মুহম্মদ ২৫, ৫৩
শাকটায়নী ২৩
শিক্ষা (বেদাঙ্গ) ২৩
শিশধ্বনি ৭৫
শিশিরকুমার দাশ ২৬
শূন্য প্রত্যয় ১২৮, ১৩৭
শেখেই, আলবেয়ার ২৮০
শ্যামাচরণ শর্মা ২৪
শ্যামাচরণ সরকার ১০, ২৪
শ্যামাপদ চক্রবর্তী ২৫
শ্রীরামকৃষ্ণ ৫৩

ষত্ব ৯২

সঞ্জননী ব্যাকরণ ২৬
সঞ্জননী শক্তি ২৯৪
সংযোগমূলক ধাতু ১৯০
সংস্কৃতায়িত শব্দ ২৭
স-উপসর্গ ১৫১
সকারীভবন ৮৭
সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ১০
সত্যজিৎ রায় ৭৯
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ৫৭
সন্ধি (মৌখিক) ৯৪, ১০৫
সবিভক্তিক ভাষা ২৭৯
সমধাতুজ কর্ম ১৯৩
সমাপিকা ক্রিয়া ১৯৩
সমাস ২৩১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাস (ছদ্মবেশী) ২৪৭
সমাসসৌষ্ঠব ২৪৮
সমাসান্ত প্রত্যয় ২৪৬
সমীকরণ ৮৫
সম্প্রদান ২১৭
সম্প্রসারণ ১২৩
সম্বন্ধ পদ ২১৯
সম্বোধন পদ ২২০
সর্বনাম ১৭০
সহরূপ মূল ২৮১
সাধুভাষা ১৯, ৪৮
সাপির, এডোয়ার্ড ২৮১
'সারস্বত সমাজ' ১০
সিদ্ধান্তকৌমুদী ২৪
সীরদেব ২৪
সুকুমার রায় ২১, ৭৩, ৭৬
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ২৪৮
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯, ২৪, ২৫, ৫৮, ৭২, ১১৯, ১৯০-১, ২১৪, ২৫৮, ২৯৯
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২৪৯
সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৮৭, ২৪৮
সুর ১০৯
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ১০
সুশীল রায় ২৪৮
স্পর্শ বর্ণ ৭২
স্যোসুর, ফার্দিনন্দঁ দ্য ২৮০, ২৯২
স্বতোনাসিক্যীভবন ৮৭
স্বরবর্ণ ৬৫, ৬৭
স্বরসঙ্গতি ৮২
স্বরাগম ৮৪
স্বাভাবিক ণত্ব ৯১
স্বাভাবিক ষত্ব ৯২

হ-কারলোপ প্রবণতা ৮৬
হর্টন, জি.সি. ৮
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১১, ২৫, ১৯১, ২১২
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১০
হুম্‌বোল্ট, ফন ভিল্‌হেল্ম ২৭৯, ২৮০, ২৯২
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ৫৮
হ্যারিস, জেলিগ এস্‌ ২৯২
হ্যালহেড ৮, ২৪, ২৬

Addition ২৯০
Asyndeton ১৮৬

Competence ২৮৬, ২৯২
Copying ২৯০

Deep Structure ২৮৭, ২৯১

Elision ২৯০
Erzengung ২৮০

IC analysis ২৮১

Langue ২৮০
Loop ২৮৭

Nominative Absolute ২১৪
Nexus ২৬৩
Nesting ২৮৩

'Origin of Species' ২৮০

Period ২৬৭
Performance ২৮৬, ২৯২
Polysyndeton ১৮৬

Reordering ২৯০
Reporting Verb ২৬২

Surface structure ২৮৬, ২৯১

Tongue-twister ৭৯
Tree diagram ২৮২
T-rule ২৯৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~